মাধ্যমিক
রসায়ন বিজ্ঞান

[উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর
ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত]

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, পি-এইচ. ডি.
কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের
রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) ঃঃ কলিকাতা ১২

MADHYAMIK RASAYAN BIJNAN

CHEMISTRY IN BENGALI

for **Higher Secondary Students**

By Dr. P. C. RAKSHIT, Ph. D.

Price : Rs. 11·00 (Rupees Eleven) only

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭

মূল্য : ১১·০০ (এগার টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর :
প্রথম ভাগ : শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা
দ্বিতীয় ভাগ : শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি. হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিক

বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বহুল প্রসারের এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে ইহা না করিতে পারিলে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হইবে না অথবা বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তার লাভ করিবে না। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের পক্ষেও বিজ্ঞানের আলোচনা ও পঠন-পাঠন মাতৃভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। ইহাতে শিক্ষার্থীদের বুঝিবার যেমন সুবিধা হইবে, বিদেশী ভাষার ভারমুক্ত হওয়ার ফলে তেমনই সময়ের অপব্যয়েরও লাঘব হইবে।

প্রয়োজনসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বাংলাভাষাতেই বিজ্ঞানের পুস্তক তেমন ভাবে লেখা হয় নাই এবং বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব। বর্তমানে অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রচলন হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা সামান্য। কোন কোন ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দগুলি সহজবোধ্য নয় এবং সমুচিত অর্থবোধকও নয়। ফলে উহা শিক্ষার্থীর মনে ভীতি সঞ্চার করে। এই কারণেই বিজ্ঞান-পুস্তকের পঠন ও লিখন উভয়ই দুরূহ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, বর্তমানে যাঁহারা বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে ব্যাপৃত, তাঁহারা নিজেদের ছাত্রাবস্থায় ইংরেজীতে পড়াশুনা করিয়াছেন এবং সেই ভাষাতেই অধ্যাপনাতে অভ্যস্ত। পুরাতনের অভ্যাস-মুক্ত হইয়া নূতন পরিভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানে যে পরিশ্রম প্রয়োজন তাহা স্বীকার করিতে ইঁহাদের অনেকেই আগ্রহশীল নহেন। কিন্তু যে স্বল্প কয়েকজন গত কয়েক বৎসর বাংলাতে পড়াইয়াছেন তাঁহাদের অভিমত এই যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পঠন-পাঠন শিক্ষার্থীদের পক্ষে অধিকতর সহজ এবং কল্যাণকর। যে সময়েই বাংলাতে বিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টা করা হইবে সেই সময়েই শিক্ষকদিগকে প্রাথমিক পরিশ্রমের কষ্টটুকু স্বীকার করিতে হইবে। যত শীঘ্র উহা বরণ করা যায়, ততই মঙ্গল।

কাহারও কাহারও ধারণা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে পরবর্তী কালে উচ্চতর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি বুঝিতে অসুবিধা হইবে। কিন্তু

এই আপত্তি যুক্তিপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সাহিত্য হিসাবে ছাত্ররা ইংরেজী শিখিবেই এবং ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ছাত্র ইংরেজীতে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবে না, এরূপ হইতে পারে না। বর্তমানে কলেজ-জীবনে শিক্ষার্থীরা জার্মান বা ফরাসী ভাষা শেখে না। কিন্তু গবেষণাকার্যে এই সকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সাহায্যের প্রায়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছাত্রজীবনে এই সকল ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়েন নাই বলিয়া কোন গবেষক এই সব ভাষা শিখিয়া গবেষণামূলক গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, এমন শোনা যায় না। যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক, বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে এবং সেই প্রয়োজন অনুভব করিয়াই বর্তমান প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি।

পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পুস্তকে যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অধিকাংশই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিভাষা হইতে গৃহীত। অন্যান্য শব্দগুলি লেখকের নিজেরই চয়ন করিতে হইয়াছে। এই শব্দগুলি সর্বজনগ্রাহ্য এবং প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা এখন বলা যায় না। বিভিন্ন লেখকের চেষ্টায় কালে সঙ্গত পরিভাষা গড়িয়া উঠিবে, এখন প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা যাইতেছে মাত্র। প্রচলিত পরিভাষারও কোন কোন স্থলে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিতে হইয়াছে, অর্থের প্রাঞ্জলতার অজুহাতে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। 'Catalyst'-এর প্রচলিত পারিভাষিক অনুবাদ—'অনুঘটক'। কিন্তু এই গ্রন্থে অনুঘটকের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য 'প্রভাবক' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে পরিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হইল। বস্তুসমূহের ইংরেজী রাসায়নিক নামই রাখা হইয়াছে কিন্তু উহাদের বাংলা অক্ষরে বানান করা হইয়াছে।

শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠ লওয়ার সময় ইংরেজী বা বাংলা পরিভাষার কোন আপেক্ষিক গুরুত্ব নাই, একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বুঝাইয়া উহাকে 'distillation' বা 'পাতন' বলায় কোন পার্থক্য নাই, এবং পরে তাহার পাতন-ক্রিয়া বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কারণ নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা শব্দটি অধিকতর সহজ মনে হইবে—যেমন, 'mordant' অপেক্ষা 'রাগবন্ধক' কথাটি স্পষ্টতর।

আমার পরম স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী এবং ছাত্র শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত আমাকে এই পুস্তক প্রণয়নে বহুরকম সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইঁহাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত কখনও ইহা আমি সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। ইঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করিয়া নিজেকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবুও নাম উল্লেখ না করিলে মনে অস্বস্তি থাকিয়া যাইবে বলিয়াই এই ভূমিকায় তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতা ও একান্ত আগ্রহ ব্যতীত ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত না। তাঁহাকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা

১লা আষাঢ়, ১৩৫৯ শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান' বইখানি ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লেখা হইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যে উহার তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত নিঃশেষিত হওয়ায় মনে হয়, বইখানি ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছিল। এখন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস উঠিয়া গিয়াছে। পাঠ্যসূচীর অধিকাংশ বিষয়গুলি এখন স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে অথবা প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীতে (Pre-University) পড়ান হইবে। পুরাতন বইখানি এই সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে গুরুভার হইবে। সেইজন্য এই নূতন সংস্করণ বর্তমান একাদশ-শ্রেণীর স্কুলের এবং প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিয়া প্রকাশ করা হইল। আশা করি এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষেই এই পুস্তকটি পাঠের উপযোগী বিবেচিত হইবে। এই সংস্করণে পুরাতন বইখানির অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি মাত্র পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অবশ্য কয়েকটি অধ্যায়ের বিশেষ পরিবর্তনও প্রয়োজন হইয়াছে। একাদশ-শ্রেণী স্কুলের বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল শাখার নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর রসায়নের সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয়গুলি এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। যদিও পাঠ্যসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয় নাই।

বিহারের একাদশ-শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হইয়াছে উহাও সম্পূর্ণ এই বইতে রহিয়াছে। প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ ও উৎসাহেই এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হইল।

কলিকাতা
দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৭

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ অবতরণিকা—রসায়ন-চর্চার ইতিহাস ১-৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জড়পদার্থ ঃ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ৭-২৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাধারণ পরীক্ষা-প্রণালী ২৯-৫০
চতুর্থ অধ্যায় ঃ জড় পদার্থের নিত্যতাবাদ ঃ বস্তুর অবিনাশিতা ৫০-৫৬
পঞ্চম অধ্যায় ঃ রাসায়নিক সংজ্ঞা ঃ চিহ্ন, সঙ্কেত ও সমীকরণ ৫৬-৬০
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রাসায়নিক সংযোগ-বিধিসমূহ ৬০-৬৮
সপ্তম অধ্যায় ঃ গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থাগত ধর্ম ৬৮-৭৭
অষ্টম অধ্যায় ঃ আণবিক ও পারমাণবিক গুরুত্ব ৭৮-৮৩
নবম অধ্যায় ঃ গ্যাসায়তন সূত্র ঃ অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প ৮৩-১০১
দশম অধ্যায় ঃ যোজ্যতা ও যোজনভার ঃ তুল্যাঙ্ক নির্ণয় ১০১-১২২
একাদশ অধ্যায় ঃ পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় ১২৩-১২৯
ডুলং পেটিট সূত্র—সমাকৃতি সূত্র
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ তড়িৎ-বিশ্লেষণ ১২৯-১৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ অম্ল, ক্ষারক ও লবণ ১৪৪-১৫৬
রাসায়নিক বিক্রিয়া
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ পরমাণুর গঠন ১৫৭-১৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড অধাতব মৌল

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ হাইড্রোজেন ১৬৭-১৭৮
ষোড়শ অধ্যায় ঃ অক্সিজেন ১৭৯-১৯৮
অক্সাইড—জারণ ও বিজারণ—বহুরূপতা—ওজোন
সপ্তদশ অধ্যায় ঃ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ ১৯৮-২১৭
জল—জলের খরতা—হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড
অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ বায়ু ও তাহার উপাদান ঃ নাইট্রোজেন ২১৭-২৩০
উনবিংশ অধ্যায় ঃ নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ ২৩১-২৬৬
বিংশ অধ্যায় ঃ হ্যালোজেন গোষ্ঠী ২৬৬-৩০৮
একবিংশ অধ্যায় ঃ ফসফরাস ৩০৯-৩২১
দ্বাবিংশ অধ্যায় ঃ সালফার ৩২২-৩৬০

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় খণ্ড : জৈব-রসায়ন

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় :	কার্বন (অঙ্গারক)	৩-২১
	বহুরূপতা—কার্বন-ডাই-অক্সাইড—কার্বন মনোক্সাইড	
চতুর্বিংশ অধ্যায় :	জৈব-পদার্থ	২১-২৯
পঞ্চবিংশ অধ্যায় :	হাইড্রোকার্বন	৩০-৫৫
	মিথেন—ইথিলীন—অ্যাসিটিলীন—জ্বালানি গ্যাস—ক্লোরোফর্ম—আয়োডোফর্ম	
ষড়বিংশ অধ্যায় :	কোহল ও ইথার	৫৬-৬৫
সপ্তবিংশ অধ্যায়	অ্যালডিহাইড এবং কিটোন	৬৬-৭৩
অষ্টাবিংশ অধ্যায় :	জৈব-অ্যাসিড	৭৩-৮৫
	তৈল—চর্বি—মোম	
উনত্রিংশ অধ্যায়	শর্করা : কার্বোহাইড্রেট	৮৬-৯৩
	খাদ্য ও রসায়ন—ভাইটামিন	
ত্রিংশ অধ্যায় :	বৃত্তাকার জৈব-পদার্থ	৯৩-১০৫
	বেন্‌জিন—টলুইন—নাইট্রোবেনজিন—অ্যানিলীন—ফিনোল—বেনজয়িক অ্যাসিড	

চতুর্থ খণ্ড

একত্রিংশ অধ্যায় :	ধাতুসমূহ : সোডিয়াম	১০৬-১৩৭
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় :	ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম	১৩৭-১৫৮
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় :	জিঙ্ক (দস্তা)	১৫৮-১৬২
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় :	আয়রন (লৌহ)	১৬৩-১৭৮
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় :	লেড (সীসক) এবং কপার (তাম্র)	১৭৮-১৯৪
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় :	রাসায়নিক গণনা	১৯৪-২৪৬
পরিভাষা		২৪৭-২৬১
মৌলপঞ্জী		২৬২-২৬৪

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

সৃষ্টির আদি হইতেই মানবমনে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জাগিয়াছে। বহু উপায়ে মানুষ এই জিজ্ঞাসার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে মানুষ বুঝিয়াছে জড়, শক্তি ও চেতনা এই তিনটি উপাদানের সাহায্যে এই বিশ্বজগতের প্রকাশ। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে জড় ও শক্তির অস্তিত্ব বা পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। জড় ও শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া থাকে।

বিশ্বের বৈচিত্র্য এবং তাহার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ইত্যাদির সাহায্যে সত্যে প্রমাণিত করে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা যখন এই সমস্ত জ্ঞানকে যুক্তিসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ করা হয়, তখন দেখা যায় যে বিশ্বজগতের অসংখ্য ঘটনা কতকগুলি বিধি বা নিয়মের অনুবর্তী। এই বিধি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস জগতের ঘটনা-পরম্পরা কতকগুলি শৃঙ্খলা বা নিয়মের বন্ধনে চলে এবং এই নিয়মগুলি দেশকাল-নির্বিশেষে শাশ্বত। প্রকৃতির রাজ্যে কোন খামখেয়ালী ঘটনার সংঘটন সম্ভব নয়, সব কিছুকেই নিয়মের প্রতিপত্তি মানিয়া চলিতে হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে জলের সৃষ্টি হইয়াছে—এই সত্যটি সনাতন এবং দেশকালভেদেও ইহা অক্ষুণ্ণ থাকে। অতীতে আমরা দেখিয়াছি যে জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে ভবিষ্যতেও যে কোন দেশে জল হইতে এই দুইটি উপাদানই পাওয়া যাইবে। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা নিয়ম সম্বন্ধেই এই অক্ষুণ্ণ অনুবর্তিতা প্রযোজ্য।

আমাদের বিজ্ঞান-সাধনার দুইটি দিক আছে। মানুষ তাহার ক্ষুৎপিপাসা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার প্রয়োজনে বিজ্ঞানের চর্চা করে। ইহা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে সরল নিয়মের অনুসন্ধান করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও মানুষ চেষ্টা

করে। ইহাকে বিজ্ঞানের দার্শনিক দিক বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, এই দিকটি মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসার ফল। এই দিকে আমরা যত অগ্রসর হই, আমাদের জ্ঞানের পরিধিও তত বৃদ্ধি পায় এবং উহার সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগেরও উন্নতি হয়।

প্রকৃতির নানা বিচিত্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বিজ্ঞানের প্রধান কাজ এবং ইহার ফলে মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সব জ্ঞান আবার বহু রকমের। আলোচনার সুবিধার জন্য বিজ্ঞানেরই নিয়ম অনুসারে এই তথ্যগুলিকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে—যেমন, **পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীব-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা** ইত্যাদি। এইভাবে বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ধারার উৎপত্তি হইয়াছে।

রসায়নবিদ্যা ঃ জড় জগৎ বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে গঠিত। আমরা জগতে বহু রকমের বস্তু বা পদার্থের সংস্পর্শে আসি, তাহাদের আকার-প্রকার, গুণাবলী সবই বিভিন্ন—তাহাদের কোন কোনটি হয়ত দেখাও যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা উহাদের সকলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আবার নিজেদের স্বাভাবিক ধর্মে অথবা নানারকম শক্তির সাহায্যে এই সকল পদার্থের নিরন্তর অগণিত পরিবর্তন হইতেছে। বীজ বপন করিলে জল, বায়ু ও মৃত্তিকার সাহায্যে উহা হইতে গাছ এবং পরে ফুল-ফল সবই হইতেছে। খাদ্য হইতে শরীরের অভ্যন্তরে রক্তমাংসের সৃষ্টি হইতেছে এবং শক্তির সঞ্চার হইতেছে। তেল পুড়িয়া বাষ্প ও অঙ্গারাম্লে পরিণত হইতেছে এবং আলো ও উত্তাপ বিকিরণ করিতেছে—এই রকম বস্তু মাত্রেরই কোন না কোন রকম পরিবর্তন সম্ভব। পদার্থের গঠন ও গুণ, তাহাদের প্রস্তুতি-প্রণালী এবং নানা অবস্থায় তাহাদের বিভিন্ন পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাই '**রসায়ন-বিদ্যা**'।

রসায়নচর্চার ইতিহাস ঃ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্তমান যুগের রসায়নেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু রসায়নের আলোচনায় পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির অবলম্বন খুব বেশী দিনের নয়। বস্তুতঃ, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রসায়নে ধারাবাহিক গবেষণা বা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত তথ্যে উপনীত হওয়ার কোন প্রচেষ্টা দেখা

যায় নাই। কিন্তু বিজ্ঞান হিসাবে রসায়নের চর্চা না হইলেও বহুবিধ শিল্পে রসায়নের নানা প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ কয়েক হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কালে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে যে এই শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল, একথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। প্রায় সেই সময় চীনদেশেও বোধ হয় অল্পবিস্তর রসায়ন-চর্চা হইয়াছিল। সেই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার যুগে এদেশে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ হইতে নানারূপ ধাতু প্রস্তুত হইত। তখনকার দিনেও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিদ্‌গণ ভারতে গাছপালা ও নানা খনিজ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, ইহাতে যে নানা রকমের রাসায়নিক প্রস্তুতি-প্রণালীর প্রয়োজন হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু ব্যবহারিক দিক হইতেই নয়, দার্শনিক দিক হইতেও হিন্দুরা রসায়নের গভীর পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের ছয়-সাত শত বৎসর পূর্বে হিন্দু দার্শনিক **কণাদ** বস্তুর গঠন সম্বন্ধে তাঁহার পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রসায়নশাস্ত্রের উপর হিন্দুদের এই অধিকার কয়েক শত বৎসর অন্ততঃ অক্ষুণ্ণ ছিল। কেননা, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগেও **নাগার্জুনকে** আমরা বিভিন্ন ব্যবহারিক রসায়নের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে দেখি; তাঁহার কোন কোন প্রণালী আজ পর্যন্তও অনুসরণ করা হয়।

হিন্দু-সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ ও সংস্পর্শের ফলে রসায়ন গ্রীসে প্রবেশ লাভ করে। গ্রীক-সভ্যতার যুগে রসায়ন সেখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। **লিউকিপ্পাস্‌** হইতে **অ্যারিস্টোট্‌ল** পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা গ্রীক দার্শনিক জড়-পদার্থের গঠন ও উপাদান সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচার করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীস হইতে রসায়ন মিশরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। মিশরীয়গণ দ্বারা নীল-উপত্যকার কালো মাটিতে এবং আলেকজেন্দ্রিয়ার ধাতু ও কাচ প্রস্তুতিতে এই সকল মতবাদের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মিশরের একটি নাম **'কিমিয়া'** অর্থাৎ 'কালো জমি'—এই 'কিমিয়া' নাম হইতেই সম্ভবতঃ রসায়নের বর্তমান ইংরেজী নাম 'Chemistry' উদ্ভূত। মিশরীয় যুগের শেষে আরবীয়গণ মিশর হইতে অনেক রাসায়নিক পদ্ধতি ও প্রণালী আনিয়া বাগদাদে উহার প্রচলন করেন। সেই সময় রসায়নের নামকরণ হইয়াছিল **'অ্যালকেমি'** এবং অ্যালকেমিবিদদের প্রধান ছিলেন **'জাবের'**। জাবের এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বহুরকমের পরীক্ষা

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রসায়নের এই ঐস্লামিক প্রবাসের দিনে বিশেষ কোন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে কতকগুলি অর্ধসত্য ও কুসংস্কার রসায়নচর্চায় স্থান পাইয়াছিল। অনেক আরবীয় রসায়নবিদ্ মনে করিতেন রসায়নচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য **'পরশপাথর'** আবিষ্কার, যাহার সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হইবে। আরব হইতে স্পেনের মধ্যবর্তিতায় রসায়ন-আলোচনা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু প্রায় তিনশত বৎসর [illegible] ইহার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। এই সময়ে তথাকথিত ইউরোপীয় রাসায়নিকেরা মনে করিতেন রসায়ন রাতারাতি ধনী হইবার উপায়। বস্তুতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ লোককে প্রতারিত করার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে 'প্যারাসেল্‌সাসের' নেতৃত্বে একদল রসায়নবিদের অভ্যুদয় হয়। ইহারা মনে করিতেন যে রসায়নের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনকে সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত করিয়া অমরত্ব দেওয়া। সুতরাং রসায়ন কিয়ৎকালের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে রসায়নে কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কাজও হইয়াছিল।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি রসায়নে প্রথম প্রবর্তিত হয় সপ্তদশ শতকে **রবার্ট বয়েলের** সময় হইতে। এই সময় হইতেই বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার চেষ্টা হয় এবং পরীক্ষার ফল হইতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ দেখা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে রসায়নের মৌলিক তথ্য আবিষ্কারের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে **ল্যাভয়সিয়র** ও **বার্থোলে**, ইংলণ্ডে **প্রিস্টলী** ও **ক্যাভেণ্ডিস, সুইডেনে সিলে** প্রভৃতি মনীষীরা বহু পরীক্ষাসম্মত মতবাদ দ্বারা রসায়নকে প্রকৃতরূপে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। বায়ুর মিশ্রগঠন, জড়ের নিত্যতাবাদ প্রভৃতি প্রমাণ করিয়া ইহারা, বিশেষতঃ ল্যাভয়সিয়র, রসায়নচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করেন এবং ইহাকে একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানে পরিণত করেন। আজ পর্যন্তও এই গবেষণা ও পরীক্ষার ধারা অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে এবং বহু তথ্যের আবিষ্কারে উত্তরোত্তর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়াছে। আজ এই অনুসন্ধিৎসা সমগ্র জগতে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই ইহার তথ্যনিরূপণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য অভূতপূর্ব গবেষণা চলিয়াছে।

রসায়ন ও তাহার ব্যবহার ঃ বর্তমানে রসায়নের চর্চা এতটা ব্যাপকভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে যে ইহা নিজের গণ্ডি ছাড়াইয়াও অন্যান্য বিজ্ঞান-শাখার সহিত কোন কোন স্থানে সহব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি আজ আর রসায়নের সাহায্য ব্যতীত পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের ব্যবহারিক প্রয়োগও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কৃষক আসিয়া আজ তাহার জমির জন্য 'সার' তৈয়ারী করিতে বলিতেছে। চিকিৎসাবিদের ঔষধ রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হইতেছে। খনিজ হইতে লৌহ, তামা প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য উৎপাদনকারীরা রসায়নের দুয়ারে ভিড় করিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারের বিশেষ রকমের ইস্পাত চাই, চর্মকার তাহার চামড়া উন্নততর করিতে চায়, কুম্ভকারের চাই পর্সেলীনের জন্য চিক্কণ লেপ, এই রকম আরও কত কি? মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার সঙ্গে রসায়ন ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইতেছে।

অন্নবস্ত্রের চাহিদা, রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যোন্নতি—এইগুলি আমাদের জীবনের প্রধানতম সমস্যা। রসায়ন নানারকমে এইসকল সমস্যার সমাধানে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

কৃত্রিম সার প্রয়োগে খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তম বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষিত করিয়া উন্নততর শস্য উৎপাদন করা হইয়াছে। রসায়নের কল্যাণেই এ সকল সম্ভব হইয়াছে। নানারূপ কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে শস্যের বিনাশ বন্ধ হইয়াছে। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাসায়নিক দীর্ঘদিন খাদ্যসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া শস্যের অপচয় নিবারণ করিয়াছে। অপর দিকে, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম তন্তু ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রসায়ন বস্ত্রসমস্যার সমাধানেও সাহায্য করিয়াছে, এবং নানা উন্নত-শ্রেণীর পরিধেয় সৃষ্টি করিয়াছে, তদুপরি নানা বর্ণের সমাবেশে উহাদের সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে।

রাসায়নিক গবেষণাগারে ভাইটামিন ও শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া খাদ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। ফলে, মানুষ স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারিয়াছে। আবার, নিউমোনিয়ার জন্য পেনিসিলিন, কালাজ্বরে ইউরিয়া ষ্টিবামিন, ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন, অ্যাটেব্রিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রসায়ন

মানুষের রোগমুক্তিতে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছে। শুধু তাই নয়, আয়োডিন, ডি. ডি. টি., ফিনাইল ইত্যাদির দ্বারা রোগজীবাণুর ধ্বংস সাধনের ফলেও আমরা অনেকটা নিরাপদ হইয়াছি। রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রয়োগে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হইয়াছে। ক্লোরোফর্ম, নোভোকেন জাতীয় চেতনানাশক দ্রব্যের ব্যবহারে অস্ত্রোপচার সহনীয় হইয়াছে। এই সকলই রসায়নের কাজ।

ইহা ছাড়াও মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রসায়নের অবদান অসংখ্য। রসায়নের প্রয়োগশালাতে আসিয়া বিস্মিত নয়নে দেখি, কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে হীরকখণ্ড, আলকাতরা হইতে পাওয়া যাইতেছে নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট রঙ, সুগন্ধি ও ঔষধ। রাসায়নিক বলেন চিনি, কাগজ আর স্পিরিট একই মৌলিক পদার্থের সাহায্যে সৃষ্টি হইয়াছে। কাঠ আর বাঁশ হইতে পাওয়া যাইতেছে কাগজ, সেলুলয়েড, আরও কত কি? কৃত্রিম উপায়ে প্লাস্টিক তৈয়ারী করিয়া উহা হইতে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। এই সবই মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রকৃতির অভাব রসশালাতে আজ পরিপূরণ হইতেছে—কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম পেট্রোল, আরও সহস্র রকমের বস্তুর উৎপাদনে জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ করার প্রয়াস চলিতেছে।

বহু-প্রচলিত শিল্পেরও উন্নতি-সাধন করিয়া রসায়ন মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আকরিক হইতে নানাবিধ ধাতু নিষ্কাশন ও বিভিন্ন মিশ্রধাতুর উৎপাদনের ফলে যন্ত্রশিল্প সম্ভব হইয়াছে, যানবাহন, এরোপ্লেন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারা গিয়াছে। উন্নততর গ্যাসোলীন, ডিজেল তেল, কৃত্রিম পেট্রোল, কৃত্রিম রবার না থাকিলে এত সহজে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ কি সম্ভব হইত?

অবশ্য রসায়নের পরীক্ষাগারেই আবার যত বিস্ফোরক আর বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নাশ হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতালোভী রাজপুরুষ ও রাজনীতিবিদেরা যদি কোন রাসায়নিক আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ করিয়া সমাজের ধ্বংস সাধন করেন, তাহার জন্য রসায়ন দায়ী হইবে কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

জড় পদার্থ

২-১। পদার্থঃ বস্তুজগতে আমরা অনেক রকম পদার্থের সংস্পর্শে আসি। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকি। সুতরাং পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা আমরা পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করি। পদার্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই পদার্থ নহে। যথা, স্পর্শের দ্বারা আমরা উত্তাপ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু উত্তাপ পদার্থ নহে, শক্তিবিশেষ।

পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ বা ধর্ম থাকে। প্রথমতঃ, পদার্থ স্থান অধিকার করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত পদার্থেরই কিছু না কিছু ওজন থাকিবে। শক্তির কোন ওজন নাই। তৃতীয়তঃ, চাপের সাহায্যে যে কোন প্রকার পদার্থের ভিতর গতিবেগ সঞ্চার করা সম্ভব। যেমন, একটি টেবিল সাধারণতঃ নিশ্চল অবস্থায় আছে, কিন্তু একদিক হইতে উহাতে যথেষ্ট চাপ দিলে উহা অপরদিকে সরিয়া যাইবে, উহাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হইবে। প্রত্যেক পদার্থেরই এই তিনটি গুণ থাকে। অতএব বলা যায়, **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ওজন-বিশিষ্ট, স্থানব্যাপী ও চাপ-শক্তির প্রভাবে গতিশীল বস্তুই** পদার্থ।

২-২। পদার্থের অবস্থাভেদঃ আমরা পদার্থসমূহকে তিন অবস্থায় দেখিতে পাই :—(১) **কঠিন,** (২) **তরল,** ও (৩) **গ্যাসীয় অবস্থা।**

কঠিন পদার্থঃ কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। তাহা ছাড়া, বাহির হইতে বলপ্রয়োগ ব্যতীত তাহাদের আকারের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়; অর্থাৎ কঠিন পদার্থের খানিকটা দৃঢ়তা আছে। কাঠ, লবণ, বালু, লৌহ, স্বর্ণ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ।

তরল পদার্থঃ তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার নাই। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে। যে পাত্রে রাখা যায়, ইহা তাহার আকার ধারণ করে। এক গ্লাস জল একটি থালাতে ঢালিয়া দিলে উহা থালার আকার ধারণ করে, কিন্তু

আয়তন একই থাকে। ইহা ছাড়া, তরল পদার্থ সর্বদাই নীচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং তরল পদার্থের উপরিভাগ সর্বদা সমতল থাকে। জল, তেল, পারদ, মধু ইত্যাদি তরল পদার্থ।

গ্যাসীয় পদার্থ ঃ গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকারও নাই, আয়তনও নাই। উহারা যত স্বল্পই হউক, যে পাত্রে থাকিবে তাহার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া সেই পাত্রের আকার ধারণ করিবে। গ্যাসীয় পদার্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ-ক্ষমতা অধিক। চাপে পড়িয়া সঙ্কুচিত হওয়ার ধর্মকে গ্যাসের **সংনম্যতা (compressibility)** বলে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি গ্যাসীয় পদার্থের উপর যত চাপ দেওয়া যায় ততই উহার আয়তন কমিয়া যায়; আবার চাপ কমাইয়া দিলেই উহার আয়তন প্রসার লাভ করে। কঠিন ও তরল পদার্থের এই ধর্ম প্রায় নাই বলিলেই চলে। বায়ু, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ।

পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ, একই পদার্থ তিনটি বিভিন্ন অবস্থাতেই থাকিতে পারে। যেমন বরফ, জল ও বাষ্প একই পদার্থ, একই উপাদানে গঠিত। কঠিন বরফকে উষ্ণ করিলে তরল অবস্থায় অর্থাৎ জলে পরিণত হয় এবং জলকে ফুটাইলে বাষ্পে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রেই উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণতি সম্ভব। অবশ্য, বিভিন্ন পদার্থের এই অবস্থান্তর ঘটাইতে বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। জল যতটুকু উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়, পারদকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করিতে হইলে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী উষ্ণ করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে উত্তাপের সাহায্যে কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় যাওয়া যায়। যেমন কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি। সকল বস্তুই যে উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কাঠকে খুব উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়, তরলতা আসে না।

২.৩। পদার্থের ধর্ম ঃ প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কতকগুলি ধর্ম বা গুণ আছে। কোন পদার্থকে জানিতে হইলে উহার ধর্মগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন; যেমন, জলের কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা হইতে

সহজেই আমরা জল চিনিতে পারি। জল স্বচ্ছ, জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে ০° এবং ১০০° সেন্টিগ্রেড। জলে লবণ, চিনি ইত্যাদি দ্রব হইয়া থাকে, বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত এবং আরও অনেক ধর্মের দ্বারা আমরা জলের স্বরূপ চিনিতে পারি। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থের কতকগুলি **ধর্ম** আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের ধর্মগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করেন। (১) **অবস্থাগত ধর্ম বা ভৌত ধর্ম (physical properties)**; (২) **রাসায়নিক ধর্ম (chemical properties)**। যে সমুদয় ধর্ম হইতে শুধু পদার্থের বাহ্যিক অবস্থা ও ব্যবহার বুঝা যায় তাহাকে উহার **অবস্থাগত ধর্ম** বলে। কিন্তু পদার্থের কোন ধর্ম প্রকাশে যদি পদার্থটি নিজেই ভিন্ন কোন বস্তুতে পরিণত হইয়া যায় তাহা হইলে সেই সব ধর্মকে **রাসায়নিক ধর্ম** বলা হয়। অর্থাৎ যে ধর্মের জন্য বস্তুর মৌলিক রূপান্তর (অবস্থান্তর নহে) ঘটে, তাহাই রাসায়নিক ধর্ম। জল স্বচ্ছ, জল ১০০° ডিগ্রী উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়—এই সকল উহার অবস্থাগত ধর্ম। কেননা, এই গুণাবলী দ্বারা উহার বাহ্যিক অবস্থা প্রকাশ পায় এবং বাষ্পে পরিণত হইলেও কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু জলের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হইলে সর্বদাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। অথবা জলের ভিতর এক টুকরা সোডিয়াম দিলে জল ক্ষারে পরিণত হয়। এই সকল প্রকৃতি বা ধর্ম হেতু জল নূতন বস্তুতে পরিণতি লাভ করে। এই ধর্মগুলিকে উহার রাসায়নিক ধর্ম বলা হয়।

অনেক সময় ভৌত ধর্ম যেমন বর্ণ, গন্ধ, স্ফটিকাকৃতি প্রভৃতির সাহায্যে উহাকে চিনিতে পারা সম্ভব। তুঁতে নীল এবং চিনি সাদা, অক্সিজেন বর্ণহীন কিন্তু ক্লোরিন গ্যাস সবুজ, তামা লালচে আর টিন সাদা। এই সকল ক্ষেত্রে রঙ দেখিয়াই উহাদের চিহ্নিত করা সম্ভব। আবার জল ও কোহল উভয়েই বর্ণহীন, কিন্তু বিশিষ্ট গন্ধের সাহায্যে কোহলকে চেনা যায়। সেইরূপ অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস উভয়েই বর্ণহীন, কিন্তু অক্সিজেনের গন্ধ নাই, অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ আছে। এসকল ক্ষেত্রে গন্ধ বস্তুটিকে চিনিতে সাহায্য করে। কোন কোন সময় স্পর্শের সাহায্যেও বিভিন্ন বস্তু চিহ্নিত করা সম্ভব। ময়দা ও চিনি, অথবা গ্র্যাফাইট ও লৌহ উহাদের স্পর্শ করিয়াও বলা যায়।

বস্তুর গুরুত্বও সময় সময় এক হইতে অপরকে পৃথকভাবে চিনিতে সাহায্য করে, যেমন অ্যালুমিনিয়াম খুব হাল্কা আর সীসা খুব ভারী। ফটকিরির স্ফটিক চিনির স্ফটিক হইতে

বিভিন্ন, সুতরাং স্ফটিকাকৃতি দেখিয়া উহাদের কোন্‌টি কি জানা সম্ভব। লোহা এবং সীসা চিনিতে হইলে উহাদের চুম্বকত্ব পরীক্ষাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কখনও কখনও জলে দ্রাব্যতা দেখিয়াও জিনিস চিনিতে পারা যায়—যেমন চিনি জলে দ্রাব্য, বালু অদ্রবণীয়।

পক্ষান্তরে, রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে বস্তু সনাক্ত করাই সাধারণ রীতি। কয়লা পোড়াইলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়, উহা পরিষ্কার চুনের জলের সংস্পর্শে আসিলেই চুনের জল ঘোলাটে ও সাদা হইয়া যায়। ইহা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এই রাসায়নিক গুণ হইতেই উহাকে সর্বদা চিহ্নিত করা হয়।

২-৪। পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ঃ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষণে আমরা অসংখ্য রকম পদার্থের সংস্পর্শে আসি। এই সকল বিভিন্ন পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকের কতকগুলি নিজস্ব ধর্ম আছে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে, তাহাদের আকার-আয়তন ইত্যাদিও এক নয়, কিন্তু তাহারা একই উপাদানে গঠিত বা একই বস্তু হইতে উৎপন্ন। যেমন কলের পাইপ, কলমের নিব, বুনসেন দীপ, ঘরের কড়ি ইত্যাদি সবই বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু একই উপাদান লৌহদ্বারা তৈয়ারী।

পদার্থের কোন শ্রেণীগত বিভাগ করিতে হইলে উহাদের উপাদানের কথাই প্রথমে ভাবিতে হইবে। প্রত্যেকটি পদার্থ যে একটি মাত্র উপাদানে গঠিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। দুধ যেমন জল, স্নেহদ্রব্য, শর্করা, প্রোটিন ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে তৈয়ারী, সেই রকম কাদামাটিতেও আমরা বহু রকমের কঠিন দ্রব্য এবং জল দেখিতে পাই। সুতরাং অনেক পদার্থে দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই সকল মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলি পদার্থটির সমস্ত অংশে সমান অনুপাতে নাও থাকিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যদি কিছুটা নদীর জল একটি কাচের গ্লাসে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় নীচের দিকে অনেকটা মাটি ও বালি জমা হইয়াছে। গ্লাসের উপরের অংশে জল ও মাটির অনুপাত নীচের অংশের অনুপাতের সমান নয়। আবার অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে পদার্থটির যে কোন অংশে উপাদানগুলির অনুপাত একরকম। যেমন—দুধ একটি গ্লাসে রাখিলে উহার যে কোন অংশে জল বা প্রোটিন বা শর্করার অংশ একই দেখা যায়। বলা বাহুল্য, যে সমস্ত পদার্থে একটি মাত্র উপাদান

আছে, উহা কাহারও সহিত মিশ্রিত নয়, তাহাদের সমস্ত অংশই একই ভাবে গঠিত।

যে সকল মিশ্রিত পদার্থে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত বিভিন্ন অংশে অ-সমান তাহাদিগকে **অ-সমসত্ত্ব পদার্থ** (Heterogeneous bodies) বলে এবং যে সকল মিশ্রিত পদার্থের সর্বাংশে উপাদানগুলির আনুপাতিক হার সমান তাহাদিগকে সমসত্ত্ব পদার্থ (Homogeneous bodies) বলে।

একটিমাত্র উপাদানে গঠিত পদার্থগুলিকে বিশুদ্ধ পদার্থ বলিতে পারা যায়। অন্য কোন পদার্থ উহাতে মিশ্রিত নাই বলিয়া বিশুদ্ধ পদার্থ মাত্রই সমসত্ত্ব শ্রেণীর। বিশুদ্ধ পদার্থগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—**মৌলিক** ও **যৌগিক** পদার্থ।

মৌলিক পদার্থঃ যে সকল পদার্থ হইতে বিশ্লেষণের ফলে উহা ব্যতীত নূতন ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল** বলে। স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক, পারদ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ, ইহাদের বিশ্লেষণের ফলে কোন নূতন পদার্থ পাওয়া যায় না। শুধু পারদ হইতে পারদ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কোন উপায়ে বা কোন রকম শক্তির প্রয়োগেই পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পারদ একটি মৌলিক পদার্থ। তবে ইহা হইতে একথা বলা চলে না যে পারদ আর কোন বস্তুতে পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। কারণ, এই পারদই উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিজেনের সহযোগে লাল মারকিউরিক অক্সাইডে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য অপর একটি পদার্থকে ইহার সহিত যুক্ত হইতে হইয়াছে। কেবলমাত্র পারদ হইতে ইহা পাওয়া যায় নাই। মারকিউরিক অক্সাইডকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না, ইহা পারদ হইতে জটিলতর পদার্থ এবং ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে আবার পারদ ও অক্সিজেন পাওয়া যাইবে।

যৌগিক পদার্থঃ বিশ্লেষণের ফলে যে সমুদয় পদার্থ হইতে দুই বা ততোধিক আরও সরল পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে

যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলে। জল, চিনি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, লবণ, তেল, তুলা, বোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। বিদ্যুৎপ্রবাহ জলকে বিশ্লেষণ করে; ফলে, দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন পাওয়া যায়। চিনি বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন পাওয়া যায়। অতএব জল, চিনি ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ।

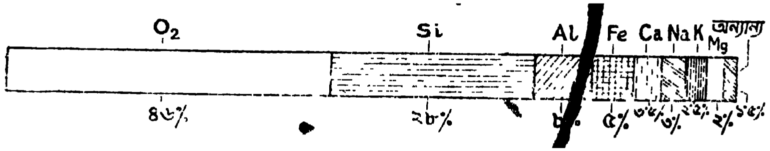
অন্যভাবে আমরা বলিতে পারি, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে যে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। এই মিলন শুধুমাত্র সংমিশ্রণ নয়; ইহাতে আরও গভীরতর রাসায়নিক সংযোগ প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। পারদ ও আয়োডিন রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা মারকিউরিক আয়োডাইড নামক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ম্যাগনেসিয়াম যখন অক্সিজেনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয় তখন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং ভস্মটি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থ।

প্রকৃতিতে অগণিত যৌগিক পদার্থ আছে এবং বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের পরীক্ষাগারে প্রতিদিন নানারকমে মৌলিক পদার্থগুলিকে যুক্ত করিয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ গঠন করিতেছেন। কিন্তু সেই তুলনায় মৌলিক পদার্থের সংখ্যা খুব কম। আপাততঃ রসায়নবিদ্‌গণ মনে করেন সর্বসুদ্ধ ৯৮টি মৌলিক পদার্থ আছে। জড়জগতের সমস্ত বস্তুই মোটামুটি ঐ ৯৮টি মৌলিক পদার্থের দুই বা ততোধিক সংখ্যা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। মৌলিক পদার্থগুলির একটি সারণী পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল।

মৌলিক পদার্থসমূহের অধিকাংশই পৃথিবীতে অন্য মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন—সোডিয়াম (লবণে), ক্যালসিয়াম (মার্বেল পাথরে), ফসফরাস (হাড়ে) ইত্যাদি। আবার কতকগুলি মৌলিক পদার্থ মুক্ত (বা স্বতন্ত্র) এবং অসংযুক্ত অবস্থাতেই পৃথিবীতে পাওয়া যায় :—স্বর্ণ, রৌপ্য, অক্সিজেন, অঙ্গার, গন্ধক ইত্যাদি।

মৌলিক পদার্থগুলির প্রায় পঁচিশটি, পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্যান্য মৌলের পরিমাণ পৃথিবীতে কম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচুর লৌহ আর নিকেল আছে। উহার চারিদিক গভীর

সিলিকেট পাথরে আবৃত। পৃথিবীর উপরের ১০-১৫ মাইল স্তরকে ভূপৃষ্ঠ বলা হয়। এই ভূপৃষ্ঠের সহিতই আমাদের পরিচয়। ভূপৃষ্ঠের বিশ্লেষণে দেখা যায়,



চিত্র ২ক—ভূপৃষ্ঠের মৌলের অনুপাত

ইহার প্রায় অর্ধাংশই অক্সিজেন এবং তাহার পরেই সিলিকন। ভূপৃষ্ঠের প্রধান প্রধান মৌলগুলির পরিমাণ এইরূপ :—

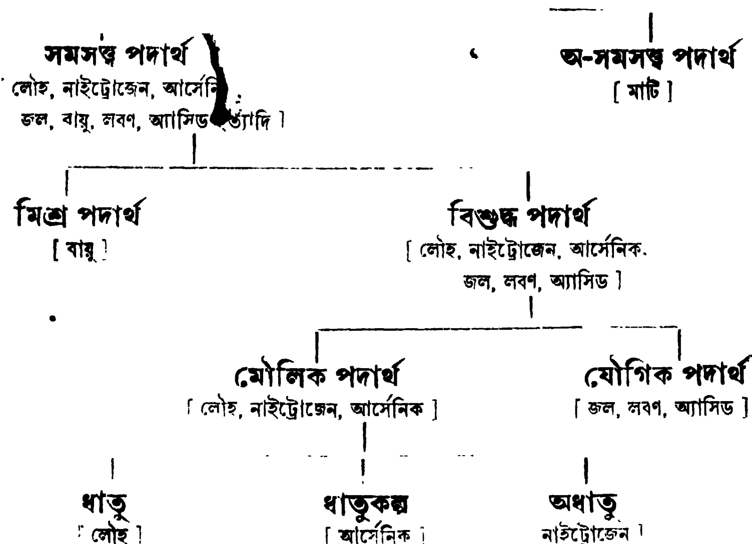
অক্সিজেন—৪৬%	ক্যালসিয়াম—৩.৫%
সিলিকন—২৮%	সোডিয়াম—৩%
অ্যালুমিনিয়াম—৮%	পটাসিয়াম—২.৫%
লৌহ—৫%	ম্যাগনেসিয়াম—২%

অন্যান্য—১.৫%

কার্বন বা অঙ্গারের একটি বিশেষ স্থান আছে। কার্বনের মত অধিক সংখ্যক যৌগিক পদার্থ আর কোন মৌলের নাই এবং থাকাও সম্ভব নয়। অঙ্গার-সমন্বিত যৌগিক পদার্থের প্রাচুর্য জীবজগতে অত্যন্ত বেশী। কার্বন ও উহার যৌগসমূহের রসায়ন এই কারণে পৃথক ভাবে আলোচিত হয় এবং তাহাকে বলে **'জৈব রসায়ন'**। অন্যান্য মৌল ও তাহাদের যৌগিক পদার্থগুলির আলোচনাই **'অজৈব রসায়ন'**।

মৌলসমূহকে আবার আরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :— **ধাতু, অধাতু** এবং **ধাতুকল্প**। ধাতু বা ধাতব পদার্থসকল, যেমন—স্বর্ণ, তাম্র ইত্যাদি, সাধারণতঃ তাপ ও তড়িৎপরিবাহী; উহাদের দ্যুতি, প্রসার্যতা (ductility) এবং অধিকতর ঘাতসহতা (malleability) প্রভৃতি কতগুলি বিশেষ ধর্ম দেখা যায়। অন্যদিকে অধাতু পদার্থসকলের, যেমন—সালফার, কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদির, দ্যুতি, তাপ ও তড়িৎ-পরিবাহিতা প্রায় নাই, তাহাদের প্রসার্যতা ও ঘাতসহতা খুব কম। আবার কোন কোন মৌলিক পদার্থ ধাতু এবং অধাতু পদার্থের মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন এবং কতক পরিমাণে উভয় শ্রেণীরই ধর্ম প্রকাশ করে—ইহাদের ধাতুকল্প বলা হয়। যেমন—

আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি। অতএব বস্তুজগতের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত উপায়ে করা হইয়াছে :—



২-৩। **পদার্থের গঠন :** বিশুদ্ধ পদার্থকে যৌগিক এবং মৌলিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর এই দুই শ্রেণীর গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

মৌলিক পদার্থ : মৌলিক পদার্থগুলি একটিমাত্র উপাদান দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের স্বকীয় কতকগুলি ধর্ম আছে। এক-খণ্ড লৌহ যদি খুব ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশে লৌহের সমস্ত গুণ বর্তমান থাকে। এই ছোট টুকরাগুলি যদি আরও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করিতে থাকি তবে উহারা আয়তনে ও ওজনে কম হইতে থাকিবে, কিন্তু উহারা মৌলিক পদার্থ লৌহরূপেই থাকিবে। ক্রমাগত এইরূপ বিভাগের ফলে তাহারা এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়িবে যে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণেও ধরা পড়িবে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে উহাদিগকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিতে থাকা যায় তবে শেষ পর্যন্ত আমরা একটি

সূক্ষ্মতম লৌহ-কণিকায় আসিয়া পৌছিব, যাহাকে আর বিভক্ত করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য লৌহ-কণিকাকে লৌহের **পরমাণু** নামে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই সূক্ষ্মতম কণাগুলিতে লৌহের সমস্ত ধর্মই বিদ্যমান। এই ক্ষুদ্রতম কণাগুলিকে গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটস নামকরণ করিলেন **'অ্যাটম'** (অর্থাৎ অবিভাজ্য)। অতএব আমরা বলিতে পারি, একটি লৌহখণ্ড অসংখ্য লৌহ-পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অবশ্য এই সকল লৌহপরমাণু আয়তনে, আকারে, ওজনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

লৌহের মত অন্য যে কোন মৌলিক পদার্থকে লইয়া উপরোক্ত উপায়ে বিভক্ত করিয়া দেখান সম্ভব যে প্রতিটি মৌলিক পদার্থই তাহাদের স্ব স্ব পরমাণু দ্বারা গঠিত। একটু পারদ বা একটু অক্সিজেন যথাক্রমে পারদ ও অক্সিজেন পরমাণুর সমষ্টি। অবশ্য বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। স্বর্ণের পরমাণুগুলির সব একরকম, কিন্তু কার্বন বা রৌপ্যের পরমাণু হইতে ওজনে ও ধর্মে সম্পূর্ণ পৃথক।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। দুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনের অর্থ ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির একত্র কোন **'সুনির্দিষ্ট সমাবেশ'**। পরমাণুগুলি অবিভাজ্য।* সুতরাং এইরূপ রাসায়নিক মিলনে একটির চেয়ে কম পরমাণু কখনও অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পরমাণুর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়—"মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম অংশ, যাহাতে সেই পদার্থের সমস্ত ধর্ম বিদ্যমান এবং যাহার চেয়ে সূক্ষ্ম কোনও অংশ ঐ পদার্থের কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাকেই সেই মৌলিক পদার্থের পরমাণু বলা যাইতে পারে।"

অনেক ক্ষেত্রে পরমাণুগুলি একাকী থাকিতে পারে না, অর্থাৎ একটি পরমাণুর স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র অবস্থান করে।

---

* অবশ্য পরমাণুকে এখন আর অবিভাজ্য বলা চলে না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুকেও ভাঙ্গা সম্ভব। কিন্তু পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কতকগুলি বিদ্যুৎকণা পাওয়া যায়, কিন্তু উহাতে আদি পদার্থের কোন গুণ থাকে না। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

অতএব অনেক মৌলিক পদার্থ হইতে একটি মাত্র পরমাণু আলাদা করা সম্ভব নয়। যেমন, অক্সিজেন বা আয়োডিনে সর্বদা দুইটি পরমাণু একত্র থাকে, ফসফরাসে চারিটি পরমাণু একত্র থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ধাতুগুলিতে, একটি পরমাণুরও স্বাধীন সত্তা আছে। স্বাধীনসত্তাসম্পন্ন মৌলিক পদার্থের এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে মৌলিক পদার্থের '**অণু**' বলে। সমস্ত অণুই পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং অণুগুলিতে সেই মৌলিক পদার্থের সমস্ত ধর্মই বর্তমান। যে সকল মৌলিক পদার্থে একটি পরমাণুই স্বাধীনভাবে বিদ্যমান, অন্য সহচরের প্রয়োজন হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে অণু ও পরমাণু অভিন্ন। অন্যান্য ক্ষেত্রে অণুগুলি একাধিক পরমাণু হইতে সৃষ্ট। পরমাণুর সংখ্যা অনুসারে, এই অণুগুলিকে **একপরমাণুক** অণু, **দ্বিপরমাণুক** অণু ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে।

যৌগিক পদার্থ ঃ যৌগসমূহ একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। চিনি একটি যৌগিক পদার্থ। বিশ্লেষণে দেখা যায়—অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা চিনি গঠিত। প্রত্যেক পদার্থের মত চিনিরও কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে। যেমন—উহা স্বাদে মিষ্ট, জলে দ্রবীভূত হয়, ইত্যাদি। এখন এক ডেলা চিনি লইয়া যদি উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করি, তাহা হইলে অংশগুলি আয়তনে ও ওজনে কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশগুলি চিনিই থাকিবে। ক্রমাগত এইভাবে প্রতিটি ছোট ছোট অংশকে বিভক্ত করিতে থাকিলে আমরা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশ পাইতে থাকিব এবং অবশেষে চিনির এমন একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে উপনীত হইব যাহাকে আর বিভক্ত করার চেষ্টা করিলে উহা আর চিনি থাকিবে না। তখন এই ক্ষুদ্রতর অংশটি ভাঙ্গিয়া উহার গঠনকারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। চিনির এই সূক্ষ্মতম অংশ, যাহাতে চিনির সমস্ত ধর্ম বজায় থাকে এবং যাহা চিনি হিসাবে অবিভাজ্য তাহাকে চিনির '**অণু**' বলা হয়। যেহেতু এই অণুগুলিও চিনি সুতরাং উহাতে চিনির মৌলিক পদার্থগুলিকেও থাকিতে হইবে। অর্থাৎ, চিনির অণুসমূহ অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং চিনির ছোট ছোট স্ফটিকগুলি কোটি কোটি অণুর সমষ্টিমাত্র। শুধু চিনি নয়, যে কোন যৌগিক পদার্থই এইরূপে গঠিত। জল

বা খড়িমাটি তাহাদের নিজ নিজ অণুর সমষ্টি। জলের অণু উহার ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাতে জলের সমস্ত ধর্ম বিদ্যমান, এবং এই অণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন। আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মৌলিক-যৌগিক পদার্থ-নির্বিশেষে অণুমাত্রেরই স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, এবং উহা একক ভাবে অবস্থান করিতে পারে।

২-৬। অণু ও পরমাণু : মৌল এবং যৌগসমূহের গঠন-প্রণালী হইতে দেখা গিয়াছে, ইহাদের ভিতর পরমাণু এবং অণুর সমষ্টি বর্তমান। এখন এই অণু ও পরমাণুর বৈজ্ঞানিক লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। স্বাধীনসত্তাসংযুক্ত পদার্থের সমস্ত ধর্মসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম অংশকেই উহার **অণু** বলা হয়, পদার্থটি যৌগিক অথবা মৌলিক যে রকমই হউক না কেন। যৌগিক পদার্থ জল যেমন জলের অণুর সমষ্টি, মৌলিক পদার্থ কার্বন তেমনই কার্বনের অণুর সমষ্টি।

যৌগিক অথবা মৌলিক পদার্থের এই অণুগুলি আবার পরমাণুর সাহায্যে গঠিত। মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে ঐ পদার্থটির সকল ধর্মই অব্যাহত থাকে। যৌগিক পদার্থের কোন পরমাণু হইতে পারে না, অণুই উহার ক্ষুদ্রতম অস্তিত্ব। যৌগিক পদার্থের অণুগুলিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বর্তমান। কেননা, যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে গড়া। অন্যদিকে মৌলিক পদার্থের অণুগুলিতে একাধিক পরমাণু থাকা অসম্ভব নয় (যেমন, অক্সিজেন বা আয়োডিনে), কিন্তু এই পরমাণুগুলি সব একরকমের। ইহাই যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের গঠন-বিভিন্নতা। হাইড্রোজেনের একটি অণুতে দুইটি পরমাণু আছে, দুইটিই এক প্রকারের। কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুতেও দুইটি পরমাণু আছে—একটি হাইড্রোজেনের, অপরটি ক্লোরিনের পরমাণু।

২-৭। ডালটনের পরমাণুবাদ : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একই রকমের কণিকা-দ্বারা যে প্রতিটি পদার্থ গঠিত এই ধারণা বহুকাল হইতেই দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে হিন্দু দার্শনিক কণাদের নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এযুগে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে বস্তুর গঠন সম্বন্ধে মতবাদ দিয়াছেন ইংরেজ বিজ্ঞানবিদ্ জন ডালটন। ইহাকে

ডালটনের পরমাণুবাদ বলা হয়। ইহাতে তিনি কয়েকটি স্বীকার্য উত্থাপন করিয়াছেন :

(১) মৌলিক পদার্থসমূহ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট কণার সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি অ-খণ্ডনীয় এবং ইহাদের পরমাণু বলা যাইতে পারে।

(২) একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই ওজনের হয়। অন্য রকমেও উহারা অভিন্ন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন।

(৩) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হইতে এক বা একাধিক পরমাণুর সুনির্দিষ্ট সমাবেশে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ দুই বা বহু বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের সৃষ্টি হয়।

বহু রকমের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই স্বীকার্যগুলির অন্তর্নিহিত সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।*

বস্তুতঃ, ডালটনের এই পরমাণুবাদই বর্তমান রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছে সন্দেহ নাই, এবং ইহার সাহায্যেই সমস্ত রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

পদার্থের গঠনকারী অণু ও পরমাণুগুলি যে অতি সূক্ষ্ম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাদের আয়তন বা ওজনের একটা ধারণা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জলীয় বাষ্পের একটি অণুর ওজন মাত্র ·০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০২৯ গ্রাম। ইহা এত ছোট যে কল্পনায় আনাও প্রায় অসম্ভব। পরমাণুর ওজন আরও কম। মৌলিক পদার্থের ভিতর হাইড্রোজেন লঘুতম এবং ইউরেনিয়াম অত্যন্ত গুরুভার।

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ·০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০১৬ গ্রাম এবং একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন ·০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০৩৭ গ্রাম।

শুধু ওজনে নয়, আয়তনেও উহারা অতি ক্ষুদ্রকায়। একটি হাইড্রোজেন অণুর ব্যাস ·০০০ ০০০ ০২৪ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ উহার অণুগুলিকে পর পর পাশাপাশি সাজাইলে এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় বিশ কোটি অণু থাকিতে পারিবে। সাধারণ চাপে এবং ০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘনায়তন সেন্টিমিটার গ্যাসে প্রায় ২৭ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ সংখ্যক অণু আছে। প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশটি অণু গণিয়া ওঠা সম্ভব হয় তবে এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের অণু গণিতে ৮৬ ০০০ ০০০ ০০০ বৎসর সময় প্রয়োজন।

* আধুনিক গবেষণার ফলে ডালটনের এই স্বীকার্যগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের খানিকটা পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে। এবিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। পদার্থমাত্রই উহার অণুপুঞ্জ। স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে এই সমস্ত অণু কি সব ঘনসন্নিবিষ্ট, না উহাদের পরস্পরের ভিতর কোন অবকাশ বা ফাঁক (space) আছে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে অণুগুলি নিরবকাশ ভাবে পুঞ্জীভূত নয়। সেইজন্য, জলের মধ্যে যখন চিনি মিশান হয়, তখন উহা দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু জলের আয়তনের বৃদ্ধি হয় না। কোন কোন সময় দুইটি পদার্থ একত্র মিশিয়া আয়তনের সঙ্কোচ সাধন করে। সুতরাং অণুগুলির পরস্পরের ভিতর যে অবকাশ আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; এই অবকাশের নাম দেওয়া হইয়াছে **'আণবিক ব্যবধান' (intermolecular space)**। কোনও গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করিলে উহার আয়তনের সঙ্কোচন হয়। আণবিক ব্যবধান যে আছে, ইহা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বস্তুতঃ অণুগুলি স্থির হইয়া থাকে না, উহারা গতিশীল এবং আণবিক ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে **'আণবিক আকর্ষণী শক্তি' (intermolecular force)** আছে। বিভিন্ন পদার্থে এবং বিভিন্ন অবস্থায় এই আকর্ষণী শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন। পদার্থের কঠিন অবস্থায় আকর্ষণী শক্তি সর্বাধিক প্রবল থাকে। তাহাদের ভিতর আণবিক ব্যবধান কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের একটা নির্দিষ্ট আকার থাকে। তরল অবস্থায় আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষাকৃত কম, অণুগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল। আণবিক ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর, তাহাদের নির্দিষ্ট আকার থাকে না। মারুত বা গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলির ভিতর আকর্ষণী শক্তি খুবই কম থাকে। অণুগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে চতুর্দিকে গতিশীল হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের আকার বা আয়তন কিছুই থাকে না। চাপ এবং শৈত্যের আধিক্যে আণবিক ব্যবধান কমিয়া যায়। এই জন্যই উষ্ণতা কমাইয়া দিলে গ্যাসীয় পদার্থ তরল এবং তরল পদার্থ কঠিন হইয়া থাকে।

২.৮। পদার্থের পরিবর্তন: আমাদের চারিদিকের বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্তন প্রকৃতিতে অনেক সময় আপনা-আপনিই হয়, আবার আমরা নিজেরাও প্রায়ই

বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে বস্তুর পরিবর্তন সাধন করি। পর্বতের উপরের কঠিন তুষার গলিয়া জল হইতেছে; নদী ও সাগরের জল সূর্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া যাইতেছে; বাতাসে থাকিয়া লোহে মরিচা পড়িতেছে; বীজ হইতে গাছ এবং সেই গাছে ক্রমে ফুল-ফল হইতেছে; অঙ্গার পুড়িয়া ভস্ম ও গ্যাস হইতেছে; ফুটন্ত জলে চাউল ভাতে পরিণত হইতেছে,—নিরন্তর এই রকম অসংখ্য পরিবর্তন বস্তুজগতের স্বাভাবিক ঘটনা। মোটামুটি বস্তুর এই সব পরিবর্তনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:—(১) **অবস্থাগত বা ভৌত পরিবর্তন** এবং (২) **রাসায়নিক পরিবর্তন**।

অবস্থাগত বা ভৌত পরিবর্তন (Physical change)ঃ যে সমস্ত পরিবর্তনে পদার্থের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনই হয়, কিন্তু যে সকল অণুদ্বারা পদার্থটি গঠিত উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে **অবস্থাগত পরিবর্তন** বলা যাইতে পারে। এই সব পরিবর্তনে অবস্থাগত ধর্মগুলি বদলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। যেমন, জল উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনে অবস্থার প্রকারভেদ ঘটিয়াছে সত্য, অর্থাৎ জলের আয়তন, ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণ লোপ হইয়াছে, কিন্তু জল ও বাষ্পের অণুগুলি একই রহিয়াছে। বাষ্পকে শীতল করিলেই আবার জল পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ, ইহাতে পদার্থের আভ্যন্তরিক বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সাধারণ অবস্থায় বরফ রাখিয়া দিলে উহা তাপ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গলিয়া জলে পরিণত হয়। আবার, খুব শীতল করিলে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। সেইরূপ, একটি কাচনলে খানিকটা মোম লইয়া উত্তপ্ত করিলে উহা তরল হইয়া যায়, আবার ঠাণ্ডা করিলে কঠিনাকার ধারণ করে। এই সব ক্ষেত্রে, বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু অবস্থার পরিবর্তন হয়। এগুলি ভৌত পরিবর্তন।

বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতরের তারটি আলো বিকিরণ করিতে থাকে। যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারটি তখন আর আলো দিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ তাহার আলো বিকিরণের ধর্মটি আর থাকে না। এই যে পরিবর্তন তাহাতে তারটি যে-সকল

অণুদ্বারা গঠিত তাহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল উহার বাহ্যিক অবস্থাগত ধর্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। সুতরাং, ইহা ভৌত বা অবস্থাগত পরিবর্তন।

একটি প্লাটিনামের তার দীপ-শিখার মধ্যে ধরিলে উহা শ্বেততপ্ত হইয়া ওঠে ও আলো বিকিরণ করে। দীপ হইতে সরাইয়া লইলে, উহার স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়া আসে। উত্তপ্ত অবস্থায় উহার একটি নূতন ধর্ম হয় বটে তবে প্লাটিনাম ধাতুটির কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং ইহা একটি অবস্থাগত পরিবর্তন।

একটি নরম লৌহদণ্ডের চারিদিকে অন্তরিত তার জড়াইয়া সেই তারের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিলে, লৌহটি চুম্বকে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলে আবার উহার চুম্বকত্ব লোপ পায়। ইহাও ভৌত পরিবর্তন।

জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে, কঠিন লবণ দ্রব হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আবার উত্তাপের সাহায্যে জল বাষ্পাকারে সরাইয়া লইলে সেই জল হইতে সম্পূর্ণ লবণই ফিরিয়া পাওয়া যায়। দ্রব অবস্থায় লবণের এই পরিবর্তনটি নিতান্তই অবস্থাগত, কারণ জলের সঙ্গে থাকিলেও লবণ লবণই থাকে ; উহার অণুগুলির কোন পরিবর্তন হয় না।

এই রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অবস্থাগত পরিবর্তনের বিশেষত্ব এই—যে সকল কারণ এবং শক্তির প্রয়োগে এই সকল পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই সকল কারণ বা শক্তি অপসারণ করিলেই পদার্থের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে অবস্থাগত পরিবর্তন অস্থায়ী।

রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical change) : পদার্থের যে সকল পরিবর্তনের ফলে উহার অণুগুলি বদলাইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি হয়, তাহাকেই **রাসায়নিক পরিবর্তন** বলে। যেহেতু অণুগুলি নূতন, সুতরাং যে পদার্থটির সৃষ্টি হয় তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। পদার্থটি নূতন বলিয়া ইহার ধর্মগুলিও পূর্বের পদার্থের ধর্ম হইতে বিভিন্ন। অবশ্য রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থাগত পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী।

একটু গন্ধক যদি আগুনে পোড়ান হয় তবে উহা হইতে একপ্রকার গ্যাস পাওয়া যায়—উহার নাম 'সালফার ডাই-অক্সাইড'। এই গ্যাসটি গন্ধক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, ইহার ধর্মগুলিও গন্ধকের মত নয়। গন্ধক কেবল গন্ধক-পরমাণু দ্বারা গঠিত, আর 'সালফার ডাই-অক্সাইড'-অণু গন্ধক ও অক্সিজেনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। ইহাকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** বলিতে হইবে।

এক টুকরা তামার পাত যদি 'নাইট্রিক অ্যাসিডে' দেওয়া যায়, তবে অতি সহজে উহা দ্রব হইয়া যাইবে। একটি লাল রঙের গ্যাস নির্গত হইবে এবং পাত্রস্থ নাইট্রিক অ্যাসিড একটি সবুজ তরল পদার্থে পরিণত হইবে; উহার নাম 'কপার নাইট্রেট'। 'কপার নাইট্রেট'-এর অণুগুলি তামার অণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং একটি নূতন পদার্থ। সুতরাং, ইহাও একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। লবণের জলে দ্রব হওয়া এবং তামার নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রব হওয়ার মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রথম ক্ষেত্রে পদার্থ একই থাকে। শুধু উহার অবস্থান্তর ঘটে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ দিলে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস দুইটি জল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহারা মৌলিক পদার্থ, জল যৌগিক পদার্থ। সুতরাং জলের এই বিশ্লেষণ রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়।

এই রকম আরও সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক টুকরা আয়োডিন যদি এক টুকরা সাদা ফসফরাসের সঙ্গে একত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্ফুলিঙ্গ সহকারে একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার নাম ফসফরাস-আয়োডাইড। ইহা একটি নূতন পদার্থ এবং পরিবর্তনটি রাসায়নিক।

কেরোসিন তেল পুড়িয়া যখন আলো বিকিরণ করে তখন উহা মুখ্যতঃ দুইটি নূতন পদার্থে পরিণতি লাভ করে—'কার্বন-ডাই-অক্সাইড' ও 'বাষ্প'। সুতরাং কেরোসিন পোড়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সেইরূপ কয়লা পোড়াইলে খানিকটা ছাই ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। এগুলি কয়লা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং নূতন পদার্থ। অতএব এই পরিবর্তনও রাসায়নিক পরিবর্তন।

একটি তামার তার বুনসেন দীপে ধরিয়া রাখিলে উহা আস্তে আস্তে একটি কালো নূতন পদার্থে (কপার অক্সাইড) পরিণতি লাভ করে, অর্থাৎ তামার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু প্লাটিনামের ঐরূপ ঘটে নাই।

খানিকটা বিশুষ্ক চুন লইয়া উহাতে জল মিশাইলে, প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয় এবং জল ফুটিতে থাকে। ইহাতে চুন কলিচুনে পরিণত হইয়া যায়। ইহাও একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

লোহা বাহিরে রাখিয়া দিলে উহাতে মরিচা ধরে। মরিচাতে লোহার ধর্মগুলি আর থাকে না। উহাও নূতন পদার্থ। অতএব, এই পরিবর্তনটিও রাসায়নিক।

রাসায়নিক পরিবর্তনে যে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় উহাকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা সহজ নয়। যেমন চাউল একবার ভাতে পরিণত হইলে, আবার উহা হইতে চাউল পাওয়া অসম্ভব। রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি স্থায়ী ধরণের।

রাসায়নিক পরিবর্তনের আর একটি দিক আছে। যখনই কোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তখনই কিছু না কিছু তাপশক্তি পদার্থটি গ্রহণ করিবে বা বাহির করিয়া দিবে। রাসায়নিক পরিবর্তনের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। জল যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয় তখন প্রতি গ্রাম জল বিশ্লেষণে প্রায় ৩৮০০ ক্যালোরি তাপশক্তি শোষিত হয়। কিন্তু অবস্থাগত পরিবর্তনে তাপশক্তির গ্রহণ বা উদ্‌গিরণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। যেমন এক গ্রাম জল বাষ্পে পরিণত হইতে প্রায় ৫৪০ ক্যালোরি তাপশক্তি গ্রহণ করে, আবার লৌহ যখন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন কোন তাপশক্তির বিনিময় দেখা যায় না।

অবস্থাগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিতে পারি।

অবস্থাগত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
১। পদার্থের অবস্থাগত ধর্মের পরিবর্তন ঘটে মাত্র, আভ্যন্তরিক অণুগুলি একই থাকে। ফলে, পদার্থের ধর্মের বাহ্যিক বা সামান্য পরিবর্তন ঘটে।	১। পদার্থের অণুগুলি পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। নূতন পদার্থের ধর্মও নূতন হয়। ফলে, পদার্থের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

অবস্থাগত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
২। অবস্থাগত পরিবর্তন অস্থায়ী হয়। যদ্দ্বারা এই সব পরিবর্তন সাধিত হয় তাহাদের সরাইয়া লইলে পূর্বাবস্থায় যাওয়া সম্ভব হয়।	২। এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয়; সহজে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।
৩। এই সকল পরিবর্তনে তাপ বিনিময় হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।	৩। এই পরিবর্তনে তাপ বিনিময় হইতেই হইবে।

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বস্তু একত্র করিলেই রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া যায়। পূর্বেই দেখিয়াছি, তামার সহিত নাইট্রিক অ্যাসিড মিশাইলেই উহা হইতে নানা পদার্থের সৃষ্টি হয়। সেইরূপ একটু সোডা যদি ভিনিগার বা অন্য কোন অ্যাসিডে দেওয়া যায় তৎক্ষণাৎ উহা হইতে গ্যাস নির্গত হয় এবং উহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এক টুকরা সাদা ফসফরাস যদি আয়োডিনের সঙ্গে একত্র করা হয় তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠে এবং নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কেবলমাত্র সংস্পর্শ হইলেই রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। নানা রকম শক্তির প্রয়োগে বা অপর কোন বস্তুর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যেমন, চাউল জলে দিলেই ভাত হয় না—তাপশক্তির প্রয়োজন। আবার, জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাইতে হইলে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক।

অন্ধকারে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস মিশাইয়া রাখিলে কিছুই হইবে না। সামান্য আলোকে রাখিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন সুরু হইবে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইবে। এখানে আলোকশক্তির প্রয়োজন হইল।

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই রাসায়নিক পরিবর্তনে শুধু তাপ নয়, অতিরিক্ত চাপ এবং লৌহচূর্ণের উপস্থিতিও প্রয়োজন।

২-৯। সাধারণ মিশ্রণ এবং রাসায়নিক সংযোগঃ পদার্থের গঠন ও পরিবর্তনের বিষয় আমরা মোটামুটি জানিতে পারিয়াছি। এখন দেখা প্রয়োজন বিভিন্ন পদার্থ একত্র হইলে তাহাদের ব্যবহার কি রকম হইবে। দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ একত্র থাকার দুইটি উপায় আছে।

(১) **সাধারণ মিশ্রণঃ** দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র সাধারণভাবে মিশিয়া কেবলমাত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে। ইহাকে পদার্থের

সাধারণ মিশ্রণ বলা হয় এবং একত্রিত পদার্থটিকে **মিশ্র পদার্থ (mechanical mixture)** বলে। সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলির স্ব স্ব প্রকৃতি ও ধর্ম অব্যাহত থাকে এবং এই উপাদানগুলিকে সহজভাবে ও নানা স্থূল উপায়ে পৃথক করা সম্ভব। যদি কিছুটা বালু ও লবণ একত্র মিশান হয়, তবে একটি মিশ্র পদার্থ হয়। উহাতে বালু এবং লবণ উভয়েরই গুণ বা ধর্ম অব্যাহত থাকে। জল এবং লবণ মিশাইলে যে দ্রবণ প্রস্তুত হইল তাহাও একটি মিশ্র পদার্থ। কারণ উক্ত দ্রবণে জল এবং লবণ উভয়ের গুণ ও ধর্ম বিদ্যমান।

(২) **রাসায়নিক সংযোগ বা মিলন**ঃ যখন দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে, তখন উহাকে **রাসায়নিক সংযোগ** বা **মিলন** বলে। নূতন যে পদার্থের সৃষ্টি হইল, তাহাকে অবশ্যই যৌগিক পদার্থ হইতে হইবে। এই নূতন পদার্থ পূর্বের উপাদানগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইবে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবে। তাহা ছাড়া, এই নূতন পদার্থ হইতে পূর্বের উপাদানগুলি আবার ফিরাইয়া পাওয়া সুকঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। এক টুকরা সাদা ফসফরাস ও এক টুকরা আয়োডিন যদি একত্র করা যায় তবে তৎক্ষণাৎ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সহকারে উহারা একটি নূতন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থটি আয়োডিন ও ফসফরাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে রাসায়নিক সংযোগ বলিতে হইবে।

এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম যদি অক্সিজেন গ্যাসে তাপিত করা হয় তবে উভয়ে মিলিয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহা একটি রাসায়নিক সংযোগ; কারণ, উৎপন্ন পদার্থটি ম্যাগনেসিয়াম বা অক্সিজেন গ্যাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

গন্ধক ও লৌহচূর লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিলে মিশ্রণ ও রাসায়নিক সংযোগের পার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে।

পরীক্ষাঃ গন্ধক (৪ ভাগ) ও লৌহচূর (৭ ভাগ) একত্র করিয়া একটি খলের মধ্যে উত্তমরূপে মিশাও।

(১) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি অণুবীক্ষণ বা একটি লেনসের সাহায্যে পরীক্ষা কর।

দেখিবে, কালো লৌহকণা ও হলুদ গন্ধককণাগুলি পাশাপাশি ছড়াইয়া আছে, তাহাদের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই।

(২) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি কাগজের উপর ছড়াইয়া দিয়া একটি চুম্বক দ্বারা স্পর্শ কর। দেখিবে লৌহকণাগুলি চুম্বকের আকর্ষণে উঠিয়া আসিবে, এবং কাগজের উপর গন্ধক পড়িয়া থাকিবে।

(৩) একটি পাত্রে খানিকটা মিশ্রিত পদার্থ লইয়া কার্বন ডাই-সালফাইড নামক তরল পদার্থ দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া লও। কার্বন ডাই-সালফাইডে গন্ধক দ্রব হইয়া যাইবে, কিন্তু লৌহ পড়িয়া থাকিবে। ফিল্টার কাগজের সাহায্যে লৌহকে ছাঁকিয়া লও, এবং পরিস্রুত কার্বন ডাই-সালফাইড দ্রবণকে বাতাসে রাখিয়া দাও। তরল পদার্থটি শীঘ্রই বাষ্পাকারে মিলাইয়া যাইবে এবং গন্ধক পড়িয়া থাকিবে।

(৪) একটি পরীক্ষ-নলে বা টেস্ট-টিউবে সেই মিশ্রিত পদার্থ লইয়া উহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাও, দেখিবে লোহার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে গন্ধহীন হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হইবে; গন্ধকের কিছু হইবে না।

চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু গন্ধক আকৃষ্ট হয় না। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে লৌহ দিলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু গন্ধকের কিছু হয় না। কার্বন ডাই-সালফাইডে গন্ধক দ্রব হয়, লৌহের কিছু হয় না। লৌহ ও গন্ধকের এইগুলি সাধারণ ধর্ম। উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থটিতেও লৌহ ও গন্ধকের এই ধর্মগুলিই অব্যাহত রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। অতএব, উহা একটি সাধারণ মিশ্রণ।

এখন এই মিশ্রিত পদার্থটির খানিকটা একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া আস্তে আস্তে উত্তপ্ত কর, দেখিবে উহা ক্রমশঃ লাল হইয়া জ্বলিতে থাকিবে এবং গলিয়া যাইবে। উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া, পরীক্ষ-নলটি ভাঙ্গিয়া কঠিন বস্তুটি বাহির কর। দেখা যাইবে, উহা খুব কালো একটি শক্ত পদার্থে পরিণত হইয়াছে। উহাকে গুঁড়া করিয়া লেনসদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিবে হলুদ কোন গন্ধককণা আর নাই। কিছুটা চূর্ণ কার্বন ডাই-সালফাইড দ্বারা নাড়িয়া পরে ছাঁকিয়া লইলে উহা হইতে কোন গন্ধক পাইবে না। একটি চুম্বক সেই গুঁড়া স্পর্শ করিলেও কোন লৌহকণা আকৃষ্ট হইবে না এবং এই চূর্ণ একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া কিঞ্চিৎ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে দুর্গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস বাহির হইবে, হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ লৌহ ও গন্ধকের স্ব স্ব ধর্ম লোপ পাইয়াছে।

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায়, এখন আর এই পদার্থটি লৌহ ও গন্ধকের সাধারণ মিশ্রণ নহে। তাপ প্রয়োগের ফলে লৌহ ও গন্ধকের ভিতর একটি রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়াছে এবং একটি নূতন যৌগিক পদার্থ (ফেরাস সালফাইড) উৎপন্ন হইয়াছে। যখন কোন বস্তু একক বা অন্য বস্তুর সংযোগে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া নূতন একটি পদার্থে পরিণত হয় তখন এই রকম পরিবর্তনকে আমরা **রাসায়নিক বিক্রিয়া (chemical reaction)** বলি।

মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের এখন তুলনা করা যাইতে পারে।

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি পাশাপাশি বর্তমান থাকে।	১। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি মিলিত হইয়া অন্য পদার্থে পরিণত হইয়া যায়।
২। মিশ্র পদার্থের ধর্ম উপাদানগুলির ধর্মের সমষ্টি মাত্র। অন্য কোন নূতন ধর্মের বিকাশ হয় না।	২। যৌগিক পদার্থের ধর্ম তাহার উপাদানগুলির ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উপাদানগুলির ধর্মের লোপ হয়।
৩। মিশ্র পদার্থ সমসত্ত্ব হইতে পারে আবার অসমসত্ত্বও হইতে পারে। যেমন জল ও লবণ মিশ্রিত হইলে সমসত্ত্ব হয়। লবণ ও বালু অসমসত্ত্ব মিশ্র পদার্থ।	৩। কিন্তু যৌগিক পদার্থ সর্বদাই সমসত্ত্ব হইবে।
৪। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়।	৪। যৌগিক পদার্থের উপাদান পৃথকীকরণ সুকঠিন।
৫। মিশ্র পদার্থের উপাদানসমূহ যে কোন অনুপাতে মিশিতে পারে। যে কোন পরিমাণ লৌহ যে কোন পরিমাণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।	৫। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি সর্বদা নির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হইবে। যেমন, গন্ধক ও লৌহের সংযোগ সর্বদাই ৪ : ৭ অনুপাতে হইবে।
৬। মিশ্র পদার্থ প্রস্তুতকালে তাপের বিনিময় হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।	৬। যৌগিক পদার্থের সংগঠনকালে তাপ বিনিময় হইবেই। কিছু তাপের উদ্ভব বা শোষণ হইতেই হইবে।
৭। মিশ্র পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্কের কোন স্থিরতা নাই। উহা উপাদানগুলির অনুপাতের উপর নির্ভর করে।	৭। যৌগিক পদার্থে স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মিশ্র পদার্থ করিতে মৌলিক বা যৌগিক উভয়বিধ পদার্থই অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সেই হিসাবে মিশ্র পদার্থ তিন রকমের হইতে পারে :

(ক) মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে—যেমন, বাতাস (অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন) ;

(খ) যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে—যেমন দুধ (স্নেহ ও জল) ;

(গ) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে—যেমন ছাপার কালি (কার্বন ও গঁদ) ।

আবার মিশ্র পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণেও হইতে পারে।

(ক) কঠিন পদার্থের মিশ্রণে—রৌপ্যমুদ্রা ;

(খ) তরল পদার্থের মিশ্রণে—মেথিলেটেড স্পিরিট ;

(গ) গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণে—বাতাস ;

(ঘ) কঠিন ও তরল পদার্থের মিশ্রণে—সাবান, আলকাতরা ;

(ঙ) কঠিন পদার্থ ও গ্যাসের মিশ্রণে—ধোঁয়া (smoke) ;

(চ) তরল পদার্থ ও গ্যাসের মিশ্রণে—ফেনা, কুয়াশা ;

(ছ) কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণে—লেমোনেড।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ পরীক্ষা-প্রণালী

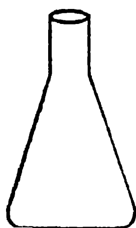
পদার্থের পরীক্ষার জন্য রসায়নাগারে কতকগুলি সাধারণ প্রণালী বা প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হয়। সব রকম রাসায়নিক পরীক্ষাতেই এই সমস্ত প্রণালীর কোন একটির প্রয়োজন হয়। নিম্নে প্রণালীগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

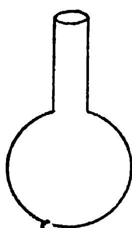
৩-১। গলন (Melting) ঃ উত্তাপের সাহায্যে পদার্থের কঠিন হইতে তরল অবস্থায় পরিণতিকে **'গলন'** বলে। যদি পদার্থটি বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে তবে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উহা গলিয়া যাইবে। এই উষ্ণতাকে উক্ত পদার্থের **গলনাঙ্ক** বলে। যেমন তুষার 0° সেণ্টিগ্রেডে গলে। আবার তরল পদার্থ যখন শৈত্যের প্রভাবে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় তখন উহাকে **হিমীভবন (freezing)** বলা যায় এবং যে উষ্ণতায় পদার্থটি কঠিন হয় তাহাকে **হিমাঙ্ক** বলে। কোন বিশুদ্ধ পদার্থের হিমাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক একই।

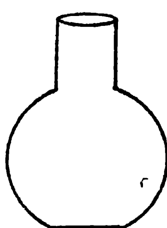
বলা বাহুল্য অনেক পদার্থ, যেমন কাঠ, কাপড় প্রভৃতি উত্তাপের প্রভাবে না গলিয়া **বিযোজিত (decomposed)** হইয়া যায়। আবার কোন কোন বস্তু উত্তপ্ত করিলেও গলে না, বরং ভাস্বর হইয়া ওঠে, যেমন চুন।

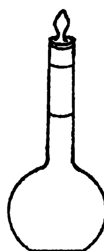
৩-২। বাষ্পীভবন ও স্ফুটন (Evaporation and boiling) ঃ যদি একটি থালাতে কিছু জল রাখা হয় তবে উহার উপর হইতে আস্তে আস্তে জল বাষ্পের আকারে চলিয়া যায়। তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে ক্রমাগত উহার বাষ্পে পরিণতিকে **বাষ্পীভবন** বলে। উষ্ণতা যত বেশী হইবে, বাষ্পীভবনও তত বেশী ও দ্রুত হইবে।

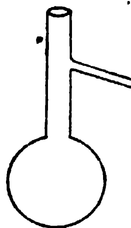
আবার যদি খানিকটা জল একটি পাত্রে উত্তপ্ত করা যায় তবে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে, জলের সমস্ত অংশ হইতেই বাষ্প উত্থিত হইতেছে। যখন তরল পদার্থ তাহার সমস্ত অংশ হইতেই মারুতাকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে, তখন ইহাকে **'স্ফুটন'** বলে। পদার্থটি বিশুদ্ধ হইলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উহা ফুটিবে এবং এই উষ্ণতাকে পদার্থটির **স্ফুটনাঙ্ক** বলে; যেমন, জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেণ্টিগ্রেড।

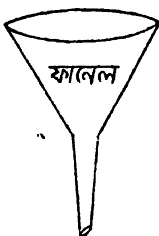

শঙ্কুকূপী

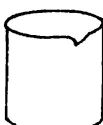

গোলকূপী

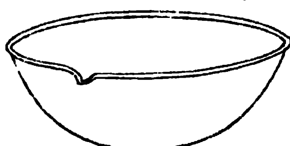

চ্যাপ্টাতল কূপী

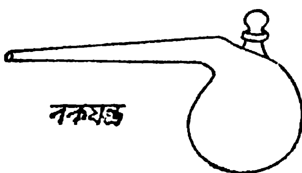

অংশাঙ্কিত
কূপী

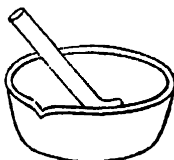

পাতন কূপী

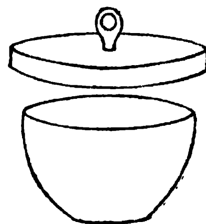

ফানেল

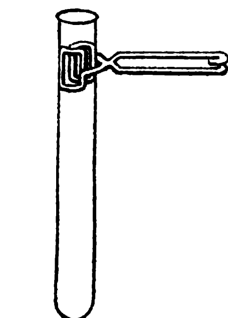

বীকার

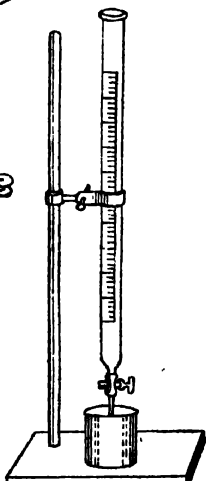

খর্পর

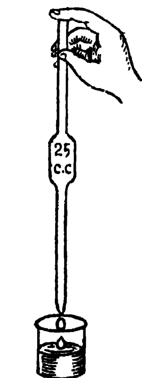

বকযন্ত্র


খল


মুচি

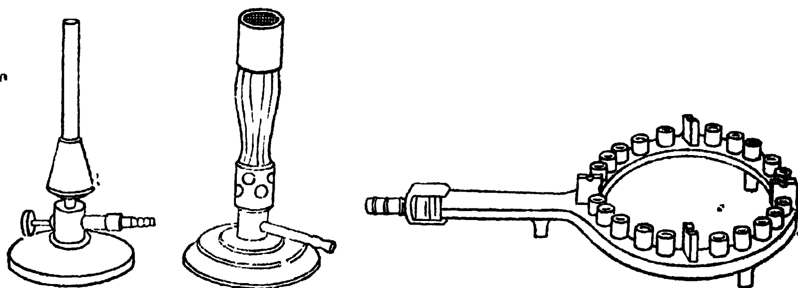

পরীক্ষ নল


বুরেট


25
c.c
পিপেট

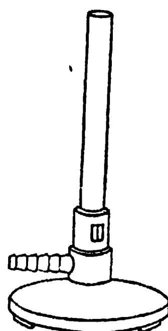
গ্যাসীয় পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে **ঘনীভবন** (**condensation**) বলে। যে উষ্ণতায় পদার্থের ঘনীভবন সম্পন্ন হয় তাহাকে **ঘনাঙ্ক** বলা হয়। বিশুদ্ধ পদার্থের ঘনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক একই উষ্ণতা।

নানা রকমের পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার জন্য ল্যাবরেটরীতে বহু প্রকারের যন্ত্রপাতি



"নানা রকমের দীপ"

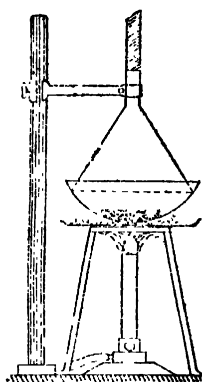
ব্যবহৃত হয়। উহাদের অধিকাংশই কাচের তৈয়ারী, কিছু কিছু পর্সেলীনের তৈয়ারী হয়। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কাচের পরীক্ষা-নল বা টেস্ট-টিউব। তরল পদার্থ রাখার বা উত্তপ্ত করার জন্য বীকার এবং নানা প্রকার কাচকূপী ব্যবহৃত হয়। ছাঁকিবার জন্য ফানেল প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থ লওয়ার জন্য অংশাঙ্কিত সিলিণ্ডার, পিপেট, বুরেট প্রভৃতি প্রয়োজন। খল, মুচি, খর্পর ইত্যাদি পর্সেলীনের তৈয়ারী। গ্যাস জ্বালাইয়া সচরাচর ল্যাবরেটরীতে তাপ-সৃষ্টি করা হয়, সেইজন্য বিভিন্ন রকমের দীপ ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে বুনসেন দীপই প্রধান। সর্বদা ব্যবহার্য কতকগুলি যন্ত্রের ছবি এখানে দেওয়া হইল। ল্যাবরেটরীতে যাইয়া অন্যান্য সকল রকম যন্ত্রের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।



বুনসেন দীপ

৩-৩। উর্ধ্বপাতন (**Sublimation**): কঠিন পদার্থে তাপ দিলে উহা গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়, এবং আরও উত্তাপে তরল পদার্থ গ্যাস হইয়া যায়। আবার ঠাণ্ডা করিয়া গ্যাসকে প্রথমতঃ

তরল এবং পরে উহাকে কঠিন করা সম্ভব। ইহাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু কখনও কখনও কঠিন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে তরল না হইয়া সোজাসুজি গ্যাস হইয়া যায় এবং এই গ্যাসীয় বস্তুটি ঠাণ্ডা করিলে আবার কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। উত্তাপে পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে একেবারে বাষ্পে পরিণতি এবং শৈত্যে বাষ্প হইতে সরাসরি কঠিন অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে **ঊর্ধ্বপাতন** বলে। এই জাতীয় রূপান্তরে পদার্থটির রাসায়নিক সংযুতি অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। আয়োডিন, নিশাদল, কর্পূর প্রভৃতি এইরূপ ব্যবহার করে। উহাদের গরম করিলে গলিবে না, কিন্তু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে।



চিত্র ৩ক—ঊর্ধ্বপাতন

পরীক্ষা : একটি খর্পরে (basin) কিছুটা নিশাদল লও আর উহাকে তারজালির উপর বসাইয়া বুনসেন দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর; খর্পরের উপর একটি ফানেল উল্টা করিয়া রাখ, যাহাতে ফানেলের নলটি উপরের দিকে থাকে। একটি পাতলা কাপড় ভিজাইয়া ফানেলের গায় জড়াইয়া দাও। উত্তাপ দিলে নিশাদল প্রথমে বাষ্পীভূত হইবে এবং পরে উহা ফানেলের ঠাণ্ডা অংশে আসিয়া লাগিলেই আবার জমিয়া কঠিন হইবে।

অনেক সময় ঊর্ধ্বপাতন-সাহায্যে মিশ্র পদার্থ পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, যদি আয়োডিন ও বালু একত্র মিশ্রিত থাকে তবে ঊর্ধ্বপাতন দ্বারা আয়োডিন সরাইয়া আনা যাইবে এবং বালু পড়িয়া থাকিবে।

যে সমস্ত তরল বা কঠিন পদার্থ সহজে বাষ্পে পরিণত হয়, যেমন জল, স্পিরিট, কর্পূর ইত্যাদি, তাহাদের **উদ্বায়ী** বস্তু বলা হয়; এবং যে সকল বস্তু সহজে বাষ্পীভূত হয় না, যেমন কাঠ, লবণ, পারদ ইত্যাদি, তাহাদিগকে **অনুদ্বায়ী** বস্তু বলে।

৩.৪। দ্রবণ (Solution): একটু চিনি যদি জলে মিশান হয় তবে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু স্বাদ হইতে উহার অস্তিত্ব জানা যাইবে। চিনি ও জলের উহা একটি মিশ্র পদার্থ। এই মিশ্র পদার্থের যে কোন অংশে দেখা যাইবে চিনি ও জলের অনুপাত এক। চিনির পরিবর্তে যদি একটু

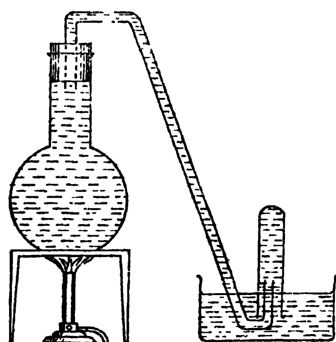
তুঁতে জলে দেওয়া হয় তবে একটি স্বচ্ছ কিন্তু নীল রঙের তরল পদার্থ পাওয়া যায়। উহাও মিশ্র পদার্থ এবং উহারও যে কোন অংশে তুঁতের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ এই মিশ্রণগুলি সব সমসত্ত্ব।

দুই বা ততোধিক বস্তু যখন সমসত্ত্ব মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে তখন উহাকে **দ্রবণ** বা **দ্রব** বলে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে, চিনি দ্রবীভূত হইয়াছে এবং জল চিনিকে দ্রবীভূত করিয়াছে। যে দ্রবীভূত হয় তাহাকে বলে **দ্রাব (solute)** এবং যে দ্রবীভূত করে তাহার নাম **দ্রাবক (solvent)**। চিনি দ্রাব, জল দ্রাবক।

দ্রাব + দ্রাবক = দ্রবণ

যদি বালু, খড়ি বা গন্ধক ইত্যাদি চূর্ণ করিয়াও জলে দেওয়া যায় তবুও তাহারা দ্রবীভূত হয় না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঐগুলি নিজেদের ভার-বশতঃ পাত্রের নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়। উহারা জলে **অদ্রবণীয় (insoluble)**; চিনি, লবণ, তুঁতে, শোরা, ফটকিরি ইত্যাদি **দ্রবণীয় (soluble)**।

প্রায়ই দেখা যায় কঠিন পদার্থগুলি তরল পদার্থ দ্বারা দ্রবীভূত হয়। কিন্তু তরল বা গ্যাসীয় বস্তুও দ্রাব হইতে পারে। যেমন, স্পিরিট বা কোহল, অ্যাসিটোন, নাইট্রিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন প্রভৃতি যে কোন পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমসত্ত্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ উহারা জলে দ্রবণীয়। অবশ্য যে কোন তরল পদার্থই যে জলে দ্রব হইবে তাহা নহে। তেল ও জল, পারদ ও জল ইত্যাদি একত্রিত করিলে তাহারা দ্রবণ সৃষ্টি করে না, উহারা দুইটি স্তরে পৃথক হইয়া থাকে। তেল জলের সহিত মিশে না বটে, কিন্তু তেল আবার বেনজিনে দ্রব হইয়া যায়।



অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, প্রভৃতি গ্যাসও জলে দ্রবণীয়। অক্সিজেন ব্যতিরেকে জীবের শ্বাসকার্য চলিতে পারে না। জলে কিছু বায়ু দ্রবীভূত থাকে বলিয়াই, সেই বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা

মৎস্য ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর শ্বাসকার্য সম্ভব হয়। জলে যে বাতাস দ্রবীভূত থাকে তাহা একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব।

পরীক্ষা: একটি গোল কূপী সম্পূর্ণ জলে ভরিয়া একটি কর্ক দিয়া মুখটি বন্ধ করিয়া দাও। কর্কের ভিতর দিয়া একটি বাঁকান নির্গম-নল জুড়িয়া দাও। নির্গম-নলটিও জলে পূর্ণ থাকিবে ও উহার বাহিরের মুখটি একটি দ্রোণীতে জলে ডুবাইয়া রাখ। এই প্রান্তটির উপরে একটি টেস্ট-টিউব জলে পূর্ণ করিয়া উপুড় করিয়া রাখ। অতঃপর তারজালির উপর রাখিয়া কূপীটিকে বুনসেন দীপ সাহায্যে উত্তপ্ত কর। দেখিবে জল হইতে ছোট ছোট বুদ্‌বুদের আকারে গ্যাস বাহির হইয়া নির্গম-নল দিয়া আসিয়া টেস্ট-টিউবে জমা হইবে। দ্রবীভূত বাতাস উত্তাপে জল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

সচরাচর যদিও জল দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য তরল পদার্থও দ্রাবক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। গন্ধক জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে উহা অতি সহজে দ্রবণীয়। কার্বন ডাই-সালফাইড গন্ধকের দ্রাবক। সেই রকম মোম কেরোসিনে দ্রবণীয়, গালা স্পিরিটে দ্রবণীয়, আয়োডিন ক্লোরোফর্মে দ্রবণীয়, ইত্যাদি। নানারকম রঙীন পদার্থ আবার কোহল প্রভৃতিতে দ্রব হইয়া বার্নিশের রঙ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

যদি দুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থ মিলিয়া সমসত্ত্ব মিশ্রণ করিতে পারে তবে তাহাও দ্রবণ হইবে। যেমন, রৌপ্যমুদ্রাতে রূপা, তামা এবং নিকেল সমসত্ত্বভাবে মিশিয়া আছে। কাজেই উহাকে কঠিন পদার্থের সমসত্ত্ব সংমিশ্রণ বা দ্রবণ বলা যাইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে যে উপাদানটি অধিক পরিমাণে বর্তমান তাহাকে দ্রাবক এবং অন্য উপাদানগুলিকে দ্রাব বলা যায়। রৌপ্য দ্রাবক, তামা ও নিকেল দ্রাব।

দুই বা ততোধিক গ্যাস সর্বদাই সমসত্ত্ব সংমিশ্রণে থাকে এবং উহাদেরও দ্রবণ বলা চলে।

পরীক্ষা: একটি পাত্রে খানিকটা জল লইয়া উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে পটাসিয়াম নাইট্রেট চূর্ণ দিতে থাক। প্রথমে উহা দেওয়া মাত্রই দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। পরে আর এত দ্রুত দ্রবীভূত হইবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উহা আর দ্রবীভূত না হইয়া নীচে জমা হইতেছে। ঐ জলটুকুর পক্ষে যতটা

পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত করা সম্ভব তাহা করিয়াছে। এই রকম দ্রবণকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ (saturated solution)** বলে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক একটি পদার্থের যতটা পরিমাণ দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাও নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব যখন দ্রবীভূত থাকে তখনই দ্রবণটিকে সম্পৃক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

এইরূপ সম্পৃক্ত দ্রবণকে যদি আরও উত্তপ্ত করা যায় তবে উহা আরও খানিকটা পটাসিয়াম নাইট্রেটকে দ্রবীভূত করিবে। অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হইবে তাহাও বৃদ্ধি পায়। আবার উত্তাপ কমাইলে দ্রবণীয়তা কমিয়া যায়।

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বাধিক যে পরিমাণ পদার্থকে ১০০ গ্রাম ওজনের দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে, সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গ্রাম হিসাবে উক্ত পরিমাণকে ঐ পদার্থের **দ্রাব্যতা (solubility)** বলা হয়। যেমন, ৯০°C উষ্ণতায় জলে লবণের দ্রাব্যতা ৪০ গ্রাম। ইহা হইতে বুঝা যায়, ৯০°C উষ্ণতায় ১০০ গ্রাম জল ৪০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করিয়া সম্পৃক্ত দ্রবণ হইতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা অবশ্যই বিভিন্ন। পদার্থের দ্রাব্যতা নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়।

পরীক্ষা ঃ জলে নাইটারের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর।

একটি পরিষ্কার শিশিতে খানিকটা জল লও এবং নাইটার চূর্ণীকৃত করিয়া আস্তে আস্তে দিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে নাইটার আর দ্রব হইবে না। শিশিটির মুখ বন্ধ করিয়া উহাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া লইতে হইবে। এইভাবে পরীক্ষাকালীন উষ্ণতায় নাইটারের সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত হইল। একটি শুষ্ক ফিল্টার কাগজের সাহায্যে এই সম্পৃক্ত দ্রবণ পরিস্রুত করিয়া লও।

এখন একটি খর্পর ওজন করিয়া লও এবং একটি পিপেট দ্বারা ঠিক ২৫ ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণ খর্পরে লও। দ্রবণ-সহ খর্পরটি আবার ওজন কর। একটি জলগাহের উপর রাখিয়া দ্রবণটি উত্তপ্ত করিয়া উহার জল সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত করিয়া দাও। বায়ুচুল্লীতে উহাকে শুষ্ক করিয়া শোষকাধারে রাখিয়া শীতল কর। উহা শীতল হইলে আবার উহার ওজন লও। বারে বারে

উহাকে উত্তপ্ত করিয়া পরে শীতল অবস্থায় ওজন লইতে হইবে যেন ওজনটি নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ জল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। মনে কর,

খর্পরের ওজন $= w_1$ গ্রাম

খর্পর ও দ্রবণের ওজন $= w_2$ গ্রাম

খর্পর ও নাইটারের ওজন $= w_3$ গ্রাম

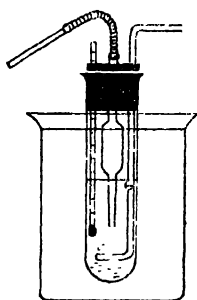
∴ $(w_2 - w_3)$ গ্রাম জলে $(w_3 - w_1)$ গ্রাম নাইটার দ্রবীভূত হইতে পারে ;

অথবা ১০০ গ্রাম জলে $\frac{w_3 - w_1}{w_2 - w_3} \times ১০০$ গ্রাম নাইটার দ্রবীভূত হইতে পারে

অতএব, সেই উষ্ণতায় নাইটারের দ্রবণীয়তা $= \frac{w_3 - w_1}{w_2 - w_3} \times ১০০$ ।

যে কোন পদার্থের দ্রাব্যতা দ্রাবকের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। উষ্ণতা ও দ্রাব্যতাকে স্থানাঙ্ক ধরিয়া যদি আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করি তাহা হইলে উহাদের এই পরিবর্তন সহজে বুঝা যাইবে।

সাধারণ উষ্ণতার পরিবর্তে যদি অন্য কোন উষ্ণতায় দ্রাব্যতা নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী চিত্রের অনুরূপ একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে। একটি বড় বীকারে জল লইয়া উহাকে গরম করিয়া বা বরফ সাহায্যে শীতল করিয়া প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় রাখা হয়। অতঃপর একটি বড় মুখের পরীক্ষা-নলে খানিকটা জল লইয়া উহাতে আস্তে আস্তে বিচূর্ণ নাইটার [অথবা অন্য কোন দ্রাব] দেওয়া হয়। এই নলটি বীকারের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হয়। একটি রবার-কর্ক দিয়া নলের মুখটি আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং কর্কের ভিতর দিয়া একটি থার্মোমিটার, একটি আলোড়ক (নাড়াচাড়া করার জন্য) এবং একটি পিপেট প্রবেশ করান থাকে। সেই উষ্ণতায় দ্রবণটি সম্পৃক্ত হইলে, পিপেটের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণ বাহিরে লইয়া পূর্বের নিয়মানুযায়ী দ্রাব ও দ্রাবকের অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

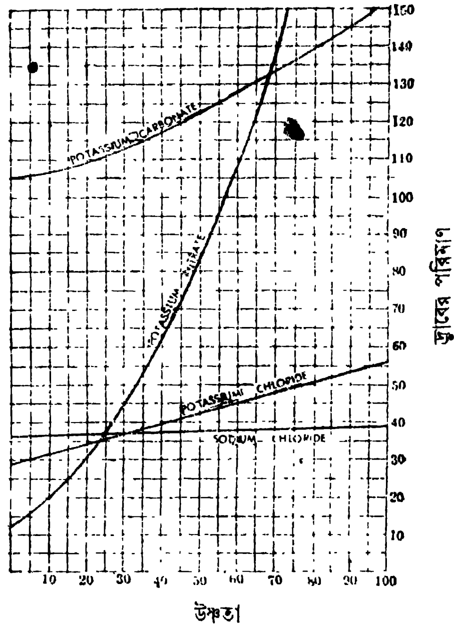


যে কোন উষ্ণতায় দ্রাব্যতা নির্ণয়

সচরাচর, উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাব্যতাও বাড়িয়া যায়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ১০০ গ্রাম জলকে সম্পৃক্ত করিতে ৫০°C উষ্ণতায় ৮৫ গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রয়োজন, এবং ৪০°C উষ্ণতায় মাত্র ৬৫ গ্রাম প্রয়োজন হয়। এখন যদি ৫০°C উষ্ণতায় ১০০ গ্রাম জলে পটাসিয়াম নাইট্রেটের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় এবং তারপর উহাকে আস্তে আস্তে শীতল করিয়া ৪০°C উষ্ণতায় আনা হয়, তবে সেই দ্রবণ হইতে প্রায় ২০ গ্রাম

দ্রাব বাহির হইয়া আসিবে। কারণ, ৪০°C উষ্ণতায়, ১০০ গ্রাম জলে সর্বাধিক যে পরিমাণ পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত হইতে পারে তাহা ৬৫ গ্রামের অধিক নয়।

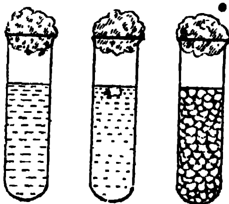
কোন কোন সময় সম্পৃক্ত দ্রবণকে এক উষ্ণতা হইতে নিম্নতর উষ্ণতায় নিয়া আসিলে যে পরিমাণ দ্রাব বাহির হইয়া আসার কথা তাহা আসে না। অর্থাৎ নিম্নতর উষ্ণতায় যতটা দ্রাব দ্রবণে থাকার কথা, তাহা হইতে অধিকতর পরিমাণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই প্রকার দ্রবণকে **অতিপৃক্ত দ্রবণ (super-saturated solution)** বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণ খুব অস্থায়ী ধরণের হয়। একটু নাড়াচাড়া করিলে বা দ্রাবপদার্থের একটুখানি উহাতে দিলেই পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রাবটুকু বাহির হইয়া আসে এবং দ্রবণটি সম্পৃক্ত হইয়া থাকে।



চিত্র ৩খ—দ্রাব্যতা-লেখ

পরীক্ষা: সোডিয়াম-থায়োসালফেটের অতিপৃক্ত দ্রবণ।

একটি পরীক্ষ-নলে কিছু সোডিয়াম-থায়োসালফেটের দানা লইয়া নলের মুখটি তুলা দিয়া আঁটিয়া দাও। অতঃপর উহাকে একটি বীকারের জলে রাখিয়া আস্তে আস্তে গরম কর। দেখিবে সোডিয়াম-থায়োসালফেটের দানাগুলি গলিয়া তরল হইতেছে। বস্তুতঃ সোডিয়াম-থায়োসালফেটের স্ফটিকের ভিতর জল আছে; উত্তাপ-প্রয়োগে, সেই জলে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। এখন টেস্ট-টিউবটি বাহিরে আনিয়া শীতল করিলেও, উহা সহজে দানা বাঁধিবে না। ইহা সোডিয়াম-থায়োসালফেটের অতিপৃক্ত দ্রবণ। এই দ্রবণে সোডিয়াম-


সোডিয়াম-থায়োসালফেটের অতিপৃক্ত দ্রবণ

থায়োসালফেটের একটি ছোট স্ফটিক ছাড়িয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্রবণ হইতে কেলাস বাহির হইয়া সম্পূর্ণ দ্রবণটি কঠিনাকার ধারণ করিবে। কিছু তাপও নির্গত হইবে। পরিপৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের একটু স্ফটিক দিলেই, দ্রাবটি কেলাসিত হইয়া বাহির হইয়া আসে।

আর একটি কথা জানিয়া রাখা দরকার। দ্রাবটি যখন কঠিন পদার্থ না হইয়া গ্যাসীয় পদার্থ হয় তখন উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দ্রাব্যতা না বাড়িয়া কমিয়া যায়। যেমন, বাতাস জলে কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং জল গরম করা হইলে সেই বাতাস প্রথমে বাহির হইয়া আসিতে থাকে।

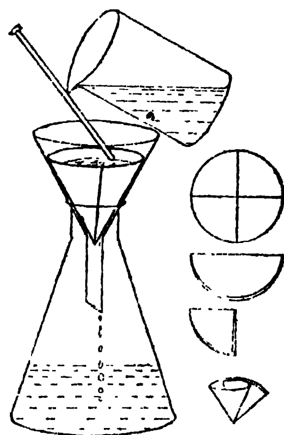
তরল পদার্থে বায়বীয় পদার্থের দ্রাব্যতা চাপের উপরেও নির্ভর করে। চাপ যত বেশী দেওয়া যায়, ততই বেশী পরিমাণে গ্যাসীয় পদার্থ তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। চাপ কমাইয়া দিলে দ্রবণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া আসে। লেমোনেড ইত্যাদিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস অতিরিক্ত চাপে দ্রবীভূত থাকে। ছিপি খুলিয়া দিলেই চাপ কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস দ্রবণ হইতে বাহির হইতে থাকে।

বিশুদ্ধ তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নির্দিষ্ট। জল ১০০° সেন্টিগ্রেডে ফোটে এবং ০° সেন্টিগ্রেডে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। কিন্তু কোন দ্রাব যদি তরল পদার্থে দ্রবীভূত থাকে তবে সেই দ্রবণের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক পরিবর্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ জলে যদি চিনি, লবণ ইত্যাদি দ্রবীভূত থাকে, তবে সেই দ্রবণটি ১০০° ডিগ্রিতে ফুটিবে না, আরও অধিকতর উষ্ণতায় ফুটিবে। আবার এই দ্রবণটি ০° ডিগ্রিতে জমিয়া বরফ হইবে না, উহার হিমাঙ্ক ০° সেন্টিগ্রেড হইতে আরও নীচে নামিয়া যাইবে। দ্রাবের উপস্থিতি হিমাঙ্ক নামাইয়া এবং স্ফুটনাঙ্ক বাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য তরল পদার্থের দ্রবণেরও ব্যবহার একই রকমের।

কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ওজনের দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রাব থাকিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তদপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রাব যদি দ্রবণে থাকে তবে দ্রবণটিকে **অসম্পৃক্ত দ্রবণ (unsaturated)** বলে। এইরূপ অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে উহাকে **লঘু দ্রবণ (dilute)** বলে এবং দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকিলে উহাকে **গাঢ় দ্রবণ (concentrated)** বলে।

৩-৫। আস্রাবণ (Decantation)ঃ একটি গ্লাসে যদি কিছু নদীর জল লইয়া পরীক্ষা কর তবে দেখিবে উহাতে মাটি ও বালুর অনেক ছোট ছোট কণা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নাড়াচাড়া না করিয়া উহাকে রাখিয়া দিলে কতক্ষণ পরে কঠিন কণাগুলির অধিকাংশ নীচে আসিয়া জমা হইবে। কোনও তরল পদার্থে ভাসমান অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ যখন তলদেশে সঞ্চিত হয়, তখন উহাকে **গাদ** বা **কল্ক (sediment)** বলে। এই ভাবে গাদ থিতাইয়া গেলে সাবধানে পাত্রটি কাত করিয়া উপর হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত জল সরাইয়া লওয়া যায়। গাদ হইতে তরল পদার্থকে এই ভাবে পৃথকীকরণকে **আস্রাবণ (decantation)** বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, আস্রাবণ-প্রণালীতে সমস্ত কঠিন পদার্থ টুকু পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম সেগুলি ভাসিয়াই থাকিবে। সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ হইতে তরল পদার্থ পৃথক করিতে হইলে যে পন্থা অনুসরণ করা দরকার তাহা **পরিস্রাবণ**।

৩-৬। পরিস্রুতি বা পরিস্রাবণ (Filtration)ঃ সচ্ছিদ্র পর্দার সাহায্যে তরল পদার্থ হইতে ভাসমান অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ পৃথক করার প্রণালীকে **পরিস্রুতি বা পরিস্রাবণ** বলে। নদীর জল যদি একটি ব্লটিং কাগজ বা ফিল্টার কাগজের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয় তবে নীচে স্বচ্ছ জল পাওয়া যাইবে এবং কঠিন পদার্থগুলি কাগজের উপর থাকিয়া যাইবে। বিভিন্ন পদার্থের জন্য অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের সচ্ছিদ্র দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যেমন অনেক সময় কাপড় বা ছাঁকনী এই কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঠকয়লা বা বালির স্তরের ভিতর যে ছিদ্রপথ আছে তাহাও বেশ ছোট; সুতরাং উহারাও পরিস্রাবণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিস্রুতি প্রণালীতে তরল বস্তু সচ্ছিদ্র পদার্থের মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, কিন্তু অদ্রবণীয় পদার্থগুলি যায় না। অতএব এই প্রণালীতে মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি অনেক সময় পৃথক করা সম্ভব।


চিত্র ৩গ—পরিস্রাবণ

পরীক্ষা ঃ খানিকটা বালু ও লবণ একত্র করিয়া মিশাইয়া লও। এখন উহাদিগকে পৃথক করিতে হইবে। একটি বীকারে মিশ্র পদার্থটি লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ জল দাও। তারপর উহাকে বুনসেন দীপের সাহায্যে তার-জালির উপর বেশ উত্তপ্ত কর। লবণ জলে দ্রব হইবে, কিন্তু বালু এমনিই থাকিবে। এখন এক টুকরা ফিল্টার কাগজ ঠোঙার মত জড়াইয়া একটি কাচের ফানেলের উপর বসাও এবং নীচে একটি পাত্র রাখ। গরম দ্রবণটি এখন ফিল্টার কাগজে ঢালিয়া দাও। দেখ, নীচের পাত্রে আস্তে আস্তে স্বচ্ছ লবণের দ্রবণ সঞ্চিত হইতেছে এবং বালুকণা ফিল্টার কাগজের উপর রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে বালু হইতে লবণ পৃথক করা হইল।

কিন্তু মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সবই যদি দ্রবণীয় হয় তবে তাহাদের এই ভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। যেমন, চিনি ও লবণ একত্র থাকিলে এই প্রণালীতে আলাদা করা যাইবে না।

পরিস্রুতির ফলে যে স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে **পরিস্রুৎ (filtrate)** এবং যে কঠিন পদার্থ ফিল্টারের উপরে থাকিয়া যায় তাহাকে **অবশেষ (residue)** বলে।

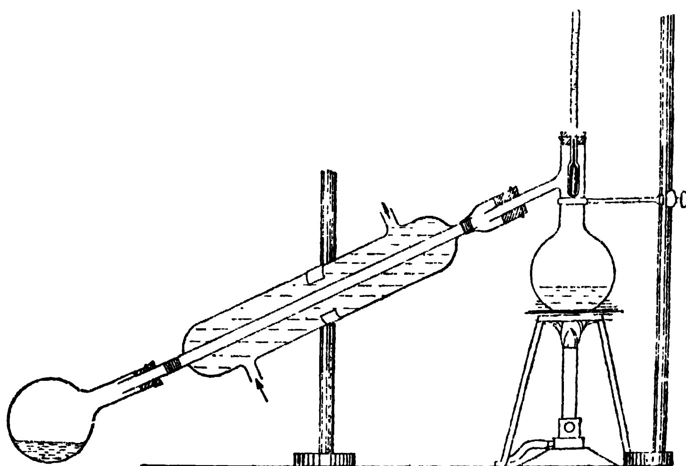
৩-৭। পাতন (Distillation) ঃ তরল পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত করা এবং সেই বাষ্পকে শীতল করিয়া আবার তরল অবস্থায় ফিরাইয়া আনাকে **পাতন প্রণালী** বলে। সুতরাং পাতন প্রণালী বাষ্পীকরণ এবং ঘনীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়। ল্যাবরেটরীতে পাতন প্রণালীর প্রয়োগ খুবই সাধারণ এবং তরল পদার্থকে বিশুদ্ধ করিতে পাতনের সাহায্য অপরিহার্য। তরল পদার্থের সঙ্গে যখন অদ্রবণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তখন পরিস্রুতির দ্বারা উহাদের পৃথক করা যায়। কিন্তু কোন পদার্থ যদি তরল পদার্থে দ্রবীভূত থাকে তাহা হইলে পরিস্রাবিত করিয়া তাহাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তখন পাতনের সাহায্য লইতে হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা পাতনের উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

পরীক্ষা ঃ নদীর অবিশুদ্ধ জল হইতে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত কর.

একটি পাতন-কূপীতে নদীর জল নাও এবং উহাতে একটুখানি পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া দাও. জলের রঙ গাঢ় লাল হইবে। পাতন-কূপীর

নলটির সহিত একটি লিবিগ-শীতক বা কনডেন্‌সার জুড়িয়া দাও (চিত্র ৩ঘ)। এই শীতকের ভিতর একটি সরু নল আছে যাহার সঙ্গে পাতন-কূপীর অভ্যন্তর সংযুক্ত হইবে এবং উহার ভিতর দিয়া বাষ্প চালিত হইবে। এই সরু নলটির চারিদিকে শীতল জল পরিচালনের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাচের নল আছে। রবার টিউবের দ্বারা জলের কলের সঙ্গে এই বাহিরের নলটি যুক্ত করিয়া শীতল জলপ্রবাহের ধারা দেওয়া হয়। শীতকটি একটু কাত করিয়া লাগান হয় যাহাতে পাতন-কূপীর বিপরীত দিকটি নীচু থাকে। এই দিকে একটি পরিষ্কার কাচের কূপী জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই কাচের কূপীতে বিশুদ্ধ তরল পদার্থটি সঞ্চিত হইবে। ইহাকে **গ্রাহক (receiver)** বলা যাইতে পারে।

পাতন-কূপীর মুখটি একটি কর্ক দিয়া বন্ধ করিয়া দাও এবং এই কর্কের ভিতর দিয়া একটি থার্মোমিটার বসাইয়া দাও। এখন তারজালির উপর রাখিয়া বুনসেন দীপ সাহায্যে পাতন-কূপীটিকে উত্তপ্ত কর। কিছুক্ষণ পরে জল ফুটিতে থাকিবে এবং বাষ্প পার্শ্ববর্তী নলের ভিতর দিয়া শীতকের মধ্যে



চিত্র ৩ঘ—পাতন

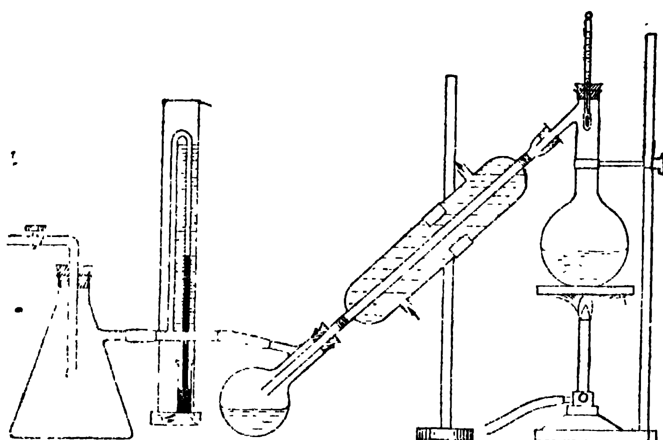
প্রবেশ করিবে। থার্মোমিটারটি লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে এই স্ফুটনের সময় পাতন-কূপীর ভিতরের উষ্ণতা একেবারে অপরিবর্তিত থাকে। স্ফুটনের সময় জল বাষ্পীভূত হয়, কিন্তু নদীর জলের অন্যান্য দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ময়লা অথবা

পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট অনুদ্বায়ী বলিয়া বাষ্পে রূপান্তরিত হয় না। কতক-গুলি ময়লা সহজে দূরীভূত করবার জন্য পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ব্যবহৃত হয়। জলীয় বাষ্প শীতকের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার উষ্ণতা কমিয়া যায় ; কারণ, শীতকের ভিতরের নলটির চারিদিকে শীতল জল প্রবাহিত থাকে। যতই উষ্ণতা কমিতে থাকে, বাষ্প স্বচ্ছ, তরল অবস্থায় ফিরিয়া নিম্নগামী হয় এবং নীচের কাচ-কূপীতে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলকে পাতিত জল বলা যায় এবং ইহা অন্যান্য ময়লা হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া আসে।

আংশিক পাতন (Fractional distillation) ঃ যদি দুই বা ততোধিক তরল পদার্থ একত্র মিশিয়া থাকে তবে তাহাদেরও পাতন-সাহায্যে পৃথক করা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। একটি তরল মিশ্রণে ঈথার (ether) এবং বেন্‌জিন্ (benzene) আছে। ঈথারের স্ফুটনাঙ্ক ৩৫°C এবং বেন্‌জিনের ৮০ C। এই মিশ্রণটিকে একটি পাতন-কূপীতে লইয়া উত্তপ্ত করিলে উহা যখন ৩৫°C উষ্ণতায় পৌঁছাইবে, তখন শুধু ঈথার বাষ্পীভূত হইবে এবং শীতক বাহিয়া নীচের কাচ-কূপীতে কেবল ঈথার আসিয়া সঞ্চিত হইবে। যতক্ষণ এই ঈথার বাষ্পীভূত হইতে থাকিবে ততক্ষণ পাতন-কূপীর আভ্যন্তরিক উষ্ণতা ৩৫° ডিগ্রীই থাকিবে। যখন সমস্ত ঈথার পৃথক করা হইয়া যাইবে, তখন আবার উষ্ণতা বাড়িতে থাকিবে এবং ৮০°C উষ্ণতা হইলে, বেন্‌জিন ফুটিতে থাকিবে এবং তাহার বাষ্প শীতকে আসিয়া তরল হইবে। উহাকে আর একটি ভিন্ন গ্রাহকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইভাবে বেন্‌জিন ও ঈথার পৃথক করা সম্ভব হইবে। দুই বা ততোধিক তরল পদার্থের মিশ্রণকে বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতন-ক্রিয়া দ্বারা পৃথক করার নাম **আংশিক পাতন।**

অনুপ্রেষ পাতন (Vacuum distillation) ঃ তরল পদার্থ যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন সেই বাষ্পের একটা চাপ বা প্রেষ দেখা যায়। উষ্ণতা যতই বৃদ্ধি পায় বাষ্পের এই চাপও ততই বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বাহিরের বায়ুর চাপের সঙ্গে সমান হইয়া যায়, তখনই স্ফুটন আরম্ভ হয়। অতএব বাহিরের চাপ যদি কম হয়, স্ফুটনও কম উষ্ণতায় সম্ভব হইবে। অর্থাৎ বাহিরের চাপের উপর স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর করিবে।

অনেকগুলি তরল পদার্থে দেখা যায় সাধারণ বায়ুর চাপে ফুটনের সময় উহারা **বিযোজিত (decomposed)** হইয়া যায় এবং পাতন দ্বারা আসল তরল পদার্থটি আর পাওয়া যায় না। যেমন তরল হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড লইয়া যদি পাতন করার চেষ্টা করা যায়, তবে উত্তাপের জন্য উহা ভাঙ্গিয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। এই প্রকম ক্ষেত্রে যদি কম উষ্ণতায় উহাদের ফুটান যায় তবে তরল পদার্থটি রক্ষা করা সম্ভব হইবে। কম্ উষ্ণতায় ফুটাইতে



চিত্র ৩৬—অনুপ্রেষ পাতন

হইলে উহার উপরকার চাপ কমাইতে হইবে। সেই জন্য পাম্পের সাহায্যে পাতন যন্ত্রের ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া চাপ কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পরে গরম করিয়া পদার্থটি পাতন করা হয়। এই রকম কম চাপে পাতন করাকে **অনুপ্রেষ পাতন** বলে (চিত্র ৩৬)।

অন্তর্ধূম পাতন ঃ কোন কোন কঠিন মিশ্র পদার্থ বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে কতকগুলি উদ্বায়ী বস্তু মারুতাকারে বহির্গত হয় এবং শৈত্যের দ্বারা এই সব উদ্বায়ী বস্তুর ঘনীকরণ সম্ভব হয়। মিশ্র পদার্থ হইতে বাতাসের অবর্তমানে উদ্বায়ী বস্তুকে পাতিত করিয়া আনার নাম **অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation)**। এই রকম পাতনে বাতাস থাকিতে দেওয়া হয় না, কারণ বাতাসের সাহায্যে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কয়লাকে এইরূপে বাতাসের অবর্তমানে

খুব উত্তপ্ত করিয়া নানা রকম পাতিত বস্তু সংগ্রহ করা হয়। যথা—কোল গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি। এই সব উদ্বায়ী বস্তু চলিয়া যাওয়ার পর যে কঠিন পদার্থ থাকিয়া যায় তাহাই **কোক-কয়লা**।

৩৮। কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ (Crystallisation): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কোন দ্রবণকে অধিকতর উষ্ণতায় সম্পৃক্ত করিয়া তারপর আস্তে আস্তে শীতল করিলে উহা হইতে দ্রাবটি বাহির হইয়া আসে। যখন এই দ্রাব পদার্থটি দ্রবণের বাহিরে আসে তখন প্রায়ই তাহা নির্দিষ্ট আকারের দানা বাঁধিয়া থাকে। এই দানাগুলির একটা জ্যামিতিক রূপ আছে। ভাল করিয়া দেখিলে বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের পৃষ্ঠদেশগুলি সব সমতল। সমতল পৃষ্ঠগুলি আবার সরল ঋজুরেখায় আসিয়া মিলিয়াছে। এই রকম দানাগুলিকে **স্ফটিক** বলা হয়। সম্পৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা করিয়া নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের কঠিন পদার্থ পৃথক করার নাম **কেলাসন** বা **স্ফটিকীকরণ**।

কোন একটি পদার্থের স্ফটিকগুলি বিভিন্ন আয়তনের হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের আকার সব সময় এক হইবে। বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিকের আকার বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন—লবণের স্ফটিকের ছয়টি সমতল পৃষ্ঠ আছে, কিন্তু ফট্‌কিরি অষ্টতল স্ফটিক। স্ফটিক আবার রঙীনও হইতে পারে; যেমন—তুঁতের স্ফটিক নীল। ঊর্ধ্বপাতনের ফলে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। কঠিন পদার্থকে চিনিবার পক্ষে তাহাদের স্ফটিকের আকার খুব সাহায্য করে। অবশ্য সমস্ত কঠিন পদার্থই যে স্ফটিকাকারে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। চূন, ময়দা ইত্যাদির কোন নির্দিষ্ট আকার নাই, তাহাদের স্ফটিক হয় না। এই সকল পদার্থকে **অনিয়তাকার পদার্থ (amorphous substance)** বলা হয়।

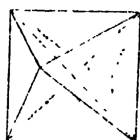
পরীক্ষা: ফট্‌কিরির স্ফটিক প্রস্তুত কর।

একটি বীকারে খানিকটা জল লও। উহাকে তারজালির উপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে আস্তে আস্তে গরম কর। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ ফট্‌কিরি উহাতে দাও এবং নাড়িতে থাক। এইভাবে যতক্ষণ না কিছু ফট্‌কিরি তলায় পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ দিতে হইবে। এইরূপে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হইল। উপর হইতে পরিষ্কার

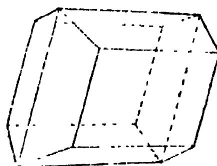
ও স্বচ্ছ দ্রবণটি অন্য একটি বীকারে আস্রাবণ করিয়া লও। যখন এই দ্রবণটি শীতল হইয়া আসিবে, দেখিবে সুন্দর অষ্টতল স্ফটিক দ্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। যত ধীরে ধীরে উহাকে শীতল করিবে ততই বড় বড় স্ফটিক পাওয়া যাইবে। স্ফটিক বাহির হইলে পরে যে সম্পৃক্ত দ্রবণ পড়িয়া থাকে তাহাকে **শেষদ্রব (mother liquor)** বলা হয়। এইভাবে স্ফটিক প্রস্তুত করা হয়।

সম্পৃক্ত দ্রবণে যদি দ্রাবের একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক সূতায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয় তবে উহা ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি বৃহদাকার স্ফটিকে পরিণত হইবে।

সম্পৃক্ত দ্রবণে যদি দুইটি দ্রাব বর্তমান থাকে তবে ঠাণ্ডা করিলে যে দ্রাবটির দ্রাব্যতা কম, উহাই প্রথমে দানা বাঁধিবে। তখন উহাকে পরিস্রুতির দ্বারা



গন্ধকের স্ফটিক



চিনির স্ফটিক

পৃথক করিয়া লওয়া হয়। পরে পরিস্রুত দ্রবণকে আরও ঠাণ্ডা করিলে দ্বিতীয় দ্রাবটির স্ফটিক বাহির হইয়া আসিবে। এই ভাবে দুইটি উপাদানকে মিশ্র পদার্থ হইতে পৃথক করা সম্ভব। ইহাকে **আংশিক কেলাসন (fractional crystallisation)** বলা যায়। যদি লবণের সঙ্গে সোরা মিশ্রিত থাকে তবে প্রথমে উহাদের জলে দ্রবীভূত করিয়া সম্পৃক্ত দ্রবণ করা হয়। পরে এই দ্রবণকে ঠাণ্ডা করিলে কেবল লবণের স্ফটিক বাহির হইবে। উহাকে ফিল্টারের সাহায্যে ছাঁকিয়া লইলেই বিশুদ্ধ এবং সোরামুক্ত লবণ পাওয়া যাইবে। পরে শেষদ্রবকে আরও ঘন করিলে বা ঠাণ্ডা করিলে সোরার স্ফটিক পাওয়া যাইবে। অনেক সময় কেলাসন দ্বারা এইরূপে মিশ্র পদার্থের উপাদান পৃথক করা সম্ভব।

কোন কোন পদার্থ স্ফটিক আকার ধারণ করার সময় দ্রবণ হইতে প্রত্যেক অণুর সঙ্গে এক বা একাধিক জলের অণু বহন করিয়া আনে। যথা—তুঁতে যখন

নীল স্ফটিক হয় তখন তুঁতের প্রতি অণুর সঙ্গে পাঁচটি জলের অণু সহযাত্রী হয়। এই সমস্ত স্ফটিককে **সোদক স্ফটিক** **(hydrated crystals)** বলা হয়। যে সমস্ত স্ফটিকে কোন জলের অণু থাকে না, যেমন লবণের স্ফটিক, তাহাদিগকে **অনার্দ্র স্ফটিক** **(anhydrous crystals)** বলে। সোদক স্ফটিকের জল অনেক সময় সেই স্ফটিকের জ্যামিতিক আকারের জন্য দায়ী এবং কোন কোন সময় স্ফটিকের রঙের জন্যও দায়ী। যেমন, তুঁতের নীল স্ফটিক উত্তপ্ত করিলে উহার অন্তঃস্থিত জল উড়িয়া যায় এবং একটি সাদা অনিয়তাকার গুঁড়া পড়িয়া থাকে। ইহা অনার্দ্র তুঁতে। কোন কোন সোদক স্ফটিক বাতাসে উন্মুক্ত করিয়া রাখিলে উহাদের জল ক্রমশঃ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং স্ফটিকগুলি অবশেষে অনিয়তাকার হইয়া পড়ে। সোদক স্ফটিকে জল থাকে, সুতরাং উহার একটি নির্দিষ্ট বাষ্পচাপ থাকে। কিন্তু বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহার চাপ যদি এই বাষ্পচাপ হইতে কম হয় তবে স্ফটিক হইতে জল বাষ্প হইয়া বায়ুতে আসিতে থাকে। এই রকম পরিবর্তনকে **উদত্যাগ** **(efflorescence)** বলে এবং স্ফটিকগুলিকে **উদত্যাগী স্ফটিক** বলা হয়। সোডিয়াম কার্বনেটের স্ফটিক ($Na_2CO_3, 10H_2O$) বাতাসে রাখিয়া দিলে উহার দশটি জলের অণুর নয়টি বাষ্পীভূত হইয়া যায়। অতএব সোডিয়াম কার্বনেট উদত্যাগী। কোন কোন স্ফটিক বাতাসে রাখিয়া দিলে তাহা জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া দ্রবীভূত হইয়া পড়ে এবং পদার্থটি একটি তরল দ্রবণে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির স্ফটিক এইরূপ ব্যবহার করে। এই সকল পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণের বাষ্পচাপ অতিশয় কম এবং সাধারণ উষ্ণতায় এই চাপ বাতাসের জলীয় বাষ্পের চাপ হইতেও কম থাকে। অতএব বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প উহারা আকর্ষণ করে এবং ক্রমশঃই দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই রকম জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া তরল দ্রবণ হওয়ার নাম **উদগ্রহণ** **(deliquescence)** এবং এইসকল স্ফটিককে **উদগ্রাহী স্ফটিক** বলা হয়।

আরও অনেক বস্তু জল আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু তাহারা দ্রবীভূত হইয়া পড়ে না, যেমন চুন। ইহাদিগকে **জলাকর্ষী** **(hygroscopic)** বস্তু বলা হয়।

সোদক স্ফটিকের জলের অনুপাত সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।

পরীক্ষা ঃ বেরিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিকের জলের অনুপাত নিরূপণ কর।

একটি পর্সেলীনের ঢাকনীসহ মুচি লও। উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া শুষ্ক অবস্থায় উহার ওজন লও। এখন এই মুচির ভিতরে এক গ্রাম পরিমাণ বিশুদ্ধ বেরিয়াম ক্লোরাইডের স্ফটিক লইয়া তৌলদণ্ডের সাহায্যে আবার উহার ওজন লও। এই দুইটি ওজন হইতে বেরিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিকের ওজন জানা হইবে। মুচিটি তৎপরে একটি ত্রিকোণ মুষাধারের উপর অর্ধোন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর। উত্তাপে স্ফটিকের জল বাষ্পীভূত হইয়া চলিয়া যাইবে। অনেকক্ষণ এই প্রক্রিয়া করিলে সমস্ত জল পদার্থটি হইতে দূরীভূত হইবে। তৎপর মুচিটিকে একটি শোষকাধারে (desiccator) রাখিয়া শীতল কর এবং পুনরায় উহার ওজন বাহির কর। পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে শীতল করিয়া এই ওজনটি লইতে হইবে, যাহাতে ওজনটি নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ সমস্ত জল দূরীভূত হইয়াছে জানা যায়। মনে কর—

ঢাকনীসহ মুচিটির ওজন $= w_1$ গ্রাম

স্ফটিক এবং ঢাকনীসহ মুচিটির ওজন $= w_2$ গ্রাম

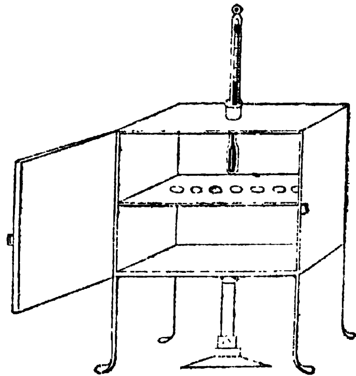
অনার্দ্র পদার্থ এবং ঢাকনীসহ মুচিটির ওজন $= w_3$ গ্রাম

$\therefore$ $(w_2 - w_1)$ গ্রাম স্ফটিকে $(w_2 - w_3)$ গ্রাম জল ছিল।

অতএব, ১০০ গ্রাম স্ফটিকে $\dfrac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1} \times ১০০$ গ্রাম জল ছিল।

অর্থাৎ, স্ফটিকের জলের অনুপাত, $\dfrac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1} \times ১০০$ %।

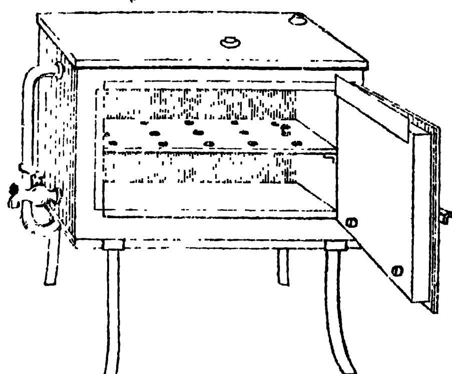
৩-৯। শুষ্কীকরণ (Drying or Desiccation) ঃ পদার্থের ভিতর প্রায়ই কিঞ্চিৎপরিমাণ জল থাকে। এই জল সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলী হইতে পদার্থে সঞ্চিত হয়। অনেক সময় রাসায়নিক বিক্রিয়াতে জলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য পদার্থ হইতে জল সরাইয়া লওয়া হয়। জল দূর করার প্রণালীকে **শুষ্কীকরণ** বলে। শুষ্কীকরণ দুই প্রকারে সম্ভব।



চিত্র ৩চ—বায়ু-চুল্লী

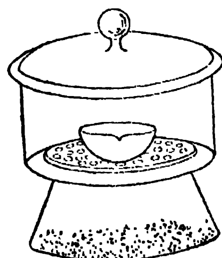
ক। উত্তাপের সাহায্যে—যদি পদার্থটি নিজে উদ্বায়ী না হয় এবং উত্তাপে বিযোজিত না হয় তবে উহাকে উত্তপ্ত করিলেই জল বাষ্পাকারে দূরীভূত হইয়া যাইবে। উত্তাপ প্রয়োগ করার জন্য

প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে—**বায়ু চুল্লী ও স্টীম প্রকোষ্ঠ (air oven and steam oven)**। (চিত্র ৩চ এবং ৩ছ)।

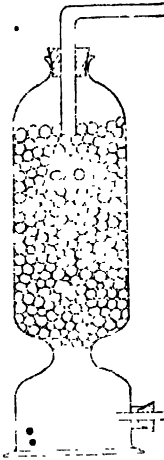


চিত্র ৩ছ — স্টীম প্রকোষ্ঠ

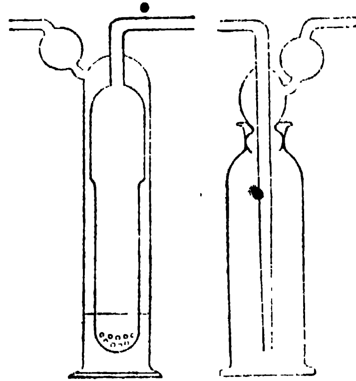
খ। নিরুদনকারী সাহায্যে (By dehydrating agents) ঃ কতকগুলি বস্তু আছে যাহারা অতি সহজে জল আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাদের **নিরুদনকারী** বলা যায়। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি উত্তম নিরুদনকারী পদার্থ। যদি একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর একটি নিরুদনকারী এবং যে পদার্থ শুষ্ক করিতে হইবে তাহা রাখিয়া দেওয়া যায় তবে প্রথমে বায়ু হইতে সমস্ত জলীয় বাষ্প নিরুদনকারী বস্তু শোষণ করিয়া লইবে ; বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অভাব হইলেই পদার্থ টি হইতে জল বাষ্পাকারে বায়ুতে সঞ্চালিত হইবে। ইহাও আবার নিরুদনকারী শোষণ করিয়া লইবে। এইভাবে সিক্ত পদার্থ টি হইতে সমস্ত জল নিরুদনকারীর ভিতর চলিয়া যাইবে। পদার্থ টি জলমুক্ত হইয়া যাইবে। যে যন্ত্রে এই কার্য সম্পাদিত হয় তাহাকে **শোষকাধার (desiccator)** বলা হয় (চিত্র ৩জ)। গ্যাসীয় পদার্থের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে উহাকে প্রায়ই নিরুদনকারী কোন পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া উহার জল বিতাড়িত করা হয়। বিভিন্ন রকমের "গ্যাস টাওয়ার" বা "ওয়াসার" (washer) এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (চিত্র ৩ঝ)।



চিত্র ৩জ—শোষকাধার



চিত্র ৩ঝ—গ্যাস টাওয়ার



চিত্র ৩ঞ—গ্যাস ওয়াসার

মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করার প্রণালী: পাতন, দ্রাবণ, পরিস্রুতি ইত্যাদি যে সমস্ত প্রণালীর আলোচনা করা হইয়াছে, এই সমস্তই মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা উপাদানের উপর নির্ভর করে। দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

১। বারুদের উপাদান পৃথকীকরণ: বারুদের তিনটি উপাদান—গন্ধক, সোরা, এবং কাঠকয়লা চূর্ণ। খানিকটা বারুদ একটি বীকারে নিয়া কার্বন ডাই-সালফাইড দিয়া ভাল করিয়া নাড়িলে, উহাতে গন্ধক দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু অপর দুইটি উপাদান দ্রবীভূত হইবে না। একটি ফিল্টার কাগজের সাহায্যে এখন এই সংমিশ্রণটিকে পরিস্রাবণ করিলে সোরা ও কয়লার গুঁড়া অবশেষ পাওয়া যাইবে এবং গন্ধক-দ্রবণের পরিস্রুৎ পৃথক হইয়া আসিবে। এই দ্রবণটিকে বাতাসে রাখিয়া দিলে কার্বন ডাই-সালফাইড বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে এবং পাত্রটিতে গন্ধক পড়িয়া থাকিবে। সোরা ও কয়লার মিশ্রণটিকে জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে সোরা দ্রবীভূত হইবে এবং ইহাকে পরিস্রাবণ করিয়া কয়লা পৃথক করিয়া লইতে পারা যাইবে। সোরা জলে দ্রবীভূত হওয়ায় যে পরিস্রুৎ পাওয়া যাইবে তাহাকে গরম করিয়া জল বাষ্পীভূত করিলেই সোরা পাওয়া যাইবে। এইভাবে উপাদান তিনটি পৃথক করা হয়।

২। লবণ, নিশাদল, বালু ও লৌহচূরের মিশ্রণ হইতে উপাদান চারিটি পৃথক করিতে হইবে।

মিশ্রণটি প্রথমে একটি কাগজের উপরে বিস্তৃত করিয়া একটি ভাল চুম্বকের সাহায্যে লোহাচূরগুলি আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ চুম্বক সঞ্চালন করিয়া সমস্ত লোহাচূর আকৃষ্ট করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে একটি উপাদান পৃথক হইল। লোহাচূর সরাইবার পর, মিশ্রণটি একটি খর্পরে রাখিয়া একটি ফানেল উল্টা করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এখন খর্পরটিকে তারজালির উপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে আস্তে আস্তে গরম করিলে নিশাদল ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া ফানেলের গায়ে জমাট বাঁধিবে। যথেষ্ট সময় দিলে সম্পূর্ণ নিশাদল এই রকমে আলাদা করা যাইতে পারে। এখন বাকী থাকিবে লবণ ও বালু। এই দুইটিকে জলের সহিত গরম করিলে লবণ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। পরিস্রুত করিলেই বালু পৃথক হইয়া যাইবে এবং দ্রবণটিকে উত্তাপের সাহায্যে শুষ্ক করিলে লবণ পাওয়া যাইবে। এইভাবে চারিটি উপাদান পৃথক করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

জড় পদার্থের নিত্যতাবাদ ঃ বস্তুর অবিনাশিতা

ম্যাগনেসিয়াম যখন আগুনে পোড়ান হয় তখন উহা অতি উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে এবং ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। ম্যাগনেসিয়াম খণ্ডটি যদি পুড়িবার পূর্বে একটি খর্পরে ওজন করিয়া লওয়া হয় এবং পরে উহাকে সেই খর্পরেই ভস্মীভূত করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া আবার ভস্মটি ওজন করা হয়, তবে দেখা যায় যে ভস্মের ওজন ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী। একটি রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই রকম খানিকটা লৌহ যদি ওজন করিয়া কয়েক দিন বাতাসে ফেলিয়া রাখা হয় তবে উহাতে মরিচা পড়ে। পরে যদি উহাকে আবার ওজন করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। যদি এক টুকরা তামা ওজন করিয়া চিমটা দিয়া ধরিয়া আগুনে উত্তপ্ত করা হয় তবে উহা আস্তে আস্তে কাল হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তামা কপার অক্সাইড হইয়া যায়। ঠাণ্ডা হইলে

পর যদি উহাকে ওজন করা হয়, ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাইবে। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে প্রতীয়মান হয় যে রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় বস্তুর ভর বৃদ্ধি পায় বা নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়।

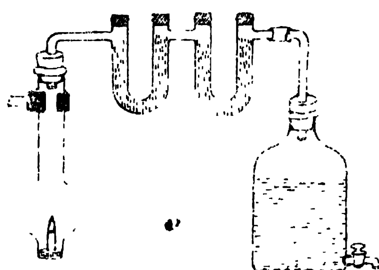
আবার মোমবাতিটি যখন পুড়িতে থাকে, স্পষ্টই দেখা যায় উহার ক্ষয় হইতেছে। সুতরাং উহার ওজন তো কমিবেই। কয়লা বা কাঠ যখন পোড়ে, তখন যেটুকু ভস্ম থাকিয়া যায় তাহার ওজন উহাদের নিজেদের ওজনের চেয়ে অনেক কম। কেরোসিন বা স্পিরিট পোড়াইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব এই সমস্ত পদার্থের পরিবর্তনে বস্তুর ভরের বিনাশ হয়। ইহাতে আপাততঃ মনে হয় এই সব জড় পদার্থ লয় পাইতেছে বা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এই সকল ধারণা ঠিক নহে। জড় পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহাদের ধ্বংসও নাই। স্থূলজ্ঞানে যাহাকে আমরা বস্তুর সৃষ্টি বা ধ্বংস বলিয়া মনে করিতেছি, বস্তুতঃ উহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র।

ম্যাগনেসিয়াম যখন ভস্মে পরিণত হয় তখন বায়ু হইতে অক্সিজেন উহার সহিত সংযোজিত হয়। যদি এই ম্যাগনেসিয়াম এবং যে অক্সিজেন উহার সহিত যুক্ত হয়, উভয়ের ওজন আমরা লই, তবে দেখিব ভস্মের ওজন উহাদের দুইটির ওজনের সমান। অতিরিক্ত কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই। তামার বা লোহার মরিচার ওজন-বৃদ্ধির হেতুও একই। কোন ক্ষেত্রেই বাস্তবিক পক্ষে পদার্থের ওজন-বৃদ্ধি ঘটে নাই। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্থ অংশ গ্রহণ করে তাহাদের সকলের ওজন লইলে দেখা যাইবে যে ওজন মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই।

আবার মোমবাতিটি যখন পোড়ে তখন মনে হয় বস্তুর বিনাশ সাধিত হইল। কিন্তু ইহা সত্য নহে। মোম যখন পোড়ে তখন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া উহা দুইটি অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়; একটি জলীয় বাষ্প, অপরটি অঙ্গারাম্ল বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড। উহারা গ্যাসীয় এবং অদৃশ্য বলিয়া আমরা সচরাচর উহাদের লক্ষ্য করি না এবং মোমবাতির ক্ষয় বা বিনাশ হইল মনে করি। মোমবাতির একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা : একটি কাচের চিমনীর নীচের মুখটি একটি ছিদ্র-যুক্ত ছিপি আঁটিয়া বন্ধ কর। ছিপির উপর একটি ছোট মোমবাতি বসাইয়া দাও (চিত্র ৪ক)। চিমনীর উপরের মুখটিও একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ কর এবং এই কর্কের ভিতর দিয়া একটি বাঁকান কাচনল প্রবেশ করাইয়া দাও। কাচনলের বাহিরের দিকটি পর পর দুইটি U-নলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দাও। একটি U-নল কষ্টিক পটাস এবং অপরটি বিশুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা ভর্তি কর।



চিত্র ৪ক—মোমবাতির দহন

U-নল দুইটি সহ চিমনীটিকে প্রথমেই একটি নিক্তিতে বাধিয়া ওজন করিয়া লও। অতঃপর শেষের U-নলটির সহিত জলপূর্ণ একটি বাতচোষক (aspirator) জুড়িয়া দাও। এখন মোমবাতিটি জ্বালাইয়া দাও এবং বাতচোষকের স্টপককটি খুলিয়া দাও। উহা হইতে জল বাহির হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর নীচের কর্কের ভিতরের ছিদ্র দিয়া বাতাস প্রবেশ করিতে থাকিবে। এই বাতাসে মোমের দহন-কার্য চলিতে থাকিবে। মোমবাতিটি অনেকক্ষণ যাবৎ পোড়ান হইলে স্টপককটি বন্ধ করিয়া দাও। আর বাতাস চিমনীতে ঢুকিবে না এবং মোমবাতিটিও নিভিয়া যাইবে। যন্ত্রটি ঠাণ্ডা হইলে পর, আবার চিমনীটিকে U-নল দুইটি সহ ওজন কর; দেখিবে এখন ওজন অনেক বেশী হইয়াছে। সাধারণভাবে মনে হয় মোম পুড়িয়া ধ্বংস হইল, কিন্তু ওজনে দেখা গেল যে ওজন বৃদ্ধি পাইল। প্রকৃতপক্ষে ইহার একটিও ঠিক নয়। মোম যখন পুড়িল, তখন যে অঙ্গারাম্ল হইল তাহা বায়ুস্রোতে গিয়া কষ্টিক পটাসের U-নলে শোষিত হইয়া রহিল; কারণ, কষ্টিক পটাস উহাকে দ্রুত শোষণ করিয়া লইতে পারে। সেই রূপে অপর পদার্থ অর্থাৎ জলীয় বাষ্পটিও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পূর্ণ নলে শোষিত হইয়া রহিল। মোম পোড়ানর রাসায়নিক পরিবর্তনে মোম এবং বায়ু (অথবা উহার অক্সিজেন) অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রথমে ওজন করার সময় আমরা মোমের ওজন করিয়াছি, বাহির হইতে যে বায়ু প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক সংযোগ সাধন

করিল তাহার ওজন লই নাই। পরীক্ষার পরে যে ওজন লওয়া হইল, তাহা ঐ বিক্রিয়ার ফলে উক্ত উভয় পদার্থের ওজন। সুতরাং ওজন বাড়িয়াছে। যদি পূর্বে কোন উপায়ে মোম এবং অক্সিজেন দুইয়েরই ওজন লইতে পারা যাইত তবে সেই ওজন ও পরবর্তী ওজন একই হইত। মোম অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই দুইটির যৌগিক পদার্থ। পুড়িবার সময় ইহারা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারাম্ল ও জলীয় বাষ্প হইয়াছে। এই পরিবর্তনে বস্তুর ভর কমে নাই বা ধ্বংস হয় নাই, শুধু রূপান্তর হইয়াছে মাত্র।

মোমের মতই স্পিরিট, কাঠ, কেরোসিন পুড়িলে আমরা আপাতদৃষ্টিতে উহারা ধ্বংস হইল মনে করি, কিন্তু সেই সব দহনের সময় যদি পূর্বাপর সমস্ত জিনিসের ওজন লইতে পারি, তবে দেখা যাইবে বিক্রিয়ার ফলে ওজনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে বোঝা যায়, বস্তুর ধ্বংস নাই এবং কোন প্রকার বিক্রিয়ার ফলেই বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব নয়, যদিও বস্তুর রূপান্তর বা পরিবর্তন সর্বদাই সম্ভব। বস্তুর এই অবিনাশিতা বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র প্রথমে যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন।

ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষা: একটি কাচের বকযন্ত্রের ভিতর কতটুকু টিন ভরিয়া তিনি বকযন্ত্রের মুখটি গালাইয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর তিনি উহা ওজন করিলেন। পরে বকযন্ত্রটি তিনি কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত উত্তপ্ত করিলেন। উত্তাপের ফলে টিন অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সঙ্গে সংহত হইয়া খানিকটা পরিবর্তিত হইয়া গেল (টিন অক্সাইড হইল)। বকযন্ত্রটি ঠাণ্ডা করিয়া আবার তিনি উহা ওজন করিলেন; দেখা গেল ওজনের কোন প্রকার তারতম্য হয় নাই। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বস্তুর বিলোপ বা বৃদ্ধি হয় নাই।

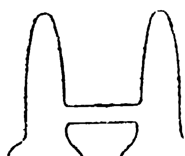
সুতরাং ল্যাভয়সিয়র বলিলেন, "যে কোন রাসায়নিক বা অবস্থাগত পরিবর্তনে বস্তুর রূপান্তর ঘটে মাত্র, কিন্তু পূর্বে বা পরে ওজনের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বস্তুর বিনাশ নাই, বস্তু অবিনশ্বর। শূন্য ভর হইতে পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব নয়, আবার জড়বস্তুকে ধ্বংস করিয়া কেবল মাত্র শূন্যে মিলাইয়া দেওয়াও সম্ভব নয়।" শূন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি এবং জড়ের শূন্যে পরিণতি সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে

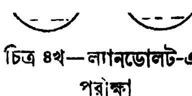
এই নিয়মের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই নিয়মকেই **জড়পদার্থের নিত্যতাবাদ (Law of Conservation of Matter)** বলা হয়। জড়বিজ্ঞানের ইহা একটি মূলসূত্র এবং এই সত্য অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিতে নিরন্তর বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুজগতের মোট পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

ডালটনের পরমাণুবাদের দিক হইতে বিচার করিলেও আমরা এই নিয়মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের অণুগুলি বদলাইয়া অন্যরকম অণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরমাণুর দ্বারা পদার্থটি গঠিত তাহাদের বিনাশ বা বিলোপ হয় না। কেবল নূতন রকমে ঐ পরমাণুগুলি সজ্জিত হইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি করে। ইহাই **ডালটনের পরমাণুবাদ।** ডালটনের মতে পরমাণুগুলির ওজন নির্দিষ্ট এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তাহাদের সংখ্যারও কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; অতএব, পদার্থের বিকার বা রূপান্তর হইলেও তাহাদের ওজন বদলাইতে পারে না। ইহাই জড়পদার্থের নিত্যতাবাদের কারণ।

জড়পদার্থের অবিনাশিতা সহজে প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা অনায়াসে করা যাইতে পারে।

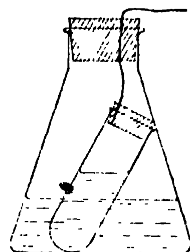
(১) **ল্যানডোলটের পরীক্ষা :** ল্যানডোলট একটি সুন্দর উপায়ে বস্তুর অবিনাশিতা প্রমাণ করেন। তিনি H-আকারের একটি নল লইতেন। উহার নীচের দিক বন্ধ থাকিত (চিত্র ৪খ)। এই নলটির দুই বাহুতে তিনি দুইটি দ্রবণ লইতেন, যাহারা পরস্পরের সহিত একত্র হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে পারে। তারপর নলটিকে সোজা রাখিয়া তিনি সন্তর্পণে উহার উপরের মুখ দুইটি গালাইয়া বন্ধ করিয়া দিতেন। অতঃপর একটি উত্তম সুবেদী নিক্তিতে উহা ওজন করিতেন। তৎপর নলটি ভাল করিয়া ঝাঁকাইলে দ্রবণ দুইটি একত্র হইয়া রাসায়নিক পরিবর্তন হইত। উহাকে আবার ওজন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রেই এই রকম রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কোন ওজন কমে নাই বা বাড়ে নাই।





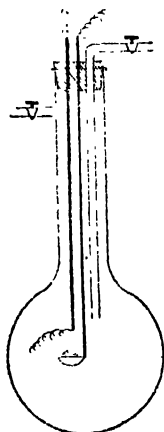
চিত্র ৪খ—ল্যানডোলট-এর পরীক্ষা

এই পরীক্ষাটি আরও সহজে করা যায়। একটি শঙ্কুকূপীতে অল্প পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ এবং একটি টেস্ট টিউবে মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লও। টেস্ট টিউবটি এমনভাবে সন্তর্পণে কূপীর ভিতরে রাখ (চিত্র ৪গ), যাহাতে দুইটি দ্রবণ মিশিয়া না যায়। কূপীটির মুখ কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া ওজন কর এবং তারপর জোরে কূপীটি নাড়িয়া দাও। দুইটি দ্রবণ একত্র হইলেই উহা হইতে লাল অধঃক্ষেপ (precipitate) বাহির হইয়া আসিবে। ইহা একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। পরে আবার কূপীটির ওজন লও, দেখিবে ওজন একই আছে। বস্তুর নিত্যতাবাদ প্রমাণিত হইল। পটাস আয়োডাইড-এর পরিবর্তে অন্যান্য উপযুক্ত দ্রবণ লইয়াও পরীক্ষা করা যাইতে পারে; যেমন, সিলভার নাইট্রেট এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি।



চিত্র ৪গ—বস্তুর নিত্যতাবাদ পরীক্ষা

(২) **পরীক্ষা:** একটি শক্ত ও পুরু কাচের কূপী লও। উহার মুখটি যেন একটি রবারের ছিপিদ্বারা বন্ধ করা যায়। রবারের ছিপিটিতে ছিদ্র করিয়া দুইটি তামার তার, **'ক'** ও **'খ'**, প্রবেশ করাইয়া দাও (চিত্র ৪ঘ)। **'ক'** তারটির শেষপ্রান্তে একটি ছোট তামার বাটি আছে। **'খ'** তারটি প্রায় সেই বাটিটি পর্যন্ত প্রবেশ করিবে, কিন্তু বাটিটি স্পর্শ করিবে না। ছোট একটু গন্ধকের টুকরা একটি সরু প্লাটিনামের তারে জড়াইয়া ঐ বাটিতে রাখ এবং প্লাটিনামের এক প্রান্ত **'খ'** তারের শেষ প্রান্তে জুড়িয়া দাও। রবারের ছিপিটি এখন কূপীর মুখে আঁটিয়া দাও এবং সবসুদ্ধ উহা ওজন কর। 'ক' এবং 'খ' তারের বহির্ভাগ দুইটি একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে সংযুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে এবং প্লাটিনামের তারটি উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। উত্তাপের ফলে গন্ধকখণ্ড মধ্যস্থ বায়ুর সাহায্যে জলিয়া উঠিবে এবং সালফার



চিত্র ৪ঘ—বস্তুর অবিনাশিতা

ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হইবে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া কুপীটিকে ঠাণ্ডা কর এবং কুপীটির আবার ওজন লও। দেখিবে ওজনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। গন্ধকের রাসায়নিক পরিবর্তনে কোন বস্তুর সৃষ্টি বা লয় হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

রাসায়নিক সংজ্ঞা ঃ চিহ্ন, সঙ্কেত ও সমীকরণ

সহজ প্রকাশভঙ্গী বিজ্ঞানের একটি প্রধান বিশেষত্ব। রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিক্রিয়া সহজে বোধগম্য করার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম প্রচলিত আছে। এই সকল সঙ্কেত বা চিহ্নের সাহায্যে খুব সংক্ষেপে সমস্ত রকম রাসায়নিক রূপান্তর বা ক্রিয়া প্রকাশ করা সম্ভব।

৫-১। **চিহ্ন (Symbol) ঃ** মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষেপকে চিহ্ন বলে। সাধারণতঃ নামের আদ্যক্ষরের দ্বারা মৌল চিহ্নিত হয়; যেমন হাইড্রোজেন H, অক্সিজেন O, কার্বন C, ইত্যাদি। একই আদ্যক্ষরবিশিষ্ট বিভিন্ন মৌল থাকিলে উহাদের চিহ্ন নির্ধারণ করিতে প্রথম অক্ষরটির সহিত নামের আর একটি অক্ষরযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ঐ জাতীয় মৌলগুলির মধ্যে একটিকে শুধু প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

বোরন—**Boron—B**
ব্রোমিন—**Bromine—Br**
বেরিলিয়াম—**Beryllium—Be**
বেরিয়াম—**Barium—Ba**
বিসমাথ—**Bismuth—Bi**

অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক পদার্থের চিহ্ন তাহাদের ল্যাটিন নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে ; যেমন : –

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন নাম	চিহ্ন
তাম্র	Copper	Cuprum	Cu
স্বর্ণ	Gold	Aurum	Au
রৌপ্য	Silver	Argentum	Ag
পারদ	Mercury	Hydrargyrum	Hg

চিহ্ন মাত্রেরই **আদিক (qualitative)** ও **মাত্রিক (quantitative)** দুইটি দিক আছে। উহা প্রথমতঃ মৌলটিকে বুঝায় ; দ্বিতীয়তঃ শুধু যদি চিহ্নটি লেখা যায় তবে একটি মাত্র পরমাণু বুঝা যাইবে। কিন্তু একাধিক পরমাণু বুঝাইতে হইলে চিহ্নটির ডান দিকে সেই রাশিটি লিখিতে হয়। P_4 ফসফরাসের চারিটি পরমাণু, Cl_2 ক্লোরিনের দুইটি পরমাণু ইত্যাদি।

মৌলিক পদার্থের অণুগুলি এক বা একাধিক পরমাণু-সমবায়ে গঠিত। যথা, হাইড্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক ; সুতরাং H_2 লিখিলে উহা হাইড্রোজেনের একটি অণু বুঝাইবে। অতএব H_2 হাইড্রোজেন-অণুর সঙ্কেত রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সেই রকম, ফসফরাস অণুর প্রকাশে P_4 লিখিতে হইবে ; কেন না, উহার অণুতে চারিটি পরমাণু থাকে।

৫-২। সঙ্কেত (Formula) : যৌগিক পদার্থগুলিকে তাহাদের নামের পরিবর্তে কতকগুলি চিহ্নের সমন্বয়ে প্রকাশ করা যায়, ইহাকে **'সঙ্কেত'** বলে। যৌগিক পদার্থগুলি একাধিক মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই সব গঠনকারী মৌলিক পদার্থের চিহ্নের সাহায্যে যৌগিক পদার্থটির সঙ্কেত স্থির করা যাইতে পারে। যেমন লবণ, সোডিয়াম (Na) এবং ক্লোরিন (Cl) এই দুই মৌলিক পদার্থের সংযোগে তৈয়ারী। অতএব লবণের সঙ্কেত NaCl। যে সমস্ত পরমাণু দ্বারা যৌগিক পদার্থটির অণু গঠিত তাহারও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। লবণ অণুতে একটি সোডিয়াম পরমাণু ও একটি ক্লোরিন পরমাণু একত্র যুক্ত থাকে। আবার সোডাতে প্রতিটি অণু দুইটি সোডিয়াম, একটি কার্বন ও তিনটি অক্সিজেন এই ছয়টি পরমাণুর সম্মিলনে গঠিত। অতএব সোডার সঙ্কেত হইবে Na_2CO_3। প্রতিটি চিহ্নের নীচে ডানদিকের রাশি দ্বারা সঙ্কেতের মধ্যে সেই সেই পরমাণুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের

সঙ্কেত H_2SO_4। অর্থাৎ ইহার প্রতিটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণু আছে।

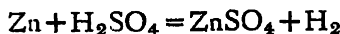
কেবল সঙ্কেতটি লিখিলে যৌগিক পদার্থের একটি মাত্র অণু বুঝায়। একাধিক অণু বুঝাইতে হইলে সঙ্কেতটির পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি লিখিতে হইবে। যেমন, $7H_2SO_4$ = ৭টি সালফিউরিক অ্যাসিডের অণু।

সালফিউরিক অ্যাসিড যদি SH_2O_4 অথবা O_4H_2S লেখা হয় তবে তাহাতে কোন ভুল হয় না। উহাকে H_2SO_4 এই ধরণে লেখার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে মাত্র। ফেরিক সালফেটকে সঙ্কেতে লেখা হয় $Fe_2(SO_4)_3$। যদি $Fe_2S_3O_{12}$ লেখা হইত তাহাতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু ফেরিক সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য $Fe_2(SO_4)_3$ এইভাবে উহার সঙ্কেত লেখা হয়। অতএব, মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের অণুর চৈহ্নিক প্রকাশকেই সঙ্কেত বলা হইবে।

৫-৩। সমীকরণ (Equation): পদার্থমাত্রকেই যৌগিক বা মৌলিক হইতে হইবে। সুতরাং চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে যে কোন পদার্থ প্রকাশ করা সম্ভব। যখনই কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখনই কোন না কোন পদার্থ অংশ গ্রহণ করিয়া নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। অতএব যাহারা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল পদার্থ নূতন গঠিত হয়, তাহাদের সকলকেই চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। যাহারা রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ নেয় তাহাদিগকে বামদিকে এবং যে সমস্ত বস্তু **ফলস্বরূপ** পাওয়া যায় (Resultants) তাহাদিগকে ডানদিকে লিখিয়া, মাঝখানে একটি সমীকরণ চিহ্ন দিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করাই রীতি; যেমন, জিঙ্ক (Zinc) সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে পারি—



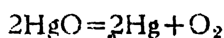
চিহ্ন ও সঙ্কেত দ্বারা ইহার প্রকাশ হইবে—



[পদার্থের মধ্যবর্তী + যোগ চিহ্ন "এবং" বুঝায়; সমীকরণ চিহ্নের অর্থ "রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা"]

অর্থাৎ, জিঙ্ক এবং সালফিউরিক অ্যাসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হইয়াছে।

চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে **"সমীকরণ"** বলে।



$$2HgO = 2Hg + O_2$$

উল্লিখিত এই সমীকরণ হইতে বুঝা যায়, মারকিউরিক অক্সাইড রাসায়নিক পরিবর্তনে মারকারি (পারদ) এবং অক্সিজেনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে দুইটি মারকিউরিক অক্সাইড অণু হইতে দুইটি মারকারি অণু এবং একটি অক্সিজেন অণু পাওয়া যায়। সুতরাং, সমীকরণ হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শুধু যে বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় তাহাই নহে, তাহাদের পরিমাণেরও আভাস পাওয়া যায়।



$$2Fe + 3Cl_2 = 2FeCl_3$$

অর্থাৎ দুইটি লৌহ অণু তিনটি ক্লোরিন অণুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে দুইটি ফেরিক ক্লোরাইড অণু গঠন করে।

রাসায়নিক সমীকরণে বীজগণিতের সাধারণ নিয়মগুলিও প্রযোজ্য। সমীকরণচিহ্নের ডানদিকে ও বামদিকে যে কোন প্রকার পরমাণুর মোট সংখ্যা সমান হইতে হইবে। উল্লিখিত সমীকরণে উভয়দিকে ক্লোরিন পরমাণুর মোট সংখ্যা ছয় এবং লৌহ পরমাণুর সংখ্যা দুই। প্রত্যেক সমীকরণেই এই নিয়ম খাটিবে। ডালটনের পরমাণুবাদ এবং জড়ের নিত্যতাবাদ হইতে আমরা জানি, পরমাণুর ধ্বংস নাই। বস্তুর রূপান্তরে কেবলমাত্র তাহাদের অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়াতে পরমাণুর সংখ্যা যে একই থাকিবে তাহা সুনিশ্চিত।

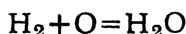
রাসায়নিক সমীকরণ গঠনকালে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

(ক) যে সমস্ত পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাদের সবগুলি জানা প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চিহ্ন বা সঙ্কেত জানিতে হইবে।

(খ) সমীকরণ প্রকাশ করিতে প্রত্যেকটি বস্তুকে উহার অণুর সঙ্কেত দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাণু গ্রহণ করিলে চলিবে না।

(গ) সমীকরণ চিহ্নের উভয় দিকে যে কোন প্রকারের পরমাণুর (অণুর মধ্যস্থিত) সংখ্যা এক হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হইবে।

যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জলের উৎপত্তি। ইহা প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে পারি—



$$H_2+O=H_2O$$

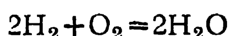
ইহাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বুঝা যায় বটে, কিন্তু ইহা নিয়মানুগত নহে। কারণ, এইখানে অক্সিজেনকে অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই। পরমাণুর সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।



আবার, $$H_2+O_2=2H_2O$$

এইবারে সবগুলি বস্তুই নিজ নিজ অণুতে লেখা হইয়াছে সত্য কিন্তু সমীকরণটি নির্ভুল নহে। কেন না, দুইদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি এক নহে।

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সঙ্গত সমীকরণ হইবে—



$$2H_2+O_2=2H_2O$$

ইহাতে সমীকরণ-পদ্ধতির সব নিয়মই প্রতিপালিত হইয়াছে।

সমীকরণ হইতে রাসায়নিক পরিবর্তন জানা যায় সত্য, কিন্তু কি অবস্থায় বা কত সময়ে বিক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাসায়নিক সংযোগ-বিধিসমূহ

রাসায়নিক সংযোগের সময় যে-কোন পরিমাণ একটি মৌলিক পদার্থ যে-কোন পরিমাণ অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। পরিমাণ-বিষয়ে রাসায়নিক সংযোগসমূহ কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাদ্বারা এই নিয়মসমূহের সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন এবং কখনও

ইহাদের কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন নাই। এই নিয়মগুলিকে **রাসায়নিক সংযোগবিধি বা সূত্র** (Laws of Chemical Combination) বলা হয়।

জড়ের নিত্যতাবাদে আমরা দেখিয়াছি যে কোন রকম পরিবর্তনে পদার্থ-গুলির মোট ভরের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না, বস্তু অবিনশ্বর। এইটিকে আমরা রাসায়নিক সংযোগ-বিধিসমূহের প্রধান সূত্র বলিতে পারি। 'ক' এবং 'খ' নামক দুইটি পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যদি 'গ' এবং 'ঘ' নামক পদার্থে পরিণত হয়, অর্থাৎ যদি



ক+খ=গ+ঘ

হয়, তাহা হইলে ক এবং খ-এর মোট ওজনকে গ এবং ঘ-এর ওজনের সমান হইতেই হইবে।

ইহা ব্যতীত আমরা এখানে আরও তিনটি সূত্রের আলোচনা করিব।

৬-১। স্থিরানুপাত সূত্র (Law of Constant Proportions): যে কোন যৌগিক পদার্থ সর্বদাই নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থসমূহের দ্বারা গঠিত এবং সেই যৌগিক পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সর্বদা একই হইবে।

একটি যৌগিক পদার্থ যে কোন উপায়েই প্রস্তুত হউক না কেন, উহাতে সর্বদাই একই মৌলিক পদার্থের সমাবেশ দেখা যাইবে। উপরন্তু এই মৌলিক পদার্থগুলির যে সমস্ত ওজন রাসায়নিক মিলনে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের অনুপাতের কখনও পরিবর্তন হইবে না, সর্বদা একই থাকিবে। যেমন, বিভিন্ন উপায়ে জল প্রস্তুত করা সম্ভব। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যখনই যে অবস্থাতে জল লওয়া যাউক না কেন, দেখা যাইবে যে উহা দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত। আবার, যেখানে যে অবস্থাতেই জল বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানেই দেখা যায় যে ৮ ভাগ অক্সিজেন (ওজনে) ১ ভাগ হাইড্রো-জেনের সঙ্গে সংযোজিত আছে। অর্থাৎ, জলে সব সময়েই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ১ : ৮ এই ওজন-অনুপাতে বর্তমান। অবশ্য ইহা হইতে একথা বুঝায় না যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অন্য কোন ওজনের অনুপাতে মিলিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ১ : ১৬ ওজনের এই অনুপাতেও সংযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার সংহতিতে জল হয় না। যখন একই

মৌলিক পদার্থসমূহ বিভিন্ন ওজনের অনুপাতে সংযুক্ত হয় তখন তাহারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। একই যৌগিক পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির ওজনের অনুপাতের তারতম্য কখনও হইতে পারে না। অন্য যে-কোন যৌগিক পদার্থেও তাহার মৌলিক পদার্থসমূহের ওজনের অনুপাতটি নির্দিষ্ট। যেমন, চিনিতে সর্বদাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত যথাক্রমে ৭২ ১১ ৮৮।

অতএব, যৌগিক পদার্থমাত্রই নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে গঠিত। ইহাকেই **স্থিরানুপাত সূত্র** বলে।

এই সূত্রটির সম্বন্ধে বহুরকম পরীক্ষা হইয়াছে। স্টাস্ (Stas) বিভিন্ন উপায়ে সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) তৈয়ারী করিয়া উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সিলভার ও ক্লোরিনের ওজনের অনুপাত সর্বদাই এক। এই রকম আরও শত শত পরীক্ষা দ্বারা স্থিরানুপাত সূত্রের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা হইয়াছে।

ডালটনের পরমাণুবাদ হইতেও আমরা স্থিরানুপাত সূত্রে পৌঁছাইতে পারি।

ধর, 'ক' এবং 'খ' দুইটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে 'গ' নামক যৌগিক পদার্থটি গঠিত। পরমাণুবাদ অনুসারে 'গ' পদার্থের অণুগুলি 'ক' এবং 'খ'-এর পরমাণুর সমাবেশে সৃষ্ট। ধর, পাঁচটি 'ক' পরমাণু ও তিনটি 'খ' পরমাণু মিলিয়া 'গ'-এর অণু গঠন করিয়াছে। মনে কর, 'ক'-এর পরমাণুর ওজন $=x$ gms, 'খ'-এর পরমাণুর ওজন $=y$ gms; তাহা হইলে 'গ'-এর প্রতিটি অণুতে $5x$ gms 'ক' এবং $3y$ gms 'খ' বর্তমান। অর্থাৎ, তাহাদের ওজনের অনুপাত $5x : 3y$। যে কোন পরিমাণ 'গ' উহার অণুর সমষ্টি মাত্র, এবং অণুগুলি সর্বতোভাবে সদৃশ। অতএব যে কোন n-সংখ্যক অণুতে 'ক' এবং 'খ'-এর পরিমাণের অনুপাত হইবে $5nx : 3ny = 5x : 3y$ অর্থাৎ অনুপাতটি নির্দিষ্টই হইবে। ইহাই স্থিরানুপাত সূত্র।

৬-২। গুণানুপাত সূত্র (Law of Multiple Proportions): একটি মৌলিক পদার্থ যখন অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দুই বা ততোধিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তখন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে

মৌলিক পদার্থগুলির ওজনের অনুপাত বিভিন্ন হয়। উহাদের একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অপরটির যে বিভিন্ন ওজন সংযুক্ত হয়, সেই বিভিন্ন ওজনগুলির মধ্যে একটি সরল অনুপাত সর্বদাই পরিদৃষ্ট হয়।

মনে কর, **'ক'** ও **'খ'** মৌলিক পদার্থ দুইটি হইতে **'গ'** এবং **'ঘ'** দুইটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। স্থিরানুপাত নিয়মানুসারে 'গ' যৌগিক পদার্থে **'ক'** ও **'খ'**-এর ওজনের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। সেই রকম **'ঘ'** যৌগিক পদার্থেও উহাদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। অতএব, নির্দিষ্ট পরিমাণ **'ক'**-এর সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ **'খ'** যুক্ত হইয়াছে। **'খ'**-এর এই বিভিন্ন ওজনগুলি যদৃচ্ছ হইতে পারে না; এই ওজনগুলির ভিতর একটি সরল অনুপাত থাকিবে। "সরল অনুপাত" বলিতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত বুঝায়। ক্ষুদ্র রাশিগুলি ১০-এর নীচে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১ : ১, ১ : ২, ৩ : ৪, ৫ : ৭ ইত্যাদিকে সরল অনুপাত মনে করা হয় ৩·৫ : ৫·৮ অথবা ১৭২ : ৩৮৩ এই প্রকার অনুপাতকে সরল অনুপাত বলা হয় না।

এখন দুই একটি বাস্তব উদাহরণ লওয়া যাউক।

(ক) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে দুইটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়—জল এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড। এই দুইটি পদার্থে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত নিম্নরূপ :—

যৌগিক পদার্থ	ওজনের অনুপাত হাইড্রোজেন : অক্সিজেন		হাইড্রোজেন : অক্সিজেন
১। জল	১ : ৮	অথবা	২ : ১৬
২। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড	১ : ১৬		১ : ১৬

অতএব নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেনের (১ ভাগ) সঙ্গে যে বিভিন্ন পরিমাণের অক্সিজেন যুক্ত হইতে পারে তাহার অনুপাত ৮ : ১৬ অর্থাৎ ১ : ২। ইহা একটি সরল অনুপাত। অথবা, বলিতে পারা যায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে (১৬ ভাগ) যে বিভিন্ন পরিমাণের হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাহার অনুপাত ২ : ১।

(খ) পারদ ও ক্লোরিনের সহযোগে দুইটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়— মারকিউরাস ক্লোরাইড এবং মারকিউরিক ক্লোরাইড। এই দুইটি পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির অনুপাত নিম্নে দেওয়া গেল :—

যৌগিক পদার্থ	ওজনের অনুপাত		
	পারদ : ক্লোরিন		পারদ : ক্লোরিন
১। মারকিউরাস ক্লোরাইড	২০০·৬ : ৩৫·৫	অথবা	২০০·৬ : ৩৫·৫
২। মারকিউরিক ক্লোরাইড	২০০·৬ : ৭১		১০০·৩ : ৩৫·৫

অতএব নির্দিষ্ট পরিমাণ পারদের সঙ্গে (২০০·৬ ভাগ) যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্লোরিন যুক্ত হয় তাহার অনুপাত ৩৫·৫ : ৭১ অর্থাৎ ১ : ২। ইহাও সরল অনুপাত।

পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্লোরিনের সঙ্গে (৩৫·৫ ভাগ) যে বিভিন্ন পরিমাণ পারদ যুক্ত হইয়াছে তাহার অনুপাত ২০০·৬ : ১০০·৩ অর্থাৎ ২ : ১। ইহাও সরল অনুপাত।

(গ) লৌহ এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়াতে তিনটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। ফেরাস, ফেরিক, এবং ফেরোসোফেরিক অক্সাইড। বিশ্লেষণে উহাদের উপাদানগুলির অনুপাত এইরূপ জানা গিয়াছে :—

যৌগিক পদার্থ	ওজনের অনুপাত		
	লৌহ : অক্সিজেন		লৌহ : অক্সিজেন
১। ফেরাস অক্সাইড	৫৬ : ১৬	অর্থাৎ	৫৬ : ১৬
২। ফেরিক অক্সাইড	১১২ : ৪৮		৫৬ : ২৪
৩। ফেরোসোফেরিক অক্সাইড	১৬৮ : ৬৪		৫৬ : $\frac{৬৪}{৩}$

অতএব, নির্দিষ্ট পরিমাণ লৌহের (৫৬ ভাগ) সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের অক্সিজেনের অনুপাত ১৬ : ২৪ : $\frac{৬৪}{৩}$ অর্থাৎ ৬ : ৯ : ৮। ইহাও সরল অনুপাত। এই রকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে "বিভিন্ন ওজনের একটি মৌলিক পদার্থ যদি নির্দিষ্ট ওজনের অপর একটি মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন

যৌগিক পদার্থ গঠন করে, তাহা হইলে প্রথম মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ওজনগুলি একটি সরল অনুপাতে থাকে।" ইহাকেই **গুণানুপাত সূত্র** বলা হয়।

গুণানুপাত সূত্রটি ডালটনের পরমাণুবাদ হইতে সমর্থন করা যাইতে পারে।

মনে কর, 'A' এবং 'B' দুইটি মৌলিক পদার্থ এবং উহাদের পরমাণুর ওজন যথাক্রমে x gms এবং y gms। 'A' এবং 'B'-এর সংযোগে যদি দুইটি যৌগপদার্থের সৃষ্টি হয় তবে উহাদের অণুগুলি ডালটনবাদ অনুসারে 'A' এবং 'B'-এর পরমাণুর সমাবেশে হইয়াছে। মনে কর, প্রথম পদার্থের অণুতে একটি 'A' এবং একটি 'B' পরমাণু আছে এবং দ্বিতীয় পদার্থের অণুগুলি দুইটি 'A' এবং তিনটি 'B' পরমাণু দ্বারা গঠিত। অতএব উহাদের সঙ্কেত হইবে AB এবং A_2B_3। এখন—

প্রথম পদার্থে x gms A এবং y gms B সম্মিলিত আছে। উহাদের ওজনের অনুপাত $x : y$। দ্বিতীয় পদার্থে $2x$ gms 'A' এবং $3y$ gms 'B' সম্মিলিত আছে। তাহাদের ওজনের অনুপাত $2x : 3y$ অথবা $x : \frac{3}{2}\ y$.

অতএব যে অনুপাতে বিভিন্ন পরিমাণ 'B', x gms 'A'-এর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইবে $y : \frac{3}{2}\ y$ অর্থাৎ ২ : ৩। ইহা একটি সরলানুপাত। অতএব ডালটনবাদের সাহায্যে গুণানুপাত-সূত্র প্রমাণিত হইল।

৬-৩। মিথোনুপাত সূত্র (Law of Reciprocal Proportions) ঃ একটি মৌলিক পদার্থ অপর দুইটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে পৃথকভাবে সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। প্রথম মৌলিক পদার্থের এক নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে শেষোক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটির বিভিন্ন ওজন মিলিত হইবে। যদি এই মৌলিক পদার্থ দুইটি নিজেরা কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে তাহারা একে অন্যের সহিত যে ওজনে মিলিত হইবে, সেই ওজনগুলি পূর্বোক্ত বিভিন্ন ওজনের সমান অথবা ঐ ওজনগুলির সরল গুণিতক হইবে।

ধরা যাউক, 'ক' মৌলিক পদার্থটি 'খ' এবং 'গ' মৌলিক পদার্থের সঙ্গে দুইটি পৃথক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে, যাহাতে কোন নির্দিষ্ট

পরিমাণ 'ক'-এর সঙ্গে 'a' gms 'খ' এবং 'b' gms 'গ' পৃথকভাবে মিলিত আছে। এখন, 'খ' ও 'গ' মিলিয়া যদি একটি যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী করে তবে 'a' gms 'খ' 'b' gms 'গ'-এর সঙ্গে যুক্ত হইবে; অথবা 'a' gms-এর কোন সরল গুণিতক 'b' gm.-এর কোন সরল গুণিতকের সহিত মিলিত হইবে।

উদাহরণঃ (ক) হাইড্রোজেন পৃথকভাবে কার্বন ও অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া মিথেন ও জল সৃষ্টি করে। উহাদের উপাদানের ওজনের অনুপাত ঃ

মিথেন—কার্বন : হাইড্রোজেন = ৩ : ১

জল—অক্সিজেন : হাইড্রোজেন = ৮ : ১

আবার কার্বন ও অক্সিজেন যখন নিজেদের ভিতর সংযুক্ত হয় উহাতে উপাদানের অনুপাত থাকে—

কার্বন ডাই-অক্সাইড— কার্বন : অক্সিজেন = ৩ : ৮

অর্থাৎ যে ওজনে উহারা একভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, সেই ওজনের অনুপাতেই তাহারা নিজেদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে।

(খ) কার্বনের সহিত পৃথকভাবে সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-সালফাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উহাদের উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত নিম্নরূপ ঃ—

কার্বন ডাই-সালফাইড—কার্বন : সালফার ৩ : ১৬

কার্বন ডাই-অক্সাইড—কার্বন : অক্সিজেন = ৩ : ৮

সালফার ও অক্সিজেনের সংহতিতে যে যৌগিক পদার্থ সালফার ডাই-অক্সাইড হয়, উহাতে

সালফার : অক্সিজেন = ১ : ১ (অর্থাৎ ১৬ : ১৬)

উপরের সূত্র অনুসারে ১৬ ভাগ সালফার, ৮ ভাগ অথবা ৮ ভাগের কোন সরল গুণিতক-পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ, দেখা গেল যে ১৬ ভাগ সালফার ৮ ভাগ অক্সিজেনের দুই গুণিতকের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সূত্রটি প্রমাণিত হইল।

অতএব আমরা বলিতে পারি, "যে বিভিন্ন ওজনে দুইটি মৌলিক পদার্থ তৃতীয় একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়,

কেবলমাত্র সেই বিভিন্ন ওজনেই অথবা ঐ সকল ওজনের সরল গুণিতকের অনুপাতেই তাহারা নিজেদের ভিতর মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে।" ইহাকেই **মিথোনুপাত সূত্র** বলা হয়।

ডালটনের পরমাণবাদ ও মিথোনুপাত সূত্রঃ মনে কর 'A' মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু পৃথকভাবে 'B' ও 'C' মৌলিক পদার্থের একটি করিয়া পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া AB এবং AC (সঙ্কেত) যৌগিক পদার্থদ্বয়ের সৃষ্টি করে। 'B'-এর পরমাণুর ওজন যদি x gms এবং 'C'-এর পরমাণুর ওজন y gms হয়, তাহা হইলে x gms 'B' এবং y gms 'C' নির্দিষ্ট পরিমাণ 'A'-র সঙ্গে মিলিত আছে।

মনে কর, B এবং C যখন সংযুক্ত হয় তখন দুইটি 'B' পরমাণুর সহিত তিনটি 'C' পরমাণুর মিলন ঘটে (B_2C_3), অর্থাৎ $2x$ gms 'B' এবং $3y$ gms 'C' সংযুক্ত হয়। অতএব যে যে ওজনে B এবং C নির্দিষ্ট পরিমাণ 'A'-র সহিত যুক্ত হয় যথাক্রমে তাহার দুই এবং তিন গুণিতকে নিজেরা মিলিত হইয়াছে। ইহাই মিথোনুপাত সূত্র।

অনুশীলনী

১। গুণানুপাত সূত্রটি বুঝাইয়া দাও। একটি ধাতুর দুইটি অক্সাইড আছে। এই অক্সাইডদ্বয়ের প্রতি গ্রাম হইতে যথাক্রমে ০·৭৯৮ এবং ০·৮৮৮ গ্রাম ধাতু পাওয়া যায়। ইহা হইতে গুণানুপাত সূত্রের যাথার্থ্য প্রমাণ কর। (কলিকাতা, ১৯২১)

২। "গুণানুপাত সূত্র"টি লেখ। অন্ততঃ দুইটি উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটির ব্যাখ্যা কর। ডালটনের পরমাণুবাদের সাহায্যে কি ভাবে এই সূত্রটিতে উপনীত হওয়া সম্ভব দেখাইয়া দাও।

একটি ধাতুর দুইটি অক্সাইডে যথাক্রমে শতকরা ২৭·৬ এবং ৩০·০ ভাগ অক্সিজেন আছে। প্রথমটির সঙ্কেত M_3O_4 হইলে দ্বিতীয়টির সঙ্কেত কি হইবে? (কলিকাতা, ১৯১০)

৩। সীসকের তিনটি অক্সাইডে সীসক ও অক্সিজেনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

	সীসক	অক্সিজেন
(১)	৯২·৮৫%	৭·১৫%
(২)	৯০·৬৩%	৯·৩৭%
(৩)	৮৬·৫১%	১৩·৪৯%

এই পরিমাণসমূহ গুণানুপাত সূত্রসম্মত, প্রমাণ কর। (বারাণসী, ১৯৩০)

৪। নিম্নলিখিত পরীক্ষার ফলসমূহ হইতে কোন্ রাসায়নিক সংযোগ-সূত্রটির প্রমাণ পাওয়া যায়? সেই সূত্রটি বর্ণনা কর।

(ক) ০·৪৬ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হইতে ০·৭৭ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়।

(খ) ০·৮২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অ্যাসিড হইতে প্রমাণ অবস্থায় ৭৬০ ঘন সেণ্টিমিটার হাইড্রোজেন উৎপাদন করে।

(গ) ১·১২ গ্রাম অক্সিজেনের সহিত হাইড্রোজেন মিলিত হইলে ১·২৬ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

(এলাহাবাদ, ১৯৩০)

৫। উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ রাসায়নিক সংযোগসূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও। পরমাণুবাদের সহিত এই সূত্রগুলির সম্পর্ক ও বুঝাইয়া দাও। (কলিকাতা, ১৯১১, '৩১, '৩৩, '৪৪)

৬। ডালটনের পরমাণুবাদ দ্বারা কি বুঝায়? এই পরমাণুবাদের সহিত স্থিরানুপাত ও গুণানুপাত সূত্র দুইটির সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব উদাহরণের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৭। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড উভয়েই কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। উহাদের ভিতর কার্বনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭% এবং ৪৩%। এই পরিমাণ কি গুণানুপাত সূত্রসম্মত?

৮। সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে একটি সালফার ও দুইটি অক্সিজেন অণু আছে। এই যোগে শতকরা ৫০ ভাগ সালফার। সালফার ও অক্সিজেনের পরমাণুর ওজনের অনুপাত কি হইবে?

সপ্তম অধ্যায়

গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থাগত ধর্ম

৭-১। গ্যাসীয় পদার্থঃ পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। গ্যাসীয় বস্তুগুলির অবস্থাজনিত ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বায়বীয় পদার্থের পরিবর্তন সম্যক্ বুঝা যায় না। উহাদের প্রধান বিশেষত্বঃ

(১) গ্যাসীয় পদার্থের কোন আকার বা আয়তন নাই। উহারা যে পাত্রে থাকিবে তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকিবে।

(২) একটি পাত্রে গ্যাস রাখিয়া তাহার উপর চাপ বৃদ্ধি করিলে গ্যাসের আয়তন কমিয়া যায়, আবার চাপ সরাইয়া লইলে উহা পূর্ব আয়তনে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ সঙ্কোচনশীল, অথবা উহাদের স্থিতিস্থাপকতা (Volume- Elasticity) আছে।

(৩) দুই বা ততোধিক যে কোন গ্যাস একত্রিত হইলে মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হয়। সমস্ত গ্যাস সমানভাবে মিশিতে পারে।

(৪) গ্যাসীয় পদার্থগুলিও জড় পদার্থ; সুতরাং উহাদের ওজন আছে।

(৫) প্রত্যেক গ্যাসীয় পদার্থের যে কোন অবস্থায় একটি চাপ আছে। যে পাত্রে উহা থাকিবে তাহার উপর উহারা এই চাপ (Pressure) দেয়। পদার্থবিদ্‌গণ ম্যাগ্‌ডেবার্গ অর্ধগোলক এবং আরও অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা বাতাসের চাপ প্রমাণ করিয়াছেন।

আমাদের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবরণ হিসাবে যে বায়ুমণ্ডলী আছে, তাহাও গ্যাসীয় পদার্থ; সুতরাং উহারও চাপ আছে। বায়ুমণ্ডলীর এই চাপ বা প্রেষ, টরিসেলী খুব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

টরিসেলীর পরীক্ষা ঃ প্রায় তিন ফুট লম্বা একটি কাচের নল লও, উহার এক মুখ বন্ধ থাকা প্রয়োজন। উহাকে পারদ দ্বারা পূর্ণ কর এবং খোলা মুখটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করিয়া দাও। এখন নলটিকে উল্টাইয়া ধরিয়া আর একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উহার খোলা মুখটি ডুবাইয়া আঙুলটি সরাইয়া লও। দেখিবে, নলের ভিতর হইতে খানিকটা পারদ নামিয়া যাইবে, কিন্তু উহার অধিকাংশই নলের ভিতরে থাকিবে। পারদের উপর খানিকটা স্থান শূন্য থাকিবে, সেখানে বাতাস মোটেই ঢুকিতে পারে নাই। উহা সম্পূর্ণ রিক্ত। উহাকে "**টরিসেলী ভ্যাকাম**" বলে। বাহিরের পাত্রে যে পারদ আছে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে মাপিলে নলের ভিতর পারদের উচ্চতা প্রায় ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেন্টিমিটার হইবে। পারদ অত্যন্ত ভারী হওয়া সত্ত্বেও নীচে পড়িয়া যায় না। ইহাতে বুঝা যায় যে বায়ুমণ্ডল পাত্রের পারদের উপর চাপ দিতেছে এবং উহার ফলে পারদ নলের ভিতরে উঠিয়া রহিয়াছে। অতএব এই পারদ-স্তম্ভের ওজন ও বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান। ইহা হইতে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণ করা যায়।

এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা বিভিন্ন অর্থাৎ চাপের পরিমাণ বিভিন্ন। 0°C উষ্ণতায় বিষুবরেখার নিকট সমুদ্র-সমতলে বায়ুমণ্ডলীর চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭৬ সেন্টিমিটার উচ্চ পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান; অর্থাৎ, ১০১×১০^৬ ডাইন এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উক্ত চাপের পরিমাণ ১৫ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে সাত সের। এই চাপকে **প্রমাণ চাপ (Normal pressure)** বলে।

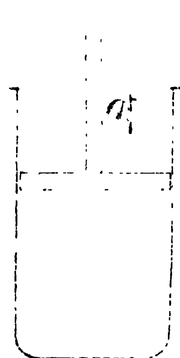
চাপের পরিমাণ সাধারণতঃ ডাইনে প্রকাশ করা হয়। যেমন ৭৬ সেণ্টিমিটার পারদের চাপ = ৭৬ × ১৩.৬ × ৯৮০ ডাইন।

[পারদের গুরুত্ব = ১৩.৬, অভিকর্ষাঙ্ক = ৯৮০ (acceleration due to gravity)]

অনেক সময় এই চাপকে 'ডাইনে' প্রকাশ না করিয়া শুধু পারদের উচ্চতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন চাপ = ৬০ সেণ্টিমিটার ; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে চাপটি ৬০ সেণ্টিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান।

যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ সেণ্টিমিটার পারদ-স্তম্ভের ওজনের সমান, এই চাপকে এক **অ্যাটমসফিয়ার (atmosphere)** বলে। অতএব কোন গ্যাসের চাপ যদি ৩২ সেণ্টিমিটার পারদের সমান হয়, তবে তাহাকে $\frac{৩২}{৭৬}$ অ্যাটমসফিয়ারও বলা যাইতে পারে।

৭-২। **বয়েল সূত্র (Boyle's Law)** : শুধু যে বায়ুমণ্ডলীর চাপ আছে তাহা নহে, সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থই সব দিকে এই রকম চাপ দিতে পারে। যদি কিছুটা গ্যাস একটি স্তম্ভকে (cylinder) পুরিয়া একটি পিস্টনের সাহায্যে আটকাইয়া রাখা হয় তবে পিস্টনের উপর একটি চাপ দিতেই হইবে। অন্যথায় পিস্টনটি উপরের দিকে চলিয়া যাইবে (চিত্র ৭ক)। এখন পিস্টনের উপরের চাপ যদি 'প' সেণ্টিমিটার হয় তবে গ্যাসটির ঊর্ধ্বচাপও নিউটনের সূত্র অনুসারে প সেণ্টিমিটারই হইতে হইবে। যদি গ্যাসের চাপ কম হয় তবে পিস্টনটি আরও নামিয়া আসিবে, আর যদি গ্যাসের চাপ প সেণ্টিমিটারের বেশী হয়, তবে পিস্টনটি উঠিয়া যাইবে এবং গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাইবে। অতএব ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন উহার চাপের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ একই পরিমাণ গ্যাসের আয়তন বিভিন্ন চাপে বিভিন্ন হইবে।



চিত্র—৭ক

চাপের সহিত গ্যাসের আয়তনের সম্পর্কটি **রবার্ট বয়েল** প্রথমে আবিষ্কার করেন। ইহাকে **বয়েল সূত্র (Boyle's Law)** বলে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ব পদার্থকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখিয়া উহার উপর যত বেশী চাপ বৃদ্ধি করা হয়, উহার আয়তন সেই অনুপাতে কমিয়া যায় এবং চাপ

যত কমানো যায় আয়তন সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ, "নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চাপের বৃদ্ধি ও হ্রাসের অনুপাতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন যথাক্রমে কমিবে ও বাড়িবে।"

একটি গ্যাসের উপর চাপ যদি দ্বিগুণ করা হয় তবে উহার আয়তন অর্ধেক হইবে; অথবা গ্যাসের উপর চাপ যদি এক-তৃতীয়াংশ করা হয় তবে উহার আয়তন তিনগুণ হইবে।

অঙ্কের সাহায্যে সূত্রটিকে আরও সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে। মনে করা যাউক, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ P এবং আয়তন V। অতএব উহাদের গুণফল $= P \times V$.

এখন, চাপ অর্ধেক করিলে আয়তন দ্বিগুণ হইবে,

অর্থাৎ, নূতন চাপ $= \frac{P}{2}$, আয়তন $= 2V$; গুণফল $= \frac{P}{2} \times 2V = PV$

অথবা, চাপ তিনগুণ করিলে আয়তন $\frac{1}{3}$ অংশ হইবে, সুতরাং নূতন চাপ $= 3P$, আয়তন $= \frac{V}{3}$, এবং ইহাদের গুণফল $3P \times \frac{V}{3} = PV$.

[অবশ্য চাপ এবং আয়তনের জন্য একবার যে যে একক গ্রহণ করা যাইবে, সর্বদাই সেই একক রাখিতে হইবে।]

অতএব, দেখা যাইতেছে যে চাপ এবং আয়তনের গুণফল নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট। অবশ্য এই চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন করার সময় উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকা চাই। ইহা যে কোন গ্যাসের পক্ষে প্রযোজ্য। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি:

$PV = K$ (নিত্য-সংখ্যা), অথবা $PV = P_1V_1 = P_2V_2$ ইত্যাদি (P_1, P_2, P_3...পরিবর্তিত চাপ; V_1, V_2, V_3...পরিবর্তিত আয়তন।)

$$\therefore P = \frac{K}{V}$$

সুতরাং, "নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ উহার আয়তনের বিপরীত অনুপাতে (বা ব্যস্ত অনুপাতে) পরিবর্তিত হয়।" ইহাই বয়েল সূত্র।

উদাহরণ ১। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ৪০ ঘনায়তন সেন্টিমিটার অক্সিজেনকে প্রমাণ চাপ হইতে ১১৪ সেন্টিমিটার পারদ চাপে নেওয়া হইলে উহার আয়তন কত হইবে?

গ্যাসের চাপ ছিল=৭৬ সেন্টিমিটার এবং আয়তন=৪০ ঘন সেণ্টি ; বর্তমান চাপ=১১৪ সেণ্টিমিটার। মনে কর, আয়তন V হইবে।

অতএব, $১১৪ \times V = ৭৬ \times ৪০$,

অথবা $V = \frac{৭৬ \times ৪০}{১১৪} = \frac{৮০}{৩} = ২৬.৬৬$ ঘন সেণ্টি। (উত্তর)

[ঘন সেণ্টি = ঘনায়তন সেন্টিমিটার = cubic centimeter]

উদাহরণ ২। ১২০ ঘনায়তন সেন্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চাপ-বৃদ্ধিতে ৪০ ঘনায়তন সেন্টিমিটার হইয়াছে। উহার পূর্বের চাপ ৩৮ সেন্টিমিটার হইলে বর্তমান চাপ কত অ্যাটমসফিয়ার হইবে ? উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

মনে কর, বর্তমান চাপ $= P$ অ্যাটমসফিয়ার

পূর্ববর্তী চাপ ছিল = ৩৮ সেন্টিমিটার $= \frac{৩৮}{৭৬} = \frac{১}{২}$ অ্যাটমসফিয়ার।

$$PV = P_1 V_1$$

অতএব $P \times ৪০ = \frac{১}{২} \times ১২০$ $\therefore$ $P = \frac{১২০}{২ \times ৪০} = \frac{৩}{২}$ অ্যাটমসফিয়ার

$= ১.৫$ অ্যাটমসফিয়ার। (উত্তর)

৭-৩। চার্লস্ সূত্র (Charles' Law) : তাপ প্রয়োগে সমস্ত জড় পদার্থেরই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়তনও প্রসার লাভ করে। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ অন্যান্য পদার্থ হইতে অনেক বেশী হয়। বলা বাহুল্য, উষ্ণতা কমাইলে গ্যাসীয় পদার্থ সঙ্কুচিত হইয়া আসে।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে বায়বীয় পদার্থের আয়তনের সঙ্কোচন বা প্রসারণের পরিমাণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে দুইটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

(১) নির্দিষ্ট চাপে এবং 0° সেণ্টি উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের একটি আয়তন থাকিবে। প্রতি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আয়তন উহার 0° সেন্টিগ্রেডের আয়তনের $\frac{১}{২৭৩}$ অংশ বাড়িয়া যাইবে। এই $\frac{১}{২৭৩}$ অংশটিকে আমরা **'প্রসারাঙ্ক'** (**coefficient of expansion**) বলিতে পারি।

যদি 0° সেণ্টি. কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন V_0 ঘন সেন্টিমিটার হয়, তাহা হইলে

১° সেণ্টি. উহার আয়তন হইবে $= V_0 + \frac{V_0}{২৭৩} = V_0\left(১ + \frac{১}{২৭৩}\right)$ ঘন সেণ্টি.

৫ সেণ্টি. উহার আয়তন হইবে $= V_0 + \frac{৫}{২৭৩} V_0 = V_0\left(১ + \frac{৫}{২৭৩}\right)$ „

অথবা, -১০° সেণ্টি. উহার আয়তন হইবে $= V_0 - \frac{১০}{২৭৩} V_0 = V_0\left(১ - \frac{১০}{২৭৩}\right)$ ঘন সেণ্টিমিটার।

[অবশ্য এই সমস্ত তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় চাপ অপরিবর্তিত থাকা চাই]

(২) সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ প্রসারণে বা সঙ্কোচনে একই রকম ব্যবহার করে ; অর্থাৎ প্রত্যেক গ্যাসেরই প্রসারাঙ্ক এক।

এই সমস্ত পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের ফলে চার্ল্‌স্ একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ইহাই চার্ল্‌স্ সূত্র নামে বিখ্যাত।

"নির্দিষ্ট চাপে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন প্রতি সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রী উষ্ণতার পরিবর্তনে উহার 0° সেণ্টিগ্রেডের আয়তনের $\frac{১}{২৭৩}$ অংশ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়।"

৭-৪। চাপের সূত্র (Law of Pressures) : কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসকে নির্দিষ্ট আয়তনে রাখিয়া যদি উহার উষ্ণতা পরিবর্তন করা হয়, তবে উহার চাপও পরিবর্তিত হইবে। উষ্ণতা পরিবর্তনের সহিত চাপ পরিবর্তনের নিয়মটি নিম্নরূপ :—

"নির্দিষ্ট আয়তনে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ প্রতি সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত উহার 0° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতার চাপের $\frac{১}{২৭৩}$ অংশ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ চাপ-প্রসারাঙ্কও $\frac{১}{২৭৩}$।" গ্যাসের চাপ-প্রসারাঙ্ক ও আয়তন-প্রসারাঙ্ক উভয়ই $\frac{১}{২৭৩}$।

কোন নির্দিষ্ট আয়তনে 0° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ যদি P_0 হয়, তাহা হইলে

১° সেণ্টিগ্রেডে উহার চাপ হইবে $= P_0 + \frac{১}{২৭৩} P_0 = P_0\left(১ + \frac{১}{২৭৩}\right)$

t° সেণ্টিগ্রেডে উহার চাপ হইবে $= P_0 + \frac{t}{২৭৩} P_0 = P_0\left(১ + \frac{t}{২৭৩}\right)$

-৩০° „ „ „ „ $= P_0 - \frac{৩০}{২৭৩} P_0 = P_0\left(১ - \frac{৩০}{২৭৩}\right)$

৭-৫। পরম শূন্য এবং পরম উষ্ণতা (Absolute zero and Absolute temperature) : একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 0° সেন্টিগ্রেডে যদি V_0 হয় এবং চাপ না বদলাইয়া উহার উষ্ণতা যদি ২৭৩ কমাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন হইবে

$$V_0\left(১ - \frac{২৭৩}{২৭৩}\right) = 0 \text{ ঘন সেন্টিমিটার ;}$$

অর্থাৎ, উহার আয়তন লোপ পাইবে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, যে কোন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ 0° সেন্টিগ্রেড হইতে $-$ ২৭৩° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত শীতল করিলে উহার কোন আয়তন থাকিবে না। যে উষ্ণতায় আয়তন লোপ পায় তাহাকে **"পরমশূন্য"** (Absolute zero) বলা হয়। এই পরম শূন্য হইতে যদি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী অনুসারে তাপমাত্রা মাপা যায় তবে উহাকে উষ্ণতার **পরম মাত্রা** (Absolute scale) বলা যায়। এই হিসাবে 0° সেন্টিগ্রেড হইবে ২৭৩° **পরম উষ্ণতা** (Absolute temperature) এবং ৩০° সেন্টিগ্রেড হইবে (২৭৩° + ৩০°) = ৩০৩ পরম উষ্ণতা। অথবা t° সেন্টিগ্রেড হইবে (২৭৩ + t°) পরম উষ্ণতা। 0° সেন্টিগ্রেড অথবা ২৭৩ পরম উষ্ণতাকে **প্রমাণ উষ্ণতা** (normal temperature) বলা হয়, যেমন ৭৬ সেন্টিমিটার চাপকে প্রমাণ চাপ বলে।

চার্ল্‌স্‌ সূত্র অনুসারে আমরা দেখিয়াছি t° সেন্টিগ্রেডে গ্যাসের আয়তন যদি V_t হয় তাহা হইলে (নির্দিষ্ট চাপে)

$$V_t = V_0\left(১ + \frac{t}{২৭৩}\right) = V_0\left(\frac{২৭৩ + t}{২৭৩}\right)$$

$$\text{সেই রকম } t_1^\circ \text{ সেন্টিগ্রেডে } V_{t_1} = V_0\left(\frac{২৭৩ + t_1}{২৭৩}\right)$$

$$\therefore \quad \frac{V_t}{V_{t_1}} = \frac{২৭৩ + t}{২৭৩ + t_1} = \frac{T}{T_1}$$

(২৭৩ + $t = T$ পরম উষ্ণতা, ২৭৩ + $t_1 = T_1$ পরম উষ্ণতা)

অর্থাৎ, "নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতে বাড়িয়া চলে।" ইহা চার্ল্‌স্‌ সূত্রের প্রত্যক্ষ ফল।

৭-৬। বয়েল সূত্র এবং চার্ল্‌স্‌ সূত্রের সমন্বয়ঃ গ্যাস সমীকরণ—

(ক) বয়েল সূত্রে বলা হইয়াছে, উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন চাপের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে।

$$V \propto \frac{1}{P}$$ (T অপরিবর্তিত থাকিবে।)

(খ) চার্ল্‌স্‌ সূত্র হইতে জানা গিয়াছে, চাপ অপরিবর্তিত থাকিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সমানুপাতে পরিবর্তিত হইবে।

$$V \propto T$$ (P অপরিবর্তিত থাকিবে।)

[V = আয়তন, P = চাপ, T = পরম উষ্ণতা]

অঙ্কের নিয়মানুসারে এই দুইটি সূত্রকে একত্র করিলে দাঁড়ায়—

(a) $V \propto \frac{1}{P}$ (b) $V \propto T$

অথবা, $V \propto \frac{T}{P}$, অর্থাৎ, $PV = KT$ (K = নিত্য সংখ্যা)।

ইহাকে গ্যাস-সমীকরণ বলে।

সুতরাং $\frac{PV}{T} = K$ (P, V, T সকলেই পরিবর্তনীয়)।

যদি গ্যাসের দুই অবস্থায় চাপ, আয়তন ও উষ্ণতা যথাক্রমে P_1, V_1, T_1, এবং P_2, V_2, T_2 হয়, তাহা হইলে $\frac{P_1V_1}{T_1} = K = \frac{P_2V_2}{T_2}$.

এই সমীকরণটি হইতে চাপ ও উষ্ণতা উভয়ই পরিবর্তিত হইলে আয়তনের পরিবর্তন অনায়াসে বাহির করা যায়।

উদাহরণ ১। ৪০০ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনকে যদি প্রমাণ উষ্ণতা ও প্রমাণ চাপ হইতে ২০° সেন্টিগ্রেড এবং ৭২ সেন্টিমিটার চাপে লইয়া যাওয়া হয়, উহার আয়তন কত হইবে?

মনে কর, V_2 উহার পরিবর্তিত আয়তন,

আমরা জানি, $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$.

অতএব, $\frac{৭৬ \times ৪০০}{২৭৩} = \frac{৭২ \times V_2}{(২৭৩+২০)}$.

অর্থাৎ $V_2 = \frac{৭৬ \times ৪০০ \times ২৯৩}{২৭৩ \times ৭২}$ ঘন সেন্টি.

= ৪৫৩.১ ঘন সেন্টি.। (উত্তর)

উদাহরণ ২। একটি বেলুনের ভিতর ১২° সেন্টিগ্রেডে ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে ৪৫০ ঘন সেন্টিমিটার বাতাস আছে। বেলুনটিকে একটি খনিগর্ভে লইয়া গেলে উহার চাপ হইল ৭৬৫ মিলিমিটার এবং তাপমাত্রা ৫° সেন্টিগ্রেড। বেলুনের আয়তনের কি পরিবর্তন হইবে?

$$\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$$

অতএব, $V_2=\frac{P_1V_1}{P_2}\times\frac{T_2}{T_1}$

$$=\frac{৭৫৬\times৪৫০}{৭৬৫}\times\frac{২৭৮}{২৮৫}$$

$=$৪৩৩·৭ ঘন সেন্টিমিটার।

মনে কর, V_2 = পরিবর্তিত আয়তন।

P_2 = ৭৬৫

T_2 = ২৭৩ + ৫ = ২৭৮

P_1 = ৭৫৬

V_1 = ৪৫০

T_1 = ২৭৩ + ১২ = ২৮৫

সুতরাং, বেলুনটি ৪৫০ − ৪৩৩·৭ = ১৬·৩ ঘন সেন্টিমিটার ছোট হইয়া যাইবে।

৭-৭। ডালটনের অংশপ্রেষ সূত্র (Law of Partial Pressures):

যদি কোন নির্দিষ্ট আয়তনে দুই বা ততোধিক গ্যাসীয় পদার্থ একত্র মিশ্রিত থাকে, তবে সেই গ্যাস-মিশ্রণের একটি চাপ থাকিবে। আবার সেই মিশ্রণের প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক পৃথক ভাবে যদি সম্পূর্ণ স্থানটি জুড়িয়া থাকে, তবে পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকটি গ্যাসের ভিন্ন ভিন্ন এক-একটি চাপ হইবে। বিভিন্ন উপাদানের এই পৃথক চাপসমূহের সমষ্টি মিশ্র গ্যাসীয় পদার্থের চাপের সমান হইবে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাপকে তাহাদের অংশপ্রেষ বলে।

কোন নির্দিষ্ট আয়তনে যদি P_1, P_2, P_3...ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপ হয় এবং একই উষ্ণতায় সেই আয়তনেই উহাদের মিশ্রণের চাপ যদি P হয়

তবে, $P=P_1+P_2+P_3+$.........হইবে

এই নিয়মটিকেই ডালটনের অংশপ্রেষ সূত্র বলে এবং বিভিন্ন উপাদানের $P_1, P_2,$...এই সকল চাপকে **অংশপ্রেষ (partial pressure)** বলে। বিভিন্ন গ্যাসের এবং মিশ্রণের উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে।

উদাহরণ ১। বায়ুতে মৌলহিসাবে একভাগ অক্সিজেন এবং চারিভাগ নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে, এবং বায়ুর চাপ ৭৬ সেন্টিমিটার।

অতএব, P_{N_2} যদি নাইট্রোজেনের অংশপ্রেষ হয় এবং P_{O_2} অক্সিজেনের অংশপ্রেষ হয়, তবে $P_{N_2}+P_{O_2}=$ ৭৬ সেন্টি.

[ইহাও প্রমাণ করা সম্ভব হইবে যে, $P_{O_2}=\frac{১}{৫}\times$৭৬ সেন্টি এবং $P_{N_2}=\frac{8}{৫}\times$৭৬ সেন্টি.]

উদাহরণ ২। মনে কর, জলের উপর ৩০ ঘনায়তন সেন্টি. হাইড্রোজেন সংগৃহীত হইয়াছে। যেহেতু উহা জলের উপরে আছে, উহার ভিতর নিশ্চয়ই জলীয় বাষ্প আছে।

মনে কর, এই গ্যাসের উষ্ণতা ৩০° সেণ্টিগ্রেড এবং চাপ=৭৫ সেণ্টিমিটার অর্থাৎ, হাইড্রোজেন এবং বাষ্পের মিলিত চাপ=৭৫ সেণ্টিমিটার। যদি হাইড্রোজেন এবং বাষ্পের অংশপ্রেষ যথাক্রমে P_{H_2} এবং P_{H_2O} হয়, তবে $P_{H_2}+P_{H_2O}=$৭৫ সেণ্টিমিটার]

জলীয় বাষ্পের চাপ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট, যথা ৩০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায়, $P_{H_2O}=$৩.১৭ সেণ্টিমিটার।

$\therefore$ $P_{H_2}=$৭৫$-P_{H_2O}=$৭৫$-$৩.১৭$=$৭১.৮৩ সেণ্টিমিটার।

অতএব, এই হাইড্রোজেন ৭৫ সেণ্টিমিটার চাপে থাকিলেও বস্তুতঃ উহার নিজস্ব চাপ হইবে ৭১.৮৩ সেণ্টিমিটার।

অনুশীলনী

১। ২০০ ঘন সেণ্টি. আয়তনের একটি গ্যাসীয় পদার্থ ৭২৮ মিলিমিটার চাপে এবং ১৮°C উষ্ণতায় আছে। প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় উহার আয়তন কত হইবে?

২। এক লিটার অঙ্গারাম্লের উষ্ণতা ৫০ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। যদি চাপ অপরিবর্তিত রাখা হয়, তবে উহার আয়তন কত হইবে? উহার আয়তন যদি নির্দিষ্ট রাখা হয়, ঐ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চাপের কত পরিবর্তন হইবে? (উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বে গ্যাসটি প্রমাণ চাপে ছিল ধরিতে হইবে।)

৩। ৫২২ ঘন সেণ্টি. হাইড্রোজেনকে ১৯° সেণ্টিগ্রেড হইতে ১০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া দেখা গেল উহার আয়তন তিনগুণ হইয়াছে। পূর্বের চাপ ৭৬২ মিলিমিটার হইলে নূতন চাপ কত হইবে?

৪। ১৫ সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৭০ মিলিমিটার চাপে পৃথকভাবে ১০০ ঘন সেণ্টি. হাইড্রোজেন এবং ৫০ ঘন সেণ্টি. হাইড্রোজেন এবং ৫০ ঘন সেণ্টি. অক্সিজেন একটি ২৫০ ঘন সেণ্টি. আয়তনের শূন্য (vacuum) পাত্রের ভিতর মিশ্রিত করা হইল। ২০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই মিশ্রপদার্থের চাপ কত হইবে?

৫। গ্যাসের চাপ, আয়তন ও উষ্ণতার পরস্পর সম্বন্ধ কি? ৭৮০ মিলিমিটার চাপের ১০ লিটার গ্যাসকে ১০° হইতে ২০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ৭৪০ মিলিমিটার চাপে রাখিলে উহার আয়তন কত হইবে?

অষ্টম অধ্যায়

আণবিক ও পারমাণবিক গুরুত্ব

৮-১। **পদার্থের ঘনত্ব (Density)** : একটি বীকার যদি একবার জল দিয়া ভর্তি কর এবং আবার জলের পরিবর্তে পারদে ভর্তি কর, দুইবারে উহার ওজন বিভিন্ন হইবে। অথচ জল এবং পারদ উভয়েরই আয়তন এইক্ষেত্রে সমান—বীকারের আয়তনের সমান। অতএব, বিভিন্ন পদার্থের একই আয়তনের ওজন বিভিন্ন।

এক ঘন সেণ্টিমিটার (1 c.c.) আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের যাহা ওজন তাহাকে তাহার **ঘনত্ব (Density)** বলে। যেমন পারদের ঘনত্ব ১৩·৬ গ্রাম, এক ঘন সেণ্টিমিটার পারদের ওজন = ১৩·৬ গ্রাম। সুতরাং

ঘনত্ব = ১ ঘন সেণ্টিমিটার আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের ওজন।

একটি বস্তুর আয়তন যদি V ঘন সেণ্টিমিটার হয় এবং ওজন যদি W গ্রাম হয়, তাহা হইলে উহার

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{W}{V} \text{ গ্রাম} = \frac{\text{বস্তুর ওজন}}{\text{বস্তুর আয়তন}} \text{।}$$

বস্তুর ওজনকে যদি উহার আয়তন দ্বারা ভাগ করা যায়, তবেই ঘনত্ব জানা যায়। সচরাচর ওজনটি গ্রাম এবং আয়তনটি ঘন সেণ্টিমিটারে প্রকাশ করা হয়।

উষ্ণতা ও চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে আয়তনের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওজন ঠিকই থাকে। সুতরাং পদার্থটির উষ্ণতা বা চাপ যদি বদল হয়, তবে ঘনত্বেরও পরিবর্তন হইবে। এই দুই কারণে কঠিন ও তরল পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন খুবই সামান্য হয় এবং সেই জন্য উহাদের ঘনত্বও খুব সামান্যই বদলায়।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চাপে এবং বিভিন্ন উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ওজনের কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বিভিন্ন হইবেই। অতএব গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব পদার্থটির উষ্ণতা ও চাপের উপরও নির্ভর করিবে। গ্যাসের ঘনত্ব বলিতে হইলে উহার চাপ ও উষ্ণতার উল্লেখ প্রয়োজন।

0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৬ সেন্টিমিটার চাপে এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তন-বিশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের ওজনকে উহার **'প্রমাণ ঘনত্ব' (Normal density)** বলা হয়। যদি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত না হয় তবে গ্যাসের 'ঘনত্ব' বলিলে "প্রমাণ ঘনত্ব"ই বুঝিতে হইবে। প্রমাণ চাপে ও উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন=˙০০০০৯ গ্রাম।

∴ হাইড্রোজেনের ঘনত্ব=˙০০০০৯ গ্রাম,

অথবা এক লিটার হাইড্রোজেনের ওজন=˙০০০০৯ × ১০০০ = ˙০৯ গ্রাম।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব=˙০০১৯৮ গ্রাম। ইহার অর্থ, এক ঘন সেন্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন=˙০০১৯৮ গ্রাম।

যেহেতু হাইড্রোজেনের ঘনত্ব=˙০০০০৯ গ্রাম, আমরা বলিতে পারি যে কার্বন ডাই-অক্সাইড হাইড্রোজেন অপেক্ষা, $\frac{˙০০১৯৮}{˙০০০০৯}$ = ২২ গুণ ভারী।

গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হয়, এবং হাইড্রোজেন সমস্ত পদার্থের চেয়ে লঘুভার। গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব সাধারণতঃ গ্রাম হিসাবে না মাপিয়া হাইড্রোজেনের ঘনত্বের সহিত তুলনা করা হয়। যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ˙০০১৯৮ গ্রাম না বলিয়া কেবল মাত্র ২২ বলা হয়। অর্থাৎ ইহা হাইড্রোজেন হইতে ২২ গুণ ভারী।

সেই রকম "জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব=৯" বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৯ গুণ ভারী। বস্তুতঃ উহার ঘনত্ব=৯ × ˙০০০০৯ গ্রাম।

এই ভাবে, হাইড্রোজেনের সহিত তুলনায় যে ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়, তাহা একটি গুণক সংখ্যা মাত্র, উহাতে কোন একক নাই। যেমন বাষ্পের ঘনত্ব, ৯। ইহা ৯ গ্রাম বা ৯ আউন্স নয়, ৯ কেবল মাত্র একটি সংখ্যা, যদ্দ্বারা হাইড্রোজেনের ঘনত্বকে গুণ করিলে পদার্থটির ঘনত্ব পাওয়া যাইবে। রাসায়নিক আলোচনা বা অঙ্কে এই রকম সংখ্যা দ্বারাই গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়।

৮-২। পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight) ঃ

মৌলিক পদার্থ মাত্রই উহার পরমাণুর সমষ্টি, এবং যে কোন একটি মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণুর ধর্ম এবং ওজনও এক। কিন্তু এই পরমাণুসমূহ অতিশয় ক্ষুদ্র এবং উহাদের ওজনও অত্যন্ত কম। হাইড্রোজেনের একটি

পরমাণুর ওজন $= ১.৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম। লৌহের একটি পরমাণুর ওজন $= ৯.৩ \times ১০^{-২৩}$ গ্রাম এবং অত্যন্ত ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন $= ৩.৮৫ \times ১০^{-২২}$ গ্রাম। ইহা ওজন করা তো দূরের কথা, এত ক্ষুদ্র ওজন কল্পনা করাই শক্ত। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে এই সকল অদৃশ্য এবং এত ক্ষুদ্র পরমাণুর ওজন কিভাবে জানা গিয়াছে। উহাদের ওজন সোজাসুজি তুলাদণ্ডে মাপিয়া বাহির করা যায় না, অন্যান্য উপায় ও পরীক্ষার দ্বারা উহাদের ওজন স্থির করা হইয়াছে।

এত ছোট দশমিক ভগ্নাংশে প্রতিটি পরমাণুর ওজন প্রকাশ করা যেমন মুস্কিল তেমনি গণনাতেও এত ছোট সংখ্যার ব্যবহার খুবই অসুবিধাজনক। এই কারণে রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুর ওজন প্রকাশের একটি নূতন পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন।

ওজন প্রকাশের যে কোন পদ্ধতিতে একটি একক প্রয়োজন। এই নূতন পদ্ধতিতেও একটি একক আছে যাহার পরিমাপে একটি অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬ একক হইবে [যদি একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন n গ্রাম হয়, তবে এই এককটি হইবে $\frac{n}{১৬}$ গ্রাম], অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন পরমাণুকে ১৬ ধরা হইয়াছে।

এই এককের পরিমাপে হাইড্রোজেন পরমাণু $= ১.০০৮$, ক্লোরিন $= ৩৫.৫$, নাইট্রোজেন $= ১৪$, ব্রোমিন $= ৮০$, ইত্যাদি। এই সংখ্যাগুলিকে পারমাণবিক ওজন বলা যায় না, ইহাদের নাম **"পারমাণবিক গুরুত্ব" (atomic wt.)**।

বস্তুতঃ অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬ গ্রাম বা আউন্স নয়। অথবা হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১.০০৮ ছটাক নয়। এই সংখ্যাগুলি হইতে আমরা পরমাণুদের পরস্পরের আপেক্ষিক গুরুত্ব (লঘু বা ভার) জানিতে পারি।

ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব $= ৩৫.৫$। অর্থাৎ যে হিসাবের অনুপাতে অক্সিজেন পরমাণুর ভার ১৬, সেই অনুপাতেই ক্লোরিনের পরমাণুর ভার ৩৫.৫। এই হিসাবেই সমস্ত মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই পারমাণবিক গুরুত্ব একটি সংখ্যা মাত্র। ইহার একক অক্সিজেন পরমাণুর ওজনের $\frac{১}{১৬}$ অংশ। নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৪। অতএব নাইট্রোজেন পরমাণু এই এককের ১৪ গুণ ভারী।

∴ নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন = ১৪ × $\frac{\text{অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন}}{১৬}$

সমস্ত পরমাণুর বেলাতেই এইরূপ হিসাব প্রযোজ্য।

আবার দেখা যায়, এই অনুপাতে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব =১০০৮। ইহা মোটামুটি অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের $\frac{১}{১৬}$ অংশ। অতএব আমাদের এই পদ্ধতির একক হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের প্রায় সমান।

অতএব, স্থুল হিসাবে পারমাণবিক গুরুত্ব বলিতে একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে কতগুণ ভারী তাহাই বুঝায়। ব্রোমিনের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা মোটামুটি ৮০ গুণ ভারী। সুতরাং ব্রোমিনের পারমাণবিক গুরুত্ব=৮০।

৮·৩। আণবিক গুরুত্ব (Molecular weight): একই প্রকারের পরমাণু সহযোগে মৌলের অণু গঠিত এবং যৌগপদার্থের অণুগঠনে বিভিন্ন পরমাণুর সমন্বয় হয়। কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া, বিশ্বের সমস্ত পদার্থের অণুতেই একাধিক পরমাণু বর্তমান। সমস্ত রকমের অণুই এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না এবং তাহাদের ওজনও এত কম যে প্রায় পরমাণুর পর্যায়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, যে কোন একটি পদার্থের সমস্ত অণুই সমধর্মী এবং একই ওজনের।

চিনির একটি অণুর ওজন মাত্র = ৫ ৬৮ × $১০^{-২২}$ গ্রাম।
লবণের একটি অণুর ওজন মাত্র = ৯ ৭১ × $১০^{-২৩}$ গ্রাম।
হাইড্রোজেন অণুর ওজন = ৩ ৩২ × $১০^{-২৪}$ গ্রাম ইত্যাদি।

পরমাণুর মত দশমিক ভগ্নাংশে অণুর ওজন প্রকাশও অসুবিধাজনক। সেই জন্য অণুর ভর প্রকাশে রসায়নবিদ্‌গণ পারমাণবিক গুরুত্বের মত এই ক্ষেত্রে **'আণবিক গুরুত্ব' (Molecular weight)** প্রচলন করিয়াছেন। পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ধারণে আমরা যে একক ব্যবহার করিয়াছি তাহাই এখানে প্রযোজ্য। স্থুল হিসাবে একটি অণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা যতগুণ ভারী তাহাকে উহার আণবিক গুরুত্ব বলা হয়। আমরা মোটামুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে 'একক' ধরিয়া পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করিয়াছি। এখানেও সেই পদ্ধতি প্রচলিত। একটি চিনির অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ৩৪২ গুণ ভারী; অর্থাৎ, চিনির আণবিক গুরুত্ব = ৩৪২।

জলের আণবিক গুরুত্ব=১৮। ইহার অর্থ, জলের একটি অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৮ গুণ ভারী। বস্তুতঃ, জলের একটি অণুর ওজন ১৮ গ্রাম বা ছটাক নয়; ইহা একটি সংখ্যা মাত্র যদ্দ্বারা হাইড্রোজেনের প্রকৃত ওজনের গুণ করিলে জলের অণুর প্রকৃত ওজন জানা যাইবে।

হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন = ১.৬৬ × ১০^{-২৪} গ্রাম

জলের অণুর ওজন = ১.৬৬ × ১০^{-২৪} × ১৮ = ২৯.৮৮ × ১০^{-২৪} গ্রাম

অতএব, আণবিক গুরুত্ব = $\frac{\text{পদার্থের একটি অণুর ওজন}}{\text{একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন}}$

সূক্ষ্ম হিসাবে অবশ্য অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া, সেই অনুপাতে আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়।

পদার্থের অণু একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত পরমাণুর গুরুত্ব যোগ করিলে সেই অণুর গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন, চিনির অণুর সঙ্কেত $C_{12}H_{22}O_{11}$, অর্থাৎ ১২টি কার্বন, ২২টি হাইড্রোজেন এবং ১১টি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা চিনির অণুটি গঠিত। এই পরমাণু সকলের গুরুত্ব হইবে—

১২টি কার্বন পরমাণু	= ১২ × ১২ = ১৪৪	[∵ কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১২]
২২টি হাইড্রোজেন পরমাণু	= ২২ × ১ = ২২	[∵ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১]
১১টি অক্সিজেন পরমাণু	= ১১ × ১৬ = ১৭৬	[∵ অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১৬]
	মোট = ৩৪২	

চিনির আণবিক গুরুত্ব হইবে = ৩৪২। অর্থাৎ সঙ্কেতের সমস্ত পরমাণুর গুরুত্বের যোগ-ফলই আণবিক গুরুত্ব।

৮-৪। গ্রাম-অণু (Gram-molecule): পূর্বেই বলা হইয়াছে পদার্থের আণবিক গুরুত্ব একটি সংখ্যা মাত্র, উহার কোন একক নাই। যেমন সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব ৯৮। সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুর ওজন ৯৮ গ্রাম বা ছটাক নয়।

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব-সংখ্যক গ্রাম ওজনের পরিমাণকে সেই পদার্থের গ্রাম-অণু (Gram-molecule) বলে। যেমন ৯৮ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড উহার এক গ্রাম-অণু। ৯৮ উহার আণবিক গুরুত্ব এবং ঐ সংখ্যক গ্রাম ওজনের বস্তুর পরিমাণ উহার এক গ্রাম-অণু।

প্রত্যেক পদার্থের গ্রাম-অণু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন যাহা সেই পদার্থের আণবিক গুরুত্ব যত তত গ্রাম। জলের আণবিক গুরুত্ব ১৮, অতএব এক গ্রাম-অণু জল = ১৮ গ্রাম। লবণের আণবিক গুরুত্ব ৫৮·৫। অতএব এক গ্রাম-অণু লবণ = ৫৮·৫ গ্রাম ইত্যাদি।

সুতরাং যদি ১০ গ্রাম-অণু জল বলা হয় তবে ১৮০ গ্রাম জল বুঝাইবে। অথবা ৫·৭ গ্রাম-অণু চিনি যদি চাওয়া যায়, তাহা হইলে ৫·৭ × ৩৪২ গ্রাম চিনি দিতে হইবে, কারণ প্রতি গ্রাম-অণু চিনি ৩৪২ গ্রাম।

মনে রাখিতে হইবে, গ্রাম-অণু একটি ওজনের পরিমাণ; সুতরাং, উহার ওজনের 'একক' গ্রাম থাকিবে, উহা একটি সংখ্যা হইতে পারে না। বিভিন্ন পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের গ্রাম-অণুর পরিমাণও বিভিন্ন।

এইভাবে পারমাণবিক গুরুত্বের সমপরিমাণ গ্রাম ওজন কোন মৌলিক পদার্থকে **"গ্রাম-পরমাণু"** বলা যায়। যেমন ১৬ গ্রাম অক্সিজেনকে এক "গ্রাম-পরমাণু" অক্সিজেন বলা যাইতে পারে।

নবম অধ্যায়

গ্যাসায়তন সূত্র ঃ অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প

৯-১। গ্যাসায়তন সূত্র (Law of Gaseous Volumes) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস্ (Cavendish) জল এবং তাহার দুইটি উপাদান—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সম্পর্কে বহু রকম পরীক্ষা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে কোন নির্দিষ্ট আয়তনের হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করিলে উহার সহিত উহার অর্ধেক আয়তন অক্সিজেন যুক্ত হয়। ২০০ ঘন সেণ্টিমিটার হাইড্রোজেন ১০০ ঘন সেণ্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত সংযোগের ফলে জল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আয়তনের যে অনুপাতে মিলিত হইয়া জল সৃষ্টি করে তাহা একটি সরল অনুপাত, ২ : ১।

ইহার পরে গে-লুসাক (Gay-Lussac) এবং হামবোল্ট অন্যান্য গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে কেবল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নয়, অন্যান্য গ্যাসসমূহের আয়তনগুলিও রাসায়নিক সংযোগকালে সরল অনুপাতে থাকে। এই সকল পরীক্ষা হইতে **গে-লুসাক** একটি সূত্র আবিষ্কার করেন—

"গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়াকালে উহাদের আয়তনগুলি সরল অনুপাতে থাকে, এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও যদি গ্যাসীয় পদার্থই উৎপন্ন হয়, তাহার আয়তনও বিক্রিয়ক গ্যাসের আয়তনের সহিত সরল অনুপাতে থাকিবে।" ইহাকে **গ্যাসায়তন সূত্র (Law of Gaseous Volumes)** বলে। অবশ্য পরীক্ষাকালে সমস্ত গ্যাসের আয়তন একই চাপ ও উষ্ণতায় মাপিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফল হইতেই এই সূত্রের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

(১) এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন ক্লোরিন মিলিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়। অতএব আয়তন হিসাবে হাইড্রোজেন : ক্লোরিন=১ : ১ ; ইহা সরল অনুপাত।

(২) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন সহযোগে দুই ঘনায়তন অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, আয়তন অনুসারে নাইট্রোজেন : হাইড্রোজেন : অ্যামোনিয়া =১ : ৩ : ২, সরল অনুপাত। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তনের সঙ্গে সরল অনুপাতে আছে।

(৩) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন এক ঘনায়তন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দুই ঘনায়তন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে। সুতরাং আয়তন অনুপাতে নাইট্রোজেন : অক্সিজেন : নাইট্রিক অক্সাইড=১ : ১ : ২, সরল অনুপাত।

(৪) দুই ঘনায়তন কার্বন ডাই-অক্সাইড বিয়োজনের ফলে এক ঘনায়তন অক্সিজেন এবং দুই ঘনায়তন কার্বন-মনোক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং আয়তন হিসাবে,

কার্বন ডাই-অক্সাইড : অক্সিজেন : কার্বন-মনোক্সাইড
২ : ১ : ২,

ইহাও সরল অনুপাত।

এই রকম আরও অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন যে বিক্রিয়ক গ্যাসসমূহের আয়তনের সমান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই ; এই সকল আয়তন সরল অনুপাতে থাকিবে মাত্র। আয়তন নির্ধারণকালে অবশ্য বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন গ্যাসসমূহের উষ্ণতা ও চাপ নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

৯-২। বার্জেলীয়াসের (Berzelius) সিদ্ধান্ত: ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে গে-লুসাকের গ্যাসায়তন সূত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সেই সময়েই (১৮০৩-১৮০৮) ডালটনের পরমাণুবাদের প্রচার হয়। ডালটনের পরমাণুতত্ত্বের মূল কথা এই যে যৌগিক পদার্থ মাত্রই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্টসংখ্যক অবিভাজ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রায়ই পরমাণুর সংখ্যাগুলি সরলানুপাতে থাকে। ডালটন অবশ্য পরমাণুবাদ প্রচারের সময় পদার্থের কোন অণুর কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, মৌলিক পদার্থ, যেমন হাইড্রোজেন বা লৌহ, উহাদের অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি, তেমনই যৌগিক পদার্থ, জল বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও জল এবং অ্যাসিডের পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। পদার্থের অণুর পৃথক অস্তিত্ব তখনও স্বীকৃত হয় নাই।

পরমাণুবাদের সাহায্যে তখন যে-সকল বিজ্ঞানী গ্যাসায়তন সূত্রটিকে বুঝিবার এবং ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টায় ছিলেন, বার্জেলীয়াস তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়। পরীক্ষাতে প্রমাণিত হইয়াছে,

এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন এক ঘনায়তন ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

আবার, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একটি ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়।

তাহা হইলে বুঝা যায় যে এক ঘনায়তন হাইড্রোজেনে যত পরমাণু আছে, এক ঘনায়তন ক্লোরিনেও ঠিক তত পরমাণু থাকিবে। অতএব বার্জেলীয়াস সিদ্ধান্ত করিলেন: 'নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এবং চাপে, সম-আয়তন যে কোন গ্যাসে একই সংখ্যক **পরমাণু** থাকে।'

সুতরাং ৫ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেন প্রভৃতি যে কোন গ্যাসে **পরমাণুর** সংখ্যা সমান। অবশ্য প্রত্যেক গ্যাসের ৫ ঘন সেন্টিমিটার একই উষ্ণতায় ও চাপে লইতে হইবে।

গে-লুসাক নিজেই পরে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং উহার ত্রুটি বাহির করিয়া দেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং এক ঘনায়তন ক্লোরিন সংযোগে দুই ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়; অর্থাৎ

২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড=১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন+১ ঘনায়তন ক্লোরিন।

অথবা, ২ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড=১ ঘন সেন্টি. হাইড্রোজেন+১ ঘন সেন্টি. ক্লোরিন।

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি মনে করা যায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে যে কোন গ্যাসের পরমাণু সংখ্যা x, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে :—

২x পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড = x পরমাণু হাইড্রোজেন + x পরমাণু ক্লোরিন।

অথবা, ১ পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড = $\frac{1}{2}$ পরমাণু হাইড্রোজেন + $\frac{1}{2}$ পরমাণু ক্লোরিন।

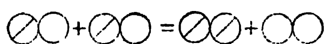
ডালটনের পরমাণুবাদ অনুসারে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। দেখা যাইতেছে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পরমাণু গঠনে অর্ধ-পরমাণু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন প্রয়োজন। পরমাণুবাদ অনুযায়ী পরমাণু অবিভাজ্য, সুতরাং $\frac{1}{2}$ পরমাণু হাইড্রোজেন সম্ভব নয়। ইহা স্বীকার করিলে যে পরমাণুতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া বার্জেলীয়াসের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সেই পরমাণুবাদকেই অস্বীকার করিতে হয়। অতএব বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে।

৯-৩। অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প (Avogadro's hypothesis) : বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত গ্যাসায়তন সূত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেগুলি দূর করিতে সমর্থ হইলেন ইতালীয় পদার্থবিদ্ অ্যাভোগাড্রো। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাভোগাড্রো প্রথমে পদার্থের অণুর কল্পনা করেন। তিনি বলেন, পদার্থের ভিতর দুই রকম ক্ষুদ্র কণিকা বর্তমান :

(১) অণু : প্রত্যেক পদার্থই—যৌগিক বা মৌলিক—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সমধর্মী কণার সমষ্টি। এই কণাগুলির স্বাধীন সত্তা আছে এবং ইহাতে পদার্থের সমস্ত ধর্ম বর্তমান। ইহারা মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ-বিহারী এবং এই সকল সমধর্মী কণাগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ নাই। ক্ষুদ্র কণাগুলিকে **অণু (molecules)** বলা হয়।

(২) পরমাণু : রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলিক পদার্থে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাকে **পরমাণু (atoms)** বলা হয়। এই পরমাণু-সমষ্টি হইতেই মৌলিক পদার্থ গঠিত। কিন্তু পরমাণুগুলির স্বাধীন সত্তা নাও থাকিতে পারে। দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র থাকিয়া একটি স্বাধীন-সত্তা-সম্পন্ন অণুর সৃষ্টি করিতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ডালটন ও তাঁহার সমসাময়িকগণ মনে করিতেন যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস যখন পৃথক পৃথক থাকে তখন উহাদের ভিতর উহাদের নিজ নিজ পরমাণু সকল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এই দুইটি গ্যাসের যখন মিলন হয়, তখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি ক্লোরিন পরমাণু একত্র হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একটি যুগ্ম পরমাণুর সৃষ্টি করে। অ্যাভোগাড্রো বলিলেন, উহা ঠিক নয়। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাসে পরমাণুগুলি একক থাকে না। এই দুইটি গ্যাসেই দুইটি পরমাণু একত্র জুড়িয়া থাকে, এবং এই যুক্ত পরমাণুদ্বয়কে উহাদের অণু বলিতে হইবে। যখন উহাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তখন একটি করিয়া পরমাণু অণু হইতে বাহির হইয়া একত্র হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুর সৃষ্টি করে।



হাইড্রোজেন অণু   ক্লোরিন অণু   হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু

সঙ্কেত সাহায্যে লেখা যায় : $H_2 + Cl_2 = HCl + HCl = 2HCl.$

অতএব, অ্যাভোগাড্রোর মতে সমস্ত মৌলিক পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি বটে, তবে সব ক্ষেত্রে পরমাণুগুলি একক থাকে না। পরমাণুগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সবসময় সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেক সময়ে একাধিক পরমাণু একত্র হইয়া ছোট ছোট পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি করে। উহাদিগকে অণু বলে। অণু সর্বদাই একক থাকিতে পারে।

এইভাবে অণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া অ্যাভোগাড্রো বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিয়া বলিলেন :

"নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এবং চাপে সম-আয়তন-বিশিষ্ট যে কোন গ্যাসে অণুর সংখ্যা একই হইবে।" অর্থাৎ, সম-অবস্থায় ১ ঘন সেণ্টিমিটার বাষ্প, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেন প্রভৃতি যে কোন গ্যাসীয় পদার্থে অণুর সংখ্যা একই হইবে (পরমাণুর সংখ্যা নয়)।

ইহাকেই **"অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প"** বলে। ইহার সত্যতা বহু রকমে পরীক্ষিত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাকে সূত্র না বলিয়া প্রকল্প বলা হয় কারণ প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্দিষ্ট আয়তনে গ্যাসের অণুর সংখ্যা গণনা

দ্বারা ইহা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া পরোক্ষে অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা ও বাস্তবতা নির্ধারিত হইয়াছে।

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত যেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সাহায্যে তাহার সহজ সমাধান হইয়াছে। যেমন :—

২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড = ১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তন ক্লোরিন।

অথবা, ২ ঘন সেণ্টি. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড = ১ ঘন সেণ্টি হাইড্রোজেন + ১ ঘন সেণ্টি ক্লোরিন।

অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প অনুসারে যদি প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার যে-কোন গ্যাসে x অণু থাকে, তাহা হইলে, ২x হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু = x হাইড্রোজেন অণু + x ক্লোরিন অণু অথবা, ১ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু = $\frac{1}{2}$ হাইড্রোজেন অণু + $\frac{1}{2}$ ক্লোরিন অণু।

পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু অণু অবিভাজ্য নয়। সুতরাং $\frac{1}{2}$ অণুর অস্তিত্ব সম্ভব। যদি হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন অণুতে যুগ্ম-সংখ্যক পরমাণু থাকে তাহা হইলে তাহাদের $\frac{1}{2}$ অণু হওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়। এইটিই অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের বিশেষত্ব। এইভাবে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প হইতে গ্যাসায়তন সূত্রেরও সমর্থন পাওয়া যায়।

চিত্রের সাহায্যে প্রকল্পটি আরও সহজে বুঝা যাইতে পারে। নিম্নের চিত্রের প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে যদি সম-আয়তন গ্যাস থাকে, অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প অনুসারে উহাতে সমান-সংখ্যক অণুও থাকিবে। এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন ক্লোরিন মিলিয়া দুই ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়। মনে কর,

○ —হাইড্রোজেন পরমাণু।

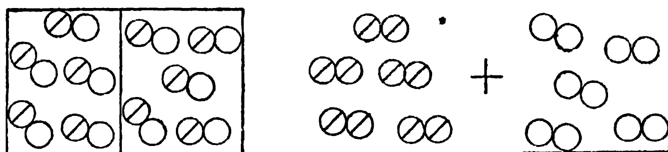
○○ —হাইড্রোজেন অণু।

⊘ —ক্লোরিনের পরমাণু।

⊘⊘ —ক্লোরিনের অণু।

○⊘ —হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু।

অতএব,

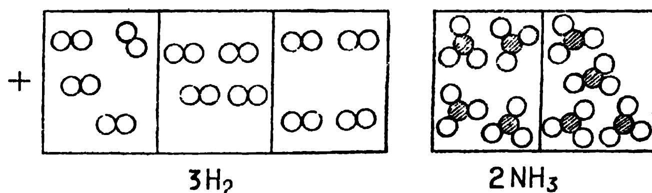


১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তন ক্লোরিন = ২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

সেই রকমেই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়ার উৎপত্তি প্রকাশ সম্ভব।

○ - H-পরমাণু   ○○ - H_2-অণু   - অ্যামোনিয়া অণু

● - N-পরমাণু   ●● - N_2-অণু



অতএব অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সাহায্যে বিক্রিয়াগুলি কিভাবে গ্যাসায়তন সূত্র অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই সকল গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়াতে বিক্রিয়কের আয়তন এবং যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইল তাহাদের আয়তন সমান নাও হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থেই সম-আয়তনে অণুর সংখ্যা সমান হইবে, পরমাণুর সংখ্যা সমান নাও হইতে পারে (অবশ্য চাপ ও উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে)।

৯·৪। অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প ও গ্যাসায়তন সূত্র : এই প্রকল্পটি হইতে অতি সহজেই গ্যাসায়তন সূত্রটি অনুমান করা সম্ভব। মনে কর 'ক' এবং 'খ' নামক দুইটি গ্যাসের, যথাক্রমে 'a' এবং 'b' সংখ্যক অণু মিলিত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। 'a' এবং 'b' অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা এবং এই সংখ্যাগুলি সাধারণতঃ ছোট। অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প

অনুযায়ী, যদি মনে করা যায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসে 'x' অণু বর্তমান, তাহা হইলে

'ক'-এর 'a' অণু 'খ'-এর 'b' অণুর সহিত যুক্ত হয়। অথবা, 'ক'-এর $\frac{a}{x}$ ঘন সেন্টিমিটার, 'খ'-এর $\frac{b}{x}$ ঘন সেন্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। অথবা, 'ক'-এর 'a' ঘন সেন্টিমিটার 'খ'-এর 'b' ঘন সেন্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। অর্থাৎ, 'ক' এবং 'খ' আয়তনের a : b অনুপাতে যুক্ত হয়।

a এবং b ছোট ছোট পূর্ণ সংখ্যা, সুতরাং a : b একটি সরল অনুপাত। অতএব, 'ক' এবং 'খ' আয়তনের সরল অনুপাতে মিলিত হইয়া থাকে। ইহাই **গ্যাসায়তন সূত্র।**

৯-৫। অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের প্রয়োগ : অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পটির প্রয়োগ দ্বারা কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। সেইগুলি আমরা এখানে আলোচনা করিব।

(১) হাইড্রোজেনের অণু দ্বি-পরমাণুক : ½ অণু হাইড্রোজেন এবং ½ অণু ক্লোরিন সংযোগে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু গঠিত, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (পৃ ৮৮)। অণুসকল পরমাণুর সমষ্টি। হাইড্রোজেন অণুতে একাধিক পরমাণু না থাকিলে ½ অণু সংযুক্ত হইতে পারে না, এবং যেহেতু পরমাণুগুলি অবিভাজ্য, সুতরাং হাইড্রোজেন অণুতে জোড়-সংখ্যক পরমাণু (২, ৪, ৬, ৮···) থাকিতেই হইবে, নতুবা অণুকে দুই ভাগ করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, হাইড্রোজেন অণুতে ন্যূনপক্ষে দুইটি পরমাণু থাকিবেই। এই একই কারণে ক্লোরিনের অণুতেও অন্ততঃ দুইটি পরমাণু থাকিবে।

অ্যাসিড মাত্রেই হাইড্রোজেন থাকে। অ্যাসিডের অণুর হাইড্রোজেনকে অন্যান্য ধাতুর পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপন (replacement) করা সম্ভব। যদি সোডিয়াম ধাতুর পরমাণু দ্বারা অ্যাসিডের অণুর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি প্রতিস্থাপিত হয়, তবে অ্যাসিডের অণুতে যতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, ততগুলি বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, উহা হইতে সোডিয়ামের সাহায্যে দুইটি নূতন পদার্থ (লবণ) পাওয়া যায়। সেই রকম ফসফরিক অ্যাসিডের

অণুতে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। উহা হইতে তিনটি পদার্থ পাওয়া সম্ভব।



$$H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4, Na_2SO_4,$$



$$H_3PO_4 \longrightarrow NaH_2PO_4, Na_2HPO_4, Na_3PO_4.$$

সেই রকম ভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেনকে সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপন করিলে কখনও একটির বেশী পদার্থ পাওয়া যায় না। অতএব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুতে একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু আছে মনে করা অযৌক্তিক নয়।

$\frac{1}{2}$ অণু হাইড্রোজেন হইতে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু পাওয়া যায়। আবার একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। অতএব, হাইড্রোজেনের $\frac{1}{2}$ অণু = ১টি পরমাণু,

১ অণু = ২টি পরমাণু।

সুতরাং, হাইড্রোজেন অণু দ্বি-পরমাণুক।

পদার্থবিদ্‌গণ হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক তাপ (Specific heat ratio, $\gamma = 1{\cdot}44$) নির্ণয় করিয়া এবং ভর-বর্ণালীর (Mass spectrograph) পরীক্ষার সাহায্যে হাইড্রোজেন অণুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

হাইড্রোজেনের মত অক্সিজেন অণুও দ্বি-পরমাণুক। কারণ, পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে—

এক ঘনায়তন অক্সিজেন এবং ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন সমন্বয়ে ২ ঘনায়তন বাষ্প উৎপন্ন হয়। যদি সমস্ত গ্যাসের এক ঘনায়তনে n অণু বর্তমান থাকে, তাহা হইলে

n অণু অক্সিজেন $+ 2n$ অণু হাইড্রোজেন $= 2n$ অণু বাষ্প

অথবা $\frac{1}{2}$ অণু অক্সিজেন + ১ অণু হাইড্রোজেন = ১ অণু বাষ্প।

অর্থাৎ বাষ্পের একটি অণুতে $\frac{1}{2}$ অণু অক্সিজেন বর্তমান। সুতরাং অক্সিজেন অণুতে অন্ততঃ পক্ষে দুইটি পরমাণু থাকা প্রয়োজন। আপেক্ষিক তাপ নাহির করিয়া অক্সিজেন অণুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থসমূহ প্রায়ই দ্বি-পরমাণুক; যেমন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, অক্সিজেন ইত্যাদি।

(২) পদার্থের আণবিক গুরুত্ব উহার গ্যাসীয় অবস্থার ঘনত্বের দ্বিগুণ।

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বলিতে সেই পদার্থের একটি অণু হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অপেক্ষা কতগুণ ভারী তাহা বুঝায় (পৃঃ ৮১)। সচরাচর পদার্থটি যে অবস্থাতেই থাকুক—কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়—উহার আণবিক গুরুত্ব একই হইবে।

কোন গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব বলিতে একই চাপে ও উষ্ণতায় উহার সম-আয়তন হাইড্রোজেন হইতে কতগুণ ভারী তাহাই বুঝা যায়। সুতরাং

$$\text{গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব} = \frac{a \text{ ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের ওজন}}{a \text{ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন}}$$

অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প অনুসারে a ঘন সেন্টিমিটার কোন গ্যাস ও হাইড্রোজেনে সম-অবস্থায় একই সংখ্যক অণু থাকিবে এবং সেই সংখ্যাটি যদি n হয় তাহা হইলে গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব

$$D = \frac{\text{গ্যাসের } n \text{ অণুর ওজন}}{\text{হাইড্রোজেনের } n \text{ অণুর ওজন}}$$

$$= \frac{\text{গ্যাসের একটি অণুর ওজন}}{\text{হাইড্রোজেনের একটি অণুর ওজন}}$$

$$= \frac{\text{গ্যাসের একটি অণুর ওজন}}{\text{হাইড্রোজেনের ২টি পরমাণুর ওজন}} \quad [\because \text{ হাইড্রোজেন অণু দ্বি-পরমাণুক}]$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\text{গ্যাসের একটি অণুর ওজন}}{\text{হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন}}$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব।}$$

অর্থাৎ, M যদি পদার্থের আণবিক গুরুত্ব হয়, তাহা হইলে $D = \frac{1}{2}M$

অথবা, $M = ২D$.

যেমন, কোহল তরল পদার্থ; বাষ্পীয় অবস্থায় উহার ঘনত্ব = ২৩। সুতরাং আণবিক গুরুত্ব = ২ × ২৩ = ৪৬।

(৩) নির্দিষ্ট উষ্ণতা এবং চাপে এক গ্রাম-অণু পরিমাণ যে কোন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় আয়তন একই হইবে। প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে সেই আয়তনের পরিমাণ প্রায় ২২.৪ লিটার।

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব যত, তত গ্রাম ওজনের পদার্থকে উহার গ্রাম-অণু বলা হয়। যেমন জলের আণবিক গুরুত্ব ১৮, অতএব এক গ্রাম-অণু জল বলিলে ১৮ গ্রাম জল বুঝাইবে।

(ক) পারমাণবিক গুরুত্বের পরিমাপে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর গুরুত্বকে মোটামুটি 'এক' ধরা হইয়াছে। হাইড্রোজেন অণুটি দ্বি-পরমাণুক, অর্থাৎ উহাতে দুইটি পরমাণু বর্তমান। সুতরাং

হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব = ২।

যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃত ওজন w গ্রাম হয়, তবে একটি হাইড্রোজেন অণুর ওজন = ২w গ্রাম।

অতএব, ১ গ্রাম-অণু হাইড্রোজেন অণুর সংখ্যা হইবে $= \frac{২ \text{ গ্রাম}}{২w \text{ গ্রাম}} = \frac{১}{w}$

(খ) অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঘনত্ব দেখা গিয়াছে = ৮·৫।

অতএব, অ্যামোনিয়ার আণবিক গুরুত্ব = ২ × ৮·৫ = ১৭।

অর্থাৎ, অ্যামোনিয়ার একটি অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৭ গুণ ভারী।

অতএব, অ্যামোনিয়ার একটি অণুর প্রকৃত ওজন = ১৭w গ্রাম।

এক গ্রাম-অণু অ্যামোনিয়াতে অণুর সংখ্যা হইবে $= \frac{১৭ \text{ গ্রাম}}{১৭w \text{ গ্রাম}} = \frac{১}{w}$।

(গ) কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব = ২২।

∴ কার্বন ডাই-অক্সাইডের আণবিক গুরুত্ব = ২ × ২২ = ৪৪।

অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ৪৪ গুণ ভারী।

∴ কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণুর ওজন = ৪৪w গ্রাম

অতএব, এক গ্রাম-অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডে অণুর সংখ্যা হইবে

$$= \frac{৪৪ \text{ গ্রাম}}{৪৪w \text{ গ্রাম}} = \frac{১}{w}।$$

দেখা যাইতেছে যে যে-কোন পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে, অণুর সংখ্যা একই হইবে। এক গ্রাম-অণুর ভিতরে যত সংখ্যক অণু আছে তাহাকে **অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা (Avogadro's number)** বলে। এই সংখ্যার পরিমাণ, ৬×১০^{২৩}।

যেহেতু যে কোন রকম পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে একই সংখ্যক অণু আছে, উহাদের আয়তনও অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প অনুযায়ী একই হইবে। অতএব, আমরা বলিতে পারি, নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে যে কোন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় এক গ্রাম-অণুর আয়তন একই হইবে।

(ক) এখন, হাইড্রোজেনের এক গ্রাম-অণু = ২ গ্রাম

হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব = ০০০০৯ গ্রাম (প্রতি ঘন.) সেণ্টিমিটার

∴ প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু হাইড্রোজেনের আয়তন

$$= \frac{২}{০০০০৯} \text{ ঘন সেণ্টিমিটার}$$

$$= ২২২২২ \text{ ঘন সেণ্টিমিটার}$$

$$= ২২.২ \text{ লিটার}$$

(খ) অ্যামোনিয়ার এক গ্রাম-অণু = ১৭ গ্রাম ; উহার ঘনত্ব = ৮.৫

অতএব, গ্রাম হিসাবে, অ্যামোনিয়ার প্রমাণ ঘনত্ব = ৮.৫ × ০০০০৯ গ্রাম

∴ প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু অ্যামোনিয়ার আয়তন

$$= \frac{১৭}{৮.৫ \times .০০০০৯} = \frac{২}{.০০০০৯} = ২২.২ \text{ লিটার}$$

(গ) জলের এক গ্রাম-অণু = ১৮ গ্রাম ; জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব = ৯

অতএব, গ্রাম হিসাবে বাষ্পের প্রমাণ ঘনত্ব = ৯ × ০০০০৯ গ্রাম

∴ প্রমাণ অবস্থায়, এক গ্রাম-অণু জলীয় বাষ্পের আয়তন

$$= \frac{১৮}{৯ \times .০০০০৯} = \frac{২}{০০০০৯} = ২২.২ \text{ লিটার}$$

প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এক গ্রাম-অণুর আয়তন হইবে ২২.২ লিটার।

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১ না ধরিয়া যদি অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া হিসাব করা যায়, তবে গ্রাম-অণুর আয়তন ২২.২ লিটারের পরিবর্তে ২২.৪ লিটার হইবে।

[হাইড্রোজেন = ১, অক্সিজেন = ১৫.৮৮,

$$\text{অক্সিজেন} = ১৬, \text{ হাইড্রোজেন} = \frac{১৬}{১৫.৮৮} = ১.০০৮$$

অতএব, গ্রাম-অণুর আয়তন $= \frac{২.০১৬}{.০০০০৯} =$ ২২.৪ লিটার]

সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে ২২.৪ লিটার আয়তনবিশিষ্ট যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের ওজন উহার এক গ্রাম-অণুর সমান, এবং সেই সংখ্যাটি পদার্থটির আণবিক গুরুত্ব হইবে। যেমন, প্রমাণ অবস্থায় ২২.৪ লিটার অক্সিজেনের ওজন ৩২ গ্রাম, অতএব এক গ্রাম-অণু অক্সিজেন = ৩২ গ্রাম, এবং অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব = ৩২।

(৪) বিভিন্ন গ্যাসের সংযোগে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, আয়তনের অনুপাত হইতে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সাহায্যে উহাদের সঙ্কেত নির্ণয় সম্ভব। দুই একটি উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

(ক) পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে—

এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন এবং তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন সংযুক্ত হইয়া দুই ঘনায়তন অ্যামোনিয়া হয়।

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে যদি 'n' সংখ্যক অণু থাকে, তাহা হইলে বলা যায় ২n অণু অ্যামোনিয়ার জন্য n অণু নাইট্রোজেন এবং ৩n অণু হাইড্রোজেন প্রয়োজন। অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার ১টি অণু = $\frac{১}{২}$ অণু নাইট্রোজেন এবং $\frac{৩}{২}$ অণু হাইড্রোজেন।

∴ ১টি অ্যামোনিয়া অণু = ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু + ৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু (কারণ, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উভয়েই দ্বি-পরমাণুক)

অতএব, অ্যামোনিয়ার সঙ্কেত, NH_3।

(খ) পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে

২ ঘনায়তন বাষ্প উৎপাদনে ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং ১ ঘনায়তন অক্সিজেন প্রয়োজন।

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে যদি p সংখ্যক অণু থাকে, তাহা হইলে,

২p বাষ্পীয় অণু = ২p হাইড্রোজেন অণু + p অক্সিজেন অণু।

অর্থাৎ ১টি বাষ্পীয় অণু = ১টি হাইড্রোজেন অণু + ½ অক্সিজেন অণু
২টি হাইড্রোজেন পরমাণু + ১টি অক্সিজেন পরমাণু।

∴ জলীয় বাষ্পের সঙ্কেত হইবে, H_2O।

(৫) পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ঃ

অ্যাভোগাড্রো-প্রকল্পের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির করাও সম্ভব।

মৌলিক পদার্থগুলি একই রকম পরমাণুসমন্বয়ে গঠিত এবং এই পরমাণুগুলি অবিভাজ্য। সুতরাং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে যখন যৌগিক পদার্থ রচিত হয় তখন কোন মৌলিক পদার্থেরই একটির চেয়ে কম পরমাণু উহাতে থাকিতে পারে না। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ক্যানিজারো মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির করেন। ইহার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রয়োজন।

(ক) যে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব জানা প্রয়োজন, উহার কতকগুলি যৌগিক পদার্থ লইতে হইবে। এই যৌগিক পদার্থগুলি গ্যাস অথবা উদ্বায়ী বস্তু হওয়া চাই। প্রত্যেকটি পদার্থের গ্যাসীয় ঘনত্ব বাহির করিয়া উহা হইতে পদার্থগুলির আণবিক গুরুত্ব বা গ্রাম-অণু নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) ঐ সকল যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের গ্রাম-অণু পরিমাণ বস্তুতে সেই মৌলিক পদার্থের কতটা আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

যদি বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থ এইভাবে পরীক্ষা করা যায় তবে অন্ততঃ একটি পদার্থ পাওয়া যাইবে যাহার অণুতে সেই মৌলিক পদার্থের একটি মাত্র পরমাণু বর্তমান। এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে সেই মৌলিক পদার্থের যে নিম্নতম পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহাকেই উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বলা হয়। কারণ, উহার চেয়ে কম পরিমাণ অংশ কোন যৌগিক পদার্থে থাকে না, এবং একটির চেয়ে কম সংখ্যক পরমাণুও কোন যৌগিক পদার্থে থাকিতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব-নির্ণয় দেখা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে।

কার্বনের উদ্বায়ী যৌগিক পদার্থ	ঘনত্ব	আণবিক গুরুত্ব	পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে যে পরিমাণ কার্বন আছে
কার্বন মনোক্সাইড	১৪	২৮	১২
কার্বন ডাই-অক্সাইড	২২	৪৪	১২
মিথেন	৮	১৬	১২
ইথেন	১৫	৩০	২৪
অ্যাসিটিলিন	১৩	২৬	২৪
বেনজিন	৩৯	৭৮	৭২
ইথার	৩৭	৭৪	৪৮

অতএব দেখা যায়, কার্বনের যে কোন যৌগিক পদার্থের আণবিক গুরুত্বে ১২ ভাগ অথবা উহার কোন সরল গুণাঙ্ক ভাগ কার্বন থাকে। এমন কোনও কার্বনের যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায় না যাহার এক গ্রাম-অণুতে ১২ ভাগের চেয়ে কম কার্বন আছে। কোনও যৌগিক পদার্থে একটি পরমাণুর চেয়ে কম কার্বন থাকিতে পারে না। অতএব কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১২ হইবে।

* * * * *

৯-৬। **গ্রেহামের গ্যাস-ব্যাপন সূত্র (Graham's Law of Gaseous Diffusion) :** গ্যাসীয় পদার্থের আর একটি সাধারণ ধর্মের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একাধিক গ্যাস একত্রিত হইলে উহারা সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায় এবং মিশ্রণটি সমসত্ত্ব হইয়া থাকে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সমসত্ত্ব মিশ্রণ। বস্তুতঃ, সমস্ত গ্যাসীয় মিশ্রণই সমসত্ত্ব। এই ঘরের এক কোণে যদি একটু ক্লোরিন গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়, অল্পক্ষণের ভিতরেই উহা ঘরের বাতাসের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিয়া যাইবে এবং ঘরের সর্বত্র ক্লোরিনের অনুপাত একই দেখা যাইবে। ইহাকে গ্যাসের **ব্যাপন** বা **ব্যাপ্তি** (**Diffusion**) বলা হয়। ব্যাপন গ্যাস মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম।

আবার, অনেক সময় দেখা যায়, পাত্রের ভিতর কোন গ্যাস বন্ধ করিয়া রাখিলে, উহা পাত্রটির প্রাচীরের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। যেমন, একটি রবারের বেলুনে হাইড্রোজেন রাখিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে উহা হইতে হাইড্রোজেন প্রায় বাহির হইয়া গিয়াছে। যে পাত্রে গ্যাস রাখা হয় তাহার প্রাচীর কঠিন পদার্থে তৈয়ারী। পদার্থ-মাত্রেই **সচ্ছিদ্রতা** (**Porosity**) বর্তমান। প্রাচীরের মধ্যে অণুগুলি ঠিক গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে, উহাদের মধ্যে **ব্যবধান** বা **অবকাশ** (**intermolecular space**) আছে। এই অবকাশের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে গ্যাসের অণুগুলি চলাচল করিতে পারে। সমস্ত পদার্থের সচ্ছিদ্রতা এক রকম নয়, সুতরাং সকল রকম প্রাচীরের ভিতর দিয়া গ্যাসের এক রকমভাবে যাতায়াত সম্ভব নয়। বেলুন হইতে খুব সহজে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে বটে, কিন্তু একটি তামার বাল্‌বের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া রাখিলে তাহা আদৌ বাহির হইবে না।

যে কোন একটি নির্দিষ্ট সচ্ছিদ্র প্রাচীরের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে যতটুকু গ্যাস নির্গত হয় তাহাকে সেই গ্যাসের **ব্যাপন-বেগ** (**velocity of diffusion**) বলা যাইতে পারে। যদি t সেকেণ্ডে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভিতর দিয়া v ঘন সেণ্টিমিটার একটি গ্যাস বাহিরে আসে, তাহা হইলে প্রতি সেকেণ্ডে সেই গ্যাসের ব্যাপন-বেগ হইবে $=\frac{v}{t}$ ঘন সেণ্টিমিটার। বলা বাহুল্য, গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতার উপর এই বেগ নির্ভর করে। গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতা যত বৃদ্ধি পাইবে, ব্যাপন-বেগও তত বেশী হইবে।

আবার, একই উষ্ণতা ও চাপে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভিতর দিয়া বিভিন্ন গ্যাস প্রতি সেকেণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে নির্গত হয়। গ্যাসের ঘনত্বের উপর উহার ব্যাপন-বেগ নির্ভর করে। যে গ্যাস যত বেশী ভারী, উহার ব্যাপন-বেগ তত কম। গ্রেহাম প্রথমে পরীক্ষার সাহায্যে ইহা প্রমাণ করেন এবং এই বিষয়ে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। **"নির্দিষ্ট চাপ এবং উষ্ণতায় কোন গ্যাসের ব্যাপন-বেগ উহার ঘনত্বের বর্গমূলের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।"** ইহাই গ্রেহামের গ্যাস-ব্যাপন সূত্র।

গ্যাসের ঘনত্ব যদি d হয় এবং ব্যাপন-বেগ R হয়,

তবে $R \propto \frac{1}{\sqrt{d}}$.

অথবা $R = \frac{k}{\sqrt{d}}$ [k, নিত্য সংখ্যা]

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে একই প্রাচীরের ভিতর দিয়া দুইটি গ্যাসের ব্যাপন-বেগ বিচার করিলে,

$$R_1 = \frac{k}{\sqrt{d_1}}; \qquad R_2 = \frac{k}{\sqrt{d_2}}.$$

অথবা $\frac{R_1}{R_2} = \frac{\sqrt{d_2}}{\sqrt{d_1}}.$

যেহেতু আণবিক গুরুত্ব ঘনত্বের দ্বিগুণ, পদার্থ দুইটির আণবিক গুরুত্ব যদি M_1 এবং M_2 হয়, তাহা হইলে

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}} = \sqrt{\frac{M_2/2}{M_1/2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}.$$

আণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ঃ পরীক্ষা দ্বারা যদি ব্যাপন-বেগ R_1 এবং R_2 স্থির করা যায় এবং একটি গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব (M_1) যদি জানা থাকে, তাহা হইলে এই সমীকরণের সাহায্যে অপর গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব খুব সহজেই বাহির করা যায়।

দুইটি গ্যাসের একই আয়তন পরিমাণ গ্যাস (V ঘন সেন্টিমিটার) যদি একই নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভিতর দিয়া একই অবস্থায় বাহির হইয়া আসিতে t_1 এবং t_2 সেকেণ্ড সময় লাগে—তাহা হইলে উহাদের ব্যাপন গতি হইবে

$$R_1 = \frac{V}{t_1};\ R_2 = \frac{V}{t_2} \qquad \text{এবং} \quad \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

$$\text{অথবা,} \quad \frac{V/t_1}{V/t_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \qquad \text{অথবা,} \quad \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

উদাহরণ। **একই আয়তন-পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস একটি সচ্ছিদ্র প্রাচীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে যথাক্রমে ১৬ সেকেণ্ড এবং ৬৪ সেকেণ্ড সময় লাগে। অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব কত হইবে ?**

মনে কর, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের আয়তন ছিল ত ঘন সেন্টিমিটার।

অতএব, হাইড্রোজেনের ব্যাপন-বেগ $= \frac{v}{১৬} = \frac{k}{\sqrt{D_H}}$

এবং অক্সিজেনের ব্যাপন-বেগ $= \frac{v}{৬৪} = \frac{k}{\sqrt{D_O}}$

[D_H এবং D_O হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের ঘনত্ব]

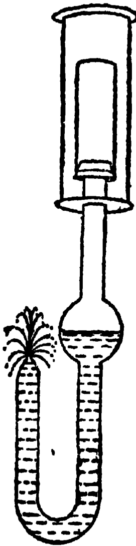
$$\text{অথবা, } \frac{৬৪}{১৬}=\frac{\sqrt{D_O}}{\sqrt{D_H}}$$

$$\text{অর্থাৎ } \sqrt{D_O}=\frac{৬৪}{১৬}\times\sqrt{D_H}=৪\times১=৪$$

$$\therefore D_O=১৬\text{ ; অক্সিজেনের ঘনত্ব}=১৬$$

অতএব অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব $=২\times১৬=৩২$।

গ্যাসের ব্যাপন-বেগ যে উহার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে তাহা খুব একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব।


গ্যাস-ব্যাপন

পরীক্ষা ঃ মাটির অথবা প্রলেপ-বিহীন পর্সেলীনের একটি বীকার লইয়া উহার মুখটি একটি রবারের কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া দাও। উহাকে এখন উল্টাইয়া রাখিয়া রবার-কর্কের ভিতর দিয়া একটি U-নলের বাহু সংযুক্ত করিয়া লও। U-নলের অপর বাহুটি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া প্রয়োজন (পার্শ্ববর্তী চিত্র)। U-নলের ভিতর খানিকটা রঙীন জল ভরিয়া রাখ। এখন, বীকারটির ঠিক চারিদিকে আর একটি বড় পাত্র রাখিয়া উহার ভিতর হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দাও। দেখা যাইবে, U-নলের ভিতর হইতে রঙীন জল বাহির হইয়া আসিতেছে। কারণ পর্সেলীনের বীকারের ভিতর বায়ু আছে এবং বাহিরে হাইড্রোজেন আছে। হাইড্রোজেন অনেক লঘু বলিয়া অতি সহজে ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু বাতাস ঘনতর বলিয়া অত সহজে বাহিরে আসিতে পারে না। ফলে, ভিতরে গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। চাপ-বৃদ্ধির ফলে U-নলের জল বাহির হইয়া আসে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে গ্যাসের ঘনত্ব বেশী হইলে ব্যাপন-বেগ কম হইবে।

অনুশীলনী

১। গ্রেহামের ব্যাপন-বেগ সূত্রটি কি? উহা প্রমাণ করিতে কি পরীক্ষা করা যাইতে পারে? একটি সচ্ছিদ্র পাত্র হইতে ৩০০ ঘন সেণ্টিমিটার অক্সিজেন যদি ৫০ সেকেণ্ডে বাহিরে যায়, ৫০০ ঘন সেণ্টিমিটার ক্লোরিন কতক্ষণে বাহির হইতে পারিবে?

২। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোনের ব্যাপন-বেগের অনুপাত ·২৯ : ·২৭১। ওজোনের ঘনত্ব কত হইবে? কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব $=২২$।

৩। ২৪ ঘন সেন্টিমিটার বাতাস একটি প্রাচীরের ভিতর দিয়া আসিতে ১৮ সেকেণ্ড সময় লাগে। ২১ ঘন সেন্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড সেই প্রাচীরের ভিতর দিয়া আসিতে ১৯.৫ সেকেণ্ড সময় নেয়। বাতাসের ঘনত্ব যদি ১৪.৪ হয় তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আণবিক গুরুত্ব কত হইবে ?

৪। আয়তনের শতকরা ২০ ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত 'ওজোন' ১৭৫ সেকেণ্ডে একটি পাত্র হইতে বাহিরে আসে। সেই একই আয়তনের অক্সিজেনের সময় লাগে মাত্র ১৬৮ সেকেণ্ড। ওজোনের ঘনত্ব নির্ণয় কর।

দশম অধ্যায়

যোজ্যতা ও যোজনভার

১০-১। যোজ্যতা (Valency)ঃ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয়। যে কোন যৌগিক পদার্থের অণুতে উহার বিভিন্ন পরমাণুর সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট। দুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা একটি সালফিউরিক অ্যাসিডের অণু রচিত হয়। এই সংখ্যাগুলির ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের যে সকল পরমাণু অপর একটি মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত পৃথকভাবে যুক্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা এক নয়। যেমন, হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি সকলেই অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। কিন্তু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে ঐ সকল মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণু যুক্ত হয়। যথা :—

	সঙ্কেত	একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলিত অপর পরমাণু-সংখ্যা
১। জল	H_2O	২
২। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	MgO	১
৩। কার্বন ডাই-অক্সাইড	CO_2	১/২
৪। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড	P_2O_5	২/৫

অতএব দেখা যায়, ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন, কার্বন ইত্যাদির পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইতে পারে। কেবলমাত্র অক্সিজেনের সঙ্গে নয়, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সংযোগকালেও একই অবস্থার উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক মিলনেও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন সংখ্যাতে যুক্ত হইবে। যথা—

	সঙ্কেত	বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর-সংখ্যা
১। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl	১
২। জল	H_2O	২
৩। অ্যামোনিয়া	NH_3	৩
৪। মিথেন	CH_4	৪

ক্লোরিনের একটি পরমাণু একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, কিন্তু একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন। মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের এই ক্ষমতাকে সাধারণতঃ উহাদের **'যোজন-ক্ষমতা'** বা **'যোজ্যতা' (valency)** বলা হয়।

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একাধিক অন্য কোন পরমাণু যুক্ত হইয়াছে এমন কোন যৌগিক পদার্থ দেখা যায় না।* অর্থাৎ, অন্য কোন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত একটির চেয়ে কম হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হইতে পারে না। এই কারণেই মৌলিক পদার্থগুলির যোজ্যতা হাইড্রোজেনের ভিত্তিতে স্থির করা হয়। মৌলিক পদার্থটির একটি পরমাণুর সহিত যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়, তাহাকেই ইহার যোজ্যতা ধরা হয়। জলের অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। সুতরাং, অক্সিজেনের যোজ্যতা দুই অথবা **অক্সিজেন দ্বিযোজী**। একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমন্বয়ে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি করে, অতএব নাইট্রোজেনের যোজ্যতা তিন, বা **নাইট্রোজেন ত্রিযোজী**। কোন মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা বলিতে একটি

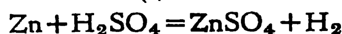
* N_3H—হাইড্রাজয়িক অ্যাসিড একমাত্র ব্যতিক্রম।

রাশি বা সংখ্যা বুঝায় এবং সেই সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু উহার একটি পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের সৃজন করে।

আরগন, হিলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থ অন্য কোন পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে না। ইহাদের কোন যোজন-ক্ষমতা নাই; অর্থাৎ, ইহারা **শূন্যযোজী**। অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলির যোজ্যতা এক হইতে আট পর্যন্ত হইতে পারে। যেমন :—

একযোজী—হাইড্রোজেন, ক্লোরিন।
দ্বিযোজী—ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন।
ত্রিযোজী—নাইট্রোজেন, বোরন, অ্যালুমিনিয়াম।
চতুর্যোজী—কার্বন, সিলিকন।
পঞ্চযোজী—ফসফরাস, আর্সেনিক।
ষড়্‌যোজী—ক্রোমিয়াম, সেলিনিয়াম;
সপ্তযোজী—ম্যাঙ্গানিজ।
অষ্টযোজী—অসমিয়াম।

কোন কোন মৌলিক পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, যেমন জিঙ্ক, কপার ইত্যাদি। ইহাদের যোজ্যতা অন্য কোন যৌগিক পদার্থ হইতে ইহারা যতটা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করিতে পারে তদ্দ্বারা নিরূপিত হয়। যেমন সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে জিঙ্কের একটি পরমাণু অ্যাসিড হইতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে। অতএব জিঙ্কের যোজ্যতা দুই অর্থাৎ জিঙ্ক দ্বিযোজী।



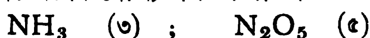
$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

এমন মৌলিক পদার্থও আছে যাহাদের হাইড্রোজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব নয় এবং কোন যৌগিক পদার্থ হইতে হাইড্রোজেনকে উহারা প্রতিস্থাপন করিতেও সক্ষম নয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইহাদের যোজ্যতা অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে নিরূপণ করা হয়। গোল্ড (স্বর্ণ, Au) সোজাসুজি হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় না। কিন্তু উহার একটি পরমাণু তিনটি ক্লোরিন পরমাণুর সহিত মিলিয়া গোল্ড ক্লোরাইড ($AuCl_3$) সৃষ্টি করে। ক্লোরিনের যোজ্যতা এক; অতএব, তিনটি ক্লোরিন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পারে। অতএব, গোল্ডের যদি হাইড্রোজেনের সহিত মিলন সম্ভব হইত, তবে উহার একটি

পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইত। সুতরাং গোল্ডের যোজ্যতা তিন অর্থাৎ স্বর্ণ ত্রিযোজী।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্লোরিন প্রভৃতি বহু মৌলিক পদার্থেরই যোজ্যতা নির্দিষ্ট, কিন্তু আবার এমন অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যাহাদের একাধিক যোজ্যতা বা যোজন-ক্ষমতা থাকিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন, কপার ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের যোজ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ ইহাদের যোজনক্ষমতা পরিবর্তনশীল (variable valency)। যেমন :—

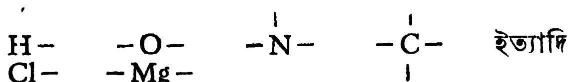
নাইট্রোজেনের যোজ্যতা তিন বা পাঁচ উভয়ই হইতে পারে :—


NH_3 (৩) ; N_2O_5 (৫)

আবার, লৌহের যোজ্যতা দুই বা তিন হওয়া সম্ভব : -


$FeCl_2$ (২) ; $FeCl_3$ (৩)

১০-২। সংযুতি-সঙ্কেত (Structural formula) : সহজে বুঝিবার জন্য মৌলিক পদার্থের যোজ্যতাকে সাধারণতঃ পরমাণুর পাশে ছোট ছোট লাইন বা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যাহার যত যোজ্যতা, সেই পরমাণুর পাশে ততটা রেখা থাকিবে। এই রেখাগুলিকে আমরা উহার **যোজক** বা **বাহু (Bonds)** বলিতে পারি। যেমন :—



(বস্তুতঃ পরমাণুগুলির কোন বাহু থাকিতে পারে না, ইহা আমাদের কল্পনা মাত্র)।

রাসায়নিক মিলনের সময় পরস্পরের এই বাহুগুলি সম্মিলিত হয় এবং এই মিলনের সময় উহারা দুইটি নিয়ম মানিয়া থাকে।

(ক) কোন পরমাণুর একটি বাহু অপর কোন পরমাণুর একটি মাত্র বাহুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। একটি বাহুর সঙ্গে অন্য পরমাণুর একাধিক বাহু মিলিত হওয়া সম্ভব নহে।

(খ) যৌগিক অণুর গঠনকালে, উহার সমস্ত পরমাণুর সকল বাহুকেই পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে। কোন পরমাণুর কোন বাহুই সাধারণতঃ মুক্ত অবস্থায় (free state) থাকিতে পারিবে না।

যেমন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ কালে যদি একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত থাকে, তাহা হইলে অক্সিজেনের একটি বাহু মুক্ত থাকিবে। ইহা সম্ভব নয়।

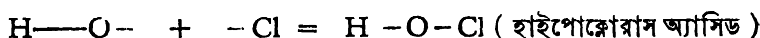


$$H- \;+\; -O- \;=\; H—O-$$

অক্সিজেনের অপর বাহুটি অন্য পরমাণুর একটি বাহু দ্বারা যুক্ত হইতে হইবে। যদি আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণু আসিয়া ইহাকে পূর্ণ করে, তবে জলের অণু গঠিত হইবে। অথবা যদি ক্লোরিনের একটি পরমাণু দ্বারা উহা যুক্ত হয় তবে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড হইবে।



$$H—O- \;+\; -H \;=\; H-O-H$$ (জল)



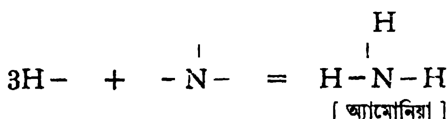
$$H—O- \;+\; -Cl \;=\; H-O-Cl$$ (হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড)

এইভাবে বিভিন্ন বস্তুর অণুর গঠন প্রকাশ করা সম্ভব।



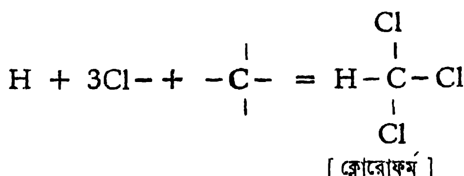
$$H- \;+\; -Cl \;=\; H-Cl$$

[হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড]



$$3H- \;+\; -\overset{|}{N}- \;=\; H-\overset{\overset{H}{|}}{N}-H$$

[অ্যামোনিয়া]



$$H \;+\; 3Cl- + -\underset{|}{\overset{|}{C}}- \;=\; H-\underset{\underset{Cl}{|}}{\overset{\overset{Cl}{|}}{C}}-Cl$$

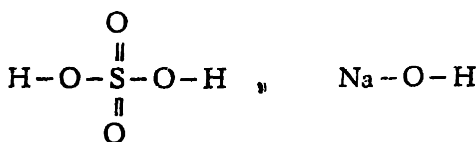
[ক্লোরোফর্ম]



$$Mg< \;+\; >O \;=\; Mg=O$$

[ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড]

যোজ্যতার সাহায্যে অণুর সঙ্কেত এই রকম ভাবে প্রকাশ করিলে উহার আভ্যন্তরিক গঠন জানা সম্ভব। এই রকম সঙ্কেতকে **সংযুতি-সঙ্কেত** (**Structural formulae**) বলা হয়। যেমন :—

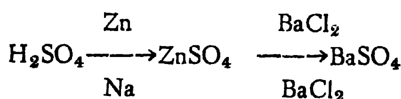


$$H-O-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{\overset{O}{\|}}{S}}-O-H \quad , \quad Na-O-H$$

সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড

হাইড্রোজেন একযোজী, উহার একটি যোজক বা বাহু আছে। অন্য যে কোন পরমাণুর এক বা একাধিক বাহু থাকে। কোন একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হওয়ার সময় উহার যতটা যোজক উহা ততটা হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণ করিবে এবং এই হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাদ্বারা সেই মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা স্থির হইবে। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণু অবিভাজ্য, যত হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হইবে তাহা একটি পূর্ণ সংখ্যা হইতেই হইবে। অতএব কোন মৌলিক পদার্থের যোজ্যতাই ১, ২, ৩, ৪……ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া হইতে পারে না।

১০-৩। যৌগমূলক (Radical) ঃ অনেক সময় দেখা যায় যৌগিক পদার্থের অণুর ভিতর কতকগুলি পরমাণু একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই যৌগিক পদার্থটি যখন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে অন্য কোন পদার্থে পরিণত হয় তখন সেই দলবদ্ধ পরমাণুপুঞ্জ অবিকৃত অবস্থায় নূতন পদার্থের অণুতে আসিয়া স্থান লয়। যেমন,



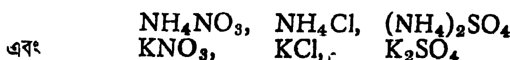
$$H_2SO_4 \xrightarrow[Na]{Zn} ZnSO_4 \xrightarrow[BaCl_2]{BaCl_2} BaSO_4$$

অথবা, $H_2CO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 \longrightarrow BaCO_3$ ইত্যাদি।

এই সকল পদার্থে SO_4 বা CO_3 এই পরমাণুগোষ্ঠী একটি অণু হইতে অপর অণুতে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলিয়া যায়।

NH_4Cl, NH_4Br, NH_4NO_3, NH_4NO_2, $(NH_4)_2SO_4$ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ এবং স্বভাবতঃই উহাদের অণুগুলিও বিভিন্ন হইবে, কিন্তু প্রতিটি অণুতেই 'NH_4' এই পরমাণুদল বর্তমান।

SO_4, CO_3, NH_4 ইত্যাদি এই সকল পরমাণু-সমবায়ের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ইহারা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মত ব্যবহার করে। যেমন,



$$NH_4NO_3,\quad NH_4Cl,\quad (NH_4)_2SO_4$$

এবং $$KNO_3,\quad KCl,\quad K_2SO_4$$

এই রকম পরমাণুদলকে **"যৌগিক মূলক" (Radical)** বা যৌগ-মূলক বলা হয়। দেখা যাইতেছে 'SO_4' যৌগমূলক দুইটি হাইড্রোজেনের

সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে (H_2SO_4)। তাহা হইলে 'SO_4' মূলকের যোজ্যতা দুই। প্রত্যেক মূলকেরই পরমাণুর মত যোজ্যতা আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

নাম	মূলক	যোজ্যতা	নাম	মূলক	যোজ্যত
অ্যামোনিয়াম	NH_4	১	ফসফেট	PO_4	৩
কার্বনেট	CO_3	২	নাইট্রাইট	NO_2	১
নাইট্রেট	NO_3	১	হাইড্রক্সিল	OH	১
সালফেট	SO_4	২	বোরেট	BO_3	৩

১০-৪। যোজ্যতা ও সঙ্কেত: যৌগিক পদার্থের অণুতে বিভিন্ন পরমাণু কি কি সংখ্যায় থাকিবে তাহা উহাদের যোজ্যতার উপর নির্ভর করে। যোজ্যতা জানা থাকিলে দুইরকম বিভিন্ন পরমাণু কি অনুপাতে যুক্ত হইবে তাহা সহজেই বাহির করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, পরমাণুগুলির সংযুক্তির সময় উহাদের সমস্ত যোজকগুলিই সম্মিলিত হইতে হইবে। মনে কর, 'ক' মৌলের n_1-সংখ্যক পরমাণু, 'খ' মৌলের n_2-সংখ্যক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবে।

'ক'এর পরমাণুর যোজ্যতা s_1, 'খ'এর পরমাণুর যোজ্যতা s_2।

∴ 'ক'এর পরমাণুর মোট যোজ্যতা $= n_1 \times s_1$

'খ'এর পরমাণুর মোট যোজ্যতা $= n_2 \times s_2$

যেহেতু, উভয়ের সমস্ত যোজ্যতা পরস্পর যুক্ত হইবে

$$\therefore \quad n_1 s_1 = n_2 s_2$$

অথবা, $$\frac{n_1}{n_2} = \frac{s_2}{s_1}$$

অর্থাৎ যৌগের ভিতর পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত উহাদের যোজ্যতার বিপরীত অনুপাতে হইবে।

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন আছে। উহাদের যোজ্যতা, Al=৩, O=২, অতএব অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইডএর সঙ্কেত হইবে Al_2O_3.

সালফেট (SO_4) মূলকের যোজ্যতা ২, ক্রোমিয়ামের যোজ্যতা ৩, সুতরাং ক্রোমিয়াম সালফেটের সঙ্কেত $Cr_2(SO_4)_3$।

নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল:

নাম	যোজ্যতা	সঙ্কেত
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	Ca=২, Cl=১	$CaCl_2$
পটাসিয়াম আয়োডাইড	K=১, I=১	KI

নাম	যোজ্যতা	সঙ্কেত
কপার নাইট্রেট	Cu=২, NO_3=১	$Cu(NO_3)_2$
জিঙ্ক ফসফেট	Zn=২, PO_4=৩	$Zn_3(PO_4)_2$
অ্যামোনিয়াম কার্বনেট	NH_4=১, CO_3=২	$(NH_4)_2CO_3$
বেরিয়াম কার্বনেট	Ba=২, CO_3=২	$BaCO_3$ *
মারকিউরিক অক্সাইড	Hg=২, O=২	HgO *

১০-৫। যোজনভার বা তুল্যাঙ্কভার (Combining weight or Equivalent weight) :

বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে এক ভাগ ওজন হাইড্রোজেনের সঙ্গে

৩ ভাগ ওজন কার্বন,
৮ ভাগ ওজন অক্সিজেন,
১৬ ভাগ ওজন সালফার,
২০ ভাগ ওজন ক্যালসিয়াম,
২৩ ভাগ ওজন সোডিয়াম,
৩৫ ৫ ভাগ ওজন ক্লোরিন,
অথবা ৮০ ভাগ ওজন ব্রোমিন ইত্যাদি মিলিত হয়।

এই সকল মৌলিক পদার্থ যখন নিজেদের ভিতর সংযোগ সাধন করিবে তখনও উপরোক্ত ওজনের অনুপাতে তাহারা মিলিত হইবে। অর্থাৎ, ওজনের হিসাবে ৩ ভাগ কার্বন ৩৫˙৫ ভাগ ক্লোরিনের সহিত যুক্ত হইবে। বস্তুতঃ কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে (CCl_4) কার্বন এবং ক্লোরিনের ওজনের অনুপাত ৩ : ৩৫˙৫।

অথবা, ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম ৮০ ভাগ ব্রোমিনের সঙ্গে যুক্ত হইবে। ক্যালসিয়াম ব্রোমাইডে ($CaBr_2$) উহারা ঠিক এই অনুপাতেই থাকে।

ওজন হিসাবে ৩৫˙৫ ভাগ ক্লোরিন বাস্তবিক পক্ষে ৩ ভাগ কার্বন, ৮ ভাগ অক্সিজেন, ১৬ ভাগ সালফার, ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম অথবা ২৩ ভাগ সোডিয়ামের সঙ্গেই যুক্ত হয়।

মৌলিক পদার্থগুলির প্রত্যেকেই ঐ সকল ওজনে এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, ২৩ ভাগ ওজনের সোডিয়াম, ৩ ভাগ ওজনের কার্বন, বা ৮০ ভাগ ওজনের ব্রোমিন ইত্যাদির যোজন-ক্ষমতা সমতুল্য। এই কারণে মৌলিক পদার্থের এই

* যোজ্যতার সরল অনুপাত ব্যবহার্য।

সংখ্যাগুলিকে **যোজনভার (Combining weight)** অথবা **তুল্যাঙ্কভার (Equivalent weight)** বলা হয়।

কোন মৌলিক পদার্থের যত পরিমাণ ওজন একভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় উহাকে সেই মৌলিক পদার্থের যোজনভার বা তুল্যাঙ্কভার বলা যাইতে পারে।

আমরা দেখি, ১ গ্রাম হাইড্রোজেন ৮ গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়, অথবা ১ পাউণ্ড হাইড্রোজেন ৩ পাউণ্ড কার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়। অক্সিজেন ও কার্বনের যোজনভার যথাক্রমে ৮ এবং ৩।

যদি গ্রাম বা পাউণ্ড ইত্যাদিতে না লইয়া হাইড্রোজেনের ওজনকে উহার পারমাণবিক গুরুত্বে (H=১) প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে অক্সিজেন ও কার্বনের যোজনভারও সেই ৮ এবং ৩ হইবে। পারমাণবিক গুরুত্বের ভিত্তিতে যোজনভার বা তুল্যাঙ্কভার প্রকাশ করিলে উহাকে **তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব** বলাই সমীচীন। এই তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব (Equivalent or Equivalent weight) একটি সংখ্যা মাত্র, উহার কোন একক থাকিতে পারে না। এই তুল্যাঙ্ক গুরুত্বকে সাধারণতঃ **রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক** অথবা কেবলমাত্র **'তুল্যাঙ্ক'** বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

আয়োডিনের তুল্যাঙ্ক ১২৭ অর্থাৎ ১২৭ ভাগ ওজনের আয়োডিন এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, ওজনের যে কোন এককই ধরা হউক না কেন।

যখন মৌলিক পদার্থটি সোজাসুজি হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন উহার যত পরিমাণ ওজন কোন যৌগিক পদার্থ হইতে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে তদ্দ্বারা উহার তুল্যাঙ্ক নিরূপিত হয়। যেমন, ১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে ১ গ্রাম হাইড্রোজেন বহিষ্কৃত করে, অতএব ম্যাগনেসিয়াম তুল্যাঙ্ক=১২।

হাইড্রোজেনের বদলে অক্সিজেনের ভিত্তিতে তুল্যাঙ্ক নিরূপণ বর্তমান প্রথা। মৌলিক পদার্থটির যত পরিমাণ ওজন ৮ ভাগ ওজন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়, উহাই সেই মৌলিক পদার্থটির তুল্যাঙ্ক।

অথবা, কোন মৌলিক পদার্থের যে পরিমাণ ওজন অন্য একটি মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক-ভার ওজনের সহিত যুক্ত হয়, উহাকে তাহার তুল্যাঙ্ক বলা

যাইতে পারে। যেমন, ক্লোরিনের তুল্যাঙ্ক ৩৫·৫। দেখা গিয়াছে ৩৫·৫ গ্রাম ক্লোরিনের সঙ্গে ১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হয়; সুতরাং ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক=১২।

১০-৬। তুল্যাঙ্ক-অনুপাত সূত্র (Law of Equivalent Proportions) : আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি দুইটি মৌলিক পদার্থ সর্বদাই তাহাদের তুল্যাঙ্কের অনুপাতে যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, ৮ গ্রাম অক্সিজেন ও ১ গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হয়; ৮ এবং ১ যথাক্রমে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের তুল্যাঙ্ক।

যখন দুইটি মৌলিক পদার্থ একাধিক যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে তখন উহারা উহাদের তুল্যাঙ্কের কোন সরল গুণিতকের অনুপাতে মিলিত হয়। যেমন, সোডিয়াম (তুল্যাঙ্ক ২৩) এবং অক্সিজেন (তুল্যাঙ্ক ৮) দুইটি যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে—সোডিয়াম মনোক্সাইড (Na_2O) এবং সোডিয়াম পারঅক্সাইড (Na_2O_2)।


Na : O

সোডিয়াম মনোক্সাইডে উহাদের ওজনের অনুপাত=২৩ : ৮

সোডিয়াম পারঅক্সাইডে উহাদের ওজনের অনুপাত=২৩ : ১৬

অতএব, "মৌলিক পদার্থগুলি সংযোগকালে উহাদের নিজ নিজ তুল্যাঙ্ক বা তুল্যাঙ্কের কোন সরল গুণিতকের অনুপাতে মিলিত হয়।" ইহাই **তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র।**

যেহেতু ২৩ এবং ৮ সোডিয়াম ও অক্সিজেনের তুল্যাঙ্ক, অতএব এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ২৩ ভাগ ওজনের সোডিয়াম এবং ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন পৃথকভাবে যুক্ত হইতে পারে। আবার মিথোনুপাত সূত্র অনুসারে সোডিয়াম ও অক্সিজেন সংযোগকালে এই দুই সংখ্যার অনুপাতে বা তাহাদের সরল গুণিতকের অনুপাতে তাহারা মিলিত হইবে। বস্তুতঃ আমরা তাহাই দেখিয়াছি। সুতরাং মিথোনুপাত সূত্রটি মূলতঃ তুল্যাঙ্ক-অনুপাত সূত্রেরই প্রকাশান্তর মাত্র।

১০-৭। তুল্যাঙ্ক ও পারমাণবিক গুরুত্ব (Equivalent and atomic weights) : যে কোন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে যৌগপদার্থ সৃষ্টি করিতে এক বা একাধিক পূর্ণসংখ্যক

হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবে। 'X' নামক কোন মৌলিক পদার্থের হাইড্রোজেন যৌগিকের সঙ্কেত XH_1, XH_2, XH_3 ইত্যাদি হইতে পারে। যদি 'X'-এর যোজ্যতা n হয়, তাহা হইলে উহার একটি পরমাণু n সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পারে, এবং উহার সঙ্কেত হইবে XH_n।

যদি মৌলিক পদার্থটির পারমাণবিক গুরুত্ব 'a' মনে করা যায়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি,

n সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত 'X'-এর একটি পরমাণু যুক্ত হয়।

অর্থাৎ, ওজনে 'n' ভাগ হাইড্রোজেন 'a' ভাগ 'X'-এর সহিত যুক্ত হয়।

(∵ H=১)

∴ ১ ভাগ হাইড্রোজেন $\frac{a}{n}$ ভাগ 'X'-এর সহিত যুক্ত হয়।

কিন্তু এক ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত মৌলিক পদার্থের পরিমাণ-ভাগকে উহার তুল্যাঙ্ক বলা হয়। অতএব, "X" মৌলিক পদার্থের

$$\text{তুল্যাঙ্ক} = \frac{a}{n} = \frac{\text{মৌলিক পদার্থটির পারমাণবিক গুরুত্ব}}{\text{যোজ্যতা}}$$

∴ মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব = তুল্যাঙ্ক × যোজ্যতা।

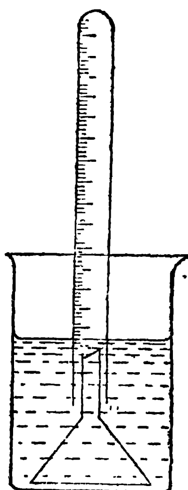
পারমাণবিক গুরুত্ব নিরূপণে এই সমীকরণটির বিশেষ প্রয়োজন হইবে।

১০-৮। তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি (Determination of Equivalent Weights): মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক নিরূপণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। কয়েকটি পদ্ধতির কথা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

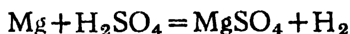
(১) অনেক সময় যৌগিক পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন দ্বারা তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করা হয়।

কোন কোন ধাতব মৌলিক পদার্থের সহিত অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। অ্যাসিড হইতে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিতে যত ভাগ মৌলিক পদার্থ প্রয়োজন হইবে, তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে।

ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ঃ ০·২ গ্রাম পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লইয়া তৌল সাহায্যে উহার যথার্থ ওজন প্রথমে স্থির করা হয়। ম্যাগনেসিয়ামের টুকরাটি একটি বীকারে রাখিয়া একটি ফানেল দ্বারা উহা ঢাকিয়া দেওয়া হয় (চিত্র ১০ক)। তারপর বীকারে জল ঢালিয়া নলসহ সম্পূর্ণ ফানেলটি ডুবাইয়া দেওয়া হয়। একটি অংশাঙ্কিত নল জলে পূর্ণ করিয়া উহা ফানেলের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। বীকারের জলে অতঃপর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই অ্যাসিড আস্তে আস্তে ফানেলের ভিতরে যায় এবং উহা ম্যাগনেসিয়ামের সংস্পর্শে আসা মাত্র হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। বুদ্‌বুদের আকারে এই হাইড্রোজেন উঠিয়া অংশাঙ্কিত নলে সঞ্চিত হয়।



চিত্র—১০ক
ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়



$$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$$

এইভাবে সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং উৎপন্ন হাইড্রোজেনটুকু সম্পূর্ণ উপরের নলে সংগ্রহ করা হয়। (বিক্রিয়াটি দ্রুততর করার জন্য একটু কপার সালফেট দেওয়া হয়।) বিক্রিয়া শেষ হইলে অংশাঙ্কিত নলটির মুখ আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া (যাহাতে বাহিরের বাতাস প্রবেশ না করে) একটি বড় জলের পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। উহাকে এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে ভিতরের এবং বাহিরের জল একই সমতলে থাকে ; অর্থাৎ, হাইড্রোজেন গ্যাসটিকে সেই সময়ের বায়ুচাপে আনা হয়। এই অবস্থায় অংশাঙ্কিত নল হইতে হাইড্রোজেনের আয়তন স্থির করা হয়। ব্যারোমিটার হইতে সেই সময়কার বায়ুচাপ জানা যায় এবং একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে জলের উষ্ণতা জানিয়া লওয়া হয়। ইহা হইতেই ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব।

গণনাঃ মনে কর,

ম্যাগনেসিয়ামের ওজন $= w$ গ্রাম।

সঞ্চিত হাইড্রোজেনের আয়তন $= v$ ঘন সেন্টিমিটার।

উষ্ণতা $= t°$ সেন্টিগ্রেড, এবং বায়ুচাপ $= P$ মিলিমিটার।

$t°$ উষ্ণতায় জলীয় বাষ্প-চাপ $= f$ মিলিমিটার।

অতএব, হাইড্রোজেনের প্রকৃত চাপ $=(P-f)$ মিলিমিটার।

প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় সেই হাইড্রোজেনের আয়তন যদি v' ঘন সেণ্টিমিটার হয়,

তাহা হইলে $\frac{v' \times ৭৬০}{২৭৩} = \frac{v \times (P-f)}{২৭৩+t}$

অথবা, $v' = \frac{v \times (P-f) \times ২৭৩}{(২৭৩+t) \times ৭৬০}$ ঘন সেণ্টিমিটার

হাইড্রোজেনের প্রমাণ-ঘনত্ব$=\cdot০০০০৯$ গ্রাম, সুতরাং সঞ্চিত হাইড্রোজেনের ওজন$=v' \times \cdot০০০০৯$ গ্রাম

অর্থাৎ, $v' \times \cdot০০০০৯$ গ্রাম হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিতে w গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন।

$\therefore$ ১ গ্রাম হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিতে $\frac{w}{v' \times \cdot০০০০৯}$ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন।

অতএব, ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক$=\frac{w}{v' \times \cdot০০০০৯}$

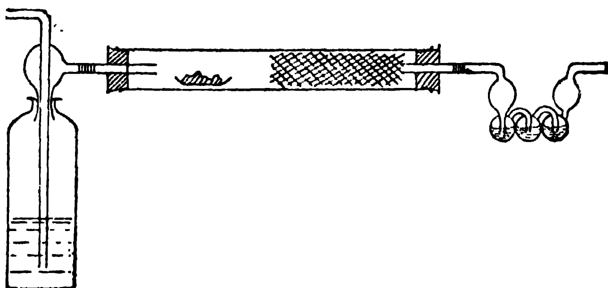
$$= \frac{w \times (২৭৩+t) \times ৭৬০}{v \times (P-f) \times ২৭৩ \times \cdot০০০০৯}।$$

(২) অক্সিজেনের সহিত মৌলিক পদার্থের সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়াও উহার তুল্যাঙ্ক নিরূপণ করা যায়।

(ক) অনেক মৌলিক পদার্থ সহজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত থাকে। মৌলিক পদার্থগুলি অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাহাকে অক্সাইড বলে। ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যত পরিমাণ মৌলিক পদার্থ মিলিত হইবে, তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে।

কার্বনের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ঃ তৌল-সাহায্যে প্রথমে একটি ছোট পরিষ্কার পর্সেলীন বোট ওজন করিয়া লওয়া হয়। উহাতে ০·২ গ্রাম পরিমাণ বিশুদ্ধ কার্বন (চিনি হইতে প্রস্তুত) লইয়া উহাকে আবার ওজন করা হয়। এই দুইটি ওজন হইতে কার্বনের যথার্থ ওজন জানা যাইবে। কার্বন-সহ এই বোটটি একটি পুরু ও শক্ত কাচের নলের ভিতর রাখা হয়, কাচের নলের অপর অংশ কপার-অক্সাইডে পূর্ণ করিয়া রাখা হয় (চিত্র ১০খ)। নলটির দুইটি মুখ কর্কদ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্যাস চলাচলের জন্য এই দুই কর্কের ভিতর দুইটি সরু নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেদিকে কার্বন বোটটি থাকে, সেই প্রান্ত হইতে প্রবেশ-নলের ভিতর দিয়া শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন

গ্যাস ভিতরে পরিচালনা করা হয়। এই অক্সিজেন প্রবাহে নলের মধ্যস্থিত বায়ু বিদূরিত হইয়া যায়। একটি কষ্টিক-পটাস-পূর্ণ বাল্‌ব ওজন করা হয় এবং উহা অপর প্রান্তের নির্গম নলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। এখন একটি চুল্লীতে বড় নলটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং অক্সিজেন-প্রবাহ চলিতে থাকে। কার্বন পুড়িয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন দ্বারা চালিত হইয়া পটাস-বাল্‌বে প্রবেশ করে। কস্টিক-পটাস কার্বন



চিত্র ১০থ—কার্বনের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়

ডাই-অক্সাইডের বিশোষক। সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পটাস-বাল্‌বে শোষিত হয়। এইভাবে সমস্তটুকু কার্বনকে উহার অক্সাইডে পরিণত করিয়া পটাস-বাল্‌বে সংগ্রহ করা হয়। যদি কোন কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়, উহাও উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়া অতিক্রম করার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। এইজন্যই কপার অক্সাইড নলের ভিতর দেওয়া হয়। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি নিভাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অক্সিজেন প্রবাহ চলিতে থাকে। অতঃপর পটাস বাল্‌বটি খুলিয়া আবার উহার ওজন লওয়া হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড বিশোষণের জন্য উহার ওজন বৃদ্ধি পাইবে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন হইতে সহজেই কার্বনের তুল্যাঙ্ক বাহির করা যাইতে পারে।

গণনা : পার্সেলীন বোটের ওজন $= w_1$ গ্রাম।

কার্বন সহ পর্সেলীন বোটের ওজন $= w_2$ গ্রাম।

$\therefore$ কার্বনের ওজন $= w_2 - w_1$ গ্রাম।

পরীক্ষার পূর্বে পটাস-বাল্‌বের ওজন $= w_3$ গ্রাম।

পরীক্ষার পরে পটাস-বাল্‌বের ওজন $= w_4$ গ্রাম।

$\therefore$ কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন $= w_4 - w_3$ গ্রাম।

∴ কার্বনের সহিত সম্মিলিত অক্সিজেনের ওজন $= (w_4 - w_3) - (w_2 - w_1)$ গ্রাম।

অতএব, $(w_4 - w_3) - (w_2 - w_1)$ গ্রাম অক্সিজেন $(w_2 - w_1)$ গ্রাম কার্বনের সহিত যুক্ত হয়।

∴ ৮ গ্রাম অক্সিজেন $\frac{(w_2 - w_1) \times 8}{(w_4 - w_3) - (w_2 - w_1)}$ গ্রাম কার্বনের সহিত যুক্ত হয়।

সুতরাং, কার্বনের তুল্যাঙ্ক $= \frac{8(w_2 - w_1)}{(w_4 - w_3) - (w_2 - w_1)}$ ।

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ওজন সংযুতি ও সঙ্কেত : উপরোক্ত পরীক্ষার ফল হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ওজন সংযুতিও নির্ধারণ করা সম্ভব। দেখা গেল : $w_2 - w_1$ গ্রাম কার্বন $(w_4 - w_3) - (w_2 - w_1)$ গ্রাম অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে কার্বন ও অক্সিজেনের ওজনের এই অনুপাতটি

কার্বন : অক্সিজেন $=$ ১ : ২.৬৭

তাহা হইলে পরমাণু সংখ্যার অনুপাতে

কার্বন : অক্সিজেন $= \frac{১}{১২} : \frac{২.৬৭}{১৬}$

$=$.০৮৩ : .১৬৬ $=$ ১ : ২

অতএব কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্থূলসংকেত CO_2।

মনে কর, উহার আণবিক সংকেত $[CO_2]_x$.

তাহা হইলে উহার আণবিক গুরুত্ব $= x \times ১২ + ২x \times ১৬$

কিন্তু গ্যাসটির ঘনত্ব $=$ ২২, অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব $=$ ৪৪

∴ ১২x + ৩২x = ৪৪, অর্থাৎ x = ১.

∴ কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত, CO_2।

(খ) কোন কোন সময় কার্বনের মত প্রত্যক্ষভাবে মৌলিক পদার্থটিকে অক্সাইডে পরিণত না করিয়া পরোক্ষভাবে উহার অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়।

কপারের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় : তৌল-সাহায্যে একটি শুষ্ক মুচি প্রথমে ওজন করা হয়। উহাতে এক টুকরা বিশুদ্ধ কপারের পাত লইয়া আবার ওজন করা হয়। ইহা হইতে কপারের যথার্থ ওজন জানা যাইবে। সেই মুচিটিতে এখন আস্তে আস্তে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কপারটুকু নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া কপার নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং একটি লাল গ্যাস বাহির হইয়া যায় :



$$Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$$

মুচিটিকে তখন একটি জল-গাহের উপর রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। সমস্ত নাইট্রিক

অ্যাসিড এবং জল এই ভাবে বাষ্পীভূত হইয়া চলিয়া যাইবে এবং কঠিন সবুজ কপার নাইট্রেট পড়িয়া থাকিবে। মুচিটিকে লইয়া এখন একটি অগ্নিসহ-মৃত্তিকার ত্রিকোণের (fire-clay triangle) উপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। অত্যধিক উত্তাপে, কপার নাইট্রেট বিযোজিত হইয়া কালো কপার-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অন্যান্য গ্যাস নির্গত হইয়া যায়।



$$2\,Cu(NO_3)_2 = 2CuO + 2N_2O_4 + O_2$$

যখন আর কোন গ্যাস নির্গত হইবে না, তখন উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ওজন করা হয়। পুনরায় উহাকে উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে ঠাণ্ডা করিয়া ওজন করা দরকার। এই দুইবার ওজনে যদি তারতম্য হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উহাকে উত্তপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে যতক্ষণ না উহার ওজন অপরিবর্তিত থাকে। এইভাবে মুচিটির ভিতরের কপার অক্সাইডের ওজন স্থির করা হয়।

গণনা ঃ শুষ্ক মুচিটির ওজন $= w_1$ গ্রাম

মুচি এবং কপারের ওজন $= w_2$ গ্রাম

$\therefore$ কপারের ওজন $= (w_2 - w_1)$ গ্রাম

মুচি এবং কপার-অক্সাইডের ওজন $= w_3$ গ্রাম

$\therefore$ কপারের সহিত মিলিত অক্সিজেনের ওজন $= (w_3 - w_2)$ গ্রাম।

অতএব,

$(w_3 - w_2)$ গ্রাম অক্সিজেন $(w_2 - w_1)$ গ্রাম কপারের সহিত যুক্ত হয়।

$\therefore$ ৮ গ্রাম অক্সিজেন $\dfrac{(w_2 - w_1) \times ৮}{w_3 - w_2}$ গ্রাম কপারের সহিত যুক্ত হয়,

অর্থাৎ, কপারের তুল্যাঙ্ক $= \dfrac{৮(w_2 - w_1)}{w_3 - w_2}$

টিন, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, লেড প্রভৃতি ধাতুর তুল্যাঙ্ক এই উপায়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

(৩) মৌলিক পদার্থটি ক্লোরিনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াও তুল্যাঙ্ক স্থির করা যায়। ৩৫.৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিনের সহিত যত পরিমাণ মৌলিক পদার্থ যুক্ত হইবে তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে।

সিলভারের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় ঃ ০.৫ গ্রাম পরিমাণ সিলভারের পাত লইয়া তৌল সাহায্যে উহার যথার্থ ওজন স্থির করা হয়। এই সিলভারটুকু একটি বীকারে রাখিয়া উহাতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। সমস্ত সিলভার

উহাতে দ্রবীভূত হইয়া সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণ প্রস্তুত হয়। অতঃপর এই দ্রবণে কিছু অধিক পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। ইহাতে সিলভার নাইট্রেটের সম্পূর্ণ সিলভারটুকু সিলভার-ক্লোরাইড রূপে কঠিন আকারে অধঃক্ষিপ্ত (precipitated) হইয়া আসে। উহাকে একটি ফিল্টার কাগজের সাহায্যে ছাঁকিয়া পাতিত জলে ধুইয়া লইতে হয়। পরে শুষ্ক করিয়া উহার ওজন লওয়া হয়।

গণনা ঃ সিলভার পাতের ওজন $= w_1$ গ্রাম।

সিলভার ক্লোরাইডের ওজন $= w_2$ গ্রাম।

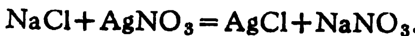
$\therefore$ $(w_2 - w_1)$ গ্রাম ক্লোরিন w_1 গ্রাম সিলভারের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অথবা, ৩৫·৫ গ্রাম ক্লোরিন $\frac{w_1 \times ৩৫·৫}{w_2 - w_1}$ গ্রাম সিলভারের সঙ্গে যুক্ত হয়।

$\therefore$ সিলভারের তুল্যাঙ্ক $= \frac{৩৫·৫ \times w_1}{w_2 - w_1}$

(৪) একটি মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক জানা থাকিলে অপর একটি মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব।

(ক) **সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ঃ** তৌল সাহায্যে সোডিয়ামের ওজন লওয়া যায় না। উহার তুল্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির করা যাইতে পারে। নির্দিষ্ট ওজনের খানিকটা সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) লইয়া পাতিত জলে উহার দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। উহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশান হয়। ইহাতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সমস্ত ক্লোরিন সিলভার ক্লোরাইড রূপে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া আসে। উহাকে ফিল্টার কাগজে ছাঁকিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া হয়। অতঃপর শুষ্ক করিয়া যথারীতি উহার ওজন স্থির করা হয়।



$$NaCl + AgNO_3 = AgCl + NaNO_3.$$

গণনা ঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড $= w_1$ গ্রাম, সিলভার ক্লোরাইড $= w_2$ গ্রাম।

সিলভারের তুল্যাঙ্ক = ১০৭.৮৮, অর্থাৎ ১০৭·৮৮ গ্রাম সিলভার ৩৫·৫ গ্রাম ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হইলে (১০৭·৮৮ + ৩৫·৫) = ১৪৩·৩৮ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$\therefore$ ১৪৩·৩৮ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ৩৫·৫ গ্রাম ক্লোরিন থাকিবে।

অথবা, w_2 গ্রাম................. $\frac{৩৫·৫ \times w_2}{১৪৩·৩৮}$ ক্লোরিন থাকিবে।

উক্ত ক্লোরিন w_1 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে ছিল।

∴ w_1 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়ামের পরিমাণ

$$=\left(w_1-\frac{৩৫.৫\times w_2}{১৪৩.৩৮}\right) \text{ গ্রাম।}$$

∴ $\frac{৩৫.৫w_2}{১৪৩.৩৮}$ গ্রাম ক্লোরিন $\left(w_1-\frac{৩৫.৫w_2}{১৪৩.৩৮}\right)$ গ্রাম সোডিয়ামের সহিত যুক্ত হয়।

∴ ৩৫.৫ গ্রাম ক্লোরিন $\frac{১৪৩.৩৮w_1-৩৫.৫w_2}{w_2}$ গ্রাম সোডিয়ামের সহিত যুক্ত হয়।

∴ সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক $=\frac{১৪৩.৩৮w_1-৩৫.৫w_2}{w_2}$

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লেড প্রভৃতির তুল্যাঙ্ক এই রকম ভাবে নির্ণীত হয়।

মৌলিক পদার্থের মত যৌগিক-মূলকেরও তুল্যাঙ্ক আছে। ইহার যত ভাগ ওজন এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন অথবা ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4 = ৯৮, ৯৬ ভাগ ওজনে SO_4 মূলক দুইভাগ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

∴ SO_4 মূলকের তুল্যাঙ্ক $=\frac{৯৬}{২}=$ ৪৮

এই সব মূলক মৌলিক পদার্থ বা অন্য কোন মূলকের সঙ্গে তুল্যাঙ্ক-অনুপাত-সূত্র অনুসারেই যুক্ত হইবে।

(খ) **বেরিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ঃ** নির্দিষ্ট পরিমাণ বেরিয়াম



$$BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4+2HCl$$

ক্লোরাইড লইয়া উহাকে পাতিত জলে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়া উহা হইতে সমস্ত বেরিয়াম 'বেরিয়াম সালফেট' হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। এই অদ্রবণীয় বেরিয়াম সালফেট যথারীতি ছাঁকিয়া, ধুইয়া শুষ্ক অবস্থায় ওজন করা হয়। মনে কর, বেরিয়ামের তুল্যাঙ্ক $=x$.

বেরিয়াম ক্লোরাইডের ওজন $=w_1$ গ্রাম।

বেরিয়াম সালফেটের ওজন $=w_2$ গ্রাম।

ক্লোরিনের তুল্যাঙ্ক = ৩৫.৫। SO_4 মূলকের তুল্যাঙ্ক = ৪৮।

তাহা হইলে, x গ্রাম বেরিয়াম ৩৫.৫ গ্রাম ক্লোরিনের সহিত যুক্ত হইয়া $BaCl_2$ দেয় এবং x গ্রাম বেরিয়াম ৪৮ গ্রাম SO_4 মূলকের সহিত যুক্ত হইয়া $BaSO_4$ দেয়।

অর্থাৎ (x+৩৫.৫) গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইড (x+৪৮) গ্রাম বেরিয়াম সালফেট দিতে পারে।

$\therefore$ w_1...................................$\frac{w_1 \times (x+৪৮)}{(x+৩৫\cdot৫)}$ গ্রাম..........................

বস্তুতঃ w_2 গ্রাম বেরিয়াম সালফেট পাওয়া গিয়াছে।

$\therefore$ $\frac{(x+৪৮) \times w_1}{(x+৩৫\cdot৫)} = w_2$.

ইহা হইতে বেরিয়ামের তুল্যাঙ্ক x নির্ণয় করা যায়।

(গ) অনেক সময় যৌগিক পদার্থের একটি ধাতুকে অপর একটি ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। যেমন, সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে যদি কপার দেওয়া হয় তবে সিলভার বাহির হইয়া আসিয়া উহাকে কপার নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে।



$$2AgNO_3 + Cu = Cu(NO_3)_2 + 2Ag$$

এই রকম প্রতিস্থাপন ব্যাপারে ধাতুগুলি—কপার এবং সিলভার—উহাদের তুল্যাঙ্কের অনুপাতে অংশ গ্রহণ করে। যদি x গ্রাম কপার দ্রবীভূত হইয়া y গ্রাম সিলভার বাহিরে আসে, তাহা হইলে $x : y = E_{Cu} : E_{Ag}$ ।

[E_{Ag}, E_{Cu} যথাক্রমে সিলভার ও কপারের তুল্যাঙ্ক।]

অথবা $E_{Cu} = \frac{x}{y} \times E_{Ag}$

সিলভারের তুল্যাঙ্ক জানা থাকিলে, পরীক্ষা দ্বারা x এবং y বাহির করিয়া কপারের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব।

এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও তাড়িত বিশ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক নিরূপণ করা হইয়া থাকে। তাড়িতরসায়ন আলোচনা করার সময়ে এ বিষয়ে জানিতে পারা যাইবে।

অনুশীলনী

(১) ১৫° সেণ্টি. উষ্ণতায় এবং ৭৬৫ মিলিমিটার চাপে ১ গ্রাম ধাতুর সহিত অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে ১৯৭ ঘন সেণ্টিমিটার শুষ্ক হাইড্রোজেন পাওয়া গেল। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত ?

উত্তর : প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনের

আয়তন, $v = \frac{১৯৭ \times ৭৬৫ \times ২৭৩}{(২৭৩+১৫) \times ৭৬০}$ ঘন সেণ্টিমিটার

∴ এক গ্রাম ধাতুর সাহায্যে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের

$$\text{ওজন} = \frac{১২৭ \times ৭৬৫ \times ২৭৩ \times .০০০০৯}{২৮৮ \times ৭৬০} \text{ গ্রাম}$$

$$\therefore \text{ ধাতুটির তুল্যাঙ্ক} = \frac{১ \times ২৮৮ \times ৭৬০}{১২৭ \times ৭৬৫ \times ২৭৩ \times .০০০০৯}$$

$$= ৫৯.১ \text{ উত্তর।}$$

(২) ০.২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হইল। বিক্রিয়ার ফলে ১৫° সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৫১.৫ মিলিমিটার চাপে ২০০ ঘন সেন্টিমিটার আর্দ্র হাইড্রোজেন পাওয়া গেল। [১৫° সেন্টিগ্রেডে বাষ্পচাপ ১৩.৫ মিলিমিটার।] ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় কর।

উত্তর : ১৫° সেন্টি. ও ৭৫১.৫ মিলিমিটার চাপে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন = ২০০ ঘন সেন্টিমিটার। প্রমাণ অবস্থায়, উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন যদি V ঘন সেন্টিমিটার হয়, তবে

$$\frac{V \times ৭৬০}{২৭৩} = \frac{২০০ \times (৭৫১.৫ - ১৩.৫)}{২৮৮}$$

$$\therefore V = \frac{২০০ \times ৭৩৮ \times ২৭৩}{৭৬০ \times ২৮৮} \text{ ঘন সেন্টিমিটার}$$

$$\therefore \text{ উক্ত হাইড্রোজেনের ওজন} = \frac{২০০ \times ৭৩৮ \times ২৭৩ \times .০০০০৯}{৭৬০ \times ২৮৮} \text{ গ্রাম}$$

ধাতুর ওজন = ০.২ গ্রাম

$$\therefore \text{ ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক} = \frac{০.২ \times ৭৬০ \times ২৮৮}{২০০ \times ৭৩৮ \times ২৭৩ \times .০০০০৯}$$

$$= ১২.০২$$

(৩) ০.২১৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হওয়াতে ১৭° সেন্টি. ও ৭৫৪.৫ মিলিমিটার চাপে ২১৮.২ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া গেল। ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যাঙ্ক কত হইবে? [১৭.০° সেন্টিগ্রেডে বাষ্পচাপ = ১৪.৪ মিলিমিটার] [পাটনা বিশ্বঃ]

(৪) ০.৪৯ গ্রাম একটি ধাতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ২২° সেন্টিগ্রেড ও ৭৫২ মিলিমিটার চাপে ২৯৫ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক নির্ণয় কর। [কলিকাতা বিশ্বঃ]

(৫) এক গ্রাম ওজনের একটি ধাতু অক্সিজেন দ্বারা জারণের ফলে ১.৬৬৫ গ্রাম অক্সাইড পাওয়া গেল। উহার তুল্যাঙ্ক কত হইবে?

উত্তর। ধাতুর সহিত মিলিত অক্সিজেনের ওজন

$$= ১.৬৬৫ - ১ = .৬৬৫ \text{ গ্রাম।}$$

$$\text{ধাতুটির তুল্যাঙ্ক} = \frac{১ \times ৮}{.৬৬৫}$$

$$= ১২.০৩।$$

(৬) ১.১৮ গ্রাম পরিমাণ ওজনের কপার প্রথমে নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হইল। উৎপন্ন কপার নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ বিযোজিত করিয়া ১.৪৮ গ্রাম কপার অক্সাইড পাওয়া গেল। কপারের তুল্যাঙ্ক নির্ধারণ কর।

(২) ০.২০৫২ গ্রাম মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ বিযোজিত করিলে ১৫° সেন্টিগ্রেডে ও ৭৬০ মিলিমিটার চাপে ১২ ঘন সেন্টি. অক্সিজেন পাওয়া গেল। মারকারির তুল্যাঙ্ক কত হইবে?

(৮) ১.৯৮৬ গ্রাম কপার হইতে ২.৪৭০ গ্রাম কপার অক্সাইড পাওয়া গেল। এবং কপার সালফেট দ্রবণে ০.৩৪৬ গ্রাম জিঙ্ক দিলে উহা দ্রবণ হইতে ০.৩৩৫ গ্রাম কপার প্রতিস্থাপিত করে।

(৯) একটি ধাতব ক্লোরাইডে ক্লোরিনের পরিমাণ ৩৮.১১%। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত?

[বোম্বে বিশ্বঃ]

(১০) কপারের দুইটি অক্সাইডে অক্সিজেনের অনুপাত যথাক্রমে ১১.২% এবং ২০.০৯% ভাগ। দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কপারের তুল্যাঙ্ক কিরূপ হইবে?

(১১) একটি ধাতব ক্লোরাইডের এক গ্রাম বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে উহাতে ০.৬১৮৩ গ্রাম ক্লোরিন আছে। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত?

(১২) ৪.৪২ গ্রাম উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন পরিচালনা করিলে উহা হইতে ৩.৫৪ গ্রাম কপার পাওয়া গেল। কপারের তুল্যাঙ্ক কত হইবে?

(১৩) কপার সালফেট দ্রবণে .১৪ গ্রাম ওজনের লোহচূর দেওয়াতে উহা হইতে .১৫৭৫ গ্রাম কপার অধঃক্ষিপ্ত হইয়া গেল। লোহের তুল্যাঙ্ক ২৮ হইলে কপারের তুল্যাঙ্ক কত হইবে?

মনে কর, কপারের তুল্যাঙ্ক x।

"তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র" অনুযায়ী ২৮ গ্রাম লোহচূর x গ্রাম কপারকে দ্রবণ হইতে অধঃক্ষিপ্ত করিবে।

অর্থাৎ .১৪ গ্রাম লৌহ $\frac{x}{২৮}\times .১৪$ গ্রাম কপার অধঃক্ষিপ্ত করিবে।

$$\therefore \quad \frac{x \times .১৪}{২৮} = .১৫৭৫$$

$$\therefore \quad x = \frac{.১৫৭৫ \times ২৮}{.১৪} = ৩১.৫ ।$$

(১৪) এক গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত করিয়া উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দেওয়া হইল। বিক্রিয়ার ফলে ২.১১০ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত হইল। জিঙ্কের তুল্যাঙ্ক কত?

সিলভারের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১০৭.৮৮

ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ৩৫.৪৬

অতএব, (১০৭.৮৮ + ৩৫.৪৬) = ১৪৩.৩৪ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ৩৫.৪৬ গ্রাম ক্লোরিন থাকে।

সুতরাং ২.১১০ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ক্লোরিনের পরিমাণ

$$=\frac{২.১১\times৩৫.৪৬}{১৪৩.৩৪} \text{ গ্রাম}$$

$\frac{২.১১\times৩৫.৪৬}{১৪৩.৩৪}$ গ্রাম ক্লোরিনের সহিত $১-\frac{২.১১\times৩৫.৪৬}{১৪৩.৩৪}$ গ্রাম জিঙ্ক যুক্ত আছে

$\therefore$ ৩৫.৪৬ গ্রাম ক্লোরিনের সহিত $\left[১-\frac{২.১১\times৩৫.৪৬}{১৪৩.৩৪}\right]\times\frac{১৪৩.৩৪}{২.১১}$ গ্রাম জিঙ্ক আছে।

$\therefore$ জিঙ্কের তুল্যাঙ্ক$=\frac{১৪৩.৩৪-২.১১\times৩৫.৪৬}{২.১১}=৩২.৪৮$।

(১৫) ০.৪৯৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রবণে লইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট সহ মিশ্রিত করিলে ১.২১ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক বাহির কর। [Ag=১০৮, Cl=৩৫.৫]

মনে কর, সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক x।

অতএব, $x+৩৫.৫$ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে $(১০৮+৩৫.৫)=১৪৩.৫$ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড পাওয়া যাইবে।

$\therefore$ ০.৪৯৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড$=\frac{১৪৩.৫}{x+৩৫.৫}\times.৪৯৫$ সিলভার ক্লোরাইড ;

অথবা, $১.২১=\frac{১৪৩.৫}{x+৩৫.৫}\times.৪৯৫$

$\therefore x=\frac{.৪৯৫}{১.২১}\times১৪৩.৫-৩৫.৫=২৩.২$।

(১৬) এক গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম, সালফেট দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করিয়া ১.২২৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন করে। ক্যালসিয়ামের তুল্যাঙ্ক কত ?

[তুল্যাঙ্ক : Cl=৩৫.৫ ; SO_4=৪৮]

একাদশ অধ্যায়

পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়

পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ের কয়েকটি উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) **ক্যানিজারো প্রণালীতে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের** সাহায্যে পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করা যায়, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

(২) **"ডুলং এবং পেটিটের সূত্র" (Dulong and Petit's Law)**: কোন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ও উহার পারমাণবিক গুরুত্বের গুণফলকে উহার **পরমাণু-তাপ (atomic heat)** বলা হয়। বিভিন্ন পদার্থের পরীক্ষার ফলে ডুলং এবং পেটিট প্রমাণ করেন :—"যে কোন কঠিন মৌলিক পদার্থের পরমাণু-তাপ সর্বদা একই হয় এবং উহার পরিমাণ ৬·৪ হইয়া থাকে।" কেবলমাত্র কার্বন, বোরন, সিলিকন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অতএব, পারমাণবিক গুরুত্ব × আপেক্ষিক তাপ = ৬·৪

$$\therefore \text{ পারমাণবিক গুরুত্ব} = \frac{৬·৪}{\text{আপেক্ষিক তাপ}}$$

সুতরাং, কোন মৌলের আপেক্ষিক তাপ নির্ধারণ করিলেই উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করা যাইবে। সঠিক এবং নির্ভুল না হইলেও এই উপায়ে পারমাণবিক গুরুত্বের একটি মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

(৩) নির্ভুল পারমাণবিক গুরুত্ব নিরূপণ করিতে হইলে প্রথম উহার তুল্যাঙ্ক স্থির করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, পারমাণবিক গুরুত্ব = যোজ্যতা × তুল্যাঙ্ক।

তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন পরমাণুর যোজ্যতা জানা সম্ভব নহে। তবে যোজ্যতা যে একটি পূর্ণসংখ্যা [১, ২, ৩,···] হইবে, তাহা নিশ্চিত।

যোজ্যতা স্থির করার জন্য প্রথমতঃ ডুলং ও পেটিট-এর সূত্র অনুযায়ী আপেক্ষিক তাপ হইতে স্থূলভাবে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করিতে

হইবে। এই পারমাণবিক গুরুত্বকে তুল্যাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলেই যোজ্যতার পরিমাণ পাওয়া যাইবে। এই ভাগফলের আসন্ন পূর্ণসংখ্যাটিকে পরমাণুটির সঠিক যোজ্যতা রূপে ধরা হয়। যেমন :—

ডুলং-পেটিট-এর নিয়ম অনুযায়ী ম্যাগনেসিয়ামের মোটামুটি পারমাণবিক

গুরুত্ব = ২৪'৪, উহার তুল্যাঙ্ক = ১২'১৫

∴ ম্যাগনেসিয়ামের যোজ্যতা = $\frac{২৪\text{'}৪}{১২\text{'}১৫}$ = ২'০১।

কিন্তু যোজ্যতা ভগ্নাংশ বা দাশমিক হইতে পারে না। অতএব উহার সঠিক যোজ্যতা ২ ধরা হইবে।

এই যোজ্যতার দ্বারা তুল্যাঙ্ককে গুণ করিয়া উক্ত মৌলিক পদার্থটির প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়।

∴ ম্যাগনেসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব = ২ × ১২'১৫ = ২৪'৩।

অতএব দেখা যাইতেছে, পারমাণবিক গুরুত্ব সঠিক বাহির করিতে হইলে :—

(ক) প্রথমতঃ উহার আপেক্ষিক তাপ স্থির করিয়া স্থূল পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) তুল্যাঙ্ক স্থির করিতে হইবে।

(গ) উপরোক্ত পারমাণবিক গুরুত্ব এবং তুল্যাঙ্ক হইতে মৌলিক পদার্থটির সঠিক যোজ্যতা নিরূপণ করিতে হইবে।

(ঘ) তুল্যাঙ্ক ও যোজ্যতার গুণফল প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত্ব হইবে।

(৪) **মিত্সারলিসের সমাকৃতি-সূত্রের (Mitscherlich's Law of Isomorphism)** সাহায্যেও পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করা সম্ভব।

প্রায়ই কঠিন পদার্থগুলি স্ফটিকাকারে থাকে। অনেক সময় একাধিক পদার্থের স্ফটিকের আকার একই রকমের হয়। এই সকল স্ফটিকগুলি **সমাকৃতি স্ফটিক** বলা যাইতে পারে। এইসব পদার্থের স্ফটিকগুলি আয়তনে ছোটবড় হইতে পারে, কিন্তু উহাদের কোণ এবং পৃষ্ঠতলের সংখ্যা সমান এবং অনুরূপ (corresponding) কোণগুলিও সমান হইয়া থাকে। কিন্তু যে কোন দুইটি পদার্থের স্ফটিকের কেবলমাত্র আকৃতিগত সাদৃশ্যই তাহাদের সমাকৃতিত্বের পূর্ণ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় না। লবণের স্ফটিক এবং হীরার স্ফটিক একই আকৃতিবিশিষ্ট বটে, কিন্তু উহাদিগকে সমাকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া ধরা হয় না।

কারণ, দুইটি পদার্থের সমাকৃতিত্ব আকৃতি ছাড়া আরও দুইটি লক্ষণের উপর নির্ভর করে।

(১) উভয় পদার্থের মিশ্র দ্রবকে কেলাসিত করিলে যে স্ফটিক পাওয়া যাইবে, তাহা উভয় পদার্থের অণুদ্বারা গঠিত হইবে, এবং উহার আকৃতি যে কোন একটির স্ফটিকের আকৃতির অনুরূপ হইবে। কেলাসন সময়ে মিশ্র-দ্রবটি একটির দ্বারা সম্পৃক্ত হইলেও উভয়ের স্ফটিক একত্র পড়িবে।

(২) একটি পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবে অপর পদার্থটির একটি ছোট স্ফটিক রাখিলে ছোট স্ফটিকটির উপর প্রথমোক্ত পদার্থের অণুর পরিন্যাস দ্বারা (Deposit) উহার আয়তনের বৃদ্ধি হইবে।

লবণ এবং হীরার স্ফটিকের এই সকল বৈশিষ্ট্য না থাকায় উহাদের মধ্যে সমাকৃতিত্ব নাই, এইরূপ মনে করা হয়।

জিঙ্ক সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ফেরাস সালফেট ইহারা সমাকৃতি স্ফটিক (Isomorphous crystals)। উহাদের আকৃতি একরকম এবং জিঙ্ক সালফেট ও ফেরাস সালফেটের মিশ্র দ্রবকে কেলাসিত করিলে যে স্ফটিক পাওয়া যাইবে উহাতে জিঙ্ক ও ফেরাস সালফেট মিশ্রিত থাকিবে। অথবা জিঙ্ক সালফেটের একটি স্ফটিক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দ্রবণের মধ্যে রাখিলে উহার উপর অনুরূপভাবে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জমিতে থাকিবে।

এইরূপ আরও অনেক সমাকৃতি-স্ফটিকের নাম করা যাইতে পারে :—

(১) জিঙ্ক সালফেট ($ZnSO_4$, $7H_2O$), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$, $7H_2O$), ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$, $7H_2O$)।

(২) পটাসিয়াম সালফেট (K_2SO_4), পটাসিয়াম ক্রোমেট (K_2CrO_4)।

(৩) পটাস অ্যালাম [K_2SO_4, $Al_2(SO_4)_3$, $24H_2O$],
ক্রোম অ্যালাম [K_2SO_4, $Cr_2(SO_4)_3$, $24\ H_2O$]

(৪) কপার সালফাইড (Cu_2S) এবং সিলভার সালফাইড (Ag_2S) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সকল সমাকৃতি-সম্পন্ন পদার্থগুলির সঙ্কেত যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহাদের অণুগুলিতে মোট পরমাণুর সংখ্যা একই এবং দুই একটি পরমাণুর স্থলে অন্য দুই একটি পরমাণু থাকিলেও উহাদের সংযুতি একই

রকমের। যেমন, K_2SO_4 এবং K_2CrO_4। ইহা হইতে মিতসারলিস একটি নিয়ম আবিষ্কার করেন :—

"যে সমস্ত যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা এবং সংযোজনা পদ্ধতি এক রকমের, তাহাদের স্ফটিকগুলি সমাকৃতি-সম্পন্ন।"

অর্থাৎ, "সমান সংখ্যক পরমাণু একই প্রকারে সংযোজিত হইয়া সমাকৃতি স্ফটিক সৃষ্টি করে। এই সকল স্ফটিকের আকৃতি কেবলমাত্র উহাদের পরমাণুগুলির সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে, পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতি বা ধর্মের উপর নির্ভর করে না।"

ইহাকেই **সমাকৃতি সূত্র (Law of Isomorphism)** বলা হয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে, দুইটি সমাকৃতি-সম্পন্ন পদার্থের অণুতে যে মৌলিক পদার্থটি বিভিন্ন হইবে, তাহাদের পরমাণুর সংখ্যাও একই হইবে। যেমন পটাসিয়াম সালফেট এবং পটাসিয়াম সেলিনেট সমাকৃতি-স্ফটিক সৃষ্টি করে। পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত K_2SO_4। অতএব, পটাসিয়াম সেলিনেটের সঙ্কেতকে K_2SeO_4 হইতে হইবে। কারণ সূত্রানুযায়ী পরমাণুর সংখ্যা ও সংযুতি এক হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু সালফেটে একটি সালফার পরমাণু আছে, সমাকৃতি সেলিনেটেও উহার পরিবর্তে একটি সেলিনিয়াম পরমাণু থাকিতে হইবে।

এই নিয়মটির সাহায্যে পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির করা যাইতে পারে। একটি উদাহরণ হইতে উহা সহজে বুঝা যাইবে।

উদাহরণ : পটাসিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম সেলিনেট সমাকৃতি-সম্পন্ন পদার্থ। বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে পটাসিয়াম সেলিনেটে শতকরা ৩৫·৭৭ ভাগ সেলিনিয়াম আছে। সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব কত ?

যেহেতু পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত K_2SO_4 এবং উহার সহিত সেলিনেট সমাকৃতি, অতএব পটাসিয়াম সেলিনেটের সঙ্কেত K_2SeO_4 হইবে।

সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব যদি x হয়, তবে K_2SeO_4-এর আণবিক গুরুত্ব হইবে,

$K_2SeO_4 = ২ \times ৩৯·০৯ + x + ৪ \times ১৬$ [$\because$ K=৩৯·০৯, O=১৬ পারমাণবিক গুরুত্ব]

$= ১৪২·১৯ + x.$

অতএব, উক্ত পদার্থে সেলিনিয়ামের শতকরা অংশ $\frac{x \times ১০০}{১৪২·১৯ + x}$

$$\therefore \frac{x \times ১০০}{১৪২\cdot১৯+x} = ৩৫\cdot৭৭$$

$$\therefore x = ৭৯\cdot১৬$$

সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব = ৭৯·১৬।

উদাহরণ। একটি অজ্ঞাত ধাতুর ক্লোরাইডে শতকরা ২৯·৩৪ ভাগ ক্লোরিন আছে, এবং উহা পটাসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সমাকৃতি-সম্পন্ন। পটাসিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরিনের অংশ শতকরা ৪৭·৬৫। ধাতুটির পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

ধাতুটির ক্লোরাইডে. ২৯·৩৪ গ্রাম ক্লোরিন (১০০ − ২৯·৩৪) = ৭০·৬৬ গ্রাম ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।

$\therefore$ ১ গ্রাম ক্লোরিন $\frac{৭০\cdot৬৬}{২৯\cdot৩৪} = ২\cdot৪০$ গ্রাম ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।

পটাসিয়াম ক্লোরাইডে, ৪৭·৬৫ গ্রাম ক্লোরিনের সঙ্গে (১০০ − ৪৭·৬৫) = ৫২·৩৫ গ্রাম পটাসিয়াম যুক্ত হয়।

$\therefore$ ১ গ্রাম ক্লোরিনের সঙ্গে $\frac{৫২\cdot৩৫}{৪৭\cdot৬৫} = ১\cdot০৯$ গ্রাম পটাসিয়াম যুক্ত হয়।

অর্থাৎ সমাকৃতি-পদার্থ দুইটিতে সমপরিমাণ ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত ধাতু ও পটাসিয়ামের ওজনের অনুপাত = ২·৪০ : ১·০৯।

কিন্তু এই দুইটি পদার্থে ধাতু ও পটাসিয়ামের সমান সংখ্যক পরমাণু থাকিবে; অর্থাৎ উহাদের ওজনের অনুপাত উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের অনুপাতে হইবে।

$$\therefore \frac{\text{ধাতুর পারমাণবিক গুরুত্ব}}{\text{পটাসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব}} = \frac{২৪০}{১০৯}$$

$$\therefore \text{ধাতুর পারমাণবিক গুরুত্ব} = \frac{২৪০}{১০৯} \times ৩৯ \qquad [K = ৩৯]$$

$$= ৮৫\cdot৮।$$

মনে রাখিতে হইবে, এইভাবে পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইলে পদার্থগুলির স্ফটিক সহজপ্রাপ্য হওয়া প্রয়োজন, এবং মৌলদের একটির পারমাণবিক গুরুত্ব জানা আবশ্যক।

(৫) পর্যায়-সারণীর সাহায্যেও (Periodic table) কোন কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব জানা যায়।

অনুশীলনী

১। একটি ধাতুর আপেক্ষিক তাপ ·১২১ এবং তুল্যাঙ্ক ১৭·৮। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত?

উঃ। স্থূল পারমাণবিক গুরুত্ব $= \frac{\text{পরমাণু তাপ}}{\text{আপেক্ষিক তাপ}} = \frac{৬\cdot৪}{\cdot১২১} = ৫২\cdot৯$

ধাতুর যোজ্যতা = $\frac{\text{পারমাণবিক গুরুত্ব}}{\text{তুল্যাঙ্ক}} = \frac{৫২\cdot৯}{১৭\cdot৮} = ২\cdot৯৭$

যেহেতু যোজ্যতা পূর্ণ সংখ্যা হইতে হইবে, সুতরাং উহার যোজ্যতা হইবে = ৩।

∴ উহার প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত্ব = ৩ × ১৭·৮ = ৫৩·৪।

২। এক গ্রাম ওজন একটি ধাতু সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে প্রমাণ অবস্থায় ১২৪২ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ = ·২৩৮ ; উহার তুল্যাঙ্ক, পারমাণবিক গুরুত্ব ও যোজ্যতা নির্ণয় কর। (এলাহাবাদ, ১৯৩২)

উঃ। উৎপন্ন হাইড্রোজেনের ওজন = ১২৪২ × ·০০০০৯ গ্রাম

∴ ধাতুটির তুল্যাঙ্ক = $\frac{১}{১২৪২ \times ·০০০০৯}$ = ৮·৯৯

ধাতুটির স্থূল পারমাণবিক গুরুত্ব $\frac{৬·৪}{·২৩৮}$ = ২৭·৮

অতএব, উহার যোজ্যতা = $\frac{২৭·৮}{৮·৯৯}$ = ৩·০৯।

যেহেতু যোজ্যতা পূর্ণ সংখ্যা হইতে হইবে, অতএব উহার যোজ্যতা = ৩

∴ উহার প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত্ব = ৩ × ৮·৯৯ = ২৬·৯৭।

৩। একটি উদ্বায়ী ধাতুর তুল্যাঙ্ক ১০০·৩ এবং আপেক্ষিক তাপ = ·০৩৩। ০·২৫ গ্রাম পরিমাণ ধাতুর ৫০০° সেন্টিগ্রেডে এবং প্রমাণ চাপে বাষ্পীয় আয়তন ৭৯·৫ ঘন সেন্টিমিটার। উহার আণবিক এবং পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৪। একটি ধাতুর আপেক্ষিক তাপ = ০·১৫২। উহার ০·৪৯ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে ২২° সেন্টিগ্রেডে ও ৭৫২ মিলিমিটার চাপে ২৯৫ ঘন সেন্টিমিটার অনার্দ্র (dry) হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। উহার তুল্যাঙ্ক ও পারমাণবিক গুরুত্ব কত? (কলিকাতা বিশ্বঃ, ১৯৩৪)

৫। ২০ গ্রাম টিন লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে প্রমাণ অবস্থায় ১·১২ লিটার হাইড্রোজেন পাওয়া গেল এবং ১৪·১ গ্রাম টিন অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়া গেল। টিনের ক্লোরাইডের বাষ্প-ঘনত্ব = ৯৪·৫। টিনের পারমাণবিক গুরুত্ব কত?

৬। ০·৫৫৭৪ গ্রাম পরিমাণ একটি ধাতু হইতে ০·৬৮১৭ গ্রাম উহার অক্সাইড পাওয়া গিয়াছে। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ = ০·০৫৫। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির কর।

৭। ২·৮৯৭২ গ্রাম জিঙ্ক-অক্সাইড হাইড্রোজেনের সহিত উত্তপ্ত করিয়া ২·২৫৬৭ গ্রাম জিঙ্ক পাওয়া যায়। জিঙ্কের আপেক্ষিক তাপ ০·০৯। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত?

৮। একটি ধাতুর ক্লোরাইডে শতকরা ২০·২ ভাগ ধাতু আছে। উহার আপেক্ষিক তাপ ·২২৬। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত হইবে?

৯। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ শতকরা ৩৪·৮ ভাগ। উহার সহিত পটাসিয়াম পারক্লোরেট সমাকৃতি ($KClO_4$)। ম্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।


[K = ৩৯, O = ১৬, Cl = ৩৫·৫]

১০। A এবং B দুইটি ধাতুর অক্সাইড সমাকৃতি-সম্পন্ন। A-এর পারমাণবিক গুরুত্ব ৫২, এবং উহার ক্লোরাইডের বাষ্প-ঘনত্ব=৭৯। B-এর অক্সাইডে অক্সিজেনের অংশ শতকরা ৮৭১ ভাগ। B-এর পারমাণবিক গুরুত্ব কত হইবে? (রেঙ্গুন, ১৯২৭)

১১। ফেরিক অ্যালামে শতকরা ১১·০৯ ভাগ আয়রন এবং ২৫·৪৫ ভাগ সালফার-অক্সাইড আছে। উহার সমাকৃতি সাধারণ অ্যালামে শতকরা ৫·৬৮ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম এবং ২৭·০১ ভাগ সালফার-অক্সাইড আছে। আয়রনের পারমাণবিক গুরুত্ব=৫৫·৮, অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব কত?

১২। ·০২২ গ্রাম একটি ধাতব ক্লোরাইড হইতে ক্লোরিনকে সম্পূর্ণ রূপে অধঃক্ষিপ্ত করিতে ·০৫১ গ্রাম সিলভার নাইট্রেট প্রয়োজন। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ ·০৫৭ হইলে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত হইবে?

দ্বাদশ অধ্যায়

তড়িৎ-বিশ্লেষণ

১২-১। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সবাই জানি বিদ্যুৎ সমস্ত বস্তুর ভিতর দিয়া চলাচল করিতে সক্ষম নয়। লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, অথবা অ্যাসিড বা লবণের জলীয় দ্রবণ অনায়াসে তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে। ইহাদিগকে **তড়িৎ-পরিবাহী** বা **বিদ্যুৎ-পরিবাহী (conductors)** বলা যায়। সাধারণ অঙ্গার, গন্ধক, কাঠ বা চিনি ইত্যাদির ভিতর দিয়া কখনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল সম্ভব নয়। ইহারা **অ-পরিবাহী (non-conductors)**।

যে সকল পদার্থ বিদ্যুৎ-পরিবহন করিতে সক্ষম তাহাদের দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

(১) কোন কোন বস্তু বিদ্যুৎ-পরিবহন করিতে পারে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা তাহাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। ধাতুগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। আয়রন বা কপারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অতি সহজে প্রবাহিত হয়, কিন্তু তাহাতে উহাদের কোন রাসায়নিক বিকার হয় না।

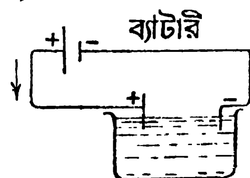
(২) কোন কোন বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-পরিবহন কালে, বস্তুগুলি বিযোজিত হইয়া যায়, এবং নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড, ক্ষার এবং

লবণ জাতীয় পদার্থের দ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ। সমস্ত যৌগিক পদার্থের অবশ্য বিদ্যুৎ-পরিবহন করার ক্ষমতা নাই। যেমন, চিনি, তেল বা স্টার্চ কোন অবস্থাতেই বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয় না। যে সকল যৌগিক-পদার্থ বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাহারাও কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। কেবলমাত্র গলিত অবস্থায় অথবা কোন কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় উহারা তড়িৎ-পরিবাহী হইয়া থাকে।

লবণের স্ফটিকের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চালনা সম্ভব নয়; কিন্তু লবণের গলিত অবস্থায় অথবা উহার জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে পারে। এই সমস্ত বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে উহারা বিযোজিত হইয়া যায়। যেমন খাদ্য-লবণের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-সাহায্যে ক্লোরিন এবং কস্টিক সোডাতে পরিণত হয়।

যে সকল তরল পদার্থ বা দ্রবণ বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিযোজিত হয় তাহারা **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য (Electrolyte)** নামে অভিহিত। বিদ্যুৎ-সাহায্যে পদার্থের বিযোজনকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis) বলা হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রবণকে একটি পাত্রে রাখিয়া উহার দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত আংশিক ডুবাইয়া রাখা হয়। এই পাত দুইটি তারের সাহায্যে একটি ব্যাটারীর পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরুর সহিত যোগ করিয়া দিলে, দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই দুইটি ধাতুর পাতকে **তড়িৎ-দ্বার (Electrodes)** বলে। যে পাতটি পজিটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **অ্যানোড (Anode)** এবং অপরটি যাহা নেগেটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **ক্যাথোড (Cathode)** বলা হয়। অতএব বিদ্যুৎ অ্যানোড-দ্বারে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড-দ্বারের সাহায্যে নির্গত হয় (চিত্র ১২ক)। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের ভিতরের পদার্থটি বিযোজিত হইয়া যাইতেছে এবং এই বিযোজন-ক্রিয়া কেবলমাত্র তড়িৎ-দ্বারের নিকটেই হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ দ্রবণের ভিতর হয় না।



চিত্র ১২ক

দ্রবণের পরিবর্তে পদার্থগুলি গলিত অবস্থায় লইলেও এই উপায়ে তাহাদের তড়িৎ-বিশ্লেষণ হইয়া থাকে।

অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসাবে যে কোন ধাতু ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ প্লাটিনাম ও কপারের প্রচলন বেশী, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নিকেল, আয়রন, গ্যাসকার্বন, গ্রাফাইট প্রভৃতি বিদ্যুৎ-পরিবাহক বস্তুও ব্যবহৃত হয়;

১২-২। "তাড়িত-বিয়োজন-বাদ" (Theory of Electrolytic Dissociation) : ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আরহেনিয়াস (Arrhenius) তাঁহার বিখ্যাত তড়িৎ-বিয়োজন-বাদ প্রবর্তন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা কি ভাবে যৌগসমূহের বিয়োজন হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। এই মতানুযায়ী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি দ্রবীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই অস্থায়ী এবং স্বতঃভঙ্গুর হইয়া পড়ে। পদার্থের অণুগুলির অল্পাধিক অংশ বিযুক্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই অণুগুলি ভাঙিয়া একাধিক সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। প্রত্যেকটি অণু হইতে দুই প্রকারের তড়িৎ-যুক্ত কণার সৃষ্টি হয়—কতকগুলি **হাঁ-ধর্মী** বা **ধনাত্মক** এবং অপরগুলি **না-ধর্মী** বা **ঋণাত্মক** বিদ্যুৎ-যুক্ত।

যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রব হইলেই উহার অধিকাংশ অণু ভাঙিয়া যায়। প্রত্যেকটি সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু হইতে একটি হাঁ-ধর্মী সোডিয়াম এবং একটি না-ধর্মী ক্লোরিন কণা উৎপন্ন হয়। সেইরূপ কপার ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে, উহার একটি অণু হইতে একটি হাঁ-ধর্মী কপার এবং দুইটি না-ধর্মী ক্লোরিন কণার উদ্ভব হয়।



$$NaCl = Na^{+} + Cl^{-} \qquad HBr = H^{+} + Br^{-}$$
$$CuCl_2 = Cu^{++} + 2Cl^{-} \qquad KI = K^{+} + I^{-}$$

উপরে '+' এবং '—' চিহ্ন দ্বারা হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী কণা নির্দেশ করা হয়। ঐরূপ একটি চিহ্ন বিদ্যুতের একটি একক বুঝায়। হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী বিদ্যুৎকে যথাক্রমে **পরা** এবং **অপরা** বিদ্যুৎ নামেও অভিহিত করা হয়।

হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী কণা সমান-সংখ্যক নাও হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র পরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ এবং সমগ্র অপরা-বিদ্যুতের এককের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। অতএব, পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ সমপরিমাণে থাকার জন্য দ্রবণটি **তড়িৎ-নিরপেক্ষ** বা **তড়িৎ-উদাসী (Electrically neutral)** হইয়া থাকে।

পদার্থের অণু বিয়োজিত হইয়া যে সমস্ত বিদ্যুৎযুক্ত কণার সৃষ্টি করে তাহাদের **'আয়ন'** (ions) বলে। পরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **'ক্যাটায়ন'** (**cation**) এবং অপরা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে **'অ্যানায়ন'** (**anion**) বলে। সংক্ষেপে, পদার্থের অণুর এই প্রকার তড়িৎ-যুক্ত কণাতে বিয়োজনকে **'আয়নিত হওয়া'** বলা হয়।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং উহার বিদ্যুৎযুক্ত আয়নের ধর্মগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন, সোডিয়ামের পরমাণু জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু হাঁ-ধর্মী সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে জলের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। অন্যান্য আয়ন ও পরমাণু সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

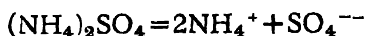
অনেক ক্ষেত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের অণু বিয়োজিত হইয়া যৌগ-মূলকের আয়নও সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন :—



$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{--}$$



$$NaNO_3 = Na^+ + NO_3^-$$



$$(NH_4)_2SO_4 = 2NH_4^+ + SO_4^{--}$$

দ্রাবের বিয়োজনের ফলে যে সকল আয়ন উৎপন্ন হয় উহাদের কোন একটিকে পৃথক করিয়া লওয়া সম্ভব নয় এবং দ্রবণ হইতে জল সরাইয়া লইলে পুনরায় পদার্থটি ফিরিয়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পর পুনর্মিলিত হয়।

জলীয় দ্রবণে অ্যাসিডের অণুগুলি বিয়োজিত হইয়া H^+ এবং অ্যানায়ন হয়। কোন কোন অ্যাসিডে প্রায় সবগুলি অণুই ভাঙিয়া যায়। যেমন, HCl, H_2SO_4 ইত্যাদি।

ইহাদের **তীব্র-অ্যাসিড** (strong) বলা হয়। আবার কোন কোন অ্যাসিডের সামান্য কিছু অণু বিয়োজিত হয় মাত্র অপর অণুগুলি আয়নিত হয় না। ইহারা মৃদু-অ্যাসিড (weak)। যেমন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, $CH_3\ COOH$, কার্বনিক অ্যাসিড, H_2CO_3 ইত্যাদি।

সেইরূপ তীব্র ক্ষারগুলি, যেমন $NaOH$, KOH, প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়। কিন্তু মৃদু-ক্ষারগুলি, যেমন NH_4OH, সামান্য বিয়োজিত হয়। অ্যাসিড বা ক্ষারের তীব্রতা বিয়োজনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে অ্যাসিড যত বেশী বিয়োজিত হয় সেইটি তত বেশী তীব্র।

লবণগুলির বিয়োজন সর্বদাই খুব বেশী। উহারা জলীয় দ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত অবস্থায় থাকে।

১২-৩। বিযোজন ও বিয়োজন (Decomposition and Dissociation) : বস্তুতঃ পদার্থের বিযোজন এবং বিয়োজনের ভিতর একটি প্রভেদ আছে। পদার্থ যখন বিযোজিত হয় তখন উহার অণুগুলি ভাঙিয়া একাধিক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহারা সহজে আর পুনর্মিলিত হইয়া আদি পদার্থে পরিবর্তিত হয় না। যেমন, $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$.

কিন্তু বিয়োজনকালে পদার্থের অণুসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া একাধিক বস্তু বা আয়ন উৎপন্ন করে। এই সকল উৎপন্ন বস্তু বা আয়ন আবার সহজেই মিলিত হইয়া পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অণুর তড়িৎ-বিয়োজন সর্বদাই এই পর্যায়ে পড়ে :


$KCl \rightleftharpoons K^+ + Cl^-$;

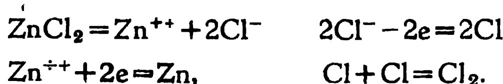

$NH_4Cl \rightleftharpoons NH_3 + HCl$

(সমীকরণ প্রকাশকালে বিয়োজন ক্রিয়াটিতে সমীকরণ চিহ্নের পরিবর্তে দুইটি বিপরীত-গতি চিহ্ন ⇌ ব্যবহৃত হয়।)

সাধারণ অর্থে বিযোজন এবং বিয়োজন এই দুইটি শব্দের ভিতর কোন পার্থক্য নাই। এখানে আমরা শব্দ দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পদার্থের একমুখী বিভাজনকে বলা হইয়াছে বিযোজন, কিন্তু বিভাজনটি যদি উভমুখী হয় তবে উহাকে বিয়োজন বলা হইবে।

১২-৪। তড়িৎ-বিশ্লেষণ : দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে দ্রাবের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। বিদ্যুৎ অ্যানোডের সাহায্যে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং অ্যানোড হইতে ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হয়। অতএব অ্যানোডকে আমরা **পরা-প্রান্ত (positive end)** এবং ক্যাথোডকে **অপরা-প্রান্ত (negative end)** বলিতে পারি। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে না-ধর্মী আয়নগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণেই বিপরীত-ধর্মী পরা-প্রান্তের দিকে এবং হাঁ-ধর্মী আয়নগুলি অপরা-প্রান্তের দিকে ধাবমান হয়। অ্যানায়নগুলি যখন পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন অ্যানোডের উপর আসিয়া পড়ে তখন উহাদের অপরা-বিদ্যুৎ লোপ পায় এবং উহারা বিদ্যুৎহীন কণা বা পরমাণুতে পরিণত হয়। ক্যাথোডেও এই ভাবেই ক্যাটায়নগুলি বিদ্যুৎহীন হইয়া পরমাণু বা কণাতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ফলে দুইটি তড়িৎ-দ্বারে পদার্থটি দুইটি নূতন পদার্থে বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ সর্বত্রই এই ভাবে হয়।

প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে জিঙ্ক ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়া দুইটি অপরা-বিদ্যুতের একক সহযোগে জিঙ্ক পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। ক্লোরিন অ্যানায়ন অ্যানোডে যাইয়া একটি অপরা-বিদ্যুতের একক পরিত্যাগ পূর্বক ক্লোরিন পরমাণু এবং অবশেষে ক্লোরিন অণুতে পরিণত হয়। এইভাবে জিঙ্ক ক্লোরাইড তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট হইয়া জিঙ্ক ও ক্লোরিন উৎপন্ন করে,



$$ZnCl_2 = Zn^{++} + 2Cl^- \qquad 2Cl^- - 2e = 2Cl$$
$$Zn^{++} + 2e = Zn, \qquad Cl + Cl = Cl_2.$$

"e" = অপরা-বিদ্যুৎ একক (unit of negative electricity)।

জিঙ্ক ক্লোরাইডের পরিবর্তে জিঙ্কের যে কোন দ্রবণীয় লবণ, যথা জিঙ্ক সালফেট, জিঙ্ক নাইট্রেট প্রভৃতি, তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সর্বদাই জিঙ্ক ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড অপরা-বিদ্যুৎবাহী। অতএব, জিঙ্ক আয়ন সব সময়ই হাঁ-ধর্মী বা পরাবিদ্যুৎ-যুক্ত হইবে।

আবার জিঙ্ক ক্লোরাইড না লইয়া যে কোনও ধাতুর দ্রবণীয় ক্লোরাইড যথা—পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কপার ক্লোরাইড প্রভৃতি, লইলে সর্বদাই ক্লোরিন অ্যানোডে নির্গত হয়। অ্যানোড পরা-বিদ্যুৎবাহী। সুতরাং, সর্বদাই ক্লোরিন আয়ন না-ধর্মী বা অপরা-বিদ্যুৎবাহী হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছে, জিঙ্ক এবং অন্যান্য যে কোন ধাতুর আয়ন এবং হাইড্রোজেনের আয়ন সকল সময়েই হাঁ-ধর্মী বা পরা-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সমস্ত অধাতু-পদার্থের আয়ন অপরা-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন বা না-ধর্মী হয়। এই কারণে হাইড্রোজেন এবং ধাতব মৌলসমূহকে **পরা-বিদ্যুৎবাহী (electro-positive)** এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অধাতব মৌলিক পদার্থগুলিকে **অপরা-বিদ্যুৎবাহী (electro-negative)** বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে কি কি বস্তু উৎপন্ন হইবে তাহা যে কেবলমাত্র সেই পদার্থের উপর নির্ভর করে, তাহা নয়। পরন্তু তড়িৎ-বিশ্লেষণ-কালীন অবস্থার উপরও নির্ভর করে। অনেক সময়েই তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে যে পদার্থটি তড়িৎ-দ্বারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে দ্রাবক অথবা তড়িৎ-দ্বারের

ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার ফলে আবার নূতন রকম পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে।

কপার সালফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণ: বিয়োজনের ফলে কপার সালফেট দ্রবণে Cu^{++}ক্যাটায়ন এবং SO_4^{--} অ্যানায়ন থাকে। দুইটি প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে এই দ্রবণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে ক্যাথোডে কপার নির্গত হয়। অ্যানোডে SO_4^{--} আয়ন গিয়া উহার অপরা-বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করিয়া SO_4 যৌগিক-মূলকে পরিণত হয়। কিন্তু SO_4 যৌগিক-মূলক, উহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। উহা জলের সহিত তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন উৎপন্ন করে। অক্সিজেন অ্যানোড হইতে বাহির হইতে থাকে।


ক্যাথোডে : $Cu^{++}+2e=Cu.$

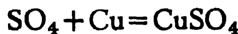

$$CuSO_4=Cu^{++}+SO_4^{--}$$


অ্যানোডে : $SO_4^{--}-2e=SO_4$


$$2SO_4+2H_2O=2H_2SO_4+O_2$$

∴ প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বার সাহায্যে কপার সালফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণে কপার ও অক্সিজেন পাওয়া যায়।

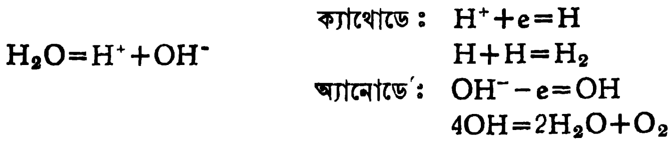
কিন্তু তড়িৎ-দ্বার দুইটি যদি প্লাটিনামের পরিবর্তে কপারের তৈয়ারী হয় তাহা হইলে SO_4 যৌগমূলক জলের সঙ্গে বিক্রিয়া না করিয়া কপার অ্যানোডের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে এবং কপার সালফেট উৎপন্ন করে। ফলে অ্যানোডের কপার দ্রবীভূত হইয়া থাকে।


$$SO_4+Cu=CuSO_4$$

∴ কপারের তড়িৎ-দ্বার সাহায্যে কপার সালফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণে ক্যাথোডে কপার পাওয়া যায় এবং অ্যানোডের কপার দ্রবীভূত হয়।

জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ: জল সুপরিবাহী না হইলেও উহার ভিতর বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে এবং জল তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। উহার কতক অণু বিয়োজনের ফলে H^+ ক্যাটায়ন এবং OH^- অ্যানায়ন সৃষ্টি করে; ($H_2O=H^++OH^-$)। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে OH^- অ্যানায়ন অ্যানোডে গিয়া উহার অপরা-বিদ্যুৎভার পরিত্যাগ করে এবং OH যৌগিক মূলকে পরিণতি লাভ করে। পরে OH যৌগিক মূলকগুলি সংযুক্ত হইয়া জল এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং অ্যানোডে আমরা অক্সিজেন নির্গত হইতে

দেখি। ক্যাথোডে অবশ্যই H^+ আয়ন মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং পরে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়। অতএব জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাই।



$H_2O = H^+ + OH^-$

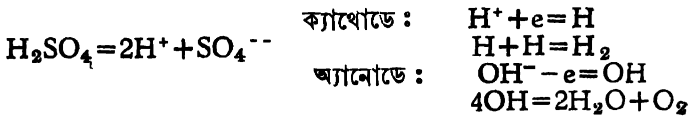
ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$

$H + H = H_2$

অ্যানোডে : $OH^- - e = OH$

$4OH = 2H_2O + O_2$

সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ : সালফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে H^+ ক্যাটায়ন এবং SO_4^{--} অ্যানায়ন আছে। প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে, H^+ ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডে গিয়া অপরা-বিদ্যুৎ গ্রহণ করে এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। দুইটি পরমাণু পরে একত্রিত হইয়া হাইড্রোজেন অণু গঠন করে এবং ক্যাথোড হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইয়া থাকে। লঘু দ্রবণে SO_4^{--} এবং জলের OH^- অ্যানায়ন উভয়েই বর্তমান। প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বার থাকিলে সাধারণতঃ OH অ্যানায়ন অ্যানোডে নিপাতিত হয় এবং উহা হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সুতরাং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়।



$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{--}$

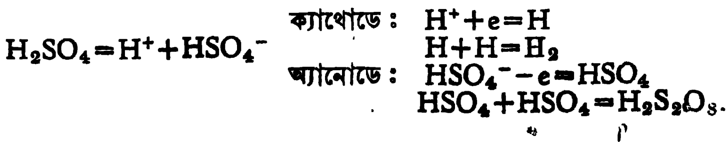
ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$

$H + H = H_2$

অ্যানোডে : $OH^- - e = OH$

$4OH = 2H_2O + O_2$

কিন্তু লঘু অ্যাসিডের পরিবর্তে যদি খুব গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড লওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা যদি বেশী দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্লিষ্ট পদার্থগুলি ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর H^+ এবং HSO_4^- আয়ন থাকে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে ক্যাথোডে যথারীতি হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কিন্তু অ্যানোডে HSO_4^- অ্যানায়ন বিদ্যুৎভার মুক্ত হইয়া HSO_4 যৌগিক মূলকে পরিণত হয়। উত্তরকালে দুইটি মূলক সংযুক্ত হইয়া $H_2S_2O_8$ পারসালফিউরিক অ্যাসিডের অণুর সৃষ্টি করে।



$H_2SO_4 = H^+ + HSO_4^-$

ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$

$H + H = H_2$

অ্যানোডে : $HSO_4^- - e = HSO_4$

$HSO_4 + HSO_4 = H_2S_2O_8$.

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ : সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে Na^+ এবং OH^- আয়ন বর্তমান। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে OH^- আয়ন অ্যানোডে গিয়া যথারীতি অক্সিজেন উৎপাদন করে। Na^+ আয়ন ক্যাথোডে গিয়া অপরা-বিদ্যুতের সাহায্যে সোডিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। সোডিয়াম পরমাণু তৎক্ষণাৎ জলের সহিত বিক্রিয়া দ্বারা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ফলে, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাই।

ক্যাথোডে : $Na^+ + e = Na$

$NaOH = Na^+ + OH^-$ $\quad$ $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$.

অ্যানোডে : $OH^- - e = OH$

$4OH = 2H_2O + O_2$

জলীয় দ্রবণের পরিবর্তে গলিত অবস্থায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে তড়িৎ-প্রবাহ দিলে, ক্যাথোডে যে সোডিয়াম উৎপন্ন হইবে তাহার আর কোন গৌণ বিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ধাতব সোডিয়ামই পাওয়া যাইবে।

এই সমস্ত ফলাফল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দ্রাব্য, দ্রাবক, দ্রবণের গাঢ়তা, তড়িৎ-দ্বারের বস্তু, তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা প্রভৃতির উপর তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফল নির্ভর করে।

বিদ্যুতের পরিমাণের একককে বলে **কুলম্ব** (Coulomb)। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ মাপিবার জন্য যে একক ব্যবহৃত হয় তাহাকে **অ্যাম্পিয়ার** (**Ampere**) বলে। কোন পরিবাহকের ভিতর দিয়া যত বেশী মাত্রায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া হইবে এবং যত বেশী সময় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে, বিদ্যুতের পরিমাণও তত বেশী হইবে। যদি কোন বস্তুর ভিতর দিয়া t সেকেণ্ডের জন্য 'c' অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে Q কুলম্ব পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে,

$$Q = c \times t.$$

কুলম্ব = অ্যাম্পিয়ার × সেকেণ্ড।

তড়িৎ-বিশ্লেষণে বিদ্যুৎ-ব্যয় এই হিসাবেই গণনা করা হয়।

১২-৫। ফ্যারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ সূত্র (Faraday's Laws of Electrolysis) : তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদার্থ-

সমূহের পরিমাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা ফ্যারাডে ১৮৩২ সালে দুইটি সূত্রের আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, যত বেশী পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, কোন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণের পরিমাণও তত বেশী হয়, অর্থাৎ বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণও তত অধিক হয়। আবার একই পরিমাণ বিদ্যুৎ দ্বারা যদি বিভিন্ন পদার্থ বিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পদার্থগুলির পরিমাণ কখনও এক হইতে পারে না। তড়িৎ-বিশ্লেষণের এই দুইটি মূল কথাই ফ্যারাডে সূত্রাকারে প্রচার করেন।

প্রথম সূত্র ঃ "তড়িৎ-বিশ্লেষণজাত পদার্থের ওজন তড়িতের পরিমাণের সমানুপাতে বাড়ে বা কমে।"

অর্থাৎ, কোন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণে যদি Q কুলম্ব তড়িৎ-প্রয়োগে W গ্রাম ওজনের একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে, $W \propto Q$

অর্থাৎ, $W = Z \times Q = Zct$ (Z= একটি নিত্য সংখ্যা।)

ইহা হইতে দুইটি নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। (ক) যদি বিভিন্ন পদার্থ বিশ্লেষণে কোন একটি নির্দিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়, সম-পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োগ করিলে একই পরিমাণ ওজনের সেই পদার্থ উৎপন্ন হইবে। জল অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যাহাই লওয়া হউক, এক কুলম্ব বিদ্যুতের দ্বারা সর্বদাই একই পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে।

(খ) একই পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োগ করিলেও বিভিন্ন পদার্থ হইতে বিশ্লেষণের ফলে যে বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইবে তাহাদের ওজন বিভিন্ন হইবেই। অর্থাৎ সর্বদাই Q কুলম্ব বিদ্যুৎ ব্যয় করিলেও W গ্রামের পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। অতএব Z অর্থাৎ নিত্য সংখ্যার পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

$$Z = \frac{W}{Q}, \text{ যদি } Q = ১ \text{ কুলম্ব হয়, তবে } Z = W$$

অতএব, এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রয়োগে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার ওজন 'Z'-এর সমান হইবে। সুতরাং কোন বস্তুর 'Z' বলিতে এক কুলম্ব বিদ্যুতের সাহায্যে ঐ পদার্থটি যে পরিমাণে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় তাহাই বুঝায়। ইহাকে (Z) **'তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক' (Electro-chemical Equivalent)** বলে।

এক কুলম্ব বিদ্যুৎ দ্বারা হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ হইতে ০০০০১০৪ গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। সুতরাং হাইড্রোজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক = ˙০০০০১০৪।

সিলভারের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক = ˙০০১১১৮। অর্থাৎ এই পরিমাণ সিলভার কোন সিলভারের যৌগিক পদার্থ হইতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা পাইতে হইলে এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রয়োজন হইবে।

এখন, একই পরিমাণ (Q) বিদ্যুৎ প্রয়োগে যদি W_1 এবং W_2 গ্রাম ওজনের দুইটি পদার্থ তড়িৎ-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে

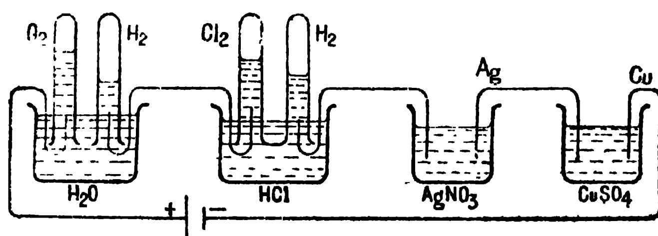
$W_1 = Z_1 Q$ এবং $W_2 = Z_2 Q$

(Z_1, Z_2, পদার্থদ্বয়ের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক)

$$\therefore \frac{W_1}{W_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

দ্বিতীয় সূত্র : "বিভিন্ন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়া একই পরিমাণ তড়িৎ প্রেরণ করিলে, বিশ্লিষ্ট পদার্থগুলির ওজনের পরিমাণ উহাদের নিজ নিজ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমানুপাতে হয়।"

পৃথকভাবে চারিটি পাত্রে যথাক্রমে জল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সিলভার নাইট্রেট, কপার সালফেট দ্রবণ লইয়া একটি ব্যাটারী হইতে (চিত্র ১২খ) একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করিলে নির্দিষ্ট সময় পরে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন,



চিত্র ১২খ—বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

ক্লোরিন, সিলভার, কপার প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত হইবে। ইহাদের ওজনের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে এবং প্রত্যেকের পরিমাণগুলি নিজ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অনুযায়ী হইবে।

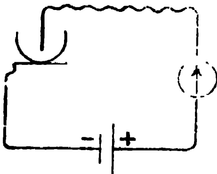
অতএব, দুইটি পদার্থের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক যদি E_1 এবং E_2 হয় এবং Q কুলম্ব বিদ্যুতের সাহায্যে W_1 এবং W_2 গ্রাম পদার্থ পাওয়া যায় তবে

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

১২-৬। তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ঃ আমরা দেখিয়াছি

$$W = Z \times C \times t\text{; অথবা } Z = \frac{W}{Ct}.$$

নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োগে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করা হয় এবং তাহা হইতে 'Z' নির্ণয় করা যাইতে পারে। সিলভারের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির করা যাইতে পারে। একটি পরিষ্কৃত প্লাটিনাম বেসিন শুষ্ক অবস্থায় তোলদণ্ডের সাহায্যে ওজন করিয়া উহাতে সিলভার নাইট্রেটের লঘু দ্রবণ লওয়া হয়। একটি সিলভার পাতের কিয়দংশ উহাতে এরূপ ভাবে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে পাতটি প্লাটিনাম বেসিনকে স্পর্শ না করে। একটি অ্যামমিটারের মধ্যস্থতায় সিলভারের পাতটি একটি ব্যাটারীর পজিটিভ মেরু এবং প্লাটিনাম বেসিনটি নেগেটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত করা হয় (চিত্র ১২গ)। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (t সেকেণ্ড) বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। অ্যামমিটার হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা (C) জানা যায়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে দ্রবণ হইতে প্লাটিনাম বেসিনের উপর একটি সিলভার প্রলেপ পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে, বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া প্লাটিনাম বেসিনটি পাতিত জলে ধুইয়া শুষ্ক করিয়া ওজন করা হয়। এই দুইটি ওজন হইতে প্লাটিনামের উপর সঞ্চিত সিলভারের ওজন (W) জানা যায়। এক্ষেত্রে W, C, এবং t জানা আছে বলিয়া Z অর্থাৎ তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্কও জানা সম্ভব।



চিত্র ১২গ—তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নির্ণয়

এইভাবে অন্যান্য পদার্থের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্কও নিরূপণ করা যাইতে পারে।

১২-৭। রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নির্ণয় প্রথম সূত্র হইতে আমরা দেখিয়াছি,

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

এবং দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, $\frac{W_1}{W_2} = \frac{E_1}{E_2}$.

সুতরাং $\frac{E_1}{E_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$.

(E_1, E_2, রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক, এবং Z_1, Z_2 তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক)

মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যা, তেমনই উহাদের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্কও নির্দিষ্ট। অতএব উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে আমরা সহজেই রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করিতে পারি।

(১) সিলভারের ও অক্সিজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক যথাক্রমে ০০১১১৮ এবং ·০০০০৮২৮। অক্সিজেনের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক = ৮।

অতএব, $$\frac{E_{Ag}}{E_{O_2}} = \frac{Z_{Ag}}{Z_{O_2}}$$

∴ সিলভারের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক, $E_{Ag} = \frac{Z_{Ag}}{Z_{O_2}} \times E_{O_2}$

$$\frac{\text{·০০১১১৮}}{\text{·০০০০৮২৮}} \times \text{৮} = \text{১০৮}$$

(২) আবার, হাইড্রোজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক = ০০০০১০৪ এবং রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক = ১, অতএব,

$$\frac{E_{Ag}}{E_H} = \frac{Z_{Ag}}{Z_H}$$

অথবা $E_{Ag} = \frac{Z_{Ag}}{Z_H} \times E_H = \frac{Z_{Ag}}{\text{·০০০০১০৪}} \times \text{১}$

অর্থাৎ $Z_{Ag} = E_{Ag} \times \text{·০০০০১০৪}$

কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক দ্বারা হাইড্রোজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক গুণ করিলে মৌলটির তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক পাওয়া যায়।

প্রতি কুলম্ব বিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমাণ মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক। অতএব এক 'গ্রাম-তুল্যাঙ্ক' পরিমাণ (Gram-equivalent) মৌলিক পদার্থ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করিতে কত কুলম্ব বিদ্যুৎ প্রয়োজন তাহা অনায়াসেই নির্ধারণ করা সম্ভব। (গ্রাম-তুল্যাঙ্ক বলিতে পদার্থের তুল্যাঙ্ক সংখ্যক গ্রাম ওজনের মৌলিক পদার্থ বুঝায়।) পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

মৌলিক পদার্থ	গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক	বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক পদার্থ উৎপন্ন করিতে কুলম্ব প্রয়োজন
H	১'০০৮	০০০০১০৪	$\frac{১'০০৮}{'০০০০১০৪}$ = ৯৬৪৯৬
Ag	১০৭'৮৮	'০০১১১৮	$\frac{১০৭'৮৮}{'০০১১১৮}$ = ৯৬৪৯৫
O	৮ ০	·০০০০৮২৯	$\frac{৮}{'০০০০৮২৯}$ = ৯৬৪৯৫
Cu	৩১'৭৮	·০০৩২৯৪	$\frac{৩১'৭৮}{'০০০৩২৯৪}$ = ৯৬৪৯৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে কোন মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক পরিমাণ গ্রাম ওজন উৎপন্ন করিতে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন =৯৬৪৯৫ কুলম্ব এবং এই বিদ্যুৎ পরিমাণকে সাধারণতঃ **'এক ফ্যারাডে'** বিদ্যুৎ বলা হয়।

পক্ষান্তরে একথা বলা যাইতে পারে, যে কোন মৌলিক পদার্থের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আয়নের বিদ্যুৎভার ৯৬৪৯৫ কুলম্ব। অর্থাৎ ১ গ্রাম হাইড্রোজেনের আয়ন এবং ৩১'৭৮ গ্রাম কপারের আয়ন উভয়েই ৯৬৪৯৫ কুলম্ব বিদ্যুৎ বহন করে। আবার—

এক গ্রাম পরমাণু = এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক × যোজ্যতা

অথবা, $\text{এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক} = \frac{\text{এক গ্রাম-পরমাণু}}{\text{যোজ্যতা}}$

কপারের যোজ্যতা ২, অতএব ১ গ্রাম হাইড্রোজেন আয়নে যতটা আয়ন আছে, ৩১'৭৮ গ্রাম কপার আয়নে তাহার অর্ধেক সংখ্যক আয়ন আছে। সুতরাং ১টি কপার আয়নে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বর্তমান ২টি হাইড্রোজেন আয়নেও সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। প্রতি হাইড্রোজেন আয়নে পরা-বিদ্যুতের একটি একক থাকে। অতএব একটি কপারের আয়নে দুইটি পরা-বিদ্যুতের একক থাকে।

সুতরাং যে মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা যত, উহার আয়নে বিদ্যুতের এককও তত সংখ্যক। ক্লোরিনের যোজ্যতা এক, উহার আয়নে অপরা-বিদ্যুতের একটি

একক আছে। বেরিয়ামের যোজ্যতা দুই, উহার আয়নে পরা-বিদ্যুতের দুইটি একক আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি সমস্ত ধাতব মৌল এবং হাইড্রোজেন পরা-বিদ্যুৎবাহী। হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অধাতব মৌলগুলি অপরা-বিদ্যুৎবাহী।

তড়িৎ-বিশ্লেষণে পরা-বিদ্যুৎবাহী মৌলগুলির আয়ন ক্যাথোডে যায় এবং সেখান হইতে অপরা-বিদ্যুৎ গ্রহণ (electron) করিয়া তড়িৎ-উদাসী পরমাণুতে পরিণত হয়। এই অপরা-বিদ্যুৎ গ্রহণ-ক্ষমতা সব ধাতুর সমান নহে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী মৌলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। নীচে সেই তাড়িত-রাসায়নিক বৈভব শ্রেণীটি (electro-chemical series) দেওয়া হইল।

পক্ষান্তরে, অপরা-বিদ্যুৎবাহী অধাতব মৌলগুলির আয়ন অ্যানোডে অপরা-বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করিয়া তড়িৎ-উদাসী পরমাণুতে পরিণতি লাভ করে। তদনুযায়ী উহাদেরও একটি সারণী দেওয়া হইল।

পরা-বিদ্যুৎবাহী মৌল		অপরা-বিদ্যুৎবাহী মৌল
পটাসিয়াম	নিকেল	ফ্লোরিন
সোডিয়াম	টিন	অক্সিজেন
বেরিয়াম	লেড	
ক্যালসিয়াম	হাইড্রোজেন	
ম্যাগনেসিয়াম	কপার	আয়োডিন
অ্যালুমিনিয়াম	মারকারি	সালফার
জিঙ্ক	সিলভার	ফসফরাস
আয়রন	গোল্ড	নাইট্রোজেন

অনুশীলনী

১। ফ্যারাডের সূত্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের তুল্যাঙ্ক কি ভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

৩। "তাড়িত-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক", "আয়ন", এবং "ফ্যারাডে"—এই তিনটি কথার অর্থ কি ?

৪। এক ঘণ্টার জন্য এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতরে পরিচালনা করিলে প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন কত হইবে ?

৫। ১.৫ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ৩০ মিনিট পরিচালনার ফলে একটি লবণের দ্রবণ হইতে ধাতু সঞ্চিত হইয়া ক্যাথোডের ওজন ·৮৮৯৮ গ্রাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধাতুটি দ্বিযোজী, উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত ?

৬। একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ টিন ক্লোরাইড দ্রব এবং জলের ভিতর দিয়া পরিচালনা করা হইয়াছে। ১ গ্রাম টিন বিশ্লিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহার আয়তন কত ?

৭। পটাসিয়াম আয়োডাইড, কপার সালফেট, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই তিনটি দ্রবণের ভিতর হইতে এক ক্যারাডে বিদ্যুৎ দ্বারা কি কি পদার্থ কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে ?

৮। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, কপার সালফেট দ্রবণ এবং সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ দিলে কোন্ কোন্ পদার্থ পাওয়া যাইবে ? (ক) ০·১ গ্রাম কপার যখন বিযোজিত হইবে, এবং (খ) ০·১৫ গ্রাম সিলভার যখন বিযোজিত হইবে, তখন উৎপন্ন হাইড্রোজেনের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন কত হইবে ? (কলিকাতা বিশ্ব: ১৯৪০)

৯। কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর দিয়া একঘন্টা ১·৮৬৪ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়ার ফলে ২·২১৮ গ্রাম কুপার উৎপন্ন হইল। কপারের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক কত ?

১০। একটি ডেনিয়েল সেলের ব্যাটারী হইতে কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়ার ফলে এক ঘণ্টায় ৩১·৫ গ্রাম কপার উৎপন্ন হইল। ব্যাটারীর ভিতর এই সময়ে কত পরিমাণ কপার উৎপন্ন হইল এবং কি পরিমাণ জিঙ্ক দ্রবীভূত হইল ? [Cu=৬৩ ; Zn=৬৫]

১১। "তড়িৎ-বিয়োজন বাদ" সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের ভিতর দিয়া ২·১ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ ২০ মিনিট পরিচালনা করিলে কতটুকু সিলভার ক্যাথোডে সঞ্চিত হইবে ? (বারাণসী ১৯৩৩)

১২। মৌলিক পদার্থের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায় ? সিলভারের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক ·০০১১১৮ হইলে অক্সিজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক কত ? (Ag=১০৮) (কলিকাতা বিশ্ব:, ১৯৪৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অম্ল, ক্ষারক, ও লবণ

১৩-১। মৌলিক পদার্থ ঃ ইহাদের নামকরণের কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম নাই। কোন কোন সময় উহার প্রাপ্তিস্থান রঙ্ বা কোন স্বাভাবিক ধর্ম দ্বারা উহাদের নাম স্থির করা হইয়াছে :—ষ্ট্রনসিয়াম (স্কটল্যাণ্ড), ক্লোরিন (সবুজ), রেডিয়াম (রশ্মিবিকিরণকারী) ইত্যাদি। অনেক সময় কোন দেশ বা গ্রহের নামানুসারেও উহাদের নাম রাখা হইয়াছে, যেমন পলোনিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। সাধারণতঃ ধাতুসমূহের নামের শেষে—**আম্ (-um)** সংযুক্ত থাকে ; সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম আছে।

যৌগিক পদার্থ ঃ একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

দুইটিমাত্র মৌলিক পদার্থের সহযোগে যে সকল যৌগিক পদার্থ গঠিত তাহাদিগকে দ্বিযৌগিক পদার্থ বলে। যেমন, CaO, Mg_3N_2, NaCl।

দ্বিযৌগিক পদার্থের নামে দুইটি মৌলিক পদার্থেরই উল্লেখ থাকে এবং নামের শেষে **'-আইড'** (-ide) যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যদি এই দুইটি মৌলিক পদার্থের একটি কোন ধাতু বা হাইড্রোজেন হয় তবে উহার নাম প্রথমে উল্লিখিত হয়। যেমন:

CaO = ক্যালসিয়াম অক্সা**ইড**

NaCl = সোডিয়াম ক্লোরা**ইড**

Mg_3N_2 = ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রা**ইড**

H_2S = হাইড্রোজেন সালফা**ইড**

কিন্তু যদি সংযুক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটির কোনটিই ধাতু না হয়, তবে উহাদের মধ্যে যেটি অধিকতর অপরা-বিদ্যুৎবাহী (Electro-negative) তাহা পরে স্থান পাইবে। অনেক সময় উহাদের পরমাণুর সংখ্যা বুঝাইবার জন্য উহাদের নামের সঙ্গে **মনো** (এক, mono), **ডাই** (দুই, di), **ট্রাই** (তিন, tri) ইত্যাদি জুড়িয়া দেওয়া হয়। যথা:

CO = কার্বন **মনো**ক্সাইড

CCl_4 = কার্বন **টেট্রা**ক্লোরাইড

P_2S_5 = ফসফরাস **পেণ্টা**সালফাইড

SF_6 = সালফার **হেক্সা**ক্লোরাইড

CS_2 = কার্বন **ডাই**সালফাইড

দুইটি মৌলিক পদার্থ যখন একাধিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, তখন যেটিতে ধাতুর পরিমাণ বেশী তাহাকে ধাতুর নামের সঙ্গে **-আস্** (-ous) যোগ করিয়া উল্লেখ করা হয়। যেটিতে ধাতুর অনুপাত কম তাহাকে ধাতুর নামের সঙ্গে **'-ইক্'** (-ic) যোগ করিয়া দেওয়া হয়। যথা:

$FeCl_2$ = **ফেরাস** ক্লোরাইড Cu_2O = **কিউপ্রাস** অক্সাইড

$FeCl_3$ = ফেরিক ক্লোরাইড   CuO = কিউপ্রিক অক্সাইড

একথাও বলা চলে, যে যৌগটিতে ধাতুর যোজ্যতা কম উহা -আস্ যৌগ, যেটিতে ধাতুর যোজ্যতা বেশী উহা -ইক যৌগ।

তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থকে ত্রি-যৌগিক পদার্থ বলা হয়। সেই রকম চারিটি মৌলিক পদার্থের যৌগকে চতুর্যৌগিক পদার্থ নাম দেওয়া হয়।

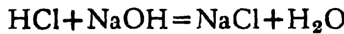
ত্রিযৌগিক পদার্থ—$KClO_3$, $CaCO_3$, H_2SO_4, HNO_3 ইত্যাদি।

চতুর্যৌগিক পদার্থ—$KHSO_4$, NaH_2PO_4 ইত্যাদি।

এই সকল যৌগিক পদার্থ অধিকাংশই অ্যাসিড, ক্ষার অথবা লবণ এই তিন শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের নাম সেই সকল অ্যাসিড, লবণ প্রভৃতির সংযুতি অনুসারে হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী যৌগসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অ্যাসিড ও ক্ষারক জাতীয় পদার্থগুলিই প্রধান।

অ্যাসিড ও ক্ষারক জাতীয় পদার্থ সাধারণতঃ বিপরীত-ধর্মী। যে কোন অ্যাসিড কোন ক্ষারের সংস্পর্শে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়াতে সর্বদাই জল এবং লবণ জাতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। খাদ্য লবণও (NaCl) লবণ শ্রেণীতে পড়ে। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি ক্ষার। উহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেই সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়ঃ



$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$

অ্যাসিড ক্ষার লবণ জল

ইহা ছাড়াও অ্যাসিড এবং ক্ষারে কতগুলি বিশেষ গুণ বর্তমান থাকে।

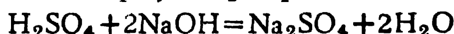
১৩-২। অম্ল বা অ্যাসিডঃ অ্যাসিড মাত্রই হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। ধাতু দ্বারা ইহাদের হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে প্রতিস্থাপনীয়। ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারী যৌগমূলক দ্বারাও অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করা যায়। অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে উহার অণুগুলি বিয়োজিত হইয়া এক বা একাধিক হাইড্রোজেন আয়নের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড সর্বদাই ক্ষারক দ্রব্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া জল এবং লবণ উৎপন্ন করে। অ্যাসিড সাধারণতঃ অম্লস্বাদযুক্ত হয় এবং উহা নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করিতে পারে। কোন পদার্থে এই সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকিলেই উহাকে অ্যাসিড বলা যাইতে পারে।

সালফিউরিক অ্যাসিড নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করে। ইহাতে হাইড্রোজেন বর্তমান এবং জলীয় দ্রবণে এই হাইড্রোজেন আয়নিত হইয়া

থাকে। ধাতু এবং ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া যে পদার্থ হয় তাহাতে ইহার হাইড্রোজেন ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।



$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{--}, \quad H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2$$



$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$$

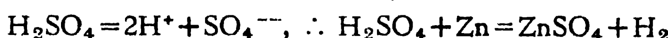
বস্তুতঃ যে কোন পদার্থের দ্রবণে যদি H^+ আয়ন উৎপন্ন হয় তাহা হইলে উহাকে আম্লিক বা অ্যাসিডিক বলা যাইতে পারে।



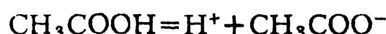
যেমন, $NaHSO_4 = Na^+ + H^+ + SO_4^{--}$

যদিও $NaHSO_4$ একটি লবণ, উহাকে আম্লিক লবণ বলা হয়।

জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অ্যাসিডের অণু বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) সৃষ্টি করে। অণুতে যতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিবে সবগুলিই যে আয়নিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। হাইপো-ফসফরাস অ্যাসিডে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। উহাদের মধ্যে একটি মাত্র আয়নিত হইয়া থাকে। $H_3PO_2 = H^+ + H_2PO_2^-$। যে সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হয় তাহারাই শুধু অন্য ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে।



$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{--}, \quad \therefore H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2$$



$$CH_3COOH = H^+ + CH_3COO^-$$



$$\therefore \quad 2CH_3COOH + 2K = 2CH_3COOK + H_2$$

অ্যাসিডসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :

(১) **হাইড্রো-অ্যাসিড**—ইহাতে যথারীতি হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু কোন অক্সিজেন নাই। ইহাদের নামের পূর্বে 'হাইড্রো' শব্দ যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যেমন HCl, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCN, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

(২) **অক্সি-অ্যাসিড**—ইহাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুই-ই বর্তমান। এই সকল অ্যাসিডে আর একটি অধাতু থাকে, তাহার নামানুসারে ইহাদের নামকরণ হয়। অক্সিজেনের অনুপাত কম বা বেশী থাকিলে -**য়াস** এবং -**ইক** নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা—

HNO_3 নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_2 নাইট্রাস অ্যাসিড
H_2SO_4 সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_3 সালফিউরাস অ্যাসিড
H_3PO_4 ফসফরিক অ্যাসিড	H_3PO_3 ফসফরাস অ্যাসিড ইত্যাদি।

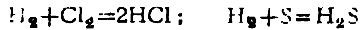
১৩-৩। অ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী: বিভিন্ন উপায়ে অ্যাসিড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাধারণ কয়েকটি প্রণালী এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) অধাতুর অক্সাইডের সহিত জলের ক্রিয়ার ফলে অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



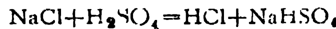
$$SO_3+H_2O=H_2SO_4\ ; \qquad N_2O_5+H_2O=2HNO_3.$$

(২) হাইড্রোজেনের সহিত কোন কোন অধাতুর সাক্ষাৎ রাসায়নিক সংযোগের ফলেও অ্যাসিড প্রস্তুত হইতে পারে।

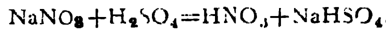


$$H_2+Cl_2=2HCl\ ; \qquad H_2+S=H_2S.$$

(৩) অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী অ্যাসিড অন্য কোন উদ্বায়ী অ্যাসিডের লবণের উপর বিক্রিয়া করিয়া শেষোক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন করিতে পারে। যেমন,



$$NaCl+H_2SO_4=HCl+NaHSO_4$$



$$NaNO_3+H_2SO_4=HNO_3+NaHSO_4.$$

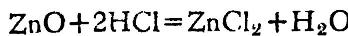
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের উদ্বায়িতা সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে অনেক বেশী।

যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ অক্সিজেন এবং অপর একটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে গঠিত তাহাদিগকে অক্সাইড বলা হয়। যে সকল যৌগিক পদার্থের অণুতে 'হাইড্রক্সিল' (OH) যৌগিক মূলক আছে, তাহাদিগকে হাইড্রক্সাইড বলে।

MgO—ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, NaOH—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড।

CaO—ক্যালসিয়াম অক্সাইড, $Ca(OH_2)$—ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড।

১৩-৪। ক্ষারক (Base): সাধারণতঃ ধাতব মৌলের অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইডসমূহকে ক্ষারক বলা হয়। ইহাদের প্রধান ধর্ম অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া দ্বারা জল এবং লবণ উৎপন্ন করা।



$$ZnO+2HCl=ZnCl_2+H_2O$$

ক্ষারক অ্যাসিড লবণ জল



$$Ca(OH)_2+H_2SO_4=CaSO_4+H_2O$$

ক্ষারক অ্যাসিড লবণ জল

অ্যামোনিয়া, ফসফিন প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড নয় এবং যদিও উহারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে লবণ উৎপন্ন করে, কিন্তু কোন জল প্রস্তুত হয় না। সংজ্ঞা অনুসারে ঠিক না হইলেও, ইহাদের ক্ষারক বলিয়াই মনে করা হয়। যথা— $NH_3+HCl=NH_4Cl.$

ক্ষার (Alkalies ঃ কোন কোন ক্ষারকীয় হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়। সেই সকল দ্রবণে ক্ষারক সর্বদাই বিয়োজিত হইয়া **হাইড্রক্সিল** (OH^-) আয়ন উৎপন্ন করে। এই সকল ক্ষারকীয় পদার্থের দ্রবণকে কেবলমাত্র **'ক্ষার'** বলা হয়। ক্ষার অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে লবণ এবং জল উৎপন্ন করে, লাল রঙের লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত করে। সচরাচর এই সকল দ্রবণ স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বলিয়া মনে হয়। $NaOH$, KOH, NH_4OH প্রভৃতি ক্ষার বলিয়া গণ্য হয়। ক্ষার মাত্রই ক্ষারক, কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নহে।

CaO ক্ষারক, জলে ইহা দ্রবীভূত হইয়া $Ca(OH)_2$ ক্ষারে পরিণত হয় এবং বিয়োজিত হইয়া OH^- আয়ন সৃষ্টি করে।



$$Ca(OH)_2 = Ca^{++} + 2OH^-$$

১৩-৫। ক্ষারক-প্রস্তুতি ঃ ক্ষারক-প্রস্তুতির কয়েকটি উপায় আছে।

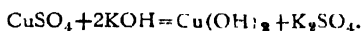
(১) ধাতব মৌলিক পদার্থগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধাতব অক্সাইড হয়। ইহারা ক্ষারক-জাতীয়।



$$2Mg + O_2 = 2MgO \; ; \qquad 2Cu + O_2 = 2CuO$$

এ জাতীয় অক্সাইড ধাতুর হাইড্রক্সাইড, কার্বনেট বা নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করিয়াও অনেক সময় পাওয়া যায়।

(২) দ্রবীভূত লবণের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়া দ্বারা অনেক সময় হাইড্রক্সাইড ক্ষারক অধঃক্ষিপ্ত হয়।

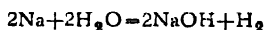


$$CuSO_4 + 2KOH = Cu(OH)_2 + K_2SO_4.$$

লবণ ক্ষার ক্ষারক লবণ

যে সমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় এবং যাহাতে হাইড্রক্সিল মূলক বর্তমান তাহারাই ক্ষার। ক্ষার দুইটি উপায়ে প্রস্তুত সম্ভব।

(১) কোন কোন ধাতুর সহিত জলের বিক্রিয়ায় ক্ষার প্রস্তুত হয়।



$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$



$$Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$$

(২) কোন কোন ধাতব অক্সাইড জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষার উৎপন্ন করে।

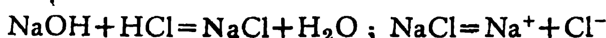


$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2 \; ; \qquad Na_2O + H_2O = 2NaOH.$$

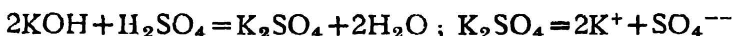
১৩-৬। প্রশমন-ক্রিয়া (Neutralisation) ঃ অ্যাসিড ও ক্ষারক একত্র হইলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া হইয়া থাকে। বিক্রিয়ার ফলে লবণ

ও জল উৎপন্ন হয়। এই লবণ ও জলের কোন ক্ষারকত্ব বা অম্লত্ব থাকে না। অতএব অ্যাসিড ক্ষারকীয় পদার্থের ক্ষারকত্ব দূর করে এবং ক্ষারকও অ্যাসিডের অম্লত্ব প্রশমিত করিয়া থাকে। অ্যাসিড এবং ক্ষারকের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়াকে প্রশমন-ক্রিয়া বলা হয়।

প্রশমন-ক্রিয়ার ফলে যে লবণ উৎপন্ন হয়, সেগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয় এবং বিয়োজিত অবস্থায় থাকে। যেমন,



$$NaOH+HCl=\underset{\text{(লবণ)}}{NaCl}+H_2O\ ;\ NaCl=Na^++Cl^-$$



$$2KOH+H_2SO_4=K_2SO_4+2H_2O\ ;\ K_2SO_4=2K^++SO_4^{--}$$

অতএব এই সকল বিক্রিয়াকে আমরা আয়নের সাহায্যে লিখিতে পারি। যথা :—



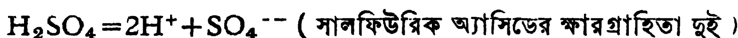
$$Na^++OH^-+H^++Cl^-=Na^++Cl^-+H_2O$$



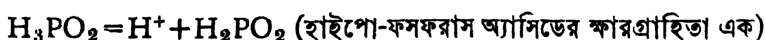
অথবা, $$2K^++2OH^-+2H^++SO_4^{--}=2K^++SO_4^{--}+2H_2O.$$

দেখা যাইতেছে যে কোন অ্যাসিড ও ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়াতে কেবল H^+ আয়নের সহিত OH^- আয়নের মিলন সম্পাদিত হয়।

৯৩·৭। অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা এবং ক্ষারকের অম্লগ্রাহিতা (Basicity of an acid and acidity of a base): দেখা যায় দুইটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু এবং একটি সালফিউরিক অ্যাসিড অণু পৃথকভাবে দুইটি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অণুকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন অ্যাসিডের ক্ষারকত্ব-প্রশমন-ক্ষমতা এক নয়। অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা বলিতে এই ক্ষারকত্ব-প্রশমন-ক্ষমতা বুঝায়। অ্যাসিডের প্রতিটি অণু হইতে যে কয়টি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয় অথবা যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইতে পারে, সেই সংখ্যা দ্বারা অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা নির্দেশ করা হয়।



$H_2SO_4=2H^++SO_4^{--}$ (সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা দুই)



$H_3PO_2=H^++H_2PO_2$ (হাইপো-ফসফরাস অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা এক)

অর্থাৎ, সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বি-ক্ষারিক, হাইপো-ফসফরাস অ্যাসিড এক-ক্ষারিক।

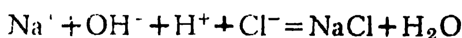
সেই রকম বিভিন্ন ক্ষারকের অ্যাসিড-প্রশমন-ক্ষমতাও এক হয় না। একটি সালফিউরিক অ্যাসিডের অণু প্রশমন করিতে পৃথকভাবে একটি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং দুইটি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অণুর প্রয়োজন হয়। ক্ষারের দ্রবণে প্রতি অণু হইতে যে কয়টি $(OH)^-$ হাইড্রক্সিল আয়ন-এর সৃষ্টি হয় তদ্দারা উহার অম্ল-গ্রাহিতা নির্দেশ করা হয়।



$$Ca(OH)_2 = Ca^{++} + 2OH^-$$

সুতরাং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের অম্লগ্রাহিতা দুই। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একাম্লিক, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্বি-আম্লিক ইত্যাদি।

১৩৮। লবণ (Salt) ঃ অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়াতে জলের সহিত অপর যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকেই লবণ বলে। অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ধাতুদ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণের সৃষ্টি হয়। অ্যাসিড ও ক্ষারকের প্রশমনক্রিয়া হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ক্ষারকের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশ অ্যাসিডের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের সহিত মিলিত হইয়া লবণ গঠন করিয়া থাকে।



$$Na^+ + OH^- + H^+ + Cl^- = NaCl + H_2O$$

ক্ষারক অ্যাসিড

এই জন্য লবণের ধাতব অংশকে ক্ষারকীয় অংশ (basic part) এবং অপর অংশকে আম্লিক অংশ (acidic part) বলা হয়। এই সমস্ত হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী আয়নগুলি মৌলিক পদার্থের নাও হইতে পারে, উহাদের স্থলে পরা- এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী যৌগমূলকও হইতে পারে ; যেমন—



$$NH_4^+ + OH^- + H^+ + NO_3^- = NH_4NO_3 + H_2O$$

পরাবিদ্যুৎবাহী NH_4^+ আয়ন ধাতুর হাঁ-ধর্মী আয়নের মতই ব্যবহার করে এবং NO_3^-, SO_4^{--}, CO_3^{--} ইত্যাদি না-ধর্মী যৌগমূলকগুলির ধর্ম সাধারণ না-ধর্মী আয়নের মতই হইয়া থাকে।

অ্যাসিড ও ক্ষারকের ক্রিয়া ছাড়াও আরও অনেক উপায়ে ক্ষারীয় অংশ ও আম্লিক অংশের সংযোগের ফলে লবণের উৎপত্তি হইতে পারে। লবণ প্রস্তুতির কয়েকটি উপায় নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) অ্যাসিড ও ক্ষারকের রাসায়নিক বিক্রিয়াদ্বারা লবণ তৈয়ারী করা যায়। ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

(২) অ্যাসিডের সহিত কোন কোন ধাতুর ক্রিয়ার ফলেও লবণের উৎপত্তি হয়; যেমন,—



$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$$

(৩) উদ্বায়ী অ্যাসিডের লবণের উপর অনুদ্বায়ী অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলেও লবণ পাওয়া যাইতে পারে। যথা—



$$2NaCl+H_2SO_4=Na_2SO_4+3HCl$$

(৪) একটি ধাতু ও একটি অধাতুর রাসায়নিক সংযোজনা দ্বারাও লবণ উৎপন্ন হইতে পারে;

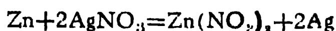


$$Cu+Cl_2=CuCl_2$$

(৫) একটি লবণের ক্ষারীয় অংশকে অন্য একটি ধাতুদ্বারা প্রতিস্থাপিত করিয়া অপর একটি লবণ প্রস্তুত করাও সম্ভব।



$$Fe+CuSO_4=FeSO_4+Cu$$



$$Zn+2AgNO_3=Zn(NO_3)_2+2Ag$$

এই সকল প্রতিস্থাপনাতে যে ধাতুর পরাবিদ্যুৎবাহিতা বেশী সেইটিই প্রতিস্থাপিত হইয়া থাকে।

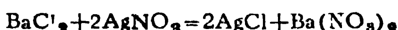
(৬) একটি ক্ষারকীয় অক্সাইডের সহিত একটি আম্লিক অক্সাইডের মিলনেও লবণ প্রস্তুত হয়। যেমন :—



$$CaO+CO_2 = CaCO_3$$

ক্ষারকীয় অক্সাইড   আম্লিক অক্সাইড   লবণ

(৭) সময় সময় দুইটি লবণের দ্রবণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পরস্পরের ক্ষারকীয় অংশগুলির বিনিময় হয় এবং নূতন লবণের সৃষ্টি হয়। যেমন,



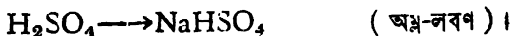
$$BaCl_2+2AgNO_3=2AgCl+Ba(NO_3)_2$$

১৩-৯। লবণের শ্রেণী-বিভাগ: অ্যাসিডের সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতুদ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে নরম্যাল **বা শমিত (Normal) লবণ** বলে।

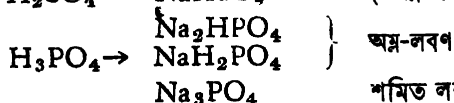


$$H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 \text{ (শমিত লবণ)}$$

কিন্তু যদি আংশিকভাবে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়, তবে উৎপন্ন লবণের অণুতে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিয়া যাইবে। এই রকম লবণকে **অম্ল-লবণ (Acid Salt)** বলে।



$$H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 \text{ (অম্ল-লবণ)}$$



$$H_3PO_4 \rightarrow \begin{cases} Na_2HPO_4 \\ NaH_2PO_4 \end{cases} \text{ অম্ল-লবণ}$$

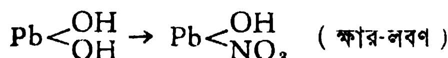
$$Na_3PO_4 \text{ শমিত লবণ}$$

অম্ল-লবণ দ্রবীভূত হইলে উহার হাইড্রোজেন আয়নিত হয় এবং অম্ল-লবণের আরও ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে।



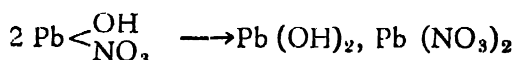
$$NaHSO_4 \longrightarrow Na^+ + H^+ + SO_4^{--}$$

ক্ষারের OH মূলককে অধাতু অথবা আম্লিক মূলক (যথা SO_4, NO_3 ইত্যাদি) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলেও লবণ উৎপন্ন হয়। ক্ষার-অণুর সবগুলি OH মূলক যদি প্রতিস্থাপিত না হয়, কেবল আংশিক প্রতিস্থাপন করা হইলে যে লবণ পাওয়া যায় তাহাকে **ক্ষার-লবণ (Basic Salt)** বলে। যেমন :—



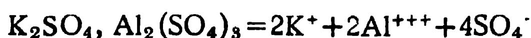
$$Pb<^{OH}_{OH} \rightarrow Pb<^{OH}_{NO_3} \quad \text{(ক্ষার-লবণ)}$$

এই সকল ক্ষার-লবণকে ক্ষার এবং শমিত লবণের মিশ্রণরূপে ধরা যাইতে পারে।



$$2\,Pb<^{OH}_{NO_3} \longrightarrow Pb(OH)_2,\ Pb\ (NO_3)_2$$

কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি লবণ একত্রিত হইয়া যুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন, পটাসিয়াম সালফেট এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট দ্রবণ একত্র করিয়া কেলাসিত করিলে উহা হইতে যে স্ফটিক পাওয়া যায় তাহার সঙ্কেত $K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$, অর্থাৎ প্রতিটি পটাসিয়াম সালফেট অণুর সহিত একটি অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের অণু যুক্ত আছে। ইহাদিগকে **দ্বি-ধাতুক লবণ (Double Salt)** বলে। ইহারা জলে দ্রব হইলে ইহাদের মধ্যস্থিত লবণ দুইটি স্বাধীনভাবে বিয়োজিত হইয়া নিজেদের আয়নের সৃষ্টি করে।



$$K_2SO_4,\ Al_2(SO_4)_3 = 2K^+ + 2Al^{+++} + 4SO_4^{-}$$

দুইটি লবণ আবার ক্ষেত্রবিশেষে এমনভাবে যুক্ত হইয়া যাইতে পারে যে উহাদের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণ লোপ পায়। একটি নূতন লবণের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া আয়ন উৎপন্ন করে। যেমন—



$$2KCl + PtCl_4 = K_2PtCl_6\ ; \qquad K_2PtCl_6 = 2K^+ + PtCl_6^{--}$$

ইহাদিগকে **'জটিল লবণ' (Complex Salt)** বলা যাইতে পারে। কঠিন অবস্থায় দ্বি-ধাতুক লবণ এবং জটিল লবণ, উভয়ের মধ্যেই একটি নূতন লবণের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থায় দ্বি-ধাতুক লবণ নির্দিষ্ট আণবিক অনুপাতে মিশ্রিত উপাদান-লবণ দুইটির সমসত্ত্ব মিশ্রের ন্যায় ব্যবহার করে। জটিল লবণ এরূপ অবস্থাতেও আদি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

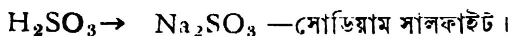
১৩-১০। লবণের নামকরণ : ধাতুর নামের সহিত যে অ্যাসিড হইতে লবণ উদ্ভূত উহার নাম যুক্ত করিয়া লবণের নাম দেওয়া হয়। যদি অম্ল-অ্যাসিড হয় তবে নামের শেষে -'য়েট' (-ate) জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং হাইড্রা-অ্যাসিডের লবণ হইলে নামের শেষে -'আইড' (-ide) যুক্ত করা হয়। যেমন—

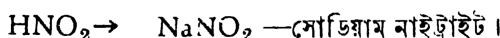
Na_2SO_4 —সোডিয়াম সালফেট KCN —পটাসিয়াম সায়ানাইড

KNO_3 —পটাসিয়াম নাইট্রেট PbI_2 — লেড আয়োডাইড

$KClO_3$ —পটাসিয়াম ক্লোরেট NaCl —সোডিয়াম ক্লোরাইড

অনধিক অক্সিজেন-সম্পন্ন '-য়াস্' (-ous) অ্যাসিডের লবণের নামের শেষে –'য়াইট্' (-ite) যুক্ত করা হয়।


$H_2SO_3 \rightarrow$ Na_2SO_3 —সোডিয়াম সালফাইট।


$HNO_2 \rightarrow$ $NaNO_2$ —সোডিয়াম নাইট্রাইট।

* * * * * * *

১৩-১১। রাসায়নিক বিক্রিয়া : সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া এক রকম নহে। কোন ক্ষেত্রে হয়ত একাধিক পদার্থ যুক্ত হইয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে একটি পদার্থ বিশ্লেষিত হইয়া একাধিক পদার্থ উৎপন্ন করে। রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

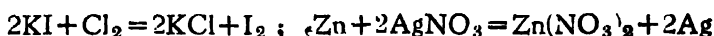
(১) **বিযোজন বা বিশ্লেষণ ক্রিয়া (Decomposition) :** একটি বস্তু হইতে একাধিক নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিযোজন বা বিশ্লেষণ ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—


$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \;;\qquad 2HgO = 2Hg + O_2$$

(২) **সংশ্লেষণ-ক্রিয়া (Synthesis) :** একাধিক বস্তু একত্র সংযুক্ত হইয়া নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিলে উহাকে সংশ্লেষণ-ক্রিয়া বলে। যেমন :—

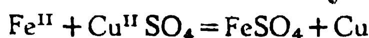

$$2Mg + O_2 = 2MgO \;;\qquad Cu + Cl_2 = CuCl_2$$

(৩) **প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া (Displacement) :** কোন কোন সময় যৌগ পদার্থের ভিতরের একটি মৌলের স্থান অপর একটি মৌল অধিকার করে। এই রকম পরিবর্তনকে প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া বলে। যেমন :—

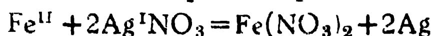

$$2KI + Cl_2 = 2KCl + I_2 \;;\qquad Zn + 2AgNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2Ag$$

যখন যৌগিক পদার্থের অণুতে একরকম পরমাণুর স্থলে অন্য রকমের পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয় তখন তাহাদের সংখ্যা সমান না হইতেও পারে। সংখ্যাগুলি উহাদের যোজ্যতার উপর নির্ভর করে।

একটি দ্বিযোজী পরমাণু দুইটি একযোজী পরমাণু প্রতিস্থাপন করিতে পারে। অথবা দুইটি ত্রিযোজী পরমাণু দ্বারা তিনটি দ্বিযোজী পরমাণুর প্রতিস্থাপন সম্ভব।

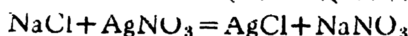


$$Fe^{II} + Cu^{II}SO_4 = FeSO_4 + Cu$$

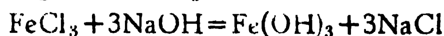


$$Fe^{II} + 2Ag^{I}NO_3 = Fe(NO_3)_2 + 2Ag$$

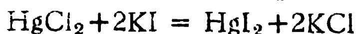
(৪) **বিপরিবর্ত-ক্রিয়া (Double Decomposition):** দুইটি যৌগিক পদার্থের ভিতর যখন উহাদের ক্ষারীয় এবং আম্লিক অংশের বিনিময় দ্বারা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় তখন উহাকে বিপরিবর্ত-ক্রিয়া বলে। লবণ, অ্যাসিড এবং ক্ষার জাতীয় পদার্থই কেবল এই রকম ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে।



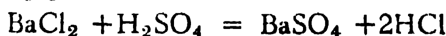
$$NaCl + AgNO_3 = AgCl + NaNO_3$$



$$FeCl_3 + 3NaOH = Fe(OH)_3 + 3NaCl$$



$$HgCl_2 + 2KI = HgI_2 + 2KCl$$



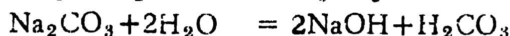
$$BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2HCl$$

অধিকাংশ বিপরিবর্ত ক্রিয়া বিক্রিয়ক দুইটির দ্রবণের ভিতর নিষ্পন্ন হয় এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের একটি অদ্রাব্য হইয়া অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই কারণে এই রকম ক্রিয়াকে অনেক সময় সংক্ষেপে **অধঃক্ষেপণ-ক্রিয়া**ও (**Precipitation**) বলা হয়।

(৫) **আর্দ্র-বিশ্লেষণ-ক্রিয়া (Hydrolysis):** কোন কোন যৌগিক পদার্থ জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া বিযোজিত হইয়া যায় এবং নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। এই রকম রাসায়নিক পরিবর্তনকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ ক্রিয়া বলা হয়।



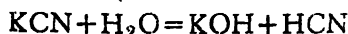
$$PCl_3 + 3H_2O = H_3PO_3 + 3HCl$$



$$Na_2CO_3 + 2H_2O = 2NaOH + H_2CO_3$$

সোডিয়াম কার্বনেট যদিও লবণ, উহা জলে দ্রব হইলে উহার কতকাংশ জলের দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়া NaOH ক্ষার এবং H_2CO_3 অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিডের তীব্রতা খুবই কম, কিন্তু NaOH একটি তীব্র ক্ষার, উহা হইতে যথেষ্ট OH^- আয়ন উৎপন্ন হয়। সুতরাং লবণ হইলেও Na_2CO_3 ক্ষারের মত ব্যবহার করে।

যে সমস্ত লবণ মৃদু অ্যাসিড বা মৃদু ক্ষার হইতে উৎপন্ন হয়, উহারা জলের সংস্পর্শে আসিলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়।



$$KCN + H_2O = KOH + HCN$$

তীব্র মৃদু

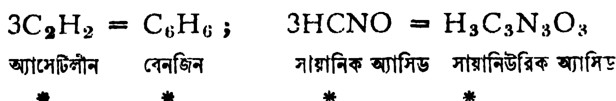
(৬) **প্রতি-বিন্যাস ক্রিয়া (Rearrangement or Isomerism :** কখনও কখনও যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুসমূহের বিন্যাসের পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরমাণুর প্রকার বা সংখ্যা একই থাকে। নূতন রকম সংযুক্তির জন্য পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বদল হইয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে। ইহাকে 'প্রতি-বিন্যাস' ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। যেমন ঃ—



$$NH_4CNO \rightleftharpoons NH_2CONH_2$$

অ্যামোনিয়াম সায়ানেট ইউরিয়া

(৭) **বহু-যৌগিক-ক্রিয়া (Polymerisation)** ঃ অনেক সময় কোন কোন যৌগিকের একাধিক অণু একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি নূতন পদার্থের অণুতে পরিণত হয়। ইহাকে বহু-যৌগিক-ক্রিয়া বা বহুসংযোগ-ক্রিয়া (Polymerisation) বলে :



$$3C_2H_2 = C_6H_6 \,; \qquad 3HCNO = H_3C_3N_3O_3$$

অ্যাসেটিলীন বেনজিন সায়ানিক অ্যাসিড সায়ানিউরিক অ্যাসিড

* * * *

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক রাসায়নিক পরিবর্তনেই তাপ-বিনিময় হইয়া থাকে। বিক্রিয়াকালে হয় তাপ বাহির হইয়া আসে অথবা পদার্থগুলি তাপ গ্রহণ করে। যে সকল বিক্রিয়াতে তাপের উদ্ভব হয় তাহাদিগকে **'তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া'** (**Exothermic reaction**) বলে। পক্ষান্তরে বিক্রিয়াতে যদি তাপের শোষণ হয় তবে উহাকে **'তাপ-গ্রাহী বিক্রিয়া'** বলে। কখন কখনও বিক্রিয়ার সমীকরণের ডানদিকে তাপের পরিমাণের সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন সহ লিখিয়া যথাক্রমে তাপ উদ্ভব বা শোষণ বুঝান হয়। যথা ঃ



$$C + O_2 = CO_2 + 97000 \text{ calories}$$ (তাপ-উদ্গারী)



$$N_2 + O_2 = 2NO - 43200 \text{ calories}$$ (তাপগ্রাহী)

যদি কোন যৌগ উহার মৌলিক উপাদানের সাক্ষাৎ-সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপ-গ্রহণের প্রয়োজন হয় তবে সেই যৌগকেও **তাপ-গ্রাহী যৌগ** বলা হয়। নাইট্রিক অক্সাইড তাপ-গ্রাহী যৌগ। মৌল-সংযোগে যৌগ উৎপন্ন করার সময় তাপের উদ্ভব হইলে উহাকে **তাপ-উদ্গারী** যৌগ বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ-উদ্গারী যৌগ।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

একটি পরমাণুর চেয়ে কম পরিমাণে কোন মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ পরমাণুর ইহাই সংজ্ঞার্থ। ডাল্‌টনের পরমাণু-তত্ত্ব অনুসারে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং অবিভাজ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহার ফলে পরমাণুকে আর অবিভাজ্য মনে করা সমীচীন হইবে না, যদিও রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ একটি পরমাণুই।

একটি কাচের পাত্রে অতি সামান্য পরিমাণ গ্যাস রাখিয়া যদি উহাতে বিদ্যুৎশক্তি পরিচালনা করা যায়, তবে ক্যাথোড হইতে একপ্রকার রশ্মি নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিক টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখান, এই রশ্মিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না-ধর্মী বিদ্যুৎকণার সমষ্টি। মিলিকান্ এবং টম্‌সন্ এই কণাগুলির বিশদ পরীক্ষা করিয়া ইহার ওজন, বিদ্যুৎমাত্রা প্রভৃতি স্থির করেন। দেখা গেল, প্রতিটি কণার ওজন একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের $\frac{১}{১৮৪০}$ ভগ্নাংশ (৯×১০^{-২৮} গ্রাম) এবং প্রতিটি কণাতে অপরাবিদ্যুতের একমাত্রা বা একটি একক বর্তমান। এই সকল না-ধর্মী বিদ্যুৎবাহী কণাকে ইলেক্‌ট্রন বলা হয়, অর্থাৎ ইহারা না-ধর্মী বিদ্যুতের পরমাণু। পরন্তু আরও দেখা গিয়াছে, সকল রকম মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় এরূপ বিদ্যুৎ-মোক্ষণে একই না-ধর্মী কণা বা ইলেকট্রন রশ্মির সৃষ্টি হয়। রঞ্জন রশ্মির পথেও যদি কোন গ্যাসের অণু পড়ে তবে উহা হইতেও একই ইলেকট্রন সর্বদা নির্গত হয়। অতএব, ইলেকট্রন যে কোন জড় পরমাণুর একটি সাধারণ উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌলিক পদার্থের পরমাণু নিত্য ও অখণ্ড—উনবিংশ শতাব্দীর এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

পরমাণুর অভ্যন্তরে না-ধর্মী ইলেকট্রন আছে কিন্তু সম্পূর্ণ পরমাণুর কোন পরা অথবা অপরা তড়িৎ-মাত্রা নাই, অর্থাৎ উহা তড়িৎ-নিরপেক্ষ। সুতরাং পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের বিপরীত-ধর্মী অর্থাৎ হাঁ-ধর্মী কণিকা থাকিতেই হইবে। পদার্থবিদ্‌গণ নানা পরীক্ষার সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে সমস্ত

পরমাণুতেই হাঁ-ধর্মী কণা বিদ্যমান। ইহাদের প্রোটন বলা হয়। প্রোটনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান (১'৬ × ১০^{-২৪} গ্রাম) এবং প্রতিটি প্রোটনের হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎমাত্রা এক।

বিজ্ঞানী সেড উইক্ আরও দেখাইয়াছেন, হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে আর এক প্রকার কণিকা আছে। ইহাদের নিউট্রন বলা হয়। নিউট্রন এবং প্রোটনের একই ওজন, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। কিন্তু নিউট্রনে হাঁ-ধর্মী বা না-ধর্মী কোন বিদ্যুতের ভার নাই, নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ।

পরমাণুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতম কণাগুলির পরিচয়—

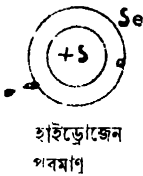
	ওজন (গ্রাম)	ব্যাস (সেণ্টি)	তড়িৎমাত্রা (কুলম্ব)
ইলেকট্রন	— ৯১×১০^{-২৮}	১×১০^{-১২}	−১'৬×১০^{-১৯}
প্রোটন	— ১৬৭×১০^{-২৪}	"	+১'৬×১০^{-১৯}
নিউট্রন	— ১'৬৭×১০^{-২৪}	" ?	—

অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, জড় পরমাণুতেই ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এই তিন উপাদানের সমবায়ে গঠিত। সকল পদার্থের পরমাণুরই উপাদান এক, শুধু পরিমাণ বিভিন্ন। কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউট্রন নাই। সুতরাং মৌলিক পদার্থগুলির মূলতঃ কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। পরমাণুর মধ্যস্থিত প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের সংযুতি বা বিন্যাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড এবং বয়র-এর যে ধারণা তাহা এই রকম—

প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থলে একটি অতি সূক্ষ্ম গুরুভার কেন্দ্র আছে। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ওজন বা ভর এই কেন্দ্রে ঘনীভূত। ইহাকে আমরা পরমাণুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বলি। এই পরমাণু-কেন্দ্র সর্বদাই হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎযুক্ত, অর্থাৎ ইহাতে এক বা একাধিক পরাবিদ্যুতের একক বর্তমান। এই পরমাণু-কেন্দ্রটিতে পরমাণুর সমস্ত প্রোটন এবং নিউট্রন একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া অবস্থান করে। নিউট্রনসমূহের কোন বিদ্যুৎ-মাত্রা নাই, কিন্তু প্রতি প্রোটনে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুতের একটি একক আছে। সুতরাং, কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা পরমাণু-কেন্দ্রের হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ-এককের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। পরমাণু-কেন্দ্রের হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ-এককের সংখ্যাকেই সেই পদার্থের **পরমাণু-ক্রমাঙ্ক (Atomic number)** বলা হয়।

সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের চক্রগতির মত, পরমাণু-কেন্দ্রের চারিদিকে চক্রাকারে সর্বদা ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। ইলেকট্রনের সংখ্যা কেন্দ্রস্থ পরাবিদ্যুতের এককের সংখ্যার সমান, প্রত্যেকটি ইলেকট্রনে না-ধর্মী বিদ্যুতের একটি একক থাকে। ফলে সমগ্র পরমাণুটির কোন বিদ্যুৎ ধর্ম দেখা যায় না। উহা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের গতিপথ বিভিন্ন এবং ইহাদের গতিবেগ অত্যন্ত অধিক—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ শত মাইল। পরমাণু-কেন্দ্রটি গুরুভার হইলেও সমগ্র পরমাণুর তুলনায় আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। কেন্দ্র ও ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনসমূহের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। অর্থাৎ পরমাণু নিরেট নয়। ইহাই পরমাণুর গঠন-চিত্র।

হাইড্রোজেন পরমাণুতে কোন নিউট্রন নাই। উহার কেন্দ্রে একটিমাত্র প্রোটন আছে এবং একটি ইলেকট্রন ইহাকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করে।



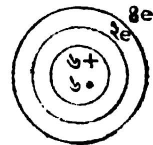
হাইড্রোজেন পরমাণু

অন্যান্য পরমাণুতে প্রোটন এবং নিউট্রন দুইই থাকে। কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ছয়টি নিউট্রন এবং ছয়টি প্রোটন থাকে। কেন্দ্র-বহির্ভূত অঞ্চলে প্রোটনের সমসংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি ইলেকট্রন কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। কার্বনের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক (কেন্দ্রের হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎমাত্রা) ছয়। কার্বন পরমাণুর ওজন

= ছয়টি নিউট্রন + ৬টি প্রোটনের ওজন [ইলেকট্রনের ওজন
= ১২টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন। নগণ্য বলিয়া ধরা হয়]

অর্থাৎ কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১২।

কার্বনের ছয়টি ইলেকট্রনের দুইটি কেন্দ্রের নিকটতম চক্রপথে এবং চারিটি উহার পরবর্তী চক্রপথে ঘুরিয়া থাকে। যদিও বলা হয় দুইটি ইলেকট্রন প্রথম চক্রপথে ঘুরিতেছে, উহাদের গতিপথ বস্তুতঃ এক নয়। প্রথম ইলেকট্রন দুইটির গতিপথের ব্যাস সমান, কিন্তু উহারা বিভিন্ন সমতলে ঘোরে।

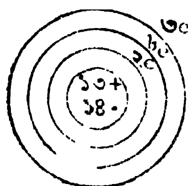


কার্বন পরমাণু

সেই রকম পরবর্তী চারিটি ইলেকট্রনেরও গতিপথ সমান, কিন্তু বিভিন্ন সমতলে।

সমস্ত মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর এই রকম সংগঠন এখন জানা গিয়াছে। ইহাদের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক, ইলেকট্রন-সংখ্যা ও উহাদের গতি-বৈচিত্র্য, নিউট্রন-সংখ্যা সবই পরীক্ষাদ্বারা স্থির করা হইয়াছে। অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু-

ক্রমাঙ্ক = ১৩, এবং পারমাণবিক গুরুত্ব = ২৭। উহার কেন্দ্রে ১৩টি প্রোটন এবং ১৪টি নিউট্রন আছে। কেন্দ্রের বাহিরের প্রথম চক্রপথে ২টি, দ্বিতীয় চক্রপথে ৮টি এবং তৃতীয় চক্রপথে ৩টি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান। কোন পরমাণুরই প্রথম চক্রপথে দুইটির অধিক ইলেকট্রন থাকিতে পারে না এবং অন্যান্য চক্রপথে সাধারণতঃ ৮টির অধিক ইলেকট্রন থাকে না। বলা বাহুল্য, এই ৮টি ইলেকট্রনের গতিপথ বিভিন্ন, কেবল পথচক্রের ব্যাস সমান। একটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর চিত্র দেওয়া হইল।



অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু

পরমাণুর এইরূপ গঠন সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে।

প্রথমতঃ—না-ধর্মী ইলেকট্রনসমূহ বিপরীত-ধর্মী কেন্দ্রের আকর্ষণে মিলিত না হইয়া বাহিরে ঘুরিতে থাকে কেন? চক্রাকারে ঘুরিতে থাকার জন্য উহাদের মধ্যে একটি কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তি ইলেকট্রনগুলিকে বাহিরের দিকে লইয়া যাইতে চাহে। অপরদিকে বিপরীতধর্মী কেন্দ্রের দ্বারা ইলেকট্রনগুলি ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই দুই বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রে একাধিক সমধর্মী প্রোটন কি করিয়া একত্র অবস্থিত থাকিতে পারে? সাধারণতঃ উহাদের পরস্পরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করা উচিত, যাহার ফলে কেন্দ্রটি ভাঙিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ দেখাইয়াছেন যে অত ঠাসাঠাসিতে নিউট্রন এবং প্রোটনের ভিতর একটা বিশেষ প্রবল আকর্ষণ দেখা দেয়। এই আকর্ষণীশক্তির সৃষ্টি হয় প্রোটন-নিউট্রনের নিরন্তর পারস্পরিক রূপান্তরে। এইজন্যই কেন্দ্রটি স্থায়িত্ব লাভ করে।

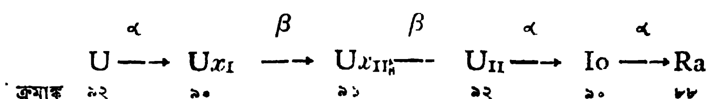
কিন্তু যেখানে নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে পরমাণু-কেন্দ্রটি অস্থায়ী ও স্বতঃভঙ্গুর হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি মৌলের কথা বলা যাইতে পারে। ইহাদের পরমাণুকেন্দ্রগুলি অত্যন্ত ভারী এবং সেইখানে বহুসংখ্যক নিউট্রন ও প্রোটন রহিয়াছে। এই পরমাণুকেন্দ্রগুলি নিজ হইতেই ভাঙিয়া যায় এবং উহাদের

ভিতর হইতে স্বতঃই বিভিন্ন-প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। পরমাণুকেন্দ্রের এই ভাঙনকে **তেজস্ক্রিয়া** (radioactivity) বলা হয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি হইতে তিন রকমের তেজরশ্মি বাহির হইতে পারে —আল্‌ফা, বীটা ও গামা রশ্মি। গামা রশ্মিগুলি আলোকের মতই সূক্ষ্ম তরঙ্গস্রোত। কিন্তু আল্‌ফা ও বীটা রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ। আলফা রশ্মিতে নির্গত কণাগুলি পরাবিদ্যুৎবাহী এবং উহাতে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন একত্র পুঞ্জীভূত থাকে। অর্থাৎ এই কণাগুলিকে ঠিক হিলিয়ামের পরমাণুকেন্দ্র মনে করা যায়। বস্তুতঃ আল্‌ফা কণাগুলি সর্বদাই দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে বীটা-রশ্মির কণাগুলি ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং তাহারা অপরাবিদ্যুৎবাহী। তেজস্ক্রিয় মৌলের কেন্দ্র হইতে এই রশ্মি-বিকিরণ সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় ঘটিতে থাকে।

কেন্দ্র হইতে আল্‌ফা অথবা বীটা কণা বাহির হইয়া যাওয়াতে পরমাণু-কেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ একটি মৌলের পরমাণু হইতে অপর একটি মৌলের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। যথা, ইউরেনিয়াম মৌল হইতে পরপর আল্‌ফা (α) এবং বীটা (β) কণা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে উহা রেডিয়ামে পরিণত হয়।



রেডিয়ামও তেজস্ক্রিয়, উহার পরমাণুকেন্দ্রটিও স্বতঃভঙ্গুর। যতক্ষণ পরমাণুকেন্দ্রটি সাম্যাবস্থা লাভ না করে ততক্ষণ কেন্দ্রটি এইরূপে ভাঙিতে থাকে। ক্রমাগত ভাঙনের ফলে α- এবং β- কণা বাহির হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম সীসাতে পরিণত হয়। তখন উহার তেজস্ক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে এবং কেন্দ্রটি স্থায়ী হয়।

পরমাণু সম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। পরমাণুর ওজন কেন্দ্রস্থ নিউট্রন ও প্রোটনের উপর নির্ভর করে। যদি প্রোটনের সংখ্যা ঠিক থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তবে পরমাণুর ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু উহার ক্রমাঙ্ক একই থাকিবে। পরমাণু-ক্রমাঙ্কের উপরেই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে। অতএব এই বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম একই হইবে। অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাণু হওয়া সম্ভব। এই রকম একই পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাণু-প্রকারকে **'এক-স্থানিক' (Isotopes)** বলা হইয়া থাকে। নিয়ন গ্যাসের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক ১০, কিন্তু উহাতে দুই রকমের পরমাণু আছে যাহাদের গুরুত্ব ২০ এবং ২২।

একটিতে→১০টি নিউট্রন + ১০টি প্রোটন + ১০টি ইলেকট্রন

অপরটিতে→১২টি নিউট্রন + ১০টি প্রোটন + ১০টি ইলেকট্রন

অনেক মৌলেরই এইরূপ একস্থানিক প্রকার দেখা যায়।

পরমাণু-গঠন ও রাসায়নিক মিলন: আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পরমাণু-কেন্দ্রের পরাবিদ্যুৎ-এককের সংখ্যাই উহার পরমাণু-ক্রমাঙ্ক। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক বিভিন্ন। পরমাণুর ভিতর পরমাণু-ক্রমাঙ্কের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। এই ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের চারিদিকে ক্রমবর্ধমান ব্যাসের কতগুলি চক্রপথে ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ ইলেকট্রনসমূহ কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রয়োজন অনুযায়ী মোট সাতটি স্তরে বা বেষ্টনীতে (Shell) অবস্থিত। কেন্দ্রের নিকটতম স্তরটিকে K-স্তর বলা হয় এবং পর পর এই বেষ্টনীগুলিকে K, L, M, N, O, P, Q স্তর বলা হয়। K-বেষ্টনীতে দুইটিমাত্র ইলেকট্রন থাকিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য বেষ্টনীতে ৮টির অধিক ইলেকট্রন থাকে না। তবে, অবস্থাবিশেষে, M, O, P-স্তরে ১৮টি এবং N-স্তরে ৩২টি ইলেকট্রনও থাকা সম্ভব। তবে সর্ববহিঃস্থ চক্রপথে ৮টির বেশী ইলেকট্রন থাকে না। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ক্রমাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ইলেকট্রন-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে K, L, M প্রভৃতি বেষ্টনীগুলি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে। নিম্নের সূচী হইতে ইহা সহজেই অনুমেয়—

দ্বিতীয় খণ্ড

অধাতব মৌল

পঞ্চদশ অধ্যায়

হাইড্রোজেন

সঙ্কেত H_2। পরমাণু-ক্রমাঙ্ক ১। পারমাণবিক গুরুত্ব ১·০০৮।

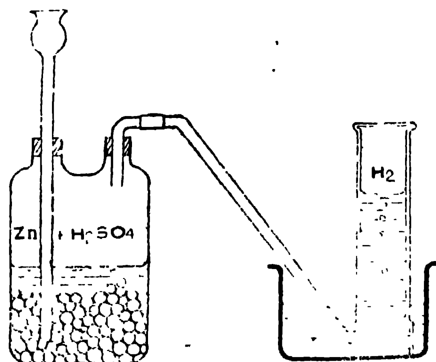
প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন প্রায় সর্বদাই অন্যান্য মৌলের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। হাইড্রোজেনের যে সমস্ত যৌগ সচরাচর পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে জল, পেট্রোলিয়াম এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্নেয়গিরি বা পেট্রোলিয়াম খনি হইতে নির্গত গ্যাসের ভিতর খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন মৌলাবস্থায় থাকে। হাইড্রোজেন যে একটি মৌলিক পদার্থ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ক্যাভেণ্ডিস্ সর্বপ্রথমে প্রমাণ করেন।

১৫-১। **প্রস্তুতিঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতিঃ** দুই-মুখ-বিশিষ্ট একটি উল্ফ-বোতলে খানিকটা দস্তার ছিবড়া (granulated zinc) লও। কর্কের সাহায্যে বোতলের একটি মুখে একটি দীর্ঘনাল ফানেল (thistle funnel) এবং অপর মুখে একটি বাঁকান নির্গম-নল জুড়িয়া দাও (চিত্র ১৫ক)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কর্ক এবং নলগুলির সংযোগ যেন সম্পূর্ণ বায়ুরোধী (air-tight) হয়। কারণ, তাহা না হইলে হাইড্রোজেনের সহিত বায়ু মিশিয়া গিয়া একটি বিস্ফোরক মিশ্রণে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর ভিতরে জলের নীচে রাখিতে হইবে। ইহার পর দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড উল্ফ-বোতলের ভিতরে ঢালিয়া দাও। অ্যাসিডের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যে দস্তার ছিবড়াগুলি সম্পূর্ণ আবৃত থাকে এবং দীর্ঘনাল-ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডুবিয়া থাকে, নচেৎ এই ফানেলের ভিতর দিয়াই হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যাইবে। অ্যাসিড জিঙ্কের সংস্পর্শে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।



$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রথমে বোতলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নির্গম-নলের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। বাতাস বাহির হইয়া যাওয়ার পর নির্গম-



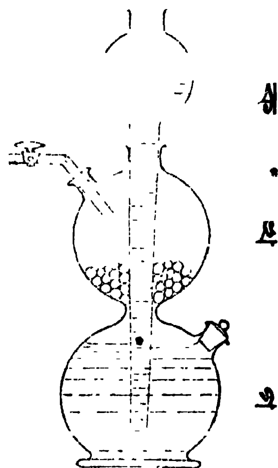
চিত্র ১৫ক—হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

নল দিয়া হাইড্রোজেন আসিতে থাকে এবং গ্যাসদ্রোণীর জলের ভিতর দিয়া বুদ্‌বুদের আকারে উঠিতে থাকে। একটি গ্যাস-জার জলে সম্পূর্ণ ভর্তি করিয়া যেখানে গ্যাসের বুদ্‌বুদ বাহির হইতেছে সেখানে উপুড় করিয়া ধর; হাইড্রোজেন তখন এই গ্যাস-জারের জল অপসারিত করিয়া সেই পাত্রে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। প্রথম গ্যাস-জারটি হাইড্রোজেন পূর্ণ করিয়া উহাতে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দাও। যদি বিস্ফোরণ হয় তবে বুঝিতে হইবে উল্‌ফ-বোতলের অভ্যন্তরের বায়ু সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় নাই। আরও খানিকক্ষণ হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া ভিতরের বাতাসকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দাও। অতঃপর কয়েকটি গ্যাস-জার প্রথমে জলপূর্ণ করিয়া পরে জল অপসারণ দ্বারা হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্তি করিয়া লও এবং ঢাকনি দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া উপুড় করিয়া রাখ। ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ এইভাবেই হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়।

কিপ-যন্ত্র: উল্‌ফ বোতলের সাহায্যে হাইড্রোজেন উৎপাদনের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে জিঙ্ক যতক্ষণ অ্যাসিডের সঙ্গে থাকিবে ততক্ষণই হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইতে থাকিবে। যে কোন সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী এবং নিয়মিত পরিমাণে হাইড্রোজেন পাওয়ার জন্য ল্যাবরেটরীতে আজকাল কিপ্-

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার হয়। কিপ্-যন্ত্রটি দুইটি অংশে তৈয়ারী (চিত্র-১৫ খ)। নীচের অংশে দুইটি গোলাকৃতি বালব ('খ' ও 'গ') একত্র যুক্ত থাকে এবং উপরের অংশে আর একটি গোলাকৃতি বালব ('ক') থাকে। উপরের এই বালবটির নীচের দিকে একটি দীর্ঘ নল যুক্ত আছে। ইহা সর্বনিম্ন বালব 'গ'-এর ভিতরে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই দুইটি অংশের সংযোগটি অবশ্য খুব দৃঢ় এবং বায়ুরোধী। মধ্যস্থ 'খ' বালবের একটি নির্গম-পথ আছে। উহাতে একটি কর্কের সাহায্যে একটি স্টপকক জুড়িয়া দেওয়া হয়। নীচের 'গ' বালবেরও একটি বহির্দ্বার আছে, উহা একটি কর্ক দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হয়, প্রয়োজন হইলে এই কর্ক খুলিয়া ভিতরের অ্যাসিড বা তরল পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া হয়।

মধ্যস্থ 'খ' বালবের ভিতরে প্রথমে কিছু জিঙ্কের টুকরা রাখা হয়। তাহার পর স্টপককটি খুলিয়া রাখিয়া উপরের বালবে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই অ্যাসিড নল বাহিয়া প্রথমে নীচের বালবে আসে এবং উহা পূর্ণ হইয়া গেলে মধ্যস্থ 'খ' বালবে প্রবেশ লাভ করে। এইখানে জিঙ্কের সংস্পর্শে অ্যাসিড আসিলেই হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রথমে স্টপককের ভিতর দিয়া 'খ' বালবের বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং পরে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। এইভাবে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।



চিত্র ১৫ 'খ'—কিপ্-যন্ত্র

প্রয়োজন শেষে স্টপককটি বন্ধ করিয়া দিলে 'খ' বালবে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহা বাহির হইতে না পারিয়া অ্যাসিডের উপর চাপ দিতে থাকে। ইহার ফলে অ্যাসিড নীচের দিকে নামিয়া যায় এবং নিম্নস্থ বালবের অ্যাসিড নল বাহিয়া উপরের 'ক' বালবে আসিয়া জড় হয়। মধ্যস্থিত বালবের জিঙ্কের সংস্পর্শ হইতে অ্যাসিড সরিয়া গেলেই হাইড্রোজেন উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইলে কেবল স্টপককটি খুলিলেই চলিবে। কারণ, স্টপকক খুলিলে স্বাভাবিক নিয়মে আবার অ্যাসিড মধ্যস্থ বালবে আসিবে এবং পূর্বের মত জিঙ্কের সহিত ক্রিয়ার ফলে

হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিবে। কিপ্-যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনানুরূপ হাইড্রোজেন পাওয়ার সুবিধা হয়।

জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে যে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ নয়। জলীয় বাষ্প ছাড়াও আরও অন্যান্য গ্যাস, যেমন আরসাইন (AsH_3), ফসফাইন (PH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) প্রভৃতি খুব অল্প পরিমাণে উহার সহিত মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধতর গ্যাস পাইতে হইলে এই হাইড্রোজেনকে যথাক্রমে লেড নাইট্রেট, সিলভার সালফেট ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ এবং সর্বশেষে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়া চালনা করিয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়। এই সকল দ্রবণ কতকগুলি গ্যাসধাবকের (Gas-washers) মধ্যে রাখিয়া হাইড্রোজেনকে বুদ্‌বুদের আকারে উহাদের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়। ইহাতে উপরোক্ত গ্যাসগুলি শোষিত হইয়া যায়। (ক) লেড নাইট্রেট H_2S দূরীভূত করে। (খ) সিলভার সালফেট AsH_3 ও PH_3 দূর করে। (গ) পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড SO_2, CO_2 ইত্যাদি এবং সালফিউরিক অ্যাসিড জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

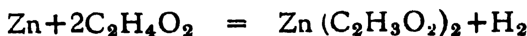
১৩-২। হাইড্রোজেন প্রস্তুতির অন্যান্য প্রণালী ঃ

তিন রকম পদার্থ হইতে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন উৎপাদন করা যাইতে পারে—(ক) অ্যাসিড, (খ) ক্ষারজাতীয় পদার্থ এবং (গ) জল।

(ক) **অ্যাসিড হইতে ঃ** আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে সহজেই হাইড্রোজেন উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু জিঙ্কের পরিবর্তে অন্যান্য অনেক ধাতু এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের বদলে অন্যান্য কোন কোন অ্যাসিডও স্বাভাবিক উষ্ণতায় এই গ্যাস উৎপন্ন করে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হইল।



$$Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2$$



$$Zn+2C_2H_4O_2 \;=\; Zn(C_2H_3O_2)_2+H_2$$

অ্যাসেটিক অ্যাসিড   জিঙ্ক অ্যাসিটেট

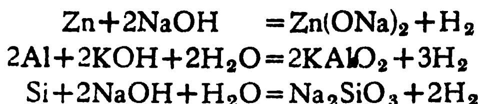


$$Mg+H_2SO_4=MgSO_4+H_2\;;\; Fe+2HCl=FeCl_2+H_2$$



$$2Na+2HCl=2NaCl+H_2$$

(খ) **ক্ষার হইতে ঃ** জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, টিন প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু বা ধাতুকল্প কষ্টিক সোডা জাতীয় তীব্র ক্ষার হইতে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। যেমন,

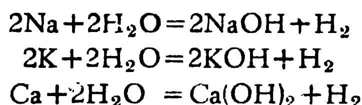


$$Zn + 2NaOH = Zn(ONa)_2 + H_2$$
$$2Al + 2KOH + 2H_2O = 2KAlO_2 + 3H_2$$
$$Si + 2NaOH + H_2O = Na_2SiO_3 + 2H_2$$

(এই সমস্ত বিক্রিয়াতে জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বিচূর্ণ অবস্থায় (dust) ব্যবহার করা প্রয়োজন।)

(গ) জল হইতে : জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার নানাপ্রকার উপায় আছে।

(১) বিভিন্ন উষ্ণতায় বিভিন্ন ধাতুর সাহায্যে জল হইতে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। যেমন, স্বাভাবিক উষ্ণতায় সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতু জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করে।

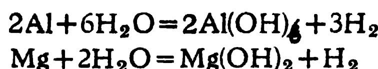


$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$
$$2K + 2H_2O = 2KOH + H_2$$
$$Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$$

এই সকল ধাতুর সহিত জলের বিক্রিয়া খুব দ্রুত এবং তীব্রতার সহিত সম্পন্ন হয় বলিয়া অনেক সময় বিস্ফোরণ হয়। সেইজন্য প্রায়ই এই ধাতুগুলি পারদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পারদসঙ্কর (amalgam) রূপে জলে দেওয়া হয়।

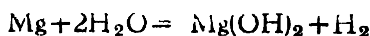
পরীক্ষা : ছোট ছোট কয়েক টুকরা সোডিয়াম খল-নুড়ির সাহায্যে পারদের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও। এই মিশ্রিত পারদসঙ্কর কঠিন আকারের হইবে। ইহার কয়েকটি টুকরা একটি পাত্রে জল রাখিয়া উহাতে ছাড়িয়া দাও। জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে আস্তে আস্তে হাইড্রোজেন উঠিতে থাকিবে। একটি গ্যাস-জার জলপূর্ণ করিয়া উহার উপরে ধরিলে হাইড্রোজেন জল অপসারিত করিয়া এই গ্যাস-জারে সঞ্চিত হইবে।

ফুটন্ত জলে ম্যাগনেসিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ দিলেও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় :—

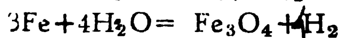


$$2Al + 6H_2O = 2Al(OH)_3 + 3H_2$$
$$Mg + 2H_2O = Mg(OH)_2 + H_2$$

ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়া অথবা উত্তপ্ত লৌহচূর্ণের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প (স্টীম) পরিচালিত করিলেও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। লোহিত-তপ্ত কার্বনের (Red hot carbon) সহিত জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়াতেও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।



$$Mg + 2H_2O = Mg(OH)_2 + H_2$$

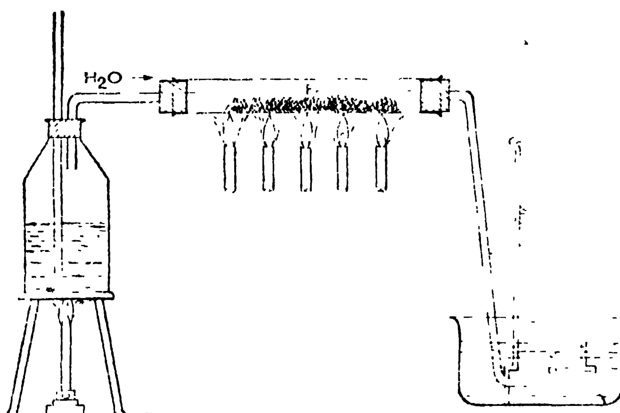


$$3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2$$



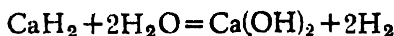
$$C + H_2O = CO + H_2$$

পরীক্ষা ঃ দুই-মুখ-খোলা অপেক্ষাকৃত মোটা একটি শক্ত কাচের নলের ভিতরে কিছু লৌহচূর্ণ লও। নলটি একটি চুল্লীতে রাখিয়া দাও। উহার দুইটি মুখে দুইটি কর্কের ভিতর দিয়া দুইটি সরু কাচ-নল জুড়িয়া দাও। ইহাদের একটি কাচনল বাঁকাইয়া ছিপিবদ্ধ একটি আংশিক জলপূর্ণ কূপীর সহিত যুক্ত করিয়া দাও (চিত্র ১৫গ)। অপর প্রান্তের কাচ-নলের শেষ অংশটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর জলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। চুল্লীটি এখন প্রজ্বলিত করিয়া দাও, লৌহচূর্ণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। কূপীর জলটি এখন দীপ-সাহায্যে ফুটাইতে থাক। জলীয় বাষ্প তখন নলের ভিতর দিয়া উত্তপ্ত লৌহচূর্ণের উপর আসিতে থাকিবে এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে। লৌহচূর্ণ একপ্রকার কঠিন অক্সাইডে পরিণত হইয়া যাইবে। উৎপন্ন হাইড্রোজেন নির্গম-নল দিয়া আসিয়া বুদ্‌বুদের আকারে জলের ভিতর দিয়া বাহির হইতে থাকিবে। একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার উপুড় করিয়া ধরিলে এই গ্যাস উহাতে সঞ্চিত হইবে।



চিত্র ১৫গ—লৌহচূর্ণ ও জলীয় বাষ্প হইতে হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

(২) ধাতব হাইড্রাইডসমূহ (ধাতু এবং হাইড্রোজেনের যৌগ) খুব সহজেই জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের সাহায্যে জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার পদ্ধতিকে হাইড্রোলিথ প্রণালী বলে।



$$CaH_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + 2H_2$$

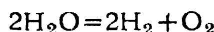


$$NaH + H_2O = NaOH + H_2$$

(৩) বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের ফলে জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলের অণুগুলির কিয়দংশ আয়নিত অবস্থায় থাকে এবং

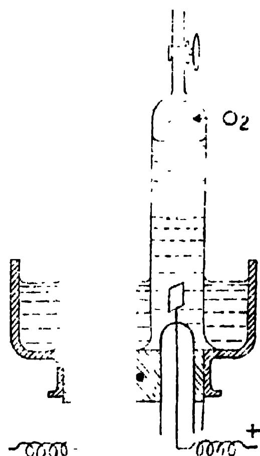
তড়িৎপ্রবাহের ফলে ক্যাথোড- বা অপরা-প্রান্তে হাইড্রোজেন নির্গত হয়। (পৃষ্ঠা ১৩৫)

কিন্তু জল সুপরিবাহী নয় বলিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বিশুদ্ধ জল হইতে হাইড্রোজেন পাওয়া শক্ত। বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে যদি কোন অ্যাসিড বা ক্ষারজাতীয় পদার্থের লঘু দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষিত করা যায় তাহা হইলে সহজে হাইড্রোজেন পাওয়া সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু জলই বিশ্লেষিত হয়।



$$2H_2O = 2H_2 + O_2$$

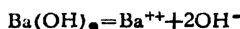
পরীক্ষা ঃ অ্যাসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য ১৫শ চিত্রানুযায়ী একটি যন্ত্রের প্রয়োজন। একটি কাচপাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড লও। এই অ্যাসিডের ভিতর দুইটি প্লাটিনামের পাত নিমজ্জিত থাকিবে। এই পাত দুইটি তারের সাহায্যে বাহিরে ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেকটি প্লাটিনাম পাতের উপর এক-মুখ-বন্ধ একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাচের নল লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে সম্পূর্ণ ভরিয়া লইয়া উল্টা করিয়া রাখ। প্রত্যেকটি নলের উপরের অংশে একটি স্টপকক লাগান থাকিবে। এই স্টপককের সাহায্যে গ্যাস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্লাটিনামের পাত দুইটি এখন কোন ব্যাটারীর পরা- ও অপরা-প্রান্তের সহিত জুড়িয়া দিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে থাকিবে এবং অ্যানোডে অক্সিজেন ও ক্যাথোডে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ হইবে।



চিত্র ১৫শ—তড়িৎ-বিশ্লেষণ

যদিও অ্যাসিড লওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহার কোন পরিবর্তন হয় না। জলের বিশ্লেষণের ফলেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়।

পরীক্ষা ২ ঃ উপরোক্ত যন্ত্রে অ্যাসিডের বদলে যদি কোন ক্ষার লওয়া হয়, তাহা হইলেও তড়িৎপ্রবাহ দিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। কেন না,



$$Ba(OH)_2 = Ba^{++} + 2OH^-$$



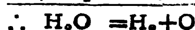
অ্যানোডে : $2OH^- = H_2O + O + 2e$



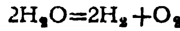
ক্যাথোডে : $Ba^{++} = Ba - 2e$



$$\underline{Ba + 2H_2O = Ba(OH)_2 + H_2}$$

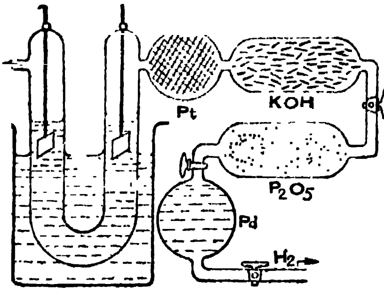


$$\therefore\ H_2O = H_2 + O$$

অথবা, 

$$2H_2O=2H_2+O_2$$

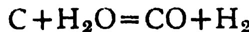
বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন এই বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণের দ্বারাই তৈয়ারী হয়। ক্যাথোডে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত প্লাটিনাম-জালি, কঠিন কস্টিকপটাস, ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড ইত্যাদির উপর দিয়া পরিচালিত করিলে অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস দূরীভূত হয়। পরে উহাকে প্যালাডিয়ামের ছোট ছোট পাত পরিপূর্ণ একটি বালবের ভিতর প্রবেশ করান হয়। প্যালাডিয়াম হাইড্রোজেন গ্যাসটি শোষণ করিয়া লয়। অন্যান্য গ্যাস শোষিত হয় না। প্রয়োজনানুসারে উক্ত প্যালাডিয়াম উত্তপ্ত করিলেই বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।



চিত্র ১৫৬—বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন

অনেক রাসায়নিক শিল্পে প্রভূত পরিমাণে হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয়। বস্ প্রণালীতে উহা প্রস্তুত হয়।

১৩-৩। বস্ প্রণালী (Bosch Process) ঃ এই প্রণালীতে জলীয় বাষ্প লোহিত-তপ্ত কোক-কয়লার উপর পরিচালনা করিয়া ওয়াটার-গ্যাস প্রথমে তৈয়ারী করা হয়। ওয়াটার-গ্যাস কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ।



$$C+H_2O=CO+H_2$$

এই ওয়াটার গ্যাস আরও অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত লৌহ-অক্সাইড ও ক্রোমিয়াম অক্সাইডের (প্রভাবক) উপর দিয়া পরিচালিত করিলে কার্বন মনোক্সাইড ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং আরও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।



$$(CO+H_2)+H_2O=CO_2+2H_2$$

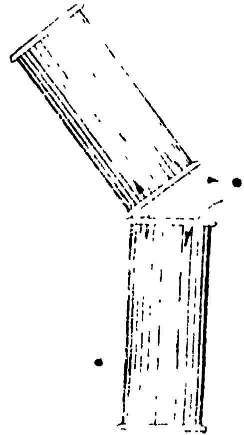
কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণটি অতিরিক্ত চাপে জল, কস্টিক সোডা ও কিউপ্রাস-ফর্মেটের দ্রবণের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে উহার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মনোক্সাইড দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

সাধারণ খাদ্য লবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণ ঃ সাধারণ খাদ্য লবণের (NaCl) দ্রবণ বিদ্যুৎবাহী। তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা হইতে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও কস্টিক সোডা পাওয়া যায়। সোডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

১৫-৪। **হাইড্রোজেনের ধর্ম ঃ** (১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন একটি স্বচ্ছ বর্ণহীন গ্যাস। ইহা জলে অদ্রবণীয়, ০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার জলে ইহার দ্রবণীয়তা মাত্র ·০২২ ঘন-সেন্টিমিটার। ইহা সমস্ত পদার্থ হইতে লঘুভার—জগতের ইহা লঘুতম পদার্থ। ইহার ঘনত্ব—·০০০০৮৯ গ্রাম (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে)।

পরীক্ষা ঃ একটি বায়ুপূর্ণ জার উল্টা করিয়া রাখিয়া তাহার নীচে একটি হাইড্রোজেন-পূর্ণ জার রাখ। একটু সময়ের মধ্যেই দেখা যাইবে যে হাইড্রোজেন উপরের জারে চলিয়া গিয়াছে। একটি জ্বলন্ত কাঠি উপরের জারে ঢুকাইলেই উহা নিভিয়া যাইবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে। হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা হালকা প্রমাণিত হইল। এইভাবে অন্যান্য গ্যাস হইতেও ইহার লঘুত্ব প্রমাণ করা সম্ভব (চিত্র ১৫চ)।

পরীক্ষা ঃ একটি ছোট বেলুনে হাইড্রোজেন ভরিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা তৎক্ষণাৎ উপরের দিকে উঠিয়া যায়। হাইড্রোজেন বায়ু হইতে হালকা না হইলে ইহা হইত না।

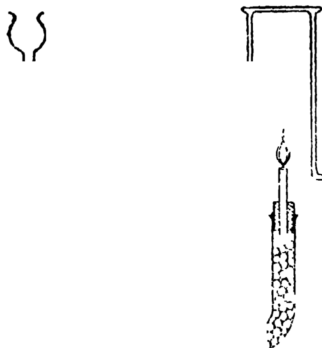

চিত্র ১৫চ—হাইড্রোজেনের লঘুত্ব

(২) হাইড্রোজেন একটি দাহ্য পদার্থ। বায়ু বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুনের সংস্পর্শে আসিলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। দহনকালে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন সংসাধিত হয় এবং জল উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন নিজে দাহ্য বটে, কিন্তু অপরের দহন ক্রিয়ায় কোন সহায়তা করে না। হাইড্রোজেনের এই দাহ্যগুণের জন্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ খুব সহজে জ্বলিয়া উঠিয়া বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। $2H_2+O_2=2H_2O$

পরীক্ষা ১ ঃ একটি জ্বলন্ত কাঠি একটি হাইড্রোজেন-পূর্ণ জারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে, উহা নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু জারের হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে।

পরীক্ষা ২ ঃ একটি শক্ত কাচের বোতল জলপূর্ণ কর। তারপর জল সরাইয়া উহাতে প্রথমে ⅔ অংশ হাইড্রোজেনে পূর্ণ কর এবং পরে ⅓ অংশ অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা ভরিয়া লও। বোতলের

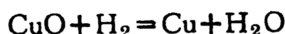
মুখটি কর্কদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখ। একটি মোটা তোয়ালে দ্বারা উহা জড়াইয়া লইয়া উহার মুখের কর্কটি একটি ছোট দীপশিখার সামনে খুলিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সহিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রণটি জ্বলিয়া উঠিবে। পরীক্ষাটি অতি সাবধানে করা প্রয়োজন।



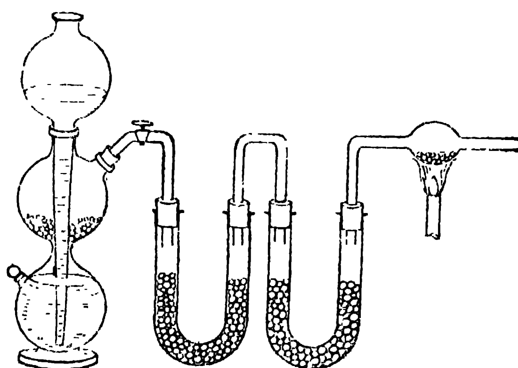
চিত্র ১৫ছ—হাইড্রোজেনের দহন

পরীক্ষা ঃ উলফ্-বোতল হইতে উদ্ভূত হাইড্রোজেন গ্যাস অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড-পূর্ণ একটি U-নলের ভিতর দিয়া চালনা করিয়া উহার জল দূরীভূত করিয়া লও। এই বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনকে একটি সরু নলের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইয়া নলের মুখে আগুন ধরাইয়া দাও। সরু নলটি একটি মোটা নলের মধ্যে রাখ। হাইড্রোজেন ঈষৎ নীল আলোর সহিত জ্বলিতে থাকিবে এবং বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল সৃষ্টি করিবে। এই জল ছোট ছোট বিন্দুর আকারে মোটা নলটির গায়ে জমিতেছে দেখা যাইবে (চিত্র ১৫ছ)।

৩। অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। অনেক উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন চালনা করিলে সেই সকল যৌগ হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইয়া হাইড্রোজেনের সংযোগে জলে পরিণত হয় এবং মৌলিক ধাতুটি উৎপন্ন হয়। যেমন, হাইড্রোজেনের সান্নিধ্যে কপার অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে জল এবং কপার পাওয়া যায়।



$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$



চিত্র ১৫জ—হাইড্রোজেন দ্বারা CuO বিজারণ

পরীক্ষা ঃ কিপ-যন্ত্র হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড-পূর্ণ U-নলের ভিতর দিয়া চালনা করিয়া উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লও। দুইদিকে দুইটি নলসংযুক্ত একটি

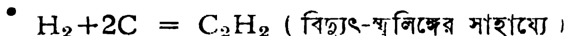
ছোট বালবে অল্প পরিমাণ কালো কপার অক্সাইড লও। এই বালবটি রবার নল দ্বারা U-নলের সহিত জুড়িয়া দাও—যাহাতে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনের প্রবাহ কপার-অক্সাইডের উপর দিয়া যাইতে পারে। বালবের অপর মুখে একটি কর্ক আঁটিয়া উহাতে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সরু নির্গম-নল যুক্ত করিয়া দাও, যাহাতে হাইড্রোজেন অনেকটা দূরে নির্গত হয়। এখন আস্তে আস্তে দীপ-সাহায্যে বালবটি উত্তপ্ত কর। দেখিতে পাইবে কালো কপার অক্সাইড লাল কপার ধাতুতে পরিণত হইয়া যাইতেছে এবং নির্গম-নলের ভিতর ছোট জল-বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে।

যৌগ হইতে এইরূপ অক্সিজেন সরাইয়া লওয়া একরূপ বিজারণ-ক্রিয়া। সুতরাং হাইড্রোজেন একটি বিজারক-দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সকল ধাতুর পরাবিদ্যুৎবাহিতা (Electro-positiveness) অপেক্ষাকৃত কম তাহাদের অক্সাইডই শুধু হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হয়।

(৪) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনেক অ-ধাতুর সহিত হাইড্রোজেনের সাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটে। যেমন :—


$H_2 + Cl_2 = 2HCl$ (আলোর বর্তমানে)


$3H_2 + N_2 = 2NH_3$ (উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে)


$H_2 + 2C = C_2H_2$ (বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে)

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর সহিতও হাইড্রোজেন মিলিত হয় :—


$Ca + H_2 = CaH_2$ $2Na + H_2 = 2NaH$

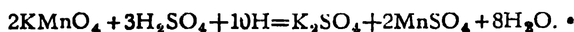
এই সমস্ত পদার্থকে ধাতব হাইড্রাইড বলে। ইহারা সাধারণতঃ অস্থায়ী ধরণের হয় এবং সহজেই ভাঙিয়া যায়।

(৫) কোন কোন ধাতব পদার্থ, বিশেষতঃ প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, আয়রন ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করিয়া লইতে পারে। ধাতুগুলি বিচূর্ণ অবস্থায় থাকিলে শোষিত হাইড্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী হয়। ধাতুর এই প্রকার গ্যাস-শোষণ কার্যকে **'অন্তর্ধৃতি'** (**occlusion**) বলা হয়। বস্তুতঃ এই অন্তর্ধৃতিতে হাইড্রোজেন কঠিন ধাতুতে দ্রবীভূত হইয়া থাকে মাত্র, এবং উহাকে উত্তপ্ত করিলেই ধাতু হইতে পুনরায় হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে। প্যালাডিয়ামের এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

(৬) দেখা গিয়াছে, কোন কোন পদার্থ হাইড্রোজেনের সহিত সাধারণভাবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। কিন্তু সেই পদার্থের ভিতরেই যদি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করা হয় তবে সদ্যোজাত হাইড্রোজেনের সহিত উক্ত পদার্থগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। সুতরাং উৎপত্তি-ক্ষণে অর্থাৎ জায়মান

অবস্থায় (nascent state) হাইড্রোজেন বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়।

পরীক্ষা ঃ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের একটি লঘু দ্রবণ একটি টেস্ট-টিউবে লইয়া কিপ-যন্ত্র হইতে একটি নলের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস উহার ভিতরে চালনা কর। দেখিবে বহুক্ষণ রাখিলেও উহার কোন পরিবর্তন হইবে না। অপর একটি টেস্ট-টিউবে সেই লঘু দ্রবণের আর খানিকটা লইয়া উহাতে একটু জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দাও। অ্যাসিড এবং জিঙ্ক হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে। এই জায়মান হাইড্রোজেন লাল পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণকে বিজারিত করিয়া বর্ণহীন করিয়া দিবে। শুধু জিঙ্ক অথবা সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত অবশ্য পারম্যাঙ্গানেটের কোন বিক্রিয়া হইতে দেখা যায় না।


$$2KMnO_4+3H_2SO_4+10H=K_2SO_4+2MnSO_4+8H_2O.$$

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের পরিবর্তে ফেরিক ক্লোরাইড বা পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণ লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রমাণিত হয় সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা জায়মান হাইড্রোজেনের সক্রিয়তা অধিকতর।


$$FeCl_3+H=FeCl_2+HCl$$


$$K_2Cr_2O_7+4H_2SO_4+6H=K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+7H_2O$$

জায়মান হাইড্রোজেনের সক্রিয়তা কেন অধিক তাহার খুব সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ মনে করেন, জায়মান অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুগুলি একক থাকে, অণুতে পরিণত হওয়ার পূর্বেই তাহারা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। অণু অপেক্ষা পরমাণুর অধিকতর সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা। আবার কেহ কেহ বলেন যে হাইড্রোজেনের উৎপত্তিক্ষণে যে বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাপশক্তি নির্গত হয় তাহাই এই হাইড্রোজেনকে সক্রিয় করিয়া তোলে এবং বিক্রিয়াতে সাহায্য করে।

১৩-৮। হাইড্রোজেনের ব্যবহার ঃ বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এবং অন্যান্য প্রয়োজনেই আজকাল হাইড্রোজেনের প্রচুর ব্যবহার হয়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যামোনিয়া, কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন শিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক। অক্সিজেনের সহিত ইহাকে জ্বালাইয়া অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা তৈয়ারী করা হয়। উহার উষ্ণতা খুব বেশী, এবং ধাতু গলানোর কাজে প্রয়োজন।

কৃত্রিম চর্বি জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে এবং উড়ো জাহাজ এবং বেলুনে ইহা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

অক্সিজেন

সঙ্কেত O_2। পরমাণু-ক্রমাঙ্ক = ৮। পারমাণবিক গুরুত্ব = ১৬।

সুইডেনবাসী শীলে (Scheele), ইংরেজ প্রিস্টলী (Priestley) এবং ফরাসী দেশের লাভয়সিয়র (Lavoisier)—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিন জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম অক্সিজেন আবিষ্কারের ইতিহাসের সহিত জড়িত। প্রায় একই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র উপায়ে এই গ্যাসটির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

মৌলসমূহের ভিতর পৃথিবীতে অক্সিজেনের প্রাচুর্য সর্বাধিক। পৃথিবীর বস্তু-সমষ্টির প্রায় অর্ধেকেই অক্সিজেন। জল, মাটি, বায়ু, বহু খনিজ পদার্থ, এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতের বিভিন্ন উপাদানে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। বাতাসে মৌলিক অবস্থায় এবং অন্যান্য পদার্থে যৌগিক অবস্থায় অক্সিজেন পাওয়া যায়। বায়ুর আয়তনের শতকরা ২০·৯ ভাগ এবং জলের ওজনের শতকরা ৮৮·৮ ভাগ অক্সিজেন।

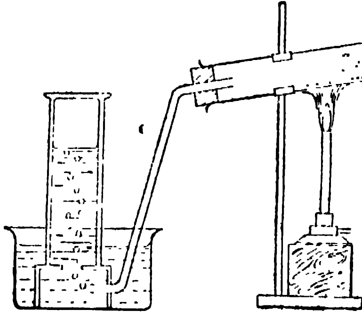
১৬-১। প্রস্তুতি: সাধারণতঃ তিন রকম পদার্থ হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত করা যাইতে পারে: (১) অক্সিজেন-বহুল কতকগুলি যৌগিক পদার্থ, (২) জল এবং (৩) বায়ু।

(ক) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি: চার ভাগ বিচূর্ণ পটাসিয়াম ক্লোরেট, এক ভাগ বিচূর্ণ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও। শক্ত কাচের একটি অপেক্ষাকৃত মোটা টেস্ট-টিউবের প্রায় অর্ধেকটা এই মিশ্রণ দ্বারা ভরিয়া লও। টেস্ট-টিউবের মুখে একটি কর্ক আঁটিয়া উহাতে একটি সরু নির্গম-নল জুড়িয়া দাও। নির্গম-নলটি বেশ দীর্ঘ এবং নীচের দিকে বাঁকান হইতে হইবে এবং উহার অপর প্রান্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীতে জলের নীচে রাখিতে হইবে। একটি বন্ধনীর সাহায্যে টেস্ট-টিউবটি এমনভাবে রাখ যাহাতে উহার মুখের দিকটা ঈষৎ অবনমিত অবস্থায় থাকে (চিত্র ১৬ ক)। এখন বুনসেন দীপ-সাহায্যে টেস্ট-টিউবটিতে তাপ দিলেই আস্তে আস্তে উহার অভ্যন্তরস্থ পটাসিয়াম ক্লোরেটের রাসায়নিক পরিবর্তন সুরু হইবে। পটাসিয়াম ক্লোরেট বিযোজিত হইয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হইবে।



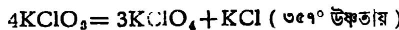
$$2KClO = 2KCl + 3O_2.$$

অক্সিজেন গ্যাস নির্গম-নল দিয়া আসিয়া জলের ভিতর বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইতে থাকিবে। যেখানে বুদ্‌বুদ উঠিবে, সেখানে একটি গ্যাসজার জলপূর্ণ করিয়া উপুড় করিয়া রাখ। ধীরে ধীরে অক্সিজেন গ্যাসজারের ভিতর জমিতে থাকিবে এবং জল সরিয়া যাইবে। গ্যাসজারটি যখন অক্সিজেনে সম্পূর্ণ ভর্তি হইয়া যাইবে, একটি ঢাকনি দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া বাহিরে লইয়া যাও। এইরূপে কয়েকটি গ্যাসজার অক্সিজেনেপূর্ণ করিয়া লইতে পার।



চিত্র ১৬ ক—অক্সিজেন প্রস্তুতি

অক্সিজেন তৈয়ারী করার সময় সর্বদাই পটাসিয়াম ক্লোরেটের সহিত ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড না দিয়া কেবলমাত্র পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিলেও অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। তাপ-প্রয়োগ করিলে পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রথমে ৩৫৭° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গলিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে পটাসিয়াম পারক্লোরেট ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডে পরিবর্তিত হইতে থাকে।

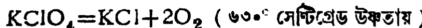


$$4KClO_3 = 3KClO_4 + KCl$$ (৩৫৭° উষ্ণতায়)

পটাসিয়াম পারক্লোরেট

আরও তাপবৃদ্ধি করিয়া ৩৮০° উষ্ণতায় পৌঁছিলে পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অল্প অল্প অক্সিজেন বাহির হইতে থাকে। $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$ (৩৮০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়)

কিন্তু এই সময় ক্লোরেট দ্রুত পারক্লোরেটে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে থাকে এবং অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। আরও অনেক বেশী উত্তপ্ত করিলে ৬১০° উষ্ণতায় পটাসিয়াম পারক্লোরেট গলিয়া যায় এবং ৬৩০° ডিগ্রীতে পারক্লোরেট হইতে আবার অক্সিজেন বাহির হইতে থাকে।



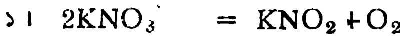
$$KClO_4 = KCl + 2O_2$$ (৬৩০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়)

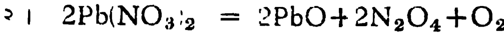
অর্থাৎ শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন পাইতে হইলে ৬৩০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশাইয়া দিলে অনেক কম উষ্ণতায় (২৪০° সেন্টিগ্রেড) অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং ক্লোরেটের বিয়োজনটিও অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। একমাত্র উহার উপস্থিতিতেই পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিশ্লেষণ অতি সহজে সম্পাদিত হয়। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ওজনেরও কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের বদলে অন্যান্য কোন

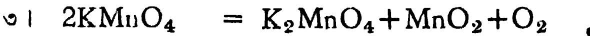
কোন পদার্থ যেমন কপার অক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও ক্লোরেটের বিযোজন ত্বরান্বিত করা যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন পদার্থ, শুধু যাহাদের উপস্থিতি দ্বারা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব অথচ যাহাদের নিজেদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, সেই পদার্থগুলিকে **'প্রভাবক'** (catalyst) বলা হয়। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

অক্সিজেন উৎপন্ন হওয়ার পর যে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কোন পরিবর্তন হয় না তাহা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। উত্তপ্ত করিয়া যথাসম্ভব অক্সিজেন প্রথমে বাহির করিয়া লওয়া হয়। পরে টেস্ট-টিউবটি ঠাণ্ডা হইলে উহাতে জল দিয়া সমস্ত কঠিন পদার্থটুকু একটি বীকারে স্থানান্তরিত করা হয়। বীকারটি গরম করিয়া উহার জল ফুটাইয়া লইলে পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয় না। ফিল্টার কাগজে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ছাঁকিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ওজন করিলে দেখা যাইবে যতটুকু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দেওয়া হইয়াছিল তাহাই রহিয়াছে এবং উহার রাসায়নিক ধর্মেরও কোন পরিবর্তন হয় নাই।

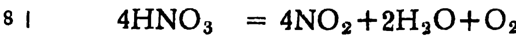
(খ) পটাসিয়াম ক্লোরেটের মত আরও অন্যান্য অনেক অক্সিজেন-বহুল পদার্থ উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—


১। $2KNO_3 = KNO_2 + O_2$


২। $2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 2N_2O_4 + O_2$


৩। $2KMnO_4 = K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

এমন কি, গাঢ় নাইট্রিক অথবা সালফিউরিক অ্যাসিডও যদি ফোঁটা ফোঁটা করিয়া লোহিত-তপ্ত ঝামাপাথরের উপর ফেলা হয় তবে উহাদের অণুগুলি ভাঙিয়া অক্সিজেন উৎপন্ন হয় :—

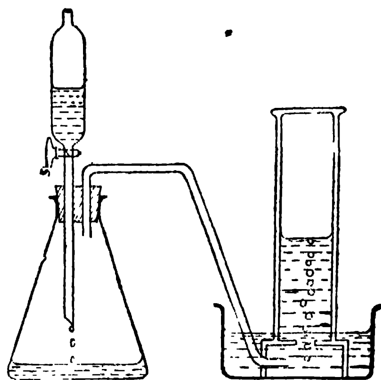

৪। $4HNO_3 = 4NO_2 + 2H_2O + O_2$

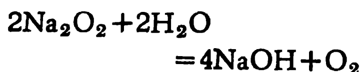

৫। $2H_2SO_4 = 2SO_2 + 2H_2O + O_2$

(গ) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এবং বিভিন্ন ধাতব পার-অক্সাইড হইতে খুব সহজে অক্সিজেন প্রস্তুত করা সম্ভব।

সাধারণতঃ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড স্বতঃভঙ্গুর। উহা নিজ হইতেই বিশ্লেষিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত হইয়া যায়। উত্তাপ অথবা বিচূর্ণ প্লাটিনাম, গোল্ড, বালু ইত্যাদির উপস্থিতিতে ইহা আরও দ্রুতগতিতে অক্সিজেন দেয়। $2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$

পরীক্ষা ঃ একটি শঙ্কু-কূপীতে খানিকটা শুষ্ক সোডিয়াম পার-অক্সাইড লও। উহার মুখটি একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে একটি বিন্দুপাতী ফানেল ও একটি নির্গম-নল আঁটিয়া দাও। ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ভিতরে দিতে থাক। জল সোডিয়াম পার-অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিবামাত্র পার-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নল দিয়া বাহির হইতে থাকিবে।


চিত্র ১৬খ—সোডিয়াম পার-অক্সাইড হইতে অক্সিজেন প্রস্তুতি



$$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2$$

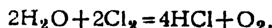
(ঘ) কোন কোন গুরু ধাতুর অক্সাইড তাপের সাহায্যে ভাঙিয়া গিয়া অক্সিজেন উৎপন্ন করে। যেমন,



$$2HgO=2Hg+O_2 \quad 2Ag_2O=4Ag+O_2 \quad 3MnO_2=Mn_3O_4+O_2.$$

(ঙ) **জল হইতে ঃ** জলের তাড়িত-বিশ্লেষণ দ্বারা অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে জলীয় বাষ্প হইতে হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। জলীয় বাষ্প এবং উহার সমায়তন ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রিত করিয়া একটি ঝামাপাথর-পূর্ণ পর্সেলীনের নলের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। পর্সেলীনের নলটি খুব উত্তপ্ত করিলে উহার অভ্যন্তরস্থ বাষ্প ও ক্লোরিনের ভিতর রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অক্সিজেন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।



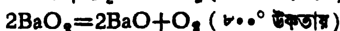
$$2H_2O+2Cl_2=4HCl+O_2.$$

(চ) **বায়ু হইতে ঃ** বাতাস প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি মৌলিক গ্যাসের সাধারণ মিশ্রণ। বায়ু হইতে দুইটি উপায়ে অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে।

১। বেরিয়াম মনোক্সাইড উত্তপ্ত করিলে প্রায় ৫০০° সেণ্টি. উষ্ণতায় উহা বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয় এবং বেরিয়াম পার-অক্সাইড যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। যদি উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে প্রায় ৮০০° সেণ্টিগ্রেডে বেরিয়াম পার-অক্সাইড বিশ্লেষিত হইয়া অক্সিজেন ও পুনরায় বেরিয়াম মনোক্সাইডে ফিরিয়া আসে। এইরূপে বাতাসের অক্সিজেন পরোক্ষ-ভাবে অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক করিয়া সঞ্চয় করা যাইতে পারে। অক্সিজেন প্রস্তুত করার এই উপায়টি 'ব্রীন প্রণালী' নামে খ্যাত।



$$2BaO+O_2=2BaO_2 \text{ (৫০০° উষ্ণতায়)}$$



$$2BaO_2=2BaO+O_2 \text{ (৮০০° উষ্ণতায়)}$$

বস্তুতঃ উষ্ণতার পরিবর্তন না করিয়া, ১০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখিয়া চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া উক্ত বিক্রিয়া দুইটি আরও সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

২। তরল বাতাসের আংশিক পাতনের সাহায্যেও বায়ু হইতে অক্সিজেন পাওয়া যায়। বাতাস হইতে প্রথমে উহার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প দূরীভূত করা হয়। তারপর অতিরিক্ত চাপে উহাকে ক্রমাগত শীতল করা হয়। উষ্ণতা কমাইবার জন্য বাহ্যিক উপায় ছাড়াও, হঠাৎ অতিরিক্ত চাপ হইতে সরু নলের ভিতর দিয়া বাতাসকে অল্প চাপে প্রসারিত করা হয়। ইহাতেও বাতাসের উষ্ণতা খুব কমিয়া যায় (জুল-টমসন্ প্রক্রিয়া)। এইভাবে যখন উষ্ণতা —১৯০° সেন্টিগ্রেডের নীচে পৌছায়, তখন বায়ু ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে। তরল বায়ুতেও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক —১৯৫° সেন্টি এবং অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক —১৮৩° সেন্টি। অতএব নাইট্রোজেন অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর উদ্বায়ী। সুতরাং তরল বাতাসকে আংশিকভাবে পাতিত করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাস হইয়া চলিয়া যাইবে এবং পাতনযন্ত্রে অক্সিজেনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে প্রায় নাইট্রোজেন-মুক্ত অক্সিজেন পাওয়া যায়। কোন শিল্পে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হইলে সচরাচর এইরূপেই তৈয়ারী করা হয়। যেখানে তড়িৎ-শক্তি সহজে ও কম খরচে পাওয়া যায় সেখানে অবশ্য ক্ষারীয় পদার্থের দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণে অক্সিজেন প্রস্তুত হয়।

১৩-২। **অক্সিজেনের ধর্ম** ঃ (১) অক্সিজেন একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। বাতাসের চেয়ে ইহা ঈষৎ ভারী ; প্রতি লিটারের ওজন = ১.৪২৯ গ্রাম। জলে ইহার দ্রাব্যতা অধিক নয়। ০° সেন্টি. উষ্ণতায় জলে ইহার দ্রাব্যতা আয়তন হিসাবে শতকরা মাত্র তিন ভাগ। স্বল্প হইলেও এই দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মাছ এবং বহুবিধ জলচর প্রাণী ফুল্কার সাহায্যে এই দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা তাহাদের শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। নতুবা অধিকাংশ জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব থাকিত না।

(২) অক্সিজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক। কাঠ, কেরোসিন, মোম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বাতাসে আগুন ধরাইয়া দিলে উহারা জ্বলিয়া ওঠে এবং পুড়িতে থাকে। পুড়িবার সময় উত্তাপ ও অল্পাধিক আলোর সৃষ্টি হয়। এই প্রজ্বলনের সময় প্রকৃতপক্ষে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত ঐ সকল পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। জ্বলন্ত মোমবাতির উপর যদি একটি গ্লাস চাপা দাও অথবা হারিকেন লণ্ঠনের নীচের বায়ু-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দাও তবে মোম বা লণ্ঠনের বাতি আর জ্বলিবে না।

যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত

ক্রিয়াকে **'দহন'** বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, বায়ু ব্যতিরেকেও দহন হইতে পারে, যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিন গ্যাস মিলিত হইয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড হওয়ার সময় তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয়। ইহাও একটি দহন-ক্রিয়া। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দহন-ক্রিয়াতে দাহ্য বস্তুটির সহিত অক্সিজেনের মিলন হয়।

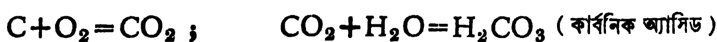
(৩) অক্সিজেন নিজে দাহ্য পদার্থ নহে, কিন্তু অপরের দহন-ক্রিয়ায় সহায়তা করে। যে সমস্ত বস্তু বাতাসে পোড়ে, উহারা অক্সিজেন গ্যাসে আরও দ্রুত এবং অধিকতর উজ্জ্বলতার সহিত পুড়িয়া থাকে।

পরীক্ষা ঃ একটি পাটকাঠির মাথায় আগুন ধরাইয়া লও, উহা জ্বলিতে থাকিবে। ফুঁ দিয়া উহার শিখাটি নিভাইয়া দাও। আলোর শিখা না থাকিলেও কাঠির অগ্রভাগ তখনও লাল হইয়া আস্তে আস্তে পুড়িতে থাকিবে। এইরূপ জ্বলন্ত কাঠিটি একটি অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে, কাঠিটি এখন উজ্জ্বল-শিখাসহ জ্বলিতেছে। অক্সিজেন নিজে কিন্তু জ্বলিবে না, অপরের প্রজ্বলন-ক্রিয়ায় উহা সাহায্য করিবে।

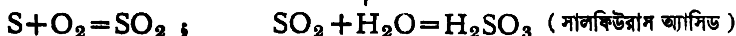
(৪) অক্সিজেন সোজাসুজি বহু ধাতব এবং অধাতব মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সংযোগের কালে তাপ ও আলোর উৎপত্তি হয়। সুতরাং, এই সকল রাসায়নিক ক্রিয়া প্রায়ই দহন বলিয়া মনে করা যায়। কোন মৌলিক পদার্থ ও অক্সিজেনের সহযোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে অক্সাইড বলে।

পরীক্ষা ঃ এক টুকরা কাঠ কয়লা (কার্বন) উজ্জ্বলন-চামচে লইয়া বুনসেন দীপে উত্তপ্ত কর। যখন উহা লাল হইয়া উঠিবে, উহাকে চামচ-সহ একটি অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে কয়লাটি উজ্জ্বল আলোর সহিত জ্বলিতেছে। দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসটি কার্বন ডাই-অক্সাইড।

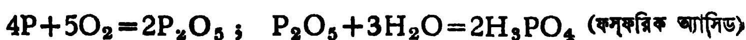
কার্বনের পরিবর্তে সালফার, ফসফরাস প্রভৃতির টুকরা যদি উজ্জ্বলন-চামচ উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারে দেওয়া যায়, উহারাও প্রদীপ্ত শিখার সহিত জ্বলিতে থাকিবে। এই সকল অধাতব অক্সাইড অম্লজাতীয় এবং উহারা জলের সহিত মিলিয়া বিভিন্ন অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। উহা নীল লিটমাসকে লাল করিয়া দেয়।



$C+O_2=CO_2$; $CO_2+H_2O=H_2CO_3$ (কার্বনিক অ্যাসিড)



$S+O_2=SO_2$; $SO_2+H_2O=H_2SO_3$ (সালফিউরাস অ্যাসিড)

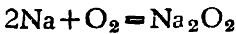


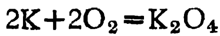
$4P+5O_2=2P_2O_5$; $P_2O_5+3H_2O=2H_3PO_4$ (ফসফরিক অ্যাসিড)

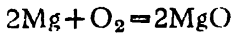
পরীক্ষা ঃ উজ্জ্বলন-চামচে এক টুকরা সোডিয়াম লও। বুনসেন দীপের উপর চামচটি একটু উত্তপ্ত করিলেই সোডিয়াম গলিয়া যাইবে। তখন উহাকে একটি অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে হলুদ-রঙের আলোর সহিত উহা জ্বলিতেছে। সোডিয়ামের পরিবর্তে পটাসিয়াম লইয়া এই পরীক্ষা করিতে পার। পটাসিয়াম দহন হওয়ার সময় বেগুনী রঙের আলো বিকিরণ করিবে।

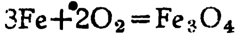
একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের তার যদি অক্সিজেনের গ্যাসজারে দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা একটি প্রখর আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করিবে এবং অতি দ্রুত উহা পুড়িয়া যাইবে।

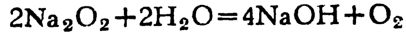
প্রত্যেকটি ধাতুর দহনের ফলেই কিছু ভস্ম পাওয়া যাইবে। এইগুলি ধাতুর অক্সাইড। ধাতব অক্সাইডগুলি সাধারণতঃ ক্ষার-জাতীয়। এই সকল অক্সাইডের দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করিয়া দেয়।

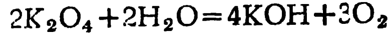

$2Na+O_2=Na_2O_2$


$2K+2O_2=K_2O_4$


$2Mg+O_2=2MgO$


$3Fe+2O_2=Fe_3O_4$


$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2$


$2K_2O_4+2H_2O=4KOH+3O_2$


$MgO+H_2O=Mg(OH)_2$

অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মত কপার, সিলভার প্রভৃতি ধাতু যদি অক্সিজেন গ্যাসে রাখিয়া বা অক্সিজেন প্রবাহের ভিতর উত্তপ্ত করা হয়, তাহা হইলে এই সকল ধাতু আস্তে আস্তে উহাদের অক্সাইডে পরিণত হয় বটে, কিন্তু কোন আলো বা শিখার উৎপত্তি হয় না। অক্সিজেন সংযোগ হইলেও ইহাকে দহন-ক্রিয়া মনে করা যায় না।


$2Cu+O_2=2CuO \qquad 4Ag+O_2=2Ag_2O$

প্লাটিনাম জাতীয় কয়েকটি অভিজাত ধাতু, আরগন প্রভৃতি পাঁচটি বিরল গ্যাস, ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদি চারিটি হ্যালোজেন—এই কয়টি মৌল সাক্ষাৎ-ভাবে অক্সিজেনের সহিত যৌগ সৃষ্টি করিতে পারে না।

(৫) অনেক যৌগিক পদার্থের সহিতও অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া সংসাধিত করে। যেমন, $2NO+O_2=N_2O_4$

স্বচ্ছ, বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেন সংস্পর্শে আসামাত্র উহা লাল রং-এর নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় এই ক্রিয়ার সহায়তা লওয়া হয়।

সালফিউরাস অ্যাসিড, অথবা ফেরাস, স্ট্যানাস, ম্যাঙ্গানাস প্রভৃতি লবণের দ্রবণ অক্সিজেনের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়া করে।



$$2H_2SO_3 + O_2 = 2H_2SO_4$$



$$4FeCl_2 + 4HCl + O_2 = 4FeCl_3 + 2H_2O$$

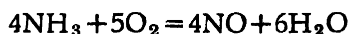


$$2SnCl_2 + 4HCl + O_2 = 2SnCl_4 + 2H_2O$$

বিভিন্ন প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সক্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং নানা বিক্রিয়ার সংঘটন করিয়া থাকে। প্লাটিনামের সাহায্যে সালফার ডাই-অক্সাইড ট্রাই-অক্সাইডে এবং অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়।



$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$



$$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$$

(৬) পটাসিয়াম পাইরোগেলেটের ক্ষারীয় দ্রবণ অথবা অ্যামোনিয়া-যুক্ত কিউপ্রাস-ক্লোরাইডের ক্ষারীয় দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাসকে দ্রুত শোষণ করিয়া লয়। অক্সিজেন প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, কেবল দ্রবীভূত হইয়া থাকে না।

১৬-৩। অক্সিজেনের ব্যবহার ঃ (১) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ একটি সরু নলের মুখে জ্বালাইয়া দিলে প্রায় বর্ণহীন একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি হয়। ইহাকে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা বলে। বিভিন্ন ধাতু বা কঠিন পদার্থ গলাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সহিত অক্সিজেন মিশাইয়াও ঐরূপ শিখা করা যাইতে পারে। ধাতুর পাত প্রভৃতি জুড়িতে এই সকল শিখার বহুল ব্যবহার আছে।

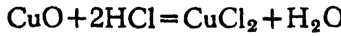
(২) সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়।

(৩) প্রাণীমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত বাতাসের প্রয়োজন হয়। প্রশ্বাসের সহিত এই বাতাস প্রাণিদেহে প্রবেশ করে। বাতাসের অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে এবং উহাদিগকে জারিত করিয়া দেয়। এই ক্রিয়ার ফলে দেহের ভিতরে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয়-বাষ্প ও তাপের সৃষ্টি হয়। এইভাবে আমাদের জীবন-রক্ষা হয়। অতএব প্রাণি-জগতের অস্তিত্বের মূলে আছে অক্সিজেন। ইহাই অক্সিজেনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। জলের নীচে ডুবুরীদের, উড়োজাহাজের চালকের, রোগীর শ্বাসকষ্টের সময় শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

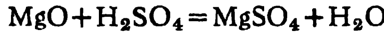
১৬-৪। "অক্সাইড"—কোন মৌলিক পদার্থের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তাহাকেই 'অক্সাইড' বলা হয়।

অতএব অক্সাইড অক্সিজেনের দ্বি-যৌগিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। অক্সাইডসমূহকে উহাদের ধর্ম ও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) **ক্ষারকীয় অক্সাইড (Basic oxide) ঃ** যে সকল অক্সাইড অ্যাসিডের সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে। সচরাচর ধাতব অক্সাইডসমূহ ক্ষারকীয় অক্সাইড হইয়া থাকে। কপার অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ইত্যাদি ক্ষারকীয় অক্সাইড।



$$CuO+2HCl=CuCl_2+H_2O$$

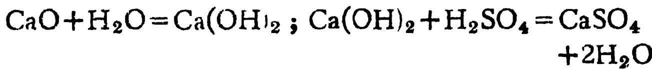


$$MgO+H_2SO_4=MgSO_4+H_2O$$

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড জলে দ্রব হয় এবং জলের সহিত মিলিয়া উহারা ক্ষার প্রস্তুত করে। ক্ষারগুলিও অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই সমস্ত দ্রবণ লাল লিট্‌মাস্‌কে নীল রঙে পরিবর্তিত করে। যেমন,—

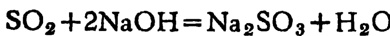


$$Na_2O+H_2O=2NaOH\ ;\ NaOH+HCl=NaCl+H_2O$$

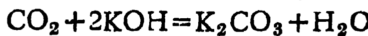


$$CaO+H_2O=Ca(OH)_2\ ;\ Ca(OH)_2+H_2SO_4=CaSO_4+2H_2O$$

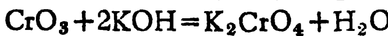
(২) **আম্লিক অক্সাইড (Acidic oxide) ঃ** যে সকল অক্সাইড ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং উহার ফলে লবণ ও জলে পরিণত হয় তাহাদিগকে আম্লিক অক্সাইড বলে। সচরাচর অধাতব অক্সাইডসমূহ আম্লিক অক্সাইড হয়। যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন পেন্টোক্সাইড ইত্যাদি আম্লিক অক্সাইড। অতিরিক্ত অক্সিজেন-সমন্বিত কোন কোন ধাতব অক্সাইডও অম্লজাতীয়; যেমন, CrO_3, Mn_2O_7 ইত্যাদি



$$SO_2+2NaOH=Na_2SO_3+H_2O$$



$$CO_2+2KOH=K_2CO_3+H_2O$$



$$CrO_3+2KOH=K_2CrO_4+H_2O$$

আম্লিক অক্সাইডগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া অ্যাসিডের সৃষ্টি করে এবং অ্যাসিড মাত্রেরই নীল লিট্‌মাসকে লাল লিট্‌মাসে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে।

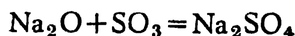


$$CO_2+H_2O=H_2CO_3$$

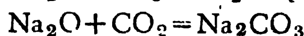


$$N_2O_5+H_2O=2HNO_3$$

আম্লিক ও ক্ষারকীয় অক্সাইড স্পষ্টতঃই পরস্পরের বিরোধী। কখন কখনও এই দুই জাতীয় অক্সাইড যুক্ত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে। যেমন,



$$Na_2O+SO_3=Na_2SO_4$$

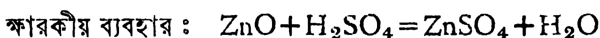


$$Na_2O+CO_2=Na_2CO_3$$

(৩) **উভধর্মী অক্সাইড (Amphoteric oxide)ঃ** কোন কোন অক্সাইডের মধ্যে ক্ষারকীয় এবং আম্লিক উভয় অক্সাইডেরই ধর্ম বিদ্যমান থাকে। উহারা অ্যাসিড এবং ক্ষারক উভয়ের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই কারণে উহাদিগকে উভধর্মী অক্সাইড বলা হয়। যেমন, জিঙ্ক অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি।



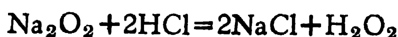
আম্লিক ব্যবহার ঃ $ZnO+2NaOH=Zn(ONa)_2+H_2O$



ক্ষারকীয় ব্যবহার ঃ $ZnO+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2O$

(৪) **প্রশম অক্সাইড (Neutral oxide)ঃ** যে সমস্ত অক্সাইড অ্যাসিড বা ক্ষারক কাহারও সহিত ক্রিয়া করে না এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থাতেও লিট্‌মাসে রঙের কোন পরিবর্তন করে না, তাহাদিগকে প্রশম অক্সাইড বলা যাইতে পারে। জল, নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি প্রশম অক্সাইড শ্রেণীভুক্ত।

(৫) **পার-অক্সাইড (Peroxide)ঃ** হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক অক্সাইড জল (H_2O), কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া হাইড্রোজেন আরও একটি অক্সাইড উৎপন্ন করে। উহাকে বলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, সঙ্কেত H_2O_2। কোন কোন ধাতব অক্সাইডেও অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সংযুক্ত আছে দেখা যায় এবং উহারা অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপন্ন করে। ঐ সকল অক্সাইডকে পার-অক্সাইড বলা হয়, যেমন,



$$Na_2O_2+2HCl=2NaCl+H_2O_2$$



$$BaO_2+2HCl=BaCl_2+H_2O_2$$

অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সন্নিবিষ্ট হইলেই যে উহা পার-অক্সাইড হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। MnO_2, PbO_2 প্রভৃতিতে উহাদের

সাধারণ ক্ষারকীয় অক্সাইড হইতে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন আছে, কিন্তু উহারা অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়ার ফলে H_2O_2 দিতে পারে না। ইহাদিগকে উচ্চতর অক্সাইড বা পলি-অক্সাইড বলা হয়।

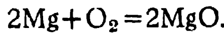
(৬) **যুগ্ম-অক্সাইড**—কোন কোন অক্সাইডের সঙ্কেত এই রকম যে উহাদিগকে দুইটি বিভিন্ন অক্সাইডের মিশ্রণ মনে করা যাইতে পারে। যেমন, Fe_3O_4 (Fe_2O_3, FeO), অথবা Mn_3O_4 ($2MnO$, MnO_2) ইত্যাদি।



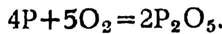
$$Fe_3O_4 + 8HCl = 2FeCl_3 + FeCl_2 + 4H_2O.$$

১৬-৫। জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া (Oxidation and Reduction)

জারণ-ক্রিয়া ঃ কোন পদার্থের জারণ বলিতে সাধারণতঃ উহার সহিত অক্সিজেনের সংযোগ বুঝায়। যে পদার্থের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হয়, তাহা জারিত হইয়াছে বলা হয়। ম্যাগনেসিয়াম বা ফসফরাস দহনকালে অক্সিজেনের সহিত সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ উহারা জারিত হইয়া উহাদের অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। সেইরূপ সালফার ডাই-অক্সাইডের জারণের ফলে সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়।



$$2Mg + O_2 = 2MgO.$$

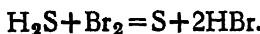


$$4P + 5O_2 = 2P_2O_5.$$



$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3.$$

অক্সিজেন সংযোগ না হইয়া যদি কোন বিক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন দূরীকৃত হয়, তাহাও জারণ-ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সরাইয়া লওয়াও সেই পদার্থের জারণ বলিয়া ধরা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) সহিত ব্রোমিনের ক্রিয়ার ফলে উহার হাইড্রোজেন চলিয়া যায় এবং সালফার পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হইয়া সালফার দিতেছে।



$$H_2S + Br_2 = S + 2HBr.$$



সেইরূপ, $2HBr + H_2SO_4 = Br_2 + SO_2 + 2H_2O$

ইহাও HBr-এর জারণ।

এই দুই প্রকার বিক্রিয়া ব্যতীতও জারণ শব্দটি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি, অক্সিজেন অপরাবিদ্যুৎবাহী মৌল। অক্সিজেনের পরিবর্তে

যদি অন্ত কোন অপরাবিদ্যুৎবাহী মৌল কোন পদার্থে যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই বিক্রিয়াটিও জারণ বলিয়া গণ্য হইবে।



$$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$$



$$SnCl_2+Cl_2=SnCl_4.$$

এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাবিদ্যুৎবাহী ক্লোরিন যুক্ত হইয়াছে। অতএব ফেরাস ক্লোরাইড জারিত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইডে পরিণত হইয়াছে। একথাও বলা যুক্তিসঙ্গত যে ফেরাস ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যুৎবাহী ক্লোরিনের অংশের অনুপাত জারণের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

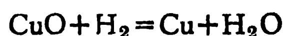


$$2FeSO_4+H_2SO_4+H_2O_2=Fe_2(SO_4)_3+2H_2O$$

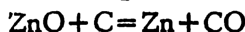
অ্যাসিডের বর্তমানে ফেরাস সালফেট দ্রবণ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড-এর সংস্পর্শে আসিলে ফেরিক সালফেট পাওয়া যায়। ইহা বস্তুতঃ ফেরাস সালফেটের জারণ। জারিত পদার্থ ফেরিক সালফেট। কেন না, ফেরাস সালফেটের অপরাবিদ্যুৎবাহী SO_4-এর অনুপাত এই বিক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অতএব, কোন পদার্থে অক্সিজেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন দূরীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অনুপাত বৃদ্ধি—এজাতীয় যে কোন প্রকারের রাসায়নিক সংঘটনকে জারণ বলা হয়।

বিজারণ: বিজারণ-ক্রিয়া জারণের সম্পূর্ণ বিপরীত। মোটামুটি কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন সরাইয়া লইলে উহা বিজারিত হইয়াছে বলা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসে কপার অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে কপার ধাতু পাওয়া যায়, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ কপার অক্সাইডের অক্সিজেন দূরীকৃত হয়। ইহাই বিজারণ-ক্রিয়া।



$$CuO+H_2=Cu+H_2O$$

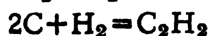


$$ZnO+C=Zn+CO$$

আবার, যদি কোন পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়, তাহা হইলেও উহা বিজারিত হইয়া থাকে।



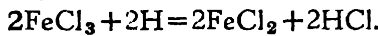
$$Cl_2+H_2=2HCl$$



$$2C+H_2=C_2H_2$$

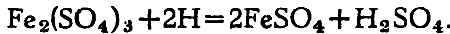
ক্লোরিনের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ হইয়াছে, ক্লোরিনের বিজারণের ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইয়াছে।

'জারণের' মত 'বিজারণ-ক্রিয়া' আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অনুপাত বিক্রিয়ার ফলে যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে সেইরূপ বিক্রিয়াকে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয়। ফেরিক ক্লোরাইডের ক্লোরিনের অংশ জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে কমিয়া যায়। উহা ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত হয়।



$$2FeCl_3 + 2H = 2FeCl_2 + 2HCl.$$

ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়াছে। সেইরূপ জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে ফেরিক সালফেটকেও বিজারিত করিয়া ফেরাস সালফেট পাওয়া যায়।



$$Fe_2(SO_4)_3 + 2H = 2FeSO_4 + H_2SO_4.$$

এখানেও অপরাবিদ্যুৎবাহী SO_4এর অনুপাত বিজারণের ফলে কমিয়াছে।

অথবা, $HgCl_2 + Hg = Hg_2Cl_2$

এই বিক্রিয়াতে মারকিউরিক ক্লোরাইড মারকিউরাস ক্লোরাইড হওয়াতে অপরাবিদ্যুৎবাহী Cl_2এর অনুপাত কমিয়াছে। সুতরাং ইহা $HgCl_2$এর বিজারণ।

অতএব, কোন পদার্থে হাইড্রোজেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন দূরীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের অনুপাত হ্রাস—এই জাতীয় যে কোন প্রকারের রাসায়নিক সংঘটনকে বিজারণ বলা হয়।

জারক ও বিজারক দ্রব্য: যে সকল পদার্থের সাহায্যে কোন বস্তুর জারণ-কার্য সম্পাদিত হয় উহাদিগকে 'জারক দ্রব্য' এবং যে সকল পদার্থের সাহায্যে বিজারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় তাহাদিগকে 'বিজারক দ্রব্য' বলে।

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড কালো লেড সালফাইডকে অক্সিজেন সংযোগে জারিত করিয়া সাদা লেড সালফেটে পরিণত করে। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এই স্থলে জারক-দ্রব্য।



$$PbS + 4H_2O_2 = PbSO_4 + 4H_2O \quad \cdots \quad (ক)$$

আবার, স্ট্যানাস ক্লোরাইড ফেরিক ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যুৎবাহী

ক্লোরিনের অংশ কমাইয়া উহাকে বিজারিত করিয়া ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত করে। স্ট্যানাস ক্লোরাইড বিজারক দ্রব্য।



$$2FeCl_3 + SnCl_2 = 2FeCl_2 + SnCl_4 \quad (\text{খ})$$

একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে, এই বিক্রিয়াগুলিতে প্রত্যেকটি জারণ-ক্রিয়ার সহিত একটি বিজারণ-ক্রিয়াও সংশ্লিষ্ট আছে। 'ক' চিহ্নিত সমীকরণে PbSএ অক্সিজেন যুক্ত হইয়াছে। উহার জারণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে H_2O_2 হইতে আংশিক অক্সিজেন দূরীভূত হইয়া জল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অক্সিজেন দূরীকরণ দ্বারা H_2O_2এর বিজারণ সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই বিজারণ-কার্যে PbS বিজারক দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি, এই বিক্রিয়াতে জারণ এবং বিজারণ উভয় কার্যই সংঘটিত হইয়াছে। বিজারক দ্রব্য (PbS) জারিত হইয়াছে এবং জারক দ্রব্য (H_2O_2) বিজারিত হইয়াছে।

'খ' চিহ্নিত বিক্রিয়াতে দেখা যাইবে, $FeCl_3$ হইতে ক্লোরিনের অংশ কমিয়াছে, উহা বিজারিত হইয়াছে। এখানে বিজারক দ্রব্য $SnCl_2$। আবার বিক্রিয়ার ফলে $SnCl_2$এ অপরাবিদ্যুৎবাহী Cl_2 যুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ $SnCl_2$ জারিত হইয়াছে। সুতরাং জারণ এবং বিজারণ ক্রিয়া উভয়ই বর্তমান। বিজারক দ্রব্য ($SnCl_2$) জারিত হইয়াছে এবং জারক দ্রব্য ($FeCl_3$) বিজারিত হইয়াছে।

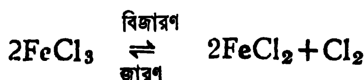
এই কারণেই বলা হয়, 'জারণ ও বিজারণ কার্য যুগপৎ সম্পন্ন হয়।'

অক্সিজেন, ওজোন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, হ্যালোজেন, নাইট্রিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ইত্যাদি বিশেষ রূপে জারক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জায়মান হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, স্ট্যানাস্ ক্লোরাইড, হাইড্রো-আয়ডিক অ্যাসিড, কার্বন, কার্বন-মনোক্সাইড ইত্যাদি সাধারণতঃ বিজারক দ্রব্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

* * * *

আমরা দেখিয়াছি, ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইলে ফেরাস্ ক্লোরাইড হইয়া থাকে।



$$2FeCl_3 \underset{\text{জারণ}}{\overset{\text{বিজারণ}}{\rightleftharpoons}} 2FeCl_2 + Cl_2$$

ক্লোরিন একযোজী। অতএব ফেরিক ক্লোরাইড়ে আয়রন পরমাণু ত্রি-যোজী এবং ফেরাস ক্লোরাইডে উহা দ্বিযোজী। অর্থাৎ বিজারণের ফলে আয়রনের যোজ্যতা কমিয়া গিয়াছে। অথবা জারণের ফলে আয়রনের যোজত্যা বাড়িয়া থাকে। সুতরাং **যে সমস্ত বিক্রিয়াতে পদার্থের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশের (অর্থাৎ ধাতুর) যোজ্যতা বৃদ্ধি পায় সেই সকল রাসায়নিক পরিবর্তন জারণ-শ্রেণীভুক্ত**। যেমন, $SnCl_2$ জারিত করিলে $SnCl_4$ হইয়া থাকে।



$$SnCl_2 + Cl_2 = SnCl_4$$

টিনের যোজ্যতা জারণের ফলে দুই হইতে চার হইয়াছে।

* * * *

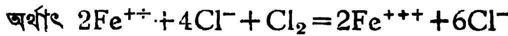
ক্লোরিনের সাহায্যে ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ জারিত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইড হইয়া থাকে। দ্রব অবস্থায় ফেরাস ক্লোরাইড বিযোজিত হইয়া Fe^{++} ক্যাটায়ন এবং Cl^- অ্যানায়ন সৃষ্টি করে।



$$FeCl_2 = Fe^{++} + 2Cl^-$$



$$2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$$

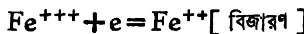


অর্থাৎ $2Fe^{++} + 4Cl^- + Cl_2 = 2Fe^{+++} + 6Cl^-$

জারণের ফলে আয়রন আয়ন আরও ইলেকট্রন ছাড়িয়া দেয় এবং ক্লোরিন সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে। এখানে স্পষ্টতঃই আয়রন জারিত হইতেছে এবং ক্লোরিন বিজারিত হইতেছে। অতএব, কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন সরাইয়া লইলে উহার জারণ হয় এবং যাহা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহাই বিজারিত হইয়া থাকে।



$Fe^{++} - e = Fe^{+++}$ [জারণ]



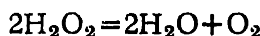
$Fe^{+++} + e = Fe^{++}$ [বিজারণ]

বিজারক দ্রব্য সর্বদাই ইলেকট্রন ছাড়িয়া দেয় এবং জারকদ্রব্য সর্বদাই ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৬-৬। প্রভাবন (Catalysis): প্রত্যেক রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিক্রিয়ার একটা বেগ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব দ্রুত হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার গতি মন্থর। প্রায়ই দেখা যায়, এই সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কোন কোন পদার্থ যোগ করিয়া দিলে, উহাদের বেগের পরিবর্তন হয়। অথচ এই সকল পদার্থের সহিত সেইসব রাসায়নিক

বিক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে এই সকল পদার্থ বিক্রিয়া শেষে রাসায়নিক বিচারে অপরিবর্তিত থাকে। এই পদার্থগুলি ঐ সকল বিক্রিয়াতে (আপাততঃ) অনাবশ্যক। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের মাত্র উপস্থিতির সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতির হ্রাসবৃদ্ধি করাকে 'প্রভাবন' বলা হয়। যে সমস্ত পদার্থ এইভাবে বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রভাবিত করে তাহাদের 'প্রভাবক' (Catalyst) বলে।

প্রভাবক দুই প্রকারের। যে সকল পদার্থ কেবলমাত্র উপস্থিতি দ্বারা কোন রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে তাহাদিগকে 'বর্ধক' (positive catalyst) বলে। আবার যে সকল পদার্থ উপস্থিত থাকিয়া কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি কমাইয়া দেয় তাহাদিগকে 'বাধক' (negative catalyst) বলা হয়। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড বিযোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত হয় :—



$$2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$$

যদি একটু প্লাটিনাম-কজ্জল উহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত দ্রুত সাধিত হইবে, অথচ প্লাটিনাম-কজ্জলীর কোন রকম রাসায়নিক পরিবর্তন হইবে না। অপরদিকে, যদি হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডে একটু সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া যায় তবে উহার বিযোজন-গতি খুব কমিয়া যাইবে। অতএব এইক্ষেত্রে প্লাটিনাম বর্ধক এবং সালফিউরিক অ্যাসিড বাধকের কাজ করে।

সোডিয়াম সালফাইট দ্রবণ বাতাসে রাখিয়া দিলে সোডিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। $2Na_2SO_3 + O_2 = 2Na_2SO_4$.

একটু কপার সালফেট দিলে ইহার গতিবেগ খুব বৃদ্ধি পায় এবং অল্প একটু গ্লিসারিন দিলে এই বিক্রিয়াটির পরিবর্তন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং এই বিক্রিয়াতে কপার সালফেট বর্ধক এবং গ্লিসারিন বাধকরূপে কাজ করে। সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিযোজনে বাধকের অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সর্বদাই যে সব বিক্রিয়াতে উহা বাধক হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক বিক্রিয়াতে ইহার কোন প্রভাবন-ক্ষমতাই নাই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা বর্ধকের কাজ করিতে পারে। একথা অন্যান্য প্রভাবক সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

প্রভাবন-ক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে :—

(১) প্রভাবকগুলির শেষ পর্যন্ত কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, এবং উহাদের ওজনেরও কোন তারতম্য ঘটে না।

(২) সাধারণতঃ খুব অল্প পরিমাণ প্রভাবক থাকিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতির যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) প্রভাবক কেবল কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়াইতে বা কমাইতে পারে, কিন্তু যে সকল বিক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় হয় না, তাহা সংঘটন করাইতে পারে না।

(৪) কোন বিক্রিয়ার গতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইলেও প্রভাবক সেই বিক্রিয়ার মোট পরিবর্তনের পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে না। যথা, হাইড্রোজেন ও আয়োডিন গ্যাস মিলিত হইয়া হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড হয়। $H_2 + I_2 = 2HI$। টান্‌স্টেন বা সিলিকা দিলে এই বিক্রিয়াটি দ্রুততর হয় বটে কিন্তু হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে না।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রভাবন-ক্রিয়ার বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

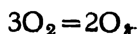
১৬-৭। বহুরূপতা (Allotropy) : কখনও কখনও দেখা যায়, একই মৌল প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্ভব। এই বিভিন্ন প্রকারগুলির অবস্থাগত ধর্মের অবশ্যই বিভিন্নতা আছে এবং অনেক সময় উহাদের রাসায়নিক ধর্মেরও খানিকটা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। মৌলের এইরূপ বিভিন্নরূপে বর্তমান থাকার গুণটিকে বহুরূপতা বলে। যেমন কার্বনের সাত রকম রূপভেদ সম্ভব। উহার দুই প্রকার স্ফটিকাকার, অপর পাঁচটি অনিয়তাকার। সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস প্রভৃতি আরও অনেক মৌলিক পদার্থে এই রকম রূপভেদ বর্তমান। যদিও, এই রকম কোন বহুরূপী মৌলের সমস্ত প্রকারই একই পরমাণুগঠিত, তবুও উহাদের গঠন-পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন রূপভেদের সৃষ্টি হয়।

১৬-৮। ওজোন (Ozone), O_3 : ওজোন ও অক্সিজেন বস্তুতঃ একই মৌলিক পদার্থ—দুইটি রূপভেদ মাত্র। ওজোনের প্রতি অণুতে তিনটি পরমাণু আর অক্সিজেনের অণুতে দুইটি পরমাণু বর্তমান। অর্থাৎ ওজোনের অণু, O_3 এবং অক্সিজেনের অণু, O_2। কিন্তু এই গঠন-বিভিন্নতার জন্য ওজোন এবং অক্সিজেনের ভিতর অবস্থাগত এবং রাসায়নিক ধর্মের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

বায়ুমণ্ডলীর উপরের অংশে খুব স্বল্প পরিমাণে ওজোন পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ অতিবেগনী আলোর সংস্পর্শে বায়ুর অক্সিজেন হইতেই সেখানে ওজোন উৎপন্ন হয়।

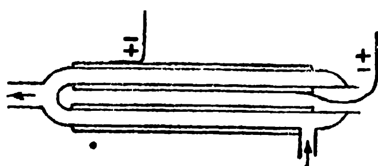
১৬-৯। প্রস্তুতিঃ সাধারণতঃ শব্দহীন বিদ্যুৎক্ষরণের সাহায্যে অক্সিজেন হইতে ওজোন উৎপন্ন করা হয়।



$$3O_2 = 2O_3$$

শব্দহীন বিদ্যুৎক্ষরণ (Silent Electric discharge) ঃ—পরা- এবং অপরা-বিদ্যুৎবাহী দুইটি ধাতুকে যদি খুব কাছাকাছি আনা যায় অথচ উহারা পরস্পরকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে পরা- হইতে অপরা-প্রান্তে বিদ্যুৎক্ষরণ হইতে থাকে। এই বিদ্যুৎক্ষরণে স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং যথেষ্ট উত্তাপ ও আলোকের সৃষ্টি হয়। যদি এই দুইটি ধাতুর ভিতর পাতলা কাচ বা অন্য কোন অন্তরক দ্রব্য (insulator) রাখা যায় তাহা হইলেও নিঃশব্দে বিদ্যুৎক্ষরণ হইতে থাকিবে ; কিন্তু কোন তড়িৎস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হইবে না। অবশ্য ধাতু দুইটি যথেষ্ট তড়িৎশক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ইহাকেই শব্দহীন বিদ্যুৎক্ষরণ বলা হয়।

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ সিমেন্স (Siemens) যন্ত্র ঃ (চিত্র ১৬ গ) এই যন্ত্রে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাচ-নলের ভিতরে একটি সরু কাচ-নল থাকে। নল দুইটির অক্ষদণ্ড (axis) একই হওয়া প্রয়োজন। সরু নলটির ভিতরের প্রান্তটি বন্ধ থাকে এবং অপর প্রান্তে উহার সহিত বাহিরের নলটি জুড়িয়া দেওয়া হয়। অক্সি-



চিত্র ১৬গ—সিমেন্সের যন্ত্র

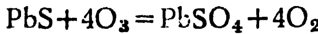
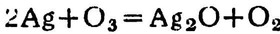
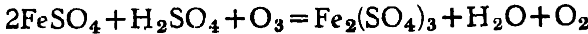
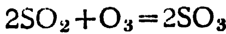
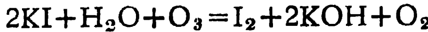
জেনের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য বাহিরের নলটিতে দুইটি পথ আছে। মোটা নলটির বাহিরের দিক এবং সরু নলটির ভিতরের দিকটি পাতলা টিনের পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয়। ব্যাটারী ও আবেশকুণ্ডলীর সাহায্যে এই টিনের পাত দুইটির ভিতর শব্দহীন বিদ্যুৎক্ষরণের সৃষ্টি করা হয়। প্রবেশ- ও নির্গম-নলের সাহায্যে দুইটি নলের মধ্যবর্তী অবকাশের ভিতর দিয়া অক্সিজেন গ্যাস আস্তে আস্তে লইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং এই গ্যাসটি অদৃশ্য এবং শব্দহীন বিদ্যুৎক্ষরণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে বাধ্য হয়। ফলে, নির্গম-পথে যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে উহাতে অক্সিজেনের সহিত ওজোন মিশ্রিত আছে দেখা যায়। এইভাবে অক্সিজেনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ ওজোনে পরিণত

হয়। স্টার্চ ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণে সিক্ত এক টুকরা কাগজ নির্গম-নলের মুখে রাখিলে উহা কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই নীল হইয়া যায়। ওজোনের অস্তিত্বের ইহা একটি প্রমাণ।

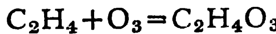
১৬-১০। ওজোনের ধর্ম ঃ (১) ওজোন একটি নীল, মৎস্যগন্ধযুক্ত গ্যাস। জলে ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর দ্রবণীয়। তার্পিন তৈল ওজোনকে খুব সহজেই শোষণ করিয়া লইতে পারে। বায়ু অপেক্ষা ওজোন প্রায় দেড়গুণ ভারী।

(২) উত্তাপের সাহায্যে ওজোন ভাঙ্গিয়া অক্সিজেনে পরিণত হইয়া থাকে। $2O_3=3O_2$

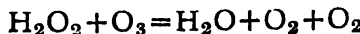
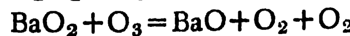
(৩) ওজোনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক। প্রায় সর্বদাই ওজোন বিশেষ ক্ষমতাশীল জারকদ্রব্য হিসাবে রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই সকল জারণ-ক্রিয়াতে প্রায়ই ওজোনের প্রত্যেকটি অণু একটি অক্সিজেন অণুতে পরিণত হইয়া যায় এবং অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটি অপর কোন পদার্থকে জারিত করে।


$$PbS+4O_3=PbSO_4+4O_2$$

$$2Ag+O_3=Ag_2O+O_2$$

$$2FeSO_4+H_2SO_4+O_3=Fe_2(SO_4)_3+H_2O+O_2$$

$$2SO_2+O_3=2SO_3$$

$$2KI+H_2O+O_3=I_2+2KOH+O_2$$

(৪) ওজোন অনেক জৈব-পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিতে সমর্থ। ইথিলিন প্রভৃতি অসম্পৃক্ত জৈব-পদার্থের সহিত ওজোন সরাসরি যুক্ত হইয়া ওজোনাইড সৃষ্টি করে।


$$C_2H_4+O_3=C_2H_4O_3$$
ইথিলিন ইথিলিন-ওজোনাইড

(৫) ওজোনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, বেরিয়াম পার-অক্সাইড প্রভৃতি বিজারিত হইয়া যায় ঃ—


$$H_2O_2+O_3=H_2O+O_2+O_2$$

$$BaO_2+O_3=BaO+O_2+O_2$$

যদিও ওজোন এই ক্ষেত্রে বিজারক দ্রব্যের মত ব্যবহার করে, তথাপি ইহাকে ঠিক বিজারণ-ক্রিয়া বলা সঙ্গত হইবে না; কেননা, বিজারক দ্রব্যটি এস্থলে জারিত হয় নাই।

কয়েকটি পরীক্ষা হইতে ওজোনের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক এক টুকরা কাগজ নিম্নলিখিত দ্রবণে সিক্ত করিয়া লইলে ওজোনের সংস্পর্শে উহাতে বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয় :—

(ক) স্টার্চ এবং পটাস-আয়োডাইড—নীল
(খ) টেট্রামিথাইল ক্ষারক —বেগুনী
(গ) বেঞ্জিডিন —তামাটে।

ওজোনের ব্যবহার : ব্যাকটিরিয়ার উপর ওজোনের বিষক্রিয়া আছে, সেইজন্য পানীয় জল নির্বীজনে ওজোন খুব ব্যবহৃত হয়। তৈল, মোম প্রভৃতি বিরঞ্জনের জন্য এবং ল্যাবরেটরীতে অনেক জৈব-পদার্থ জারিত করার জন্য ওজোনের প্রয়োজন হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে দুইটি যৌগের উৎপত্তি হয় - (১) জল, H_2O এবং (২) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, H_2O_2।

জল, H_2O

বহুদিন পর্যন্ত জল একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবেই পরিগণিত হইত। ১৭৮১ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করেন, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। প্রকৃতিতে জলের প্রাচুর্য দেখা যায়।

১৭-১। প্রাকৃতিক জল (Natural water) : উৎস অনুযায়ী প্রাকৃতিক জলকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) **বৃষ্টি-জল :** সমুদ্র, নদনদী, জলাশয় প্রভৃতি হইতে জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। পরে উহা বায়ুমণ্ডলে শীতল হইলে বৃষ্টি হয়। অতএব ইহাকে স্বাভাবিক উপায়ে পাতিত জল বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে ইহাকেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মনে করা হয়।

(২) **নদী জল :** সাধারণতঃ বৃষ্টির জল হইতে এবং পাহাড়ের উপরের বরফ হইতে নদ-নদীর সৃষ্টি। জলের দ্রাবণীশক্তি খুব বেশী। মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় উহা বহু রকম পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া লয়।

(৩) **প্রস্রবণ-জল :** ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তর হইতে বিভিন্ন ছিদ্রপথে জল নিঃসৃত হইয়া প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। প্রস্রবণের জলেও বহুবিধ লবণ-জাতীয় দ্রব্য এবং অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। কিন্তু বালু, মাটি, কাঁকর প্রভৃতির ভিতর দিয়া অতিক্রম করে বলিয়া উহা খুব স্বচ্ছ হয় এবং কোন অদ্রবণীয় ময়লা উহাতে থাকে না। বালু প্রভৃতির সাহায্যে উহা পরিস্রুত হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ-জাতীয় বস্তু প্রস্রবণ-জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহাকে প্রায়ই খনিজ-জল বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত থাকার জন্য এই জলের স্বাদ এবং প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় এই জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডও থাকে। সোডিয়াম বা লিথিয়াম বাই-কার্বনেট, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, লৌহঘটিত কোন কোন লবণ, হাইড্রোজেন

সালফাইড ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ খনিজ-জলে দেখা যায়। এই সব জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে খুব উপকারী। ভুবনেশ্বর, রাজগীর, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি জায়গার জল এই কারণেই বিখ্যাত।

কূপ অথবা নলকূপের জলও অনেকটা প্রস্রবণ-জলের মত।

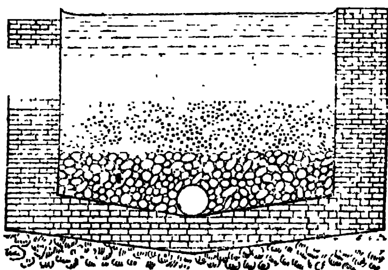
(৪) **সমুদ্র-জল**ঃ ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ সর্বাধিক। খাদ্য লবণের পরিমাণই খুব বেশী এবং খাদ্য-লবণ ছাড়াও অন্যান্য অনেক লবণ জাতীয় পদার্থ ইহাতে আছে। অত্যাধিক লবণাক্ত বলিয়াই ইহা অপেয়।

১৭-২। পানীয় জলঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক জল পানীয়রূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পানীয় জলে কোন রকম রোগজীবাণু বা ভাসমান অদ্রবণীয় পদার্থ থাকিবে না। উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণতঃ মনে হয় যে প্রাকৃতিক জলকে পাতিত করিয়া লইলেই উহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইবে এবং তাহা পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পাতিত জল স্বাদহীন; সেইজন্য পানীয় হিসাবে উহা প্রশস্ত নয়। সামান্য লবণ, একটু অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে বলিয়া পানীয় জলের স্বাদ ভাল হয়।

নদী বা পুষ্করিণীর জল প্রথমে ফুটাইয়া উহাকে বালু ও কাঠকয়লার সাহায্যে পরিস্রুত করিয়া পানের উপযুক্ত করা হয়। প্রথমে ফুটান জল একটি কলসীতে লওয়া হয়। উহাতে একটু ফটকিরি মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই কলসীর নীচে একটি সরু ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়া জল নীচে আর একটি কাঠকয়লাপূর্ণ কলসীতে পড়িতে থাকে। দ্বিতীয় কলসী হইতেও নীচের একটি ছিদ্রপথ দিয়া জল আবার চুয়াইয়া তৃতীয় একটি বালুপূর্ণ কলসীতে পড়ে। এই কলসীর নীচের একটি ছিদ্র দিয়া পরিস্রুত জল নিম্নের একটি আধারে সঞ্চিত হয়। গ্রামে গৃহস্থরা সচরাচর এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে।

বড় বড় সহরে যেখানে অনেক জল সর্বদা সরবরাহ করা আবশ্যক সেখানে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। নিকটস্থ কোন নদী হইতে পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া প্রথমে কতকগুলি বড় বড় জলাশয়ে রাখা হয়। এইখানে জলের ভাসমান অদ্রবণীয় কণাসমূহ ধীরে ধীরে নীচে থিতাইয়া যায়। খাদ কাটিয়া এই জলাশয়গুলি তৈয়ারী করা হয় এবং ইহারা আয়তনে ছোট ছোট পুষ্করিণীর সমান। লোহার জালির খাঁচায় করিয়া ফটকিরির টুকরা এই সব জলাশয়ে ডুবাইয়া রাখা হয়। বালু, মাটি প্রভৃতি সহজে থিতাইয়া যাইতে ফটকিরি সাহায্য করে। এই জলাশয়গুলির পাশেই বড় বড় কতকগুলি পরিস্রুতি-আধার তৈয়ারী করা হয়। এইগুলি ইটের তৈয়ারী চতুষ্কোণ চৌবাচ্চার মত। ইহাদের তলদেশ সমতল নয়, মধ্যস্থল অনেকটা নীচু। সেইখানে পরিস্রুত জল বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার একটি পাইপ আছে। এই

পরিস্রুতি-আধারগুলিতে প্রথমে কয়েক ফুট মোটা কাঁকর ও পাথরের নুড়ি দেওয়া থাকে এবং উহার উপর প্রথমে মোটা বালু এবং তারপর মিহি বালুর স্তর রাখা হয়। পার্শ্ববর্তী জলাশয় হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত জল উহার প্রাচীরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে এই আধারগুলিতে আসে এবং বালু ও পাথরের স্তর অতিক্রম করিয়া নীচের পাইপে যায় (চিত্র ১৭ক)। বালু ও পাথরের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় জল সম্পূর্ণরূপে পরিস্রুত হইয়া থাকে।



চিত্র ১৭ক—পানীয় জলের পরিস্রুতি

অতঃপর ক্লোরিন গ্যাস অথবা ওজোন গ্যাস দ্বারা জল জীবাণুমুক্ত করা হয়। পাম্পের সাহায্যে এই শোধিত জল একটি সু-উচ্চ জলাধারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখান হইতে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ করা হয়। কোন কোন জায়গায় এই জলাধারগুলিতে অতি-বেগনী আলো সৃষ্টি করার সরঞ্জাম থাকে এবং অল্পক্ষণের জন্য জলের মধ্যে অতি-বেগনী রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া জীবাণুসমূহ ধ্বংস করা হয়।

বাতান্বিত জল (Aerated Water)ঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবণীয় এবং চাপ বৃদ্ধির সহিত জলে ইহার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়। সোডা ওয়াটার, লেমনেড প্রভৃতি পানীয়ে পাম্পের সাহায্যে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিয়া রাখা হয়। ছিপি খুলিয়া দিলে উহার চাপ কমিয়া যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন স্বাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, চিনি, আদার রস প্রভৃতিও সেই জলে দেওয়া হয়। এইরূপ অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বিত জলকে 'বাতান্বিত জল' বলে। এই সকল জল হজমের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

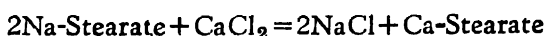
১৭-৩। খর জল ও মৃদু জল (Hard and Soft Water)ঃ সাবান জলে ঘষিলে ফেনা হয়। কিন্তু সকল রকম প্রাকৃতিক জল সাবানের সহিত সহজে ফেনা দেয় না।

মৃদু জল—যে সব জল অতি সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন করে তাহাকে মৃদু জল বলে।

খর জল—যে সব জল সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন করিতে পারে না, তাহাকে খর জল বলে।

জলের খরতার কারণঃ প্রাকৃতিক জলে অনেক রকম ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণসমূহ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে জল খরতা প্রাপ্ত হয়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের বাই-কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট সাধারণতঃ খর জলে দ্রবীভূত থাকে।

সাবানে ষ্টীয়ারিক অ্যাসিড, পামিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব-অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ থাকে। এই জৈব লবণগুলিই জলের সহিত মিশিয়া ফেনার সৃষ্টি করে। ঐ সকল অ্যাসিডের অন্যান্য ধাতব লবণের এই ক্ষমতা নাই। জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের কোন লবণ থাকিলে উহাদের সহিত সাবানের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং সাবানে আর সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের জৈব-লবণ থাকে না। সুতরাং এই সকল জলে ফেনার সৃষ্টি হয় না। জল খরতা-সম্পন্ন হয়।



$$2\text{Na-Stearate} + CaCl_2 = 2NaCl + \text{Ca-Stearate}$$

(সাদা অধঃক্ষেপ)

খর জলের শ্রেণীবিভাগঃ জলের খরতা স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই রকমের হইতে পারে।

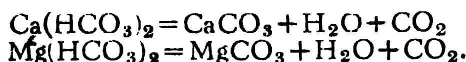
যে সমস্ত খর জল কেবলমাত্র ফুটাইলে বা অন্য কোন সহজ উপায়ে খরতা হইতে মুক্ত হয়, তাহাদিগকে **অস্থায়ী খর জল** বলে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট থাকার জন্যই জলের অস্থায়ী খরতা হয়।

কিন্তু অনেক জলের খরতা কোন সহজ উপায়ে দূর করা যায় না। উহাদিগকে মৃদু জলে পরিণত করিতে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এইসব জলকে **স্থায়ী খর জল** বলে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট জলে থাকিলে উহা স্থায়ী খর জল হইয়া থাকে।

জলের খরতা দূরীকরণঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ জলে দ্রবীভূত থাকে বলিয়াই জলের খরতা হয়। সুতরাং খরতা দূর করিয়া জল মৃদু করিতে হইলে জল হইতে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত পদার্থগুলিকে কোন প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে ঐ সকল লবণ আর দ্রবীভূত থাকিবে না। সুতরাং উহার খরতাও লোপ পাইবে।

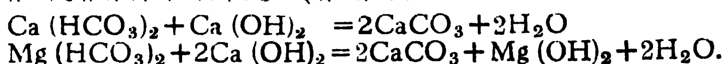
জলের অস্থায়ী খরতা দূরীকরণের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়।

(১) অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইলে উহার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তাপে ভাঙিয়া ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। জলে এই কার্বনেটের দ্রাব্যতা খুব কম, সুতরাং উহারা জল হইতে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জলে আর বিশেষ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকে না এবং উহা মৃদু জলে পরিণত হইয়া যায়।



$$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + H_2O + CO_2$$
$$Mg(HCO_3)_2 = MgCO_3 + H_2O + CO_2.$$

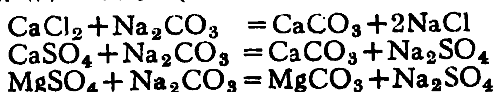
(২) **ক্লার্ক-পদ্ধতি (Clark's Process)**: চুন বা কলিচুনের সাহায্যে জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়। চুনের সহিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেটের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জল হইতে উহারা বিভিন্ন যৌগাকারে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া আসে।



$$Ca\,(HCO_3)_2 + Ca\,(OH)_2 = 2CaCO_3 + 2H_2O$$
$$Mg\,(HCO_3)_2 + 2Ca\,(OH)_2 = 2CaCO_3 + Mg\,(OH)_2 + 2H_2O.$$

এই সকল উপায়ে স্থায়ী খর জলের মৃদুকরণ সম্ভব নহে। স্থায়ী খর জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট থাকে। অস্থায়ী খরতা দূর করিতেও দুইটি উপায় ব্যবহৃত হয়।

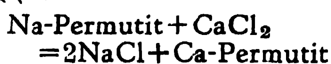
(১) **সোডার সাহায্যে**: স্থায়ী খর জলের সহিত সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বনেট মিশাইলে উহার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণগুলি উহাদের অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিণত হয় এবং অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে দ্রবীভূত অবস্থা হইতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দূরীকৃত হইয়া জল মৃদু হইয়া যায়। কিন্তু এই উপায়টি ব্যয়সাধ্য।



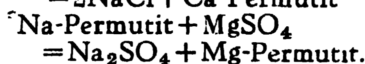
$$CaCl_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3 + 2NaCl$$
$$CaSO_4 + Na_2CO_3 = CaCO_3 + Na_2SO_4$$
$$MgSO_4 + Na_2CO_3 = MgCO_3 + Na_2SO_4$$

(২) **পারমুটিট্ পদ্ধতি (Permutit Process)**: জিয়োলাইট (Zeolite) নামক কতকগুলি খনিজ পদার্থ আছে। উহারা অনেকটা সাধারণ মৃত্তিকার মত, এবং সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটের মিশ্রণে গঠিত। কৃত্রিম উপায়েও জিয়োলাইটের মত পদার্থ সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট হইতে তৈয়ারী করা হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে পারমুটিট্। অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং গোলাকার একটি ইট বা লোহার তৈয়ারী প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারমুটিট্ রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া উপর হইতে নীচে আস্তে আস্তে

খর জল পরিচালনা করা হয়। পারমুটিট্ স্তরের উপরে ও নীচে খানিকটা মোটা বালু বা পাথরের নুড়ি থাকে। পারমুটিট্ দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণগুলিকে অদ্রবণীয় যৌগে রূপান্তরিত করিয়া জল হইতে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। নীচে যে জল সঞ্চিত হয় উহা মৃদু জল।

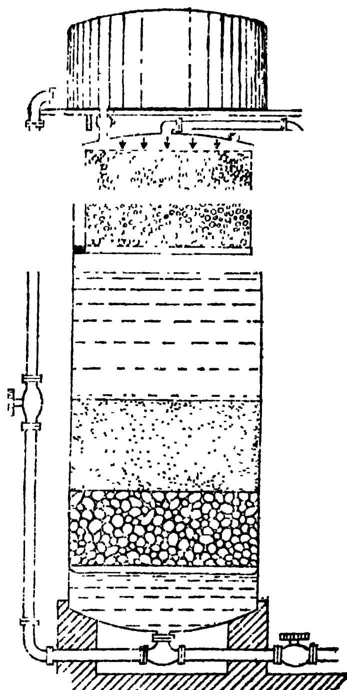


$$\text{Na-Permutit} + CaCl_2 = 2NaCl + \text{Ca-Permutit}$$

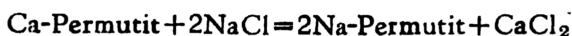


$$\text{Na-Permutit} + MgSO_4 = Na_2SO_4 + \text{Mg-Permutit}.$$

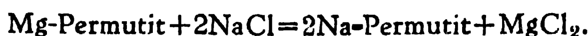
কয়েকদিন ব্যবহারের পর এই পারমুটিটের খরতা-দূরীকরণের ক্ষমতা লোপ পায়; কারণ, উহার সমস্ত সোডিয়াম পারমুটিট্ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যৌগে পরিণত হয়। খাদ্য-লবণের গাঢ় দ্রবণের দ্বারা ইহাকে ধৌত করিলে অর্থাৎ খর জলের বদলে সেই পারমুটিটের ভিতর দিয়া খাদ্য লবণের দ্রবণ প্রবাহিত করিলে ইহা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় জলের খরতা দূর করিতে সমর্থ হয়।



চিত্র ১৭খ—পারমুটিট্ পদ্ধতি



$$\text{Ca-Permutit} + 2NaCl = 2\text{Na-Permutit} + CaCl_2$$



$$\text{Mg-Permutit} + 2NaCl = 2\text{Na-Permutit} + MgCl_2.$$

এই পুনরুজ্জীবনের ফলে একই পারমুটিট্ বহুদিন ব্যবহার করা সম্ভব, অবশ্য ইহার জন্য অনেকটা খাদ্য-লবণ ব্যয় করিতে হয়। বলা বাহুল্য, শুধু স্থায়ী খরতা নয়, দুই রকম খরতাই এই প্রকারে দূর করা সম্ভব।

খর জলের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে বলিয়াই ইহাকে মৃদু করা হয়। (১) খর জলের সাহায্যে কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে সাবানের অপব্যয় হয়। (২) জল অধিক খর হইলে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী এবং এই জন্য পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। উহাতে অনেক খাদ্যদ্রব্যও

সহজে সিদ্ধ করা যায় না। (৩) কেটলীতে এই খর জল উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের স্তর কেট্‌লীর গায়ে জমিতে থাকে। যখন বেশ পুরু স্তর পড়িয়া যায় তখন কেট্‌লীতে সহজে জল উত্তপ্ত হয় না। কারণ, পাত্রের তাপ-বাহিতা অনেক কমিয়া যায়। ফ্যাক্টরীর বয়লারেও যদি খর জল ব্যবহার করা হয়, তবে উহাতেও কিছুদিন পরে কার্বনেটের স্তর জমিয়া যায়। পরে অনেক কয়লা পোড়াইলেও জল ফুটান দুষ্কর হইয়া উঠে।

সমস্ত প্রাকৃতিক জলের খরতার পরিমাণ এক নহে। জলের খরতা ডিগ্রীতে পরিমাপ করা হয়। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে একভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা উহার তুল্যাঙ্ক পরিমাণ অন্য প্রকার ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকিলে জলের এক ডিগ্রী খরতা আছে ধরা হয়। অর্থাৎ ২২° খর জল বলিলে প্রতি লক্ষ পাউণ্ডে ২২ পাউণ্ড ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে মনে করিতে হইবে।

১৭-৪। বিশুদ্ধ জলের ধর্ম ঃ প্রাকৃতিক জলকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে উহাকে অল্প পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও একটু ক্ষারকের সহিত পাতিত করা হয়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে অনেক জীবাণু ত নষ্ট হয়ই, উপরন্তু অন্যান্য জৈবপদার্থও জারিত হইয়া দূরীকৃত হয়। পাতিত জল সমস্ত প্রকার দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ময়লা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ। ইহার স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেন্টিগ্রেড এবং হিমাঙ্ক ০° সেন্টিগ্রেড। ইহার উদ্বায়িতা যথেষ্ট এবং সমস্ত উষ্ণতাতেই ইহা বাষ্পীভূত হইয়া থাকে। ৪° সেন্টিগ্রেডে এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজনকে এক গ্রাম ধরা হয় এবং ইহাই ওজন ও ঘনত্ব পরিমাপের এককরূপে ব্যবহৃত হয়। জলের দ্রাবণী শক্তি অত্যন্ত বেশী। বহু রকম পদার্থ ইহাতে অনায়াসে দ্রাব্য হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর দ্রবণের সময় তাপ বাহির হয় (KOH), আবার কখনও দ্রাবণ কালে উহা শীতল হইয়া যায়, অর্থাৎ বাহির হইতে তাপ গ্রহণ করে (চিনি, NH_4Cl)। জলের তাপ- ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা খুব কম।

অনেক সময় এক বা একাধিক জলের অণু অন্যান্য বিভিন্ন বস্তুর একটি অণুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, $CuSO_4,5H_2O$; $ZnSO_4,7H_2O$। জল-সংযুক্ত পদার্থের এই সকল অণুকে "সোদক অণু" বলা হয়, এবং অধিকাংশ

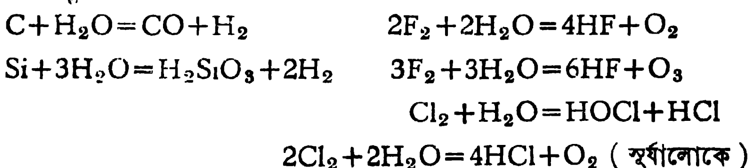
ক্ষেত্রেই সোদক পদার্থসমূহ স্ফটিকের আকারে থাকে। সোদক স্ফটিকের আকৃতি ও রঙ এই কেলাস-জলের (water of crystallisation) উপর নির্ভর করে।

অধিক উত্তাপে, বিশেষতঃ প্লাটিনামের প্রভাবে, জল বিযোজিত হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়; $2H_2O = 2H_2 + O_2$

জল প্রশম অক্সাইড, কিন্তু জলের রাসায়নিক সক্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ক্ষার-ধাতু জলের সংস্পর্শে আসিলেই জল বিশ্লেষিত হইয়া যায়। জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতু অধিকতর উষ্ণতায় জলীয় বাষ্পের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। মারকারি, গোল্ড, সিলভার ও প্লাটিনাম ধাতুর সহিত জলের কোন বিক্রিয়া হয় না।

(২) কয়েকটি অধাতুর সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও জল বিশ্লেষিত হইয়া যায়। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, উত্তপ্ত কার্বন ও সিলিকন প্রভৃতির সহিত জলের বিক্রিয়া হইয়া থাকে।



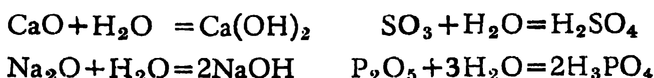
$$C + H_2O = CO + H_2 \qquad 2F_2 + 2H_2O = 4HF + O_2$$

$$Si + 3H_2O = H_2SiO_3 + 2H_2 \qquad 3F_2 + 3H_2O = 6HF + O_3$$

$$Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$$

$$2Cl_2 + 2H_2O = 4HCl + O_2 \text{ (সূর্যালোকে)}$$

(৩) অনেক ধাতব-অক্সাইড ও অধাতব-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে ক্ষার ও অ্যাসিডের উৎপত্তি করে। এইরূপ দ্রবণ বস্তুতঃ রাসায়নিক সংযোগ। যেমন :—



$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2 \qquad SO_3 + H_2O = H_2SO_4$$

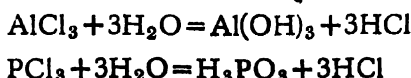
$$Na_2O + H_2O = 2NaOH \qquad P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$$

অ্যামোনিয়ার সহিত জলের সংযোগেও ক্ষার উৎপন্ন হয়।



$$NH_3 + H_2O = NH_4OH$$

(৪) অনেক যৌগিক-পদার্থ জলের দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়া যায়। এইরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াকে "আর্দ্র-বিশ্লেষ" (Hydrolysis) বলা হয়।

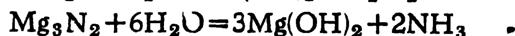


$$AlCl_3 + 3H_2O = Al(OH)_3 + 3HCl$$

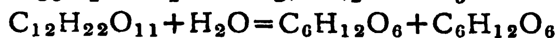
$$PCl_3 + 3H_2O = H_3PO_3 + 3HCl$$



$$CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$$



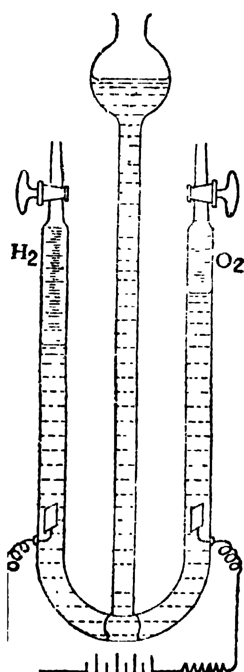
$$Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$$



$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O = C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

চিনি গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ

১৭-ঙ। **জলের সংযুতি ও সঙ্কেত** ঃ যৌগিক পদার্থের উপাদানসমূহ ওজন বা আয়তনের কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিত হইয়া থাকে। এই অনুপাতটিকেই উহার সংযুতি বলা হয় এবং ইহার সাহায্যেই যৌগিক পদার্থের সঙ্কেত ঠিক করা হয়। নির্দিষ্ট অথচ বিভিন্ন পরিমাণ উপাদানগুলির রাসায়নিক মিলন সংঘটিত করিয়া উহাদের অনুপাত জানা যাইতে পারে। অথবা যৌগিক পদার্থটি বিযোজিত করিয়া উপাদানসমূহের যে বিভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা নির্ধারণ করিয়াও উহাদের অনুপাত জানিতে পারা যায়। প্রথমটিকে সাংশ্লেষিক (Synthetic) এবং দ্বিতীয়টিকে বৈশ্লেষিক (Analytical) উপায় বলা চলে। জলের সংযুতি এই দুইটি উপায়েই স্থির করা হইয়াছে।



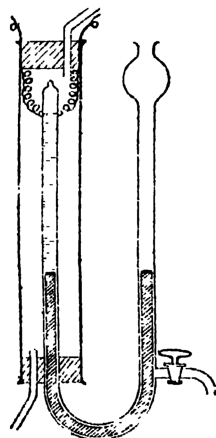
চিত্র—১৭গ
হফম্যান ভল্টামিটার

বৈশ্লেষিক পদ্ধতি ঃ হফম্যানের ভল্টামিটার যন্ত্রে জল বিশ্লেষিত করিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। হফম্যান যন্ত্রটি ১৭গ চিত্রের অনুরূপ। এই যন্ত্রে একটি অংশাঙ্কিত U-নলের নীচের দিকে দুইটি প্লাটিনাম-পাত এবং উপরে দুইটি স্টপকক্ থাকে। U-নলটির মধ্যস্থলে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় নল সংযুক্ত থাকে। এই তৃতীয় নলটির ভিতর দিয়া জল দেওয়া হয় এবং U-নলটির দুইটি বাহুই সম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ করিয়া রাখা হয়। বাহির হইতে এই প্লাটিনাম পাত দুইটিকে একটি ব্যাটারীর দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে জল বিশ্লেষিত হয় এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও অ্যানোডে অক্সিজেন সঞ্চিত হয়। সর্বদাই এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের

আয়তনের অনুপাত দেখা যায়, ২ : ১। অর্থাৎ প্রতি ঘনায়তন অক্সিজেনের সহিত দুই ঘনায়তন হাইড্রোজেনও উৎপন্ন হয়। অতএব, আয়তন হিসাবে জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত, ২ : ১।

সাংশ্লেষিক পদ্ধতি ঃ জলের উপাদানদ্বয়ের আয়তন ও ওজন উভয়েরই অনুপাত সাংশ্লেষিক উপায়ে স্থির করা যাইতে পারে।

আয়তন-সংযুতি ঃ হফম্যানের পরীক্ষা ঃ একটি U-আকৃতিবিশিষ্ট গ্যাসমান যন্ত্রে (Eudiometer) এই পরীক্ষা করা হয়। U-নলটির একটি মুখ বন্ধ থাকে, এবং উহাতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেওয়ার জন্য দুইটি প্লাটিনামের তার লাগান থাকে। নলের এই বাহুটি অংশাঙ্কিত। অপর বাহুর নীচের দিকে স্টপককযুক্ত একটি নির্গম-নল আছে। প্রথমে সম্পূর্ণ নলটি পারদে ভর্তি করিয়া লইয়া উহার অংশাঙ্কিত বাহুতে খানিকটা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ লওয়া হয়। এই মিশ্রণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত রাখা হয়—২ : ১। গ্যাসমান যন্ত্রের বদ্ধ বাহুটির চারিপাশে কঞ্চুকের মত আর একটি অপেক্ষাকৃত মোটা নল রাখা হয়। এই বাহিরের নলটির ভিতর দিয়া অ্যামিল অ্যালকোহলের (amyl alcohol) বাষ্প সঞ্চালিত করা হয়। উহার উষ্ণতা প্রায় ১৩২° সেন্টিগ্রেড। ইহার ফলে ভিতরের মিশ্রণটিও উত্তপ্ত থাকে। উষ্ণতা সমতা প্রাপ্ত হইলে গ্যাসমান যন্ত্রের দুইটি বাহুতে পারদ-তল সমান করিয়া প্রমাণ চাপে ভিতরের গ্যাস-মিশ্রণের আয়তনের পরিমাণ জানিয়া লওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে পারদ-তল সমান করার জন্য স্টপককের সাহায্যে পারদ বাহির করিয়া লইতে হয়। এখন প্লাটিনাম তার দুইটি একটি আবেশ-কুণ্ডলীর সহিত সংযোগ করিলেই গ্যাসমিশ্রণের ভিতরে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হইবে এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু নলটি ১৩২° উষ্ণতায় থাকাতে উৎপন্ন জল বাষ্পাকারে থাকিবে (চিত্র ১৭ঘ)। U-নলের দুই দিকের পারদ আবার সমতলে আনিয়া এই জলীয় বাষ্পের



চিত্র—১৭ঘ
জলের আয়তন-সংযুতি

আয়তন জানিতে পারা যায়। সমস্ত পরীক্ষাতেই দেখা যায়, জলীয় বাষ্পের আয়তন পূর্বোক্ত মিশ্রণের আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ।

যন্ত্রটিকে অতঃপর ঠাণ্ডা করিলে এবং নলের খোলা মুখে অধিক পারদ ঢুকাইলে দেখা যাইবে, ক্রমশঃ বাষ্পের আয়তন কমিতেছে এবং পারদ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। এইভাবে সমস্ত বাষ্প জল হইয়া গেলে নলটি পারদে পূর্ণ হইয়া যায়, কোন গ্যাস আর থাকে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন লওয়া হইয়াছিল তাহার উদ্বৃত্ত আর কিছু থাকে না। অতএব বলিতে পারা যায়, দুই ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন অক্সিজেন মিলিত হইয়া দুই ঘনায়তন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে। অতএব, আয়তন হিসাবে, $H_2 : O_2$: বাষ্প = ২ : ১ : ২। ইহাই জলের আয়তন-সংযুতি। ইহা হইতেই জলীয় বাষ্পের সঙ্কেতও বাহির করা যাইতে পারে। মনে কর, পরীক্ষাকালীন উষ্ণতায় ও চাপে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার কোন গ্যাসে x সংখ্যক অণু থাকে [অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প]। সুতরাং

২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তন অক্সিজেন = ২ ঘনায়তন জলীয় বাষ্প।

∴ ২x হাইড্রোজেন অণু + x অক্সিজেন অণু = ২x জলীয় বাষ্পের অণু।

∴ ১টি হাইড্রোজেন অণু + $\frac{1}{2}$টি অক্সিজেন অণু = ১টি জলীয় বাষ্পের অণু।

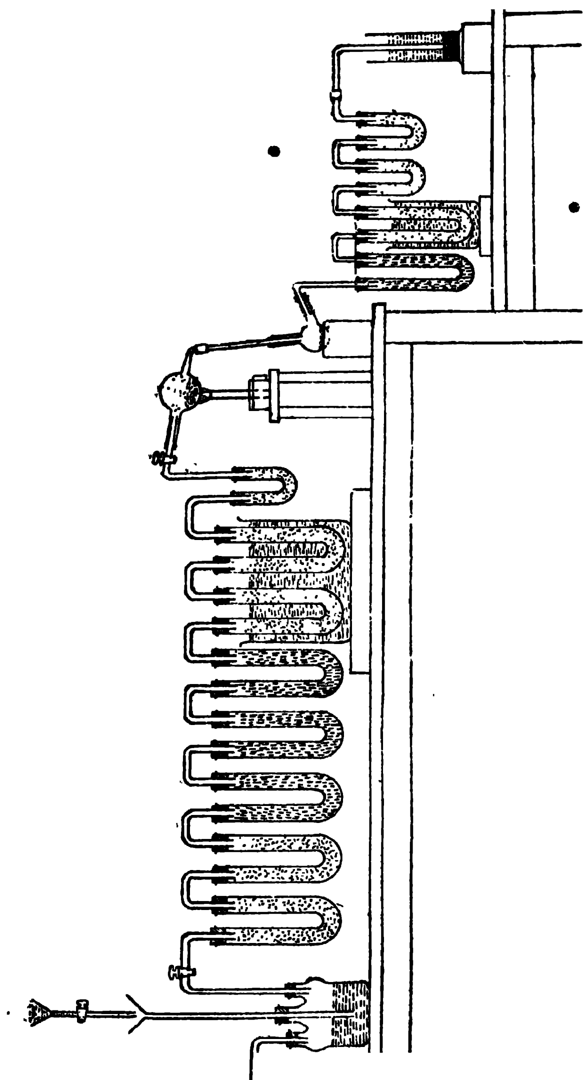
অর্থাৎ ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু + ১টি অক্সিজেন পরমাণু = ১টি জলীয় বাষ্পের অণু।

অতএব, জলীয় বাষ্পের অণুর সঙ্কেত, H_2O।

তরল অবস্থায় একাধিক অণু একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে এরূপ মনে করার কারণ আছে। সেজন্য কখনও কখনও তরল জলের সঙ্কেত লেখা হয়, $[H_2O]_n$।

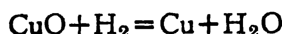
ওজন-সংযুতি : জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত নির্ণয়ের জন্য বহুরকম পরীক্ষা হইয়াছে। এইখানে উহাদের ভিতর দুইটি বিশেষ পরীক্ষার আলোচনা করা হইল।

(ক) ডুমা'র (Duma's) পরীক্ষা : ডুমা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন উত্তপ্ত কপার-অক্সাইডের উপর দিয়া পরিচালনা করিয়া উহাকে জলে পরিণত করেন। কপার-অক্সাইড কপারে বিজারিত হইয়া যায়। উৎপন্ন জলের ওজন, এবং কপার-অক্সাইডের ওজনের হ্রাস হইতে কি পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত



চিত্র ১৭৬—ডুমা'র যন্ত্র

হইয়াছে সহজেই জানা যাইতে পারে। ডুমা'র যন্ত্রের একটি মোটামুটি ধারণা ১৭৬ চিত্রে পাওয়া যাইতে পারে। জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন তৈয়ারী করিয়া উহা লেড নাইট্রেট দ্রবণ, সিলভার সালফেট দ্রবণ ও কঠিন কস্টিক পটাস ভর্তি কতকগুলি U-নলের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। তারপর এই হাইড্রোজেন ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড পূর্ণ দুইটি U-নল অতিক্রম করে, ইহাতে ইহার জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়। বিশুদ্ধ শুষ্ক হাইড্রোজেন অতঃপর একটি কাচের বালবে প্রবেশ করে। কাচের বালবটিতে পূর্বেই নির্দিষ্ট ওজনের কপার অক্সাইড দেওয়া থাকে। বালবটিকে দীপ-সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনকে উহার উপর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। হাইড্রোজেন দ্বারা উত্তপ্ত কপার-অক্সাইড বিজারিত হইয়া কপারে পরিণত হয় এবং উহার অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিয়া জল হয়।



$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$

বালব হইতে এই জল একটি শীতল কূপীতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত হাইড্রোজেন প্রবাহ আরও একপ্রস্থ U-নল অতিক্রম করে। এই U-নলগুলি কস্টিক পটাস ও ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড পূর্ণ থাকে। উৎপন্ন জলের কিছু বাষ্প যদি হাইড্রোজেনের সহিত থাকে তাহা এই U-নলে শোষিত হইয়া থাকিবে। পরীক্ষাটি আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং শেষ হইয়া গেলে শীতল কূপীটি ও এই U-নলগুলি ওজন করা হয়। ইহাতে কি পরিমাণ জল উৎপন্ন হইয়াছে জানা যায়। পরীক্ষার পর যন্ত্রটি শীতল হইলে কপার অক্সাইডের বালবটির ওজন লওয়া হয়। উহার ওজন অবশ্যই হ্রাস পাইবে।

মনে কর, বালব ও কপার অক্সাইডের পরীক্ষার পূর্ববর্তী ওজন $= x$ গ্রাম।

এবং " " " পরবর্তী " $= y$ গ্রাম।

$\therefore$ জল উৎপাদনে যে অক্সিজেন প্রয়োজন হইয়াছে তাহার ওজন $= (x - y)$ গ্রাম।

শীতল-কূপী ও U-নলের পূর্ববর্তী ওজন $= p$ গ্রাম।

" " পরবর্তী ওজন $= q$ গ্রাম।

$\therefore$ উৎপন্ন জলের ওজন $= (q - p)$ গ্রাম।

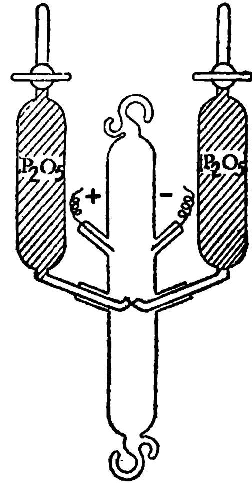
অর্থাৎ $(q - p)$ গ্রাম জল উৎপাদনে $(x - y)$ গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন।

∴ উক্ত জলের জন্য হাইড্রোজেনের পরিমাণ $=(q-p)-(x-y)$ গ্রাম। সুতরাং, $(x-y)$ গ্রাম অক্সিজেন ও $(q-r)-(x-y)$ গ্রাম হাইড্রোজেনের সম্মিলনে $(q-p)$ গ্রাম জল হইয়া থাকে।

অতএব, জলে হাইড্রোজেনেব ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত, $(q-p)-(x-y):(x-y)$। বস্তুতঃ এই অনুপাতটি দেখা গিয়াছে, $H_2:O_2$ $=$ ১ : ৭.৯৮।

(খ) **মর্লির (Morley's) পরীক্ষা**ঃ নির্দিষ্ট ওজনের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে জলে পরিণত করিয়া মর্লি উহাদের ওজনের অনুপাতে স্থির করেন।

প্রথমে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে মর্লি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করেন। কস্টিক পটাস, উত্তপ্ত কপার ও ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের সাহায্যে ইহাকে শোধিত করিয়া একটি কাচের পাত্রে প্যালেডিয়ামে উহাকে বিশোষিত করিয়া রাখা হয়। প্যালেডিয়াম-হাইড্রোজেন সহ পাত্রটি ওজন করিয়া লওয়া হয়।



চিত্র ১৭ চ—মর্লির পরীক্ষা

পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত করিয়া, কস্টিক পটাস, সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড দ্বারা উহাকে শোধিত করা হয়। একটি বায়ুহীন শূন্য পাত্রের ভিতর এই অক্সিজেন রাখা হয়। অক্সিজেন-সহ পাত্রটি ওজন করিয়া লওয়া হয়।

পৃথকভাবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দুইটি ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের বালবের ভিতর দিয়া দুইটি নির্গম-নল সাহায্যে মর্লির যন্ত্রে প্রবেশ করান হয় (চিত্র ১৭ চ)। নির্গম-নল দুইটির মুখের সামনে দুইটি প্লাটিনামের তার রাখা হয়। আবেশকুণ্ডলীর দ্বারা তার দুইটির ভিতর তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলে পরিণত হয়। জল যন্ত্রটির নীচের অংশে জমিতে থাকে। যাহাতে জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণরূপে তরলিত হয় সেইজন্য যন্ত্রটির চারিদিকে বরফ দিয়া উহাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। স্টপককের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রবাহ এমনভাবে পরিচালনা করা হয় যাহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তন-অনুপাত ২ : ১ থাকে। প্রায় ৪০ লিটার হাইড্রোজেন এইভাবে জলে পরিণত করা হয়। পাম্পের সাহায্যে অতঃপর অপরিবর্তিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাহির করিয়া লওয়া হয়। যন্ত্রটিকে ওজন করিয়া উৎপন্ন জলের পরিমাণ জানা হয়। অক্সিজেনের পাত্রটির এবং প্যালেডিয়াম-হাইড্রোজেনের আধারটিরও পুনরায় ওজন লওয়া হয়।

ইহা হইতে ওজনের কি অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়াছে জানা যায়। মর্লির পরীক্ষায় এই অনুপাতটি হইয়াছে, ৬ : ৭·৯৩৯৫।

অর্থাৎ ওজনের হিসাবে, জলে $O_2 : H_2$ = ৮ : ১·০০৭৬।

অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব = ১৬, অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬x গ্রাম হইলে হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন ধরা যায়, ১·০০৮x।

∴ জলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর অনুপাত হইবে,

$$\frac{৮}{১৬x} : \frac{১·০০৭৬}{১·০০৮x} = ১ : ১·৯৯৯ = ১ : ২$$

অর্থাৎ, জলের সঙ্কেত হইবে, H_2O।

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, H_2O_2

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে থেনার্ড প্রথমে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড আবিষ্কার করেন। প্রকৃতিতে সাধারণ অবস্থায় উহা পাওয়া যায় না। বাতাসে হাইড্রোজেন পুড়িবার সময় অথবা সাদা ফসফরাসের স্বাভাবিক মৃদু-দহনের সময় পারিপার্শ্বিক বায়ুতে সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

১৭-৬। **প্রস্তুতি**ঃ সাধারণতঃ খনিজ অ্যাসিডের সাহায্যে সোডিয়াম পার-অক্সাইড, বেরিয়াম-পার-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন পার-অক্সাইড হইতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়।

ল্যাবরেটরী-পদ্ধতিঃ পরীক্ষাগারে সচরাচর ইহা প্রস্তুত করার জন্য দুইটি উপায় প্রয়োগ করা হয়।

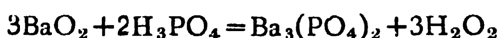
(ক) একটি বীকারে সোদক বেরিয়াম পার-অক্সাইডের সহিত অল্প পরিমাণ জল মিশাইয়া একটি লেই (paste) প্রস্তুত করা হয়। অপর একটি বীকারে খানিকটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড লওয়া হয়। এই দুইটি বীকারই চারিদিকে বরফ দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হয় যাহাতে উহাদের উষ্ণতা প্রায় 0° সেন্টিগ্রেড থাকে। এই অবস্থায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডটি ক্রমাগত নাড়িতে হয় এবং আস্তে আস্তে উহাতে বেরিয়াম পার-অক্সাইডের লেইটি মিশাইয়া দেওয়া হয়। বেরিয়াম পার-অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়ঃ



$$BaO_2 + H_2SO_4 = H_2O_2 + BaSO_4$$

এমন পরিমাণে বেরিয়াম পার-অক্সাইড দিতে হইবে যাহাতে শেষ পর্যন্ত অল্প-পরিমাণ অ্যাসিড উদ্‌বৃত্ত থাকে। কারণ, বেরিয়াম পার-অক্সাইড বেশী হইলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিশ্লেষিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বেরিয়াম সালফেট অদ্রবণীয়; সুতরাং উহা দ্রবণ হইতে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ফিল্টার কাগজের সাহায্যে উহাকে ছাঁকিয়া লইলে, পরিস্রুত দ্রবণে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড মিশ্রিত থাকে।

সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে কখনও কখনও অন্যান্য অ্যাসিডও ব্যবহৃত হয়। যেমন,



$$3BaO_2 + 2H_3PO_4 = Ba_3(PO_4)_2 + 3H_2O_2$$



$$BaO_2 + H_2SiF_6 = BaSiF_6 + H_2O_2 \text{ ইত্যাদি}$$

অনেক সময়, সোডিয়াম পার-অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড তৈয়ারী হয়।



$$Na_2O_2 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O_2$$

(খ) **মার্ক-পদ্ধতি** (Merck's Process) **:** একটি পাত্রে জলের মধ্যে খানিকটা বেরিয়াম পার-অক্সাইড মিশাইয়া দেওয়া হয়। বেরিয়াম পার-অক্সাইড জলে অদ্রবণীয়, সুতরাং উহা জলে ভাসমান বা প্রলম্বিত থাকিবে। পাত্রটিকে চারিদিকে বরফ দ্বারা আবৃত করিয়া উহার উষ্ণতা খুব কম রাখা হয়। অতঃপর ক্রমাগত কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি প্রবাহ উহাতে দিলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও অদ্রবণীয় বেরিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। বেরিয়াম কার্বনেট এবং অপরিবর্তিত বেরিয়াম পার-অক্সাইড ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া লইলেই হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের দ্রবণ পাওয়া যায়।



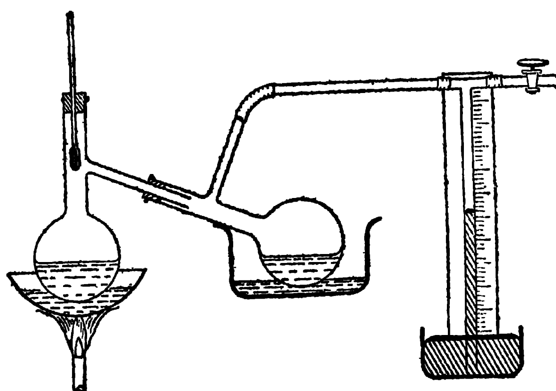
$$BaO_2 + CO_2 + H_2O = BaCO_3 + H_2O_2$$

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড : যে উপায়েই ইহা প্রস্তুত করা হউক, সর্বদাই হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। জলমুক্ত বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পাওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। জল হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অপেক্ষা অধিকতর উদ্বায়ী। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু দ্রবণটি প্রথমতঃ একটি থালার মত বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া একটি জলগাহের উপর ৬০°-৭০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত

করা হয়। ইহাতে দ্রবণটি ঘনীভূত হইয়া, হাইড্রোজেন প্মার-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ হইয়া থাকে। আরও ঘনীভূত করিতে গেলে, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড বিযোজিত হইয়া যায়। অতঃপর এই ৬৬% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণটির অনুপ্রেষ-পাতনের সাহায্যে উহাকে শতকরা ৯৯·১ ভাগ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত করা হয়। এই পাতন ক্রিয়াটি ৮৫ সেন্টিগ্রেডে সম্পন্ন হয়। ইহার একটি চিত্র (১৭ছ) দেওয়া হইল।

পাতিত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে অতঃপর একটি অনুপ্রেষ শোষকাধারের (Vacuum desiccator) ভিতর সালফিউরিক অ্যাসিডের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে সালফিউরিক অ্যাসিড উহার জল শোষণ করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পাওয়া যায়।

বাজারে অবশ্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণের চাহিদাই অধিক এবং সচরাচর উহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড বিশ্লেষিত হইয়া সর্বদাই অক্সিজেন দেয়।



চিত্র ১৭ছ—H_2O_2এর অনুপ্রেষ পাতন

শিল্প-পদ্ধতি ঃ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বহুল ব্যবহার আছে। সুতরাং, প্রচুর পরিমাণে ইহা তৈয়ারী করা প্রয়োজন। সেই জন্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রস্তুতি একটি রাসায়নিক শিল্প হিসাবে গণ্য হইতে পারে। অধিক পরিমাণে ইহা প্রয়োজন হইলে উল্লিখিত উপায়ে বেরিয়াম পার-অক্সাইড বা সোডিয়াম পার-অক্সাইড হইতে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রস্তুত

করা হয়। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে পার-সালফিউরিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ দ্বারাও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড তৈয়ারী হয়।

ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (শতকরা ৫০ ভাগ) তাড়িত-বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডপ্রান্তে পার-সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। অতঃপর পার-সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণটি অনুপ্রেষ-পাতন করিয়া সীসার শীতক সাহায্যে ঘনীভূত করিলে উহার আর্দ্রবিশ্লেষণ হয় এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পাওয়া যায়।

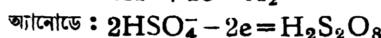
ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে H^+ এবং HSO_4^- আয়ন থাকে।



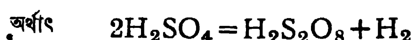
$$2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + 2HSO_4^-$$



ক্যাথোডে : $2H^+ + 2e = H_2$

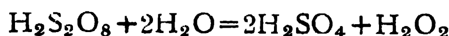


অ্যানোডে : $2HSO_4^- - 2e = H_2S_2O_8$



অর্থাৎ $2H_2SO_4 = H_2S_2O_8 + H_2$

$H_2S_2O_8$ পাতিত করার সময় আর্দ্র-বিশ্লেষণে :—



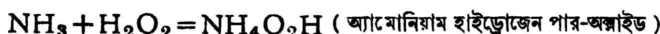
$$H_2S_2O_8 + 2H_2O = 2H_2SO_4 + H_2O_2$$

এই পদ্ধতিতে H_2SO_4 পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ জল হইতেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা H_2O_2 উৎপন্ন হইতেছে।

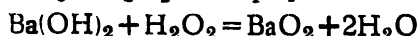
১৭·৭। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ধর্ম ঃ

(১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সাধারণ অবস্থায় একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ, উহার ঘনত্ব ১.৪৬ গ্রাম। নাইট্রিক অ্যাসিডের মত ইহার একটি তীব্র গন্ধ আছে এবং জলের সহিত ইহা যে কোন অনুপাতে মিশিতে পারে।

(২) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অম্লজাতীয়। উহা নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিবর্তিত করে, এবং কোন কোন ক্ষারপদার্থের সহিত যুক্ত হয় বা ক্রিয়া করে, যেমন :—

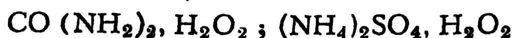


$NH_3 + H_2O_2 = NH_4O_2H$ (অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড)



$Ba(OH)_2 + H_2O_2 = BaO_2 + 2H_2O$

(৩) কেলাস জলের মত অনেক অণুর সহিত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সংলগ্ন থাকিতে পারে। যথা :—



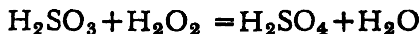
$$CO(NH_2)_2, H_2O_2 ; (NH_4)_2SO_4, H_2O_2$$

(৪) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড যৌগটি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং অতি সহজেই, এমনকি সাধারণ অবস্থাতেও, উহা বিযোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। $2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$

কাঁচের গুঁড়া, ধূলিকণা, সিলিকা, বিভিন্ন ধাতুচূর্ণ—প্লাটিনামচূর্ণ, কাঠকয়লার গুঁড়া, প্রভৃতির সংস্পর্শে এই বিযোজন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উহারা বর্ধকের (positive catalyst) কাজ করে। কঠিন পদার্থের অমসৃণ-তলের সংস্পর্শে বা উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে উহার বিযোজন বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়াতে অবশ্য H^+ আয়নের উপস্থিতি বাধকের (negative catalyst) কাজ করে। এই জন্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য প্রায়ই উহাতে খুব স্বল্প পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, বা বারবিউটিরিক অ্যাসিড মিশাইয়া দেওয়া হয়। গ্লিসারিনও বাধকের মত ব্যবহার করে। ক্ষার পদার্থের উপস্থিতি উহার বিযোজন ত্বরান্বিত করিয়া থাকে এবং ক্ষারের OH^- আয়ন বর্ধকের কাজ করে। ক্যাটালেজ (catalase) নামক উৎসেচকও (enzyme) এই বিযোজনে বিশেষ সহায়ক।

(৫) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জারণ ক্ষমতাই উহার প্রধান রাসায়নিক ধর্ম। উহার প্রতিটি অণু হইতে একটি অক্সিজেন পরমাণু সাধারণতঃ জারণ-ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। জারণের ফলে সর্বদা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নিজে বিজারিত হইয়া জলে পরিণত হয়। যেমন :—


(ক) $PbS+4H_2O_2 = PbSO_4+4H_2O$

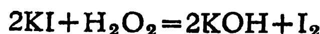

$H_2SO_3+H_2O_2 = H_2SO_4+H_2O$


$NaNO_2+H_2O_2 = NaNO_3+H_2O$


(খ) $2FeSO_4+H_2O_2+H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3+2H_2O$

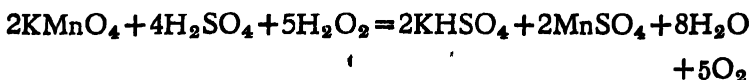

$SnCl_2+2HCl+H_2O_2 = SnCl_4+2H_2O$


(গ) $H_2S+H_2O_2 = S+2H_2O$

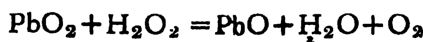
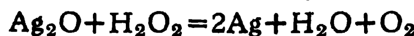
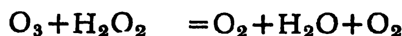
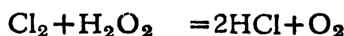

$2KI+H_2O_2 = 2KOH+I_2$

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সচরাচর জারকের মত ব্যবহার করিলেও, কোন কোন পদার্থকে ইহা বিজারিত করিতে পারে। যেমন :—

(ক) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের অ্যাসিড-দ্রবণ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্বারা বিজারিত হয়।


$$2KMnO_4+4H_2SO_4+5H_2O_2 = 2KHSO_4+2MnSO_4+8H_2O+5O_2$$

(খ) লেড ডাই-অক্সাইড, সিলভার অক্সাইড, ওজোন, ক্লোরিন প্রভৃতিও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সাহায্যে বিজারিত হয় :—


$$PbO_2 + H_2O_2 = PbO + H_2O + O_2$$

$$Ag_2O + H_2O_2 = 2Ag + H_2O + O_2$$

$$O_3 + H_2O_2 = O_2 + H_2O + O_2$$

$$Cl_2 + H_2O_2 = 2HCl + O_2$$

বস্তুতঃ এই বিক্রিয়াসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বিজারণ মনে করা যায় না। কারণ বিজারণ-ক্রিয়াতে বিজারকটির নিজের জারিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অপর পদার্থগুলি বিজারিত হইলেও, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নিজে জারিত হয় না; বরং বিজারিত হইয়া জলে পরিণত হয়। এই সকল বিক্রিয়াতে সব সময়েই অক্সিজেন পাওয়া যায়।

১৭-৮। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের পরীক্ষা: কয়েকটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যায়।

(১) স্টার্চ-পটাস-আয়োডাইড-সিক্ত কাগজ উহাতে নীল হয়।

(২) সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত পটাস-পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ উহার সংস্পর্শে বর্ণহীন হইয়া যায়।

(৩) টাইটানিয়াম লবণ ও অ্যাসিড উহার সংস্পর্শে কমলা রঙ ধারণ করে।

(৪) পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দিয়া পরে ইথার মিশ্রিত করিলে, ইথারের রঙ নীল হইয়া থাকে। ইহা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের একটি বিশেষ পরীক্ষা।

১৭-৯। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ব্যবহার: (১) ব্যাক্টিরিয়া ও ব্যাসিলির উপর উহার বিষক্রিয়া থাকার জন্য ঔষধরূপে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ আছে। (২) তৈলচিত্র, সিল্ক, পালক প্রভৃতি পরিষ্কার করার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। (৩) জারক হিসাবে বহু রকম জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বায়ু ও তাহার উপাদান: নাইট্রোজেন

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে, ইহাকেই বায়ুমণ্ডল বলা হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বায়ুকে একটি মৌল মনে করিতেন; গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণও ইহাকে মৌলিক পদার্থ হিসাবেই গণ্য করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শীলে, প্রিস্টলী ও ল্যাভয়সিয়রের বিভিন্ন পরীক্ষাতে দেখা যায়, বায়ুর একটি অংশ বিভিন্ন দহন-ক্রিয়ায় এবং প্রাণীদের শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে, অপর অংশটির সেই ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ, বায়ু অন্ততঃ দুইটি পদার্থের মিশ্রণ।

বায়ু মুখ্যতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ। ইহাদের সহিত স্বল্প পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রভৃতি মিশ্রিত আছে। বায়ু একটি মিশ্রণ বলিয়াই উহার উপাদানসমূহের অনুপাত সর্বত্র এবং সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। তথাপি আয়তন হিসাবে উহার উপাদানসমূহের মোটামুটি অনুপাত :—

(১)	নাইট্রোজেন	= ৭৭ ১৬	ভাগ
(২)	অক্সিজেন	= ২০·৬০	„
(৩)	জলীয় বাষ্প	= ১·৪০	„
(৪)	নিষ্ক্রিয় গ্যাস	= ০·৮০	„
(৫)	কার্বন ডাই-অক্সাইড	= ০·০৪	„
		১০০·০০	„

এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প, ওজোন এবং প্রচুর সূক্ষ্ম ধূলিকণা বর্তমান।

কস্টিক পটাস (ক্ষার) এবং অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংস্পর্শে একটি আবদ্ধ পাত্রে বায়ু থাকিলে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উহারা শোষণ করিয়া লয়। এই বিশুদ্ধ বায়ুতে উপাদানসমূহের অনুপাত সাধারণতঃ দেখা যায়—

	ওজনে	আয়তনে
নাইট্রোজেন	৭৫·৫%	৭৮ ১১%
অক্সিজেন	২৩·২%	২০·৯৬%
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	১·৩%	·৯৩%
	১০০·০০	১০০·০০

বলা বাহুল্য, এই উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা এক হয় না। স্থান-কালভেদে এই অনুপাত পরিবর্তনশীল।

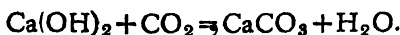
১৮-১। বায়ুর উপাদানসমূহ ও তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ বায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির অস্তিত্ব কয়েকটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ক) জলীয় বাষ্প– একটি কাচের গ্লাসে বরফ রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে গ্লাসের বাহিরে বিন্দু বিন্দু জল জমিতে থাকে। বাতাসের জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয় এবং তরলাকারে গ্লাসের শীতল গাত্রে সঞ্চিত হয়।

একটি কাচের ডিসে করিয়া অল্প একটু অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বাতাসে রাখিয়া দিলে বাতাস হইতে উহা জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং প্রথমে সিক্ত হইয়া পরে দ্রবণে পরিণত হইতে থাকে। এই সকল পরীক্ষা দ্বারা বাতাসে জলের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই জল নদী-নালা বাহিয়া সাগরে বা হ্রদে আসে এবং পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া যায়। পৃথিবীতে সতত এই পরিবর্তন-চক্র আছে বলিয়াই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের অস্তিত্ব সম্ভব। বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকিলে নদী প্রভৃতি হইতে ক্রমাগত জল উবিয়া যাইত এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্ হইতেও অনুরূপ বাষ্পীভবন হইত। ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগৎ শুষ্ক হইয়া লোপ পাইত।

(খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ একটি কাচের ডিসে খানিকটা স্বচ্ছ পরিস্রুত চুনের জল [$Ca(OH)_2$] বাতাসে রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে উহার উপরে একটি সাদা সর পড়ে এবং ক্রমশঃ চুনের জল ঘোলাটে হইয়া যায়। চুনের জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া উহাকে ঘোলাটে করা কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিশেষত্ব। এই ক্ষেত্রে যেহেতু চুনের জল ঘোলা হইয়াছে, সুতরাং বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্তমান। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও চুনের জল মিলিয়া খড়িমাটি বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হয়। উহা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া চুনের জল ঘোলা করে।



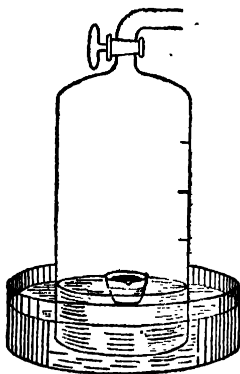
$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O.$$

জীবজন্তুর কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হয় না, বরং শ্বাসকার্যের ফলে জীবদেহ হইতে সর্বদা কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌সমূহের

জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন। ইহাই উহাদের খাদ্য। প্রাণীজগৎ হইতে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহা আবার উদ্ভিদ্-জগৎ গ্রহণ করে। সেই কারণেই বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব কম এবং মোটামুটি নির্দিষ্ট।

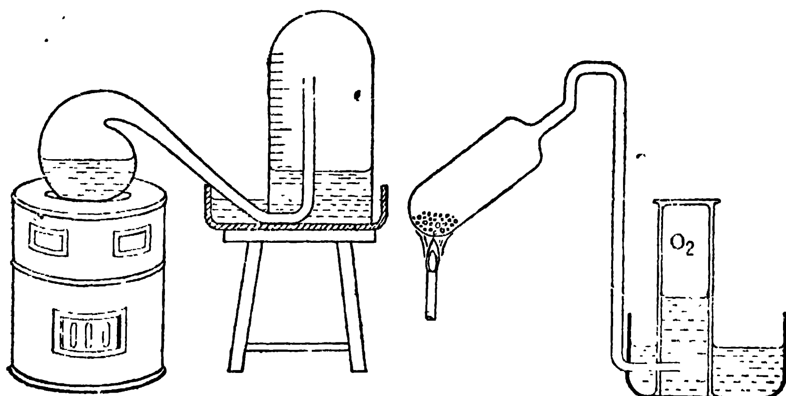
(গ) **নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনঃ** বাতাসে এই দুইটি মৌলিক পদার্থের তুলনায় অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ এত কম যে সাধারণতঃ বাতাস বলিতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণই বুঝায়। এই দুইটি গ্যাস সাধারণভাবে মিশ্রিত আছে। সুতরাং, কোন উপায়ে একটিকে সরাইয়া লইতে পারিলেই অপরটি পাওয়া সম্ভব। বহু রকম প্রক্রিয়া দ্বারা এই দুইটি মৌলকে পৃথক করা যাইতে পারে।

পরীক্ষাঃ একটি বড় খোলা পাত্রে খানিকটা জল লওয়া হয়। একটি ছোট পর্সেলীনের মুচিতে একটু সাদা ফসফরাস লইয়া মুচিটি সেই জলে ভাসাইয়া দিয়া ফসফরাসটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ফসফরাসটি জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই উহার উপর একটি বেলজার চাপা দেওয়া হয় (চিত্র ১৮ক)। ফসফরাসটি খানিকক্ষণ পুড়িয়া নিভিয়া যাইবে। বেলজারটি আবার ঠাণ্ডা হইলে দেখা যাইবে বেলজারের ভিতরে কিছু জল প্রবেশ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট বায়ুর পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম। ফসফরাসের দহনের ফলে আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ বাতাস অন্তর্হিত হইয়াছে। এই অবশিষ্ট বায়ুটির কোন দহন-ক্ষমতা নাই, সেই জন্যই ফসফরাস নিভিয়া গিয়াছে। দহন-কালে বায়ুর অক্সিজেন ফসফরাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্যাস নাইট্রোজেন। এইভাবে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন পৃথক করা যাইতে পারে। ফসফরাসের দহনের ফলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, উহা জলে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষাতে ফসফরাসের পরিবর্তে সালফার, কার্বন, ম্যাগনেসিয়াম বা মোমবাতি জ্বালাইয়াও অক্সিজেনকে দূর করা সম্ভব হইত।



চিত্র—১৮ ক
ফসফরাসের দহন

ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষা : এই সম্পর্কে ল্যাভয়সিয়রের (১৭৭৫) বিশ্ববিশ্রুত পরীক্ষাটি আলোচনা করা যাইতে পারে।



চিত্র ১৮ খ—ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষা

একটি বকযন্ত্রে তিনি খানিকটা বিশুদ্ধ পারদ ভরিয়া লইয়া উহার গলাটি বাঁকাইয়া লইলেন। বকযন্ত্রের বাঁকান গ্রীবাটি একটি বেলজারের ভিতরে প্রবেশ করান হইল (চিত্র ১৮খ)। এই বেলজারটি আবার একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উপুড় করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ, বেলজারের ভিতরের বাতাসের সহিত বকযন্ত্রের অভ্যন্তরের সংযোগ রহিল। অতঃপর বকযন্ত্রটি ক্রমাগত উত্তপ্ত করা হইল। দেখা গেল, প্রথমে বেলজারের ভিতরের এবং বাহিরের পারদ একই সমতলে আছে। কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগের ফলে বকযন্ত্রের পারদে ধীরে ধীরে একটি লাল কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং সেই সঙ্গে বেলজারের মধ্যস্থিত পারদ উপরে উঠিতে লাগিল। অর্থাৎ, বাতাসের কিছু অংশ বকযন্ত্রের উত্তপ্ত পারদ শোষণ করিয়া লইল। দীর্ঘ বারদিন এইভাবে পারদকে উত্তপ্ত করার পরেও কিন্তু সম্পূর্ণ বাতাস কিছুতেই শোষিত হইল না। আবদ্ধ বায়ুর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ আয়তন শোষিত হওয়ার পর আর উহার আয়তন হ্রাস পাইল না। বাতাসের যে অংশ অবশিষ্ট রহিল উহাতে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। আরও দেখা গেল, এই অবশিষ্ট গ্যাসে প্রাণীদের শ্বাসকার্য চলে না। অতএব, স্পষ্টতঃই বাতাসের দুইটি অংশ আছে

—একটি উত্তপ্ত পারদে শোষিত হয় এবং অপরটি অবশিষ্ট থাকে এবং উহা দহনে সহায়তা করে না। এই গ্যাসটি নাইট্রোজেন।

অতঃপর ল্যাভয়সিয়র বকযন্ত্রে উৎপন্ন লাল পদার্থটিকে একটি টেস্ট-টিউবে সংগ্রহ করিলেন। টেস্ট-টিউবে মুখটি বন্ধ করিয়া একটি নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়া হইল। নির্গম-নলের বহিঃপ্রান্তটি একটি গ্যাসদ্রোণীর ভিতর উপুড়-করা জলপূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর ধীরে ধীরে টেস্ট-টিউবটি উত্তপ্ত করিলে একটি বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত হইল এবং লাল পদার্থটি পুনরায় পারদে পরিণত হইয়া গেল। ল্যাভয়সিয়র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পূর্বোক্ত পরীক্ষায় বকযন্ত্র হইতে যে পরিমাণ গ্যাস অন্তর্হিত হইয়াছিল এই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন ঠিক তাহার সমান। উপরন্তু এই গ্যাসটিতে জ্বলন্ত কাঠি এবং অন্যান্য পদার্থের প্রজ্বলন অতি দ্রুত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ইহা অক্সিজেন। এই গ্যাসের সহিত পূর্বোক্ত নাইট্রোজেন মিশাইলে আবার বায়ু পাওয়া যায়। ল্যাভয়সিয়র এইরূপে বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং উহাদের পৃথকীকরণে সক্ষম হয়েন।

অক্সিজেন ব্যতিরেকে আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হইত না। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মৃদুদহন* অক্সিজেনের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। অক্সিজেনের অভাব হইলে প্রাণীজগৎ লোপ পাইবে। অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া জীবজন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড ফিরাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদ্‌সমূহ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। এই দুই জগতের ভিতরে মোটামুটি একটি সমতা আছে বলিয়াই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বদাই আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ থাকে।

বাতাসে যদি নাইট্রোজেন না থাকিত তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত অবিমিশ্র অক্সিজেন গ্রহণের ফলে জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ দহন-ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হইত এবং জীবনধারণ অতীব কষ্টকর হইত। অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকায় শ্বাসকার্য ও তজ্জনিত দহন-ক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিয়মিতরূপে হইতে পারে।

*খাদ্যদ্রব্যের জারণকে সাধারণতঃ দহন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যদিও এই ক্রিয়াতে কোন আলোকশিখা উৎপন্ন হয় না।

১৮-২। বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ: বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত অবস্থায় আছে, ইহা কোন যৌগিক পদার্থ নহে। নানা উপায়ে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

(১) বায়ুর উপাদানগুলির অনুপাত বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে এক নয়। বায়ু যদি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হইত তাহা হইলে উহাদের কোন অবস্থাতেই অনুপাতের ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। বায়ুতে আয়তন হিসাবে মোটামুটি চারিভাগ নাইট্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন আছে, অর্থাৎ উহাদের যৌগের সঙ্কেত হওয়া উচিত N_4O এবং অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প অনুযায়ী বায়ুর ঘনত্ব হইবে ৩৬; কিন্তু বস্তুতঃ বায়ুর ঘনত্ব মাত্র ১৪·৪। সুতরাং বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হইতে পারে না।

(২) চারিভাগ নাইট্রোজেন একভাগ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইলে কোনরকম তাপ-বিনিময়ের লক্ষণ দেখা যায় না এবং মিশ্রিত পদার্থটি ঠিক বাতাসের মত গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

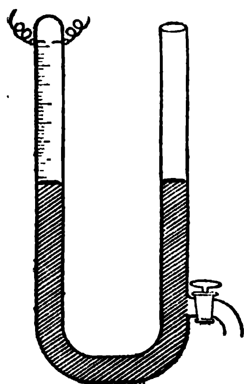
(৩) স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তন-অনুপাত = ১ : ৪, কিন্তু বাতাসের জলীয় দ্রবণে অক্সিজেনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। দ্রবীভূত বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তন-অনুপাত মোটামুটি ১ : ২। বাতাস যৌগিক পদার্থ হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়।

(৪) বাতাসের উপাদানগুলি অতি সহজেই পৃথক করা সম্ভব। (ক) বাতাসকে অত্যন্ত শীতল করিয়া অতিরিক্ত চাপে উহাকে প্রথমতঃ তরলিত করা হয়। তরল বাতাসকে আংশিক পাতন করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়। (খ) একটি সচ্ছিদ্র পর্সেলীনের নলের ভিতর দিয়া বাতাস পরিচালনা করিলে পর্সেলীনের ভিতর দিয়া অক্সিজেনের তুলনায় অধিকতর নাইট্রোজেন বাহির হইয়া আসে। বাতাস যৌগ-পদার্থ হইলে এরূপ হইতে পারে না।

এই সকল কারণেই বাতাসকে একটি মিশ্রণ বলিয়া মনে করা হয়।

১৮-৩। বায়ুর উপাদানসমূহের সংযুতি নির্ধারণ।

আয়তন-সংযুতি (Volumetric Composition): একটি অংশাঙ্কিত U-আকৃতির গ্যাসমান যন্ত্রের (eudiometer) সাহায্যে এই পরিমাপ করা হয়। উহার একটি বাহুর মুখ বন্ধ থাকে এবং এই আবদ্ধ প্রান্তে দুইটি প্লাটিনামের তার বাহির হইতে প্রবেশ করাইয়া কাচের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় (চিত্র ১৮-গ)। U-নলটির অপর বাহুর নীচের দিকে একটি স্টপককযুক্ত নির্গম-নল লাগান থাকে। U-নলটি প্রথমে সম্পূর্ণ পারদে ভর্তি করিয়া লইয়া উহার আবদ্ধ বাহুতে পারদের উপর খানিকটা কার্বন ডাই-অক্সাইড-মুক্ত বাতাস প্রবেশ করান হয়। নির্গম-নলের সাহায্যে কিছু পারদ বাহির করিয়া দিয়া উভয় বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া মধ্যস্থ বায়ুর আয়তন জানিয়া লওয়া হয়। তৎপর আবদ্ধ বাহুতে কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন প্রবেশ করান হয় এবং আবার পারদ সমতলে আনিয়া বায়ু ও হাইড্রোজেন-মিশ্রণের আয়তন স্থির করা হয়। অতঃপর নির্গম-নলের সাহায্যে অনেকটা পারদ বাহির করিয়া মিশ্রণের চাপ খুব কমাইয়া দেওয়া হয় এবং প্লাটিনাম তার দুইটি একটি আবেশ-কুণ্ডলীর সহিত যুক্ত করা হয়। ইহার ফলে গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে বাতাসের অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। যে পরিমাণ হাইড্রোজেনে বাতাসের সমস্তটুকু অক্সিজেন জলে পরিণত হয় তাহার চেয়েও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন দেওয়া প্রয়োজন। শীতল হইয়া U-নলটি পূর্ব উষ্ণতায় ফিরিয়া আসিলে জলীয় বাষ্পটুকু তরল জলে পরিণত হইবে। এই তরল জলের আয়তন বস্তুতঃ কিছুই নয়। অবশিষ্ট গ্যাসে শুধু নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থাকিবে। দুইটি বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া এই পরিত্যক্ত গ্যাসের আয়তন স্থির করা হয়। ইহা হইতেই বাতাসের আয়তন-সংযুতি নির্ধারণ সম্ভব।



চিত্র ১৮গ
বায়ুর আয়তন-সংযুতি

গণনা : মনে কর, বাতাসের আয়তন $= V_1$ ঘন সেন্টিমিটার

বাতাস ও হাইড্রোজেনের আয়তন $= V_2$ "

অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন $= V_3$ "

∴ জল উৎপাদনে আয়তন-হ্রাসের পরিমাণ $=(V_2 - V_3)$ ঘন সেন্টিমিটার

কিন্তু জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তন-অনুপাত = ২ : ১

অতএব উপরোক্ত V_1 ঘন সেন্টিমিটার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ

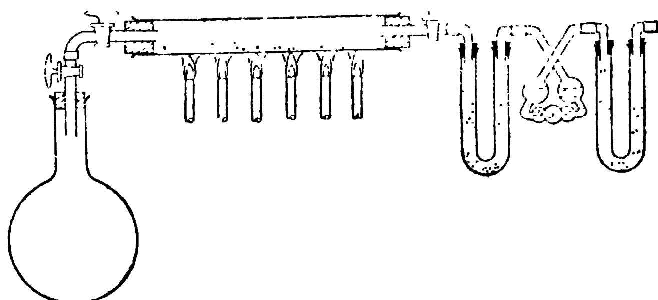
$$= \frac{V_2 - V_3}{৩} \text{ ঘন সেন্টিমিটার।}$$

∴ ১০০ ঘন সেন্টিমিটার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ

$$= \frac{V_2 - V_3}{V_1 \times ৩} \times ১০০ \text{ ঘন সেন্টিমিটার।}$$

দেখা গিয়াছে, মোটামুটি বাতাসে অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ এবং নাইট্রোজেন ৭৮ ভাগ থাকে।

ওজন-সংযুতি (Gravimetric Composition)। **ডুমার প্রণালী :** বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ওজন-সংযুতি স্থির করার জন্য নিম্নের (চিত্র ১৮ঘ) অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১৮ঘ—বায়ুর ওজন-সংযুতি

এই যন্ত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে। (১) একটি বড় এবং শক্ত কাচের গোলাকার পাত্র লওয়া হয়। উহার মুখে রবার কর্কের সাহায্যে একটি স্টপকক লাগান থাকে। পাম্পের সাহায্যে উহার ভিতরের সমস্ত বাতাস

বাহির করিয়া লইয়া উহাকে বায়ুশূন্য করা হয়। তৎপর এই বায়ুশূন্য পাত্রটির ওজন স্থির করা হয়। (২) একটি দাহ-নল (Combustion tube) ছোট ছোট কপারের ছিলাতে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। নলটির উভয় প্রান্তে দুইটি স্টপকক জুড়িয়া দেওয়া হয়। পাম্পের সাহায্যে তৎপর নলের ভিতর হইতে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া উহার ওজন স্থির করা হয়। অতঃপর কাচের গোলাকার পাত্রটি ও দাহ-নলটি পুরু রবার-নলের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। (৩) দাহ-নলের অপরপ্রান্তে কয়েকটি ছোট অনার্দ্র ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড পূর্ণ U-নল এবং কয়েকটি পটাস-বাল্‌ব (potash bulbs) সংযুক্ত করা হয়। এখন দাহ-নলকে একটি চুল্লীর (furnace) উপর রাখিয়া খুব উত্তপ্ত করা হয় এবং এই অবস্থায় স্টপককগুলি ঈষৎ খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ধীরে ধীরে বাতাস বায়ুশূন্য দাহ-নলে এবং পরে কাচের গোলকে ঢুকিতে থাকিবে। বাতাস পটাস-বাল্‌ব এবং U-নলের ভিতর দিয়া অতিক্রম করার সময় উহার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প দূরীভূত হয়। বাতাস অতঃপর উত্তপ্ত কপারের সংস্পর্শে আসিলে উহার অক্সিজেন কপারের সহিত সংযোজিত হইয়া কপার-অক্সাইডে পরিণত হয়। নাইট্রোজেন গোলকে সঞ্চিত হয়। গোলকটি নাইট্রোজেন-পূর্ণ হইলে স্টপককগুলি বন্ধ করিয়া বায়ুপ্রবাহ রোধ করা হয়। যন্ত্রটি শীতল হইয়া পূর্ব উষ্ণতায় আসিলে পৃথক ভাবে গোলকটি এবং দাহ-নলটি ওজন করা হয়। তারপর পাম্পের সাহায্যে দাহ-নলের নাইট্রোজেন বাহির করিয়া ফেলিয়া আবার উহার ওজন লওয়া হয়। ইহা হইতেই ওজন-সংযুতি স্থির করা সম্ভব।

গণনা ঃ মনে কর, বায়ুশূন্য গোলকের ওজন $= w_1$ গ্রাম

নাইট্রোজেন-পূর্ণ গোলকের ওজন $= w_2$ গ্রাম

∴ গোলকের মধ্যস্থ নাইট্রোজেনের ওজন $= (w_2 - w_1)$ গ্রাম

বায়ুশূন্য এবং কপার-পূর্ণ দাহ-নলের ওজন $= w_3$ গ্রাম

নাইট্রোজেন, কপার ও উহার অক্সাইড-পূর্ণ দাহ-নলের ওজন $= w_4$ গ্রাম

(নাইট্রোজেনমুক্ত) কপার ও কপার অক্সাইড সহ দাহ-নলের ওজন $= w_5$ গ্রাম

∴ দাহ-নলের নাইট্রোজেনের ওজন $= (w_4 - w_5)$ গ্রাম

∴ সম্পূর্ণ নাইট্রোজেনের ওজন $= (w_2 - w_1) + (w_4 - w_5)$ গ্রাম

অক্সিজেনের ওজন $= (w_5 - w_3)$ গ্রাম

∴ বাতাসের ওজন = অক্সিজেনের ওজন + নাইট্রোজেনের ওজন

$$= (w_5 - w_3) + (w_2 - w_1) + (w_4 - w_5) \text{ গ্রাম}$$

∴ বাতাসে অক্সিজেন শতকরা $\frac{100 \times (w_5 - w_3)}{w_5 - w_3 + w_2 - w_1 + w_4 - w_5}$ ভাগ,

এবং নাইট্রোজেন শতকরা $\frac{100 \times (w_2 - w_1 + w_4 - w_5)}{w_5 - w_3 + w_2 - w_1 + w_4 - w_5}$ ভাগ আছে।

পরীক্ষায় দেখা যায়, ওজন-অনুপাতে মোটামুটি, অক্সিজেন ২৩% এবং নাইট্রোজেন ৭৭%। বলা বাহুল্য, এই নাইট্রোজেনের সহিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ বর্তমান থাকে।

১৮-৪। নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert gases) : ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালে (Raleigh) দেখিতে পাইলেন যে বায়ু হইতে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের প্রতি লিটারের ওজন ১·২৫৭২ গ্রাম ; কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের ওজন, ১·২৫০৫ গ্রাম। বায়বীয় নাইট্রোজেন এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনত্বের এই বৈষম্য বিভিন্ন পরীক্ষাতেই সমর্থিত হওয়াতে, র‍্যালে মনে করিলেন যে বায়ুর নাইট্রোজেনে আরও কোন গ্যাস নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। পরবর্তীকালে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল বায়ুতে আরও পাঁচটি গ্যাস সামান্য পরিমাণে বর্তমান। এই গ্যাসগুলি কোন রকম পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে না। ইহাদের বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হয় না বলিয়া উহাদিগকে যোজ্যতাহীন বা শূন্যযোজী (zero valent) মৌল বলা হয়।

	চিহ্ন	বাতাসে আয়তনের অনুপাত (শতকরা)
হিলিয়াম (Helium)	He	·০০০৫
নিয়ন (Neon)	Ne	·০০১৮
আরগন (Argon)	Ar	০·৯৩৩
ক্রিপ্টন (Krypton)	Kr	
জিনন (Xenon)	Xe	

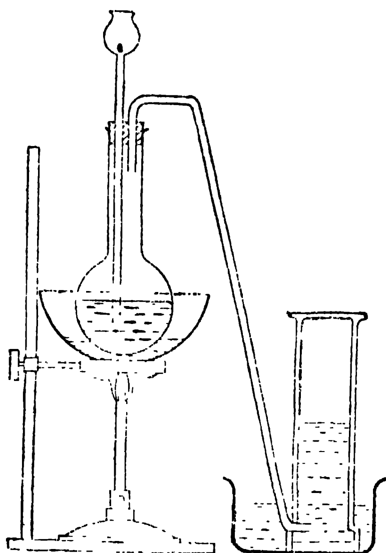
নাইট্রোজেন

সঙ্কেত = N_2। পারমাণবিক গুরুত্ব = ১৪·০০৮। পরমাণু-ক্রমাঙ্ক = ৭।

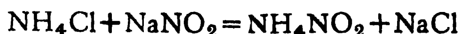
বাতাসে মৌলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বর্তমান। নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগও প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন প্রোটিনগুলি সবই নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। চিলির উপকূলে যে প্রচুর নাইটার খনিজ (Chile nitre) পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)।

১৮-৫। **প্রস্তুতি ঃ** নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত দুইটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(১) অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম লবণের বিশ্লেষণ দ্বারা, অথবা (২) বায়ু হইতে অক্সিজেন দূরীভূত করিয়া।


চিত্র ১৮৬—নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ (১) ল্যাবরেটরীতে সচরাচর অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা হয়। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বিযোজন অনেক সময় সংযত করা সুকঠিন এবং বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহার পরিবর্তে সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। ঈষৎ উত্তপ্ত করিলেই উহা হইতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। কারণ, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইট একত্র হইয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সৃষ্টি করে এবং ইহা বিযোজিত হইয়া যায়।


$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$

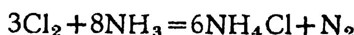

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$$

একটি গোল কুপীতে তুল্য পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ লইয়া উহার মুখটি কর্ক দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হয়। কর্কের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি বাঁকান নির্গম-নল লাগাইয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের মুখটি দ্রবণে নিমজ্জিত থাকা চাই। নির্গম-নলের বহিঃপ্রান্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর জলে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। একটি জলপূর্ণ গ্যাসজার এই নলের মুখে উপুড় করিয়া রাখা হয়। কুপীটিকে অতঃপর একটি জলগাহে বসাইয়া অল্প অল্প গরম করিলেই নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং নির্গম-নল

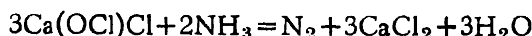
দিয়া বাহির হইয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি বিক্রিয়াটি দ্রুতবেগে হইতে থাকে তবে কুপীটিকে ঠাণ্ডা জলে বসাইয়া শীতল করিয়া উহা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই নাইট্রোজেনে স্বল্প পরিমাণ ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রোজেন-অক্সাইড মিশ্রিত থাকিতে পারে। কোন তীব্র ক্ষারের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া এই নাইট্রোজেনকে ধৌত করিয়া লইলেই এই সকল পদার্থ দূর হয়। জলীয় বাষ্প দূর করিতে হইলে ইহাকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড-পূর্ণ গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিতে হইবে। এইভাবে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাওয়া যাইতে পারে।

অ্যামোনিয়ার জারণের দ্বারা নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা সম্ভব।

(ক) ক্লোরিনের অথবা "বিরঞ্জক চূর্ণের" (Bleaching powder) সাহায্যে অ্যামোনিয়াকে জারিত করা যায় :—



$$3Cl_2+8NH_3=6NH_4Cl+N_2$$

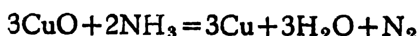


$$3Ca(OCl)Cl+2NH_3=N_2+3CaCl_2+3H_2O$$

(খ) অ্যামোনিয়া গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ যদি একটি কপার-ছিলা-পূর্ণ উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়, তাহা হইলে উহা হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা কপার কপার-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং এই কপার-অক্সাইড অ্যামোনিয়াকে জারিত করিয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে।



$$(N_2+O_2)+2Cu=2CuO+N_2$$
(বাতাস)



$$3CuO+2NH_3=3Cu+3H_2O+N_2$$

বেরিয়াম অ্যাজাইড বা সোডিয়াম অ্যাজাইডের তাপ-বিশ্লেষণে অতি সহজে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা যায়।



$$Ba(N_3)_2=Ba+3N_2 \quad 2NaN_3=2Na+3N_2$$

বায়ু হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করার প্রণালী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

(ক) ফসফরাস, কার্বন, সালফার প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থ কোন আবদ্ধ বায়ুতে পোড়াইয়া অক্সিজেন সরাইয়া লওয়া হয় এবং নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

(খ) উত্তপ্ত অবস্থায় কপার পরিপূর্ণ একটি নলের ভিতর দিয়া বাতাস ধীরে ধীরে বারংবার পরিচালিত করিলে কপার উহার অক্সিজেন সম্পূর্ণরূপে শোষণ করিয়া কপার-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং নাইট্রোজেন গ্যাস অবিকৃত থাকিয়া যায়।

(গ) অত্যধিক চাপে এবং খুব কম উষ্ণতায় (−১৯০° সেন্টিগ্রেড) বাতাস তরলিত করিয়া লইয়া উহার আংশিক পাতন করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন কেবল বাষ্পীভূত হয়। এইভাবে

তরল বাতাস হইতে নাইট্রোজেন পৃথক করা হয়। অধিক নাইট্রোজেন প্রয়োজন হইলে এই পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট।

১৮-৬। নাইট্রোজেনের ধর্ম ঃ নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ। উহার ঘনত্ব প্রায় বাতাসের ঘনত্বের সমান এবং জলে উহার দ্রাব্যতা নিতান্তই কম। সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রোজেনের কোনরূপ রাসায়নিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন মৌল বা যৌগের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় ইহা যুক্ত হয় না। ইহা নিজেও দাহ্য নয় এবং অপরের দহন-সহায়কও নয়।

(১) Ca, Mg প্রভৃতি কোন কোন ধাতু এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড যৌগ নাইট্রোজেন গ্যাসে উত্তপ্ত করিলে উহাদের সহিত নাইট্রোজেন যুক্ত হয়। যথা :—

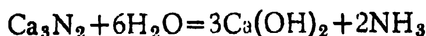

$3Ca + N_2 = Ca_3N_2$ [ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড]

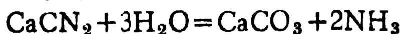

$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$ [ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড]


$CaC_2 + N_2 = C + CaCN_2$ [ক্যালসিয়াম সায়নামাইড]

$CaCN_2$ এবং কার্বনের মিশ্রণকে "নাইট্রোলিম" বলে।

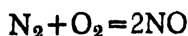
এই সমস্ত উদ্ভূত পদার্থ জলে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে :—


$$Ca_3N_2 + 6H_2O = 3Ca(OH)_2 + 2NH_3$$


$$CaCN_2 + 3H_2O = CaCO_3 + 2NH_3$$

(২) অতিরিক্ত চাপে (২০০ অ্যাট্মস্ফিয়ার) এবং প্রায় ৫৫০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়, লৌহচূর্ণের প্রভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

(৩) বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের দ্বারা প্রায় ৩০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করিলে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় :—


$$N_2 + O_2 = 2NO$$

নাইট্রোজেনের ব্যবহার ঃ (১) অ্যামোনিয়া, নাইট্রোলিম প্রভৃতি প্রস্তুতিতে প্রচুর নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। (২) বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে এবং গ্যাস থার্মোমিটারে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

উনবিংশ অধ্যায়

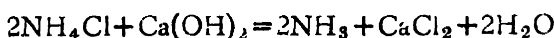
নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ

অ্যামোনিয়া, NH_3

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগসমূহের মধ্যে অ্যামোনিয়াই প্রধান।

বাতাসে কখনও কখনও স্বল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের ধ্বংস ও পচনের ফলে জমিতে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াঘটিত লবণ পাওয়া যায়। প্রোটিনের উপর ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলেই এই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

১৯·১। **প্রস্তুতি ঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ** সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের উপর কোন ক্ষারক জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়া ঘটাইয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুন ক্ষারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



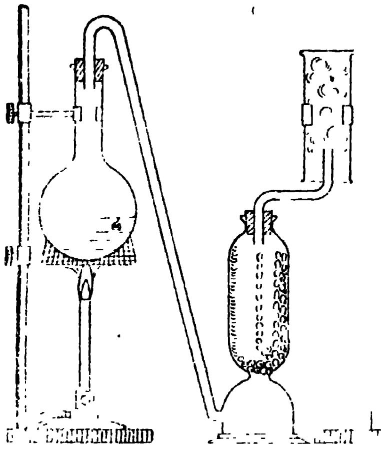
$$2NH_4Cl+Ca(OH)_2=2NH_3+CaCl_2+2H_2O$$



$$2NH_4Cl+CaO=2NH_3+CaCl_2+H_2O$$

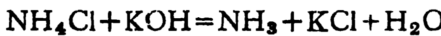
একটি গোল কূপীতে সমপরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইয়া উত্তপ্ত করা হয়। কূপীর মুখটি নির্গম-নল সহ একটি কর্কের দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হয়। নির্গম-নলের অপর-প্রান্তটি একটি কলিচুনের টাওয়ারের (lime tower) সহিত যুক্ত থাকে। চুনের টাওয়ারের উপরে একটি বাঁকা-নল সংযুক্ত থাকে। এই নলের উপর একটি গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখা হয়। উত্তাপের ফলে যে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় তাহা নির্গম-নল দিয়া আসিয়া চুনের টাওয়ারে প্রবেশ করে। চুনের ভিতর দিয়া যাওয়ার ফলে অ্যামোনিয়ার সহিত কোন জলীয় বাষ্প থাকিলে তাহা কলিচুন শোষণ করিয়া লয়। অ্যামোনিয়া আসিয়া গ্যাস-

জারে সঞ্চিত হয় (চিত্র ১৯ ক)। এই ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় বাষ্প দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় না, কারণ ইহাদের উভয়ের সহিতই অ্যামোনিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। অ্যামোনিয়া বাতাস অপেক্ষা অনেক লঘু বলিয়া উহা গ্যাসজার হইতে বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিয়া উহাতে সঞ্চিত হইতে পারে। অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, সেইজন্য ইহাকে জলের অপসারণ-দ্বারা গ্যাস-জারে সংগ্রহ করা যায় না।

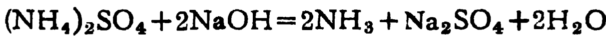


চিত্র ১৯ ক

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে অন্য কোন অ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ এবং চুনের পরিবর্তে অন্যান্য ক্ষারক ব্যবহার করিলেও অ্যামোনিয়া পাওয়া যাইবে। যেমন :—



$$NH_4Cl + KOH = NH_3 + KCl + H_2O$$

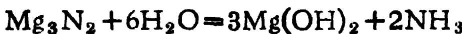


$$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH = 2NH_3 + Na_2SO_4 + 2H_2O$$

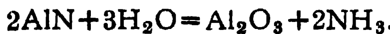


$$2NH_4Cl + PbO = 2NH_3 + PbCl_2 + H_2O.$$

(২) জলে ফুটাইলে বা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে ধাতব নাইট্রাইড আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে, যথা :—

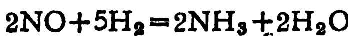


$$Mg_3N_2 + 6H_2O = 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$$



$$2AlN + 3H_2O = Al_2O_3 + 2NH_3.$$

(৩) উত্তপ্ত প্লাটিনামের প্রভাবে নাইট্রোজেনের অক্সাইড হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হইয়া আমোনিয়াতে পরিণত হয়।



$$2NO + 5H_2 = 2NH_3 + 2H_2O$$

অধিক পরিমাণে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। উহাদের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইবে।

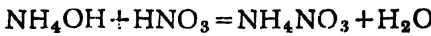
১৯·২। অ্যামোনিয়ার ধর্ম ঃ (১) অ্যামোনিয়া একটি ঝাঁঝালো-গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা অনেক হাল্কা (ঘনত্ব = ৮·৫)।

(২) অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। এক ঘন সেন্টিমিটার জলে শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় প্রায় ১৩০০ ঘন সেন্টিমিটার গ্যাস দ্রবীভূত হয়। জলে অ্যামোনিয়ার গাঢ় দ্রবণকে "লাইকার অ্যামোনিয়া" (Liquor ammonia) বলা হয়।

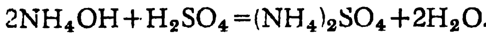
অ্যামোনিয়া জলে দ্রবীভূত হওয়ার সময় জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। ইহা একটি ক্ষার। সুতরাং, অ্যামোনিয়াকে ক্ষারক দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিয়োজিত হইয়া OH^- আয়ন উৎপন্ন করে, লাল লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত করে এবং বিভিন্ন অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া লবণ ও জলের সৃষ্টি করে।



$$NH_4OH = NH_4^+ + OH^-$$



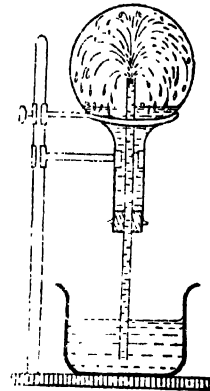
$$NH_4OH + HNO_3 = NH_4NO_3 + H_2O$$



$$2NH_4OH + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O.$$

পরীক্ষা ঃ এক টুকরা কাগজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সিক্ত করিয়া একটি অ্যামোনিয়া-পূর্ণ গ্যাসজারে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ প্রচুর সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ সাদা ধোঁয়াটি অতি সূক্ষ্ম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কণার সমষ্টি। অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এই দুইটি গ্যাস সংস্পর্শে আসিলেই তাহারা যুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। $NH_3 + HCl = NH_4Cl$.

পরীক্ষা ঃ একটি গোল কূপীতে অ্যামোনিয়া ভর্তি করিয়া উহার মুখটি একটি কর্ক দিয়া আঁটিয়া দিতে হইবে। কর্কের ভিতরে স্টপককযুক্ত একটি কাচনল লাগান থাকে। একটি বড় পাত্রে লাল লিটমাসের দ্রবণ লওয়া হয় এবং কূপীটিকে উহার উপর রাখিয়া কাচ-নলের মাথাটি লিটমাসে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। স্টপককটি খুলিয়া কূপীটিকে একটু ঠাণ্ডা করিলেই লিটমাস-দ্রবণ নলের ভিতর দিয়া কূপীতে প্রবেশ করিতে থাকে। অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে আসিলেই লাল লিটমাস নীল হইয়া যায় এবং অ্যামোনিয়া জলে দ্রুত দ্রবীভূত হয়। ফলে কূপীর অভ্যন্তরে চাপ কমিয়া যায় এবং বাহিরের লাল লিটমাস দ্রবণ বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি ফোয়ারার সৃষ্টি করে। অ্যামোনিয়ার ক্ষারকত্ব এবং জলে উহার অত্যধিক দ্রাব্যতা উভয়ই এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয় (চিত্র ১৯খ)। এই পরীক্ষাটিকে অনেক সময় "ফোয়ারা-পরীক্ষা" বলা হয়।



চিত্র ১৯খ
অ্যামোনিয়ার দ্রাব্যতা

(৩) অ্যামোনিয়া অপরের দহনে সাহায্য করে না, এবং স্বভাবতঃ নিজেও অদাহ্য। কিন্তু অবিমিশ্র

অক্সিজেনের ভিতর অ্যামোনিয়া সহজেই ঈষৎ হলুদ রংয়ের শিখাসহ জ্বলিতে থাকে।

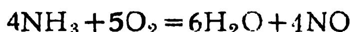


$$4NH_3+3O_2=6H_2O+2N_2$$

পরীক্ষা : একটি প্রশস্ত নলের নীচের মুখটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া উহাতে দুইটি বাঁকান সরু কাচের নল লাগান হয় (চিত্র ১৯গ)। ইহাদের একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং উহার ভিতর দিয়া শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করা হয়। অপর নলটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অক্সিজেন বহন করিয়া থাকে। অতঃপর প্রথম নলটির মুখ হইতে নির্গত অ্যামোনিয়া গ্যাসে আগুন ধরাইয়া দিলে অ্যামোনিয়া আস্তে আস্তে জ্বলিতে থাকে।

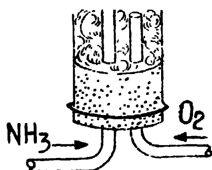
(৪) অ্যামোনিয়া স্বভাবতঃ বিজারণ-গুণসম্পন্ন না হইলেও কোন কোন অবস্থায় উহা সহজেই জারিত হইয়া নাইট্রোজেন বা উহার অক্সাইডে পরিণত হয়।

(ক) বাতাস বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অ্যামোনিয়া যদি উত্তপ্ত প্লাটিনাম-জালির (প্রভাবক) উপর দিয়া প্রবাহিত করা হয়, তাহা হইলে অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। আধুনিক নাইট্রিক অ্যাসিড শিল্প এই বিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।



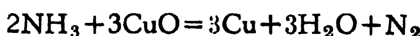
$$4NH_3+5O_2=6H_2O+4NO$$





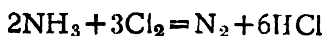
চিত্র ১৯গ
অ্যামোনিয়ার দহন

(খ) উত্তপ্ত কপার-অক্সাইডের উপর দিয়া অ্যামোনিয়া পরিচালনা করিলে অ্যামোনিয়া জারিত হইয়া নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

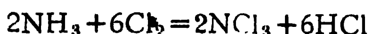


$$2NH_3+3CuO=3Cu+3H_2O+N_2$$

(গ) ক্লোরিন ও অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশী থাকা প্রয়োজন, কারণ অ্যামোনিয়া কম থাকিলে বিস্ফোরক নাইট্রোজেন ট্রাই-ক্লোরাইড হইবে :—

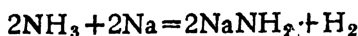


$$2NH_3+3Cl_2=N_2+6HCl$$



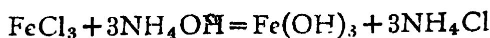
$$2NH_3+6Cl_2=2NCl_3+6HCl$$

(৫) শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস উত্তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়া পরিচালনা করিলে সোডামাইড (Sodamide) পাওয়া যায়।



$$2NH_3 + 2Na = 2NaNH_2 + H_2$$

(৬) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিভিন্ন ধাতব লবণের দ্রবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত করে :—

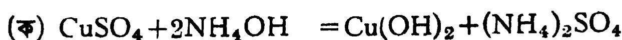


$$FeCl_3 + 3NH_4OH = Fe(OH)_3 + 3NH_4Cl$$

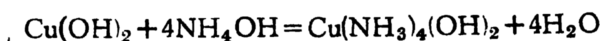


$$ZnSO_4 + 2NH_4OH = Zn(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4$$

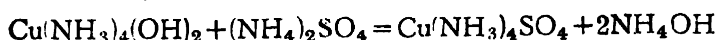
(৭) কোন কোন লবণের দ্রবণের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ার ফলে জটিল লবণের সৃষ্টি হয় ; যথা :—



(ক) $CuSO_4 + 2NH_4OH = Cu(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4$



$$Cu(OH)_2 + 4NH_4OH = Cu(NH_3)_4(OH)_2 + 4H_2O$$

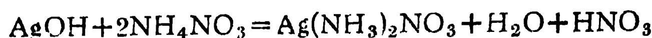


$$Cu(NH_3)_4(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4 = Cu(NH_3)_4SO_4 + 2NH_4OH$$

(কিউপ্রামোনিয়াম সালফেট)



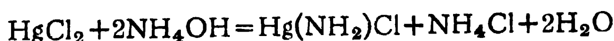
(খ) $AgNO_3 + NH_4OH = AgOH + NH_4NO_3$



$$AgOH + 2NH_4NO_3 = Ag(NH_3)_2NO_3 + H_2O + HNO_3$$

(আর্জেন্টো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট)

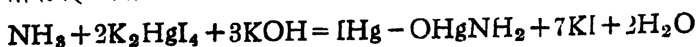
(৮) মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড একত্র করিলে একটি সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। ইহাকে অ্যামিনো-মারকিউরিক ক্লোরাইড বলে :—



$$HgCl_2 + 2NH_4OH = Hg(NH_2)Cl + NH_4Cl + 2H_2O$$

(৯) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড প্রভৃতি যৌগের সহিত অ্যামোনিয়া সংযুক্ত হইয়া যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে ; যথা :— $CaCl_2$, $8NH_3$।

(১০) অ্যামোনিয়া নেস্‌লার দ্রবণের (Nessler's Solution) সংস্পর্শে আসিলেই তামাটে রংয়ের অধঃক্ষেপ দেয়।



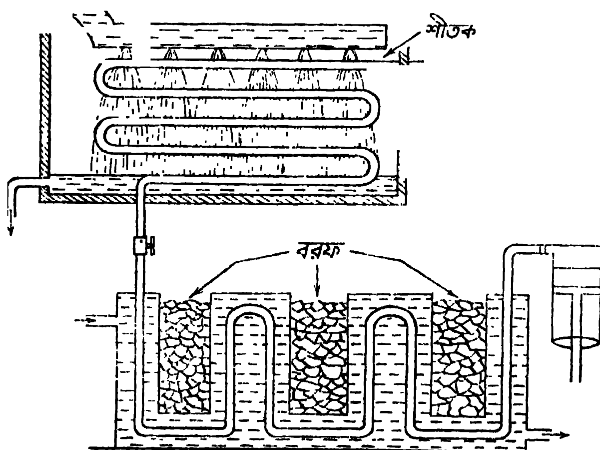
$$NH_3 + 2K_2HgI_4 + 3KOH = IHg - OHgNH_2 + 7KI + 2H_2O$$

নেস্‌লার দ্রবণ

বিশিষ্ট ঝাঁঝাল গন্ধ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত সাদা ধোঁয়া উৎপাদন এবং নেস্‌লার দ্রবণের সহিত ক্রিয়া এই তিনটি উপায়ে অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব সাধারণতঃ নির্ধারণ করা হয়।

অ্যামোনিয়ার ব্যবহার ঃ (১) অ্যামোনিয়া ক্ষারক হিসাবে ল্যাবরেটরীতে অবশ্যই প্রয়োজন। (২) সল্‌ভে প্রণালীতে সোডা তৈয়ারী করার জন্যও অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। (৩) জমিতে সার হিসাবে $(NH_4)_2SO_4$,NH_4NO_3 প্রভৃতি বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয়। এগুলি অ্যামোনিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন। (৪) বর্তমানে অ্যামোনিয়া জারিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী করা হয়। এইজন্যই আজকাল অ্যামোনিয়ার চাহিদা খুব বেশী।

বরফ তৈয়ারী করার সময় জল ঠাণ্ডা করার জন্য অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ অতিরিক্ত চাপে অ্যামোনিয়াকে তরল করিয়া লওয়া হয়। তৎপর চাপ হঠাৎ কমাইয়া দিয়া সরু সরু নলের ভিতর দিয়া তরল আমোনিয়া প্রবাহিত করা হয়। চাপ কমানোর ফলে উহা দ্রুত উদ্বায়িত হইতে থাকে। এই নলগুলির চারিদিকে টিনের প্রকোষ্ঠে পরিষ্কার জল রাখা হয়। তরল অ্যামোনিয়ার বাষ্পীভবনের সময় উহা জল হইতে প্রচুর তাপ গ্রহণ করে। ফলে জল শীতল হইয়া বরফে পরিণত হয়। এইভাবেই বরফ তৈয়ারী হয়। উদ্বায়িত অ্যামোনিয়া গ্যাসের উপর চাপবৃদ্ধি করিয়া উহাকে তরল করিয়া লইয়া আবার ব্যবহার করা হয়।



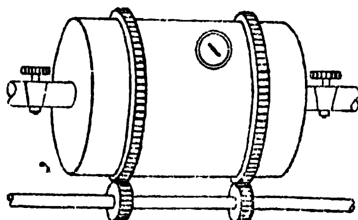
চিত্র ---বরফ প্রস্তুতি

১৯.৩। অ্যামোনিয়ার শিল্পপদ্ধতি ঃ অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করার কয়েকটি উপায় আছে।

(১) **কয়লার অন্তর্ধূমপাতন হইতে ঃ** কাঁচা কয়লাতে ওজনের শতকরা প্রায় একভাগ নাইট্রোজেন থাকে। লোহার আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া বায়ুর অনুপস্থিতিতে কয়লাকে উত্তপ্ত করিলে উহার ভিতর হইতে উদ্বায়ী বস্তুসমূহ গ্যাসের আকারে নির্গত হয়। কয়লার এই অন্তর্ধূমপাতনের ফলে উহার নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম লবণ হিসাবে বাহির হইয়া আসে। উষ্ণতা কমিয়া আসিলে এই গ্যাসের কিয়দংশ তরলীভূত হয় এবং বাকী অংশটি কোল-গ্যাস রূপে থাকিয়া যায়। তরল অংশটি আবার পরে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। নীচের দিকে আলকাতরা জাতীয় পদার্থসমূহ জড় হয় এবং উপরের অংশে অ্যামোনিয়ার ও অ্যামোনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণ থাকে। পাতিত পদার্থের জলীয় অংশটুকুকে "অ্যামোনিয়াক্যাল লিকার" (ammoniacal liquor) বলে।

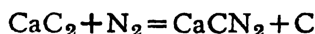
জলীয় অংশটুকুকে পৃথক করিয়া উহাতে ষ্টীম প্রয়োগ করিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস বাহির হইয়া যায়। অ্যামোনিয়া চলিয়া যাওয়ার পর উহাতে চুন মিশাইয়া আবার পাতিত করা হয়। ইহাতে অ্যামোনিয়াম লবণগুলি বিযোজিত হয় এবং আরও অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। এই সকল অ্যামোনিয়া গ্যাস অন্য একটি পাত্রে লইয়া জলে শোষণ করা হয়। এই ভাবে লাইকার অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যামোনিয়া গ্যাস লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিচালনা করিয়া উহাকে অ্যামোনিয়াম সালফেটে পরিণত করা হয়। প্রতি মণ কয়লা হইতে গড়ে প্রায় আধ সের পরিমাণ অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়।

(২) **সায়নামাইড প্রণালী (Cyanamide Process) ঃ** এই প্রণালীতে প্রথমতঃ চুন ও কোকের সাহায্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর ক্যালসিয়াম কার্বাইড উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চুল্লীর ভিতরে শুষ্ক নাইট্রোজেন গ্যাসে ১১০০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। এই অবস্থায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাই-



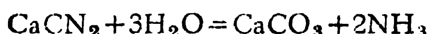
চিত্র ১৯দ—সায়নামাইড পদ্ধতি

ট্রোজেনের সহিত ক্রিয়া, করিয়া ক্যালসিয়াম সায়নামাইড উৎপন্ন করে।



$$CaC_2+N_2=CaCN_2+C$$

চুল্লী হইতে ধূসর বর্ণের যে সায়নামাইড ও কার্বনের মিশ্রণ পাওয়া যায় তাহাকে "নাইট্রোলিম" (Nitrolim) বলে এবং উহা জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোলিম হইতে অবশ্য অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম সালফেটও প্রস্তুত হয়। চূর্ণ অবস্থায় নাইট্রোলিম অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রে রাখিয়া উহাতে ৩-৪ অ্যাটমসফিয়ার চাপে স্টীম দেওয়া হয়। ইহার ফলে সায়নামাইড হইতে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।



$$CaCN_2+3H_2O=CaCO_3+2NH_3$$

(৩) **হেভার প্রণালী** (Haber Process): হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন সংযোগে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করার পদ্ধতিটি সার্থক করেন জার্মান রসায়নবিদ্ হেভার। নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় উপযুক্ত প্রভাবকের সাহায্যে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।



$$N_2+3H_2=2NH_3+24{,}000 \text{ cal.}$$

সাধারণতঃ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন আয়তনের ১ : ৩ অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া ২০০ অ্যাটমসফিয়ার চাপে উত্তপ্ত লৌহচূর্ণ প্রভাবকের উপর দিয়া পরিচালনা করিলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। প্রভাবকের উষ্ণতা অন্তত ৬০০° সেন্টিগ্রেড হওয়া প্রয়োজন।

এই বিক্রিয়াটি সফল করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(ক) প্রথমতঃ সাধারণ চাপে ও উষ্ণতায় এই মৌল দুইটির ভিতর সংযোগ-সাধন সম্ভব নয়। অতিরিক্ত চাপে এই বিক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে। সাধারণতঃ বিক্রিয়ার সময় এই গ্যাস-মিশ্রণের চাপ প্রায় ২০০ অ্যাটমসফিয়ার রাখা হয়।

কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চাপ যত বৃদ্ধি করা যায়, তত বেশী অ্যামোনিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমিতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও সচরাচর এই ক্রিয়াটি ৫৫০° - ৬০০° সেণ্টিগ্রেডে সম্পন্ন করা হয়। কারণ, ইহার চেয়ে কম উষ্ণতায় বেশী অ্যামোনিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা এত সময় সাপেক্ষ যে শিল্পের দিক হইতে বিচারে উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়, লাভজনকও নয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় চাপে ও উষ্ণতায় রাখা সত্ত্বেও প্রভাবক ব্যতিরেকে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সহজে এবং দ্রুত মিলিত হয় না। লৌহচূর এই ক্রিয়াতে উৎকৃষ্ট প্রভাবকের কাজ করে। বর্তমানে লৌহচূরের পরিবর্তে অল্প পটাসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত আয়রন অক্সাইডও ($Fe_2O_3+Al_2O_3+K_2O$) প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য উত্তপ্ত আয়রন অক্সাইড হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে আসিয়া লৌহচূরেই পরিণত হয়।

(গ) তৃতীয়তঃ, মৌলিক উপাদান দুইটি আয়তনের ১ : ৩ অনুপাতে থাকা চাই এবং উপাদানগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা প্রয়োজন।

জলের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ হইতে হাইড্রোজেন এবং তরল বায়ুর আংশিক-পাতন হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করার রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে না পারিলে এই উপায়টি ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল বস্-প্রণালীতে (Bosch Process) হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা হয়। লোহিত-তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়া বায়ু পরিচালনা করিলে উহার সহিত বায়ুর অক্সিজেন মিলিয়া কার্বন মনোক্সাইড হয় এবং নাইট্রোজেন অবিকৃত থাকে। নাইট্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণকে প্রোডিউসার গ্যাস (Producer gas) বলে।



$$(N_2+O_2)+2C=2CO+N_2$$

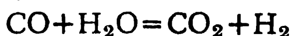
বায়ু প্রোডিউসার গ্যাস

আবার, ঐরকম উত্তপ্ত কোকের উপর দিয়া ষ্টীম পরিচালনা করিয়া হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাকে ওয়াটার গ্যাস (Water gas) বলে—



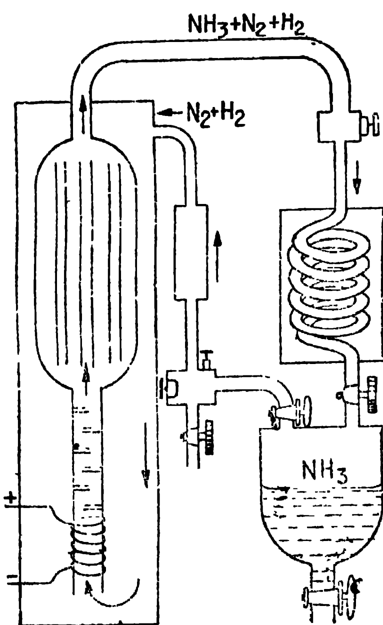
$$H_2O+C=H_2+CO$$

ওয়াটার গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস অতঃপর এমনভাবে মিশ্রিত করা হয় যাহাতে শেষ পর্যন্ত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের আয়তনের অনুপাত ১ : ৩ হয়। এই গ্যাস-মিশ্রণের সহিত আরও অতিরিক্ত পরিমাণ ষ্টীম মিশাইয়া উহাকে একটি Fe_2O_3 এবং Cr_2O_3 পূর্ণ উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ফলে গ্যাস-মিশ্রণের কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। আয়রন ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড প্রভাবকের কাজ করে।



$$CO+H_2O=CO_2+H_2$$

এই নল হইতে যখন গ্যাস বাহির হয়, উহাতে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, প্রচুর ষ্টীম ও স্বল্প-পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড থাকে। ঠাণ্ডা হইলেই অধিকাংশ ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া তরল হইয়া যায়। ইহার পর গ্যাসটিকে অতিরিক্ত চাপে জল এবং অ্যামোনিয়াক্যাল কিউপ্রাস ফরমেট দ্রবণের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মনোক্সাইড গ্যাস দূরীকৃত হয় এবং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন পড়িয়া থাকে। নিরুদকের সাহায্যে এই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিশুদ্ধ করিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

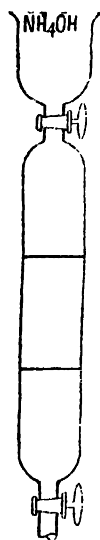


চিত্র ১৯৬—হেভার প্রণালী

অ্যামোনিয়ার সংশ্লেষণ ক্রিয়াটি একটি ক্রোম-ষ্টীলের পাত্রে সংঘটিত করা হয়। এই পাত্রটির দুইটি

প্রকোষ্ঠ থাকে। আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট তাকের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবক সজ্জিত থাকে এবং বিদ্যুৎ সাহায্যে উহাকে প্রায় ৫৫০ সেন্টিগ্রেডে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ ঘিরিয়া কঞ্চুকের মত উহার চতুর্দিকে একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ আছে। এই বহিঃপ্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের (১ : ৩) মিশ্রণ ২০০ অ্যাটমসফিয়ার চাপে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ করে এবং প্রভাবকের সংস্পর্শে আসে (চিত্র ১৯৬)। ইহার ফলে মিশ্রণের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ গ্যাস অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়।

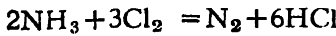
এই বিক্রিয়াটিতে যথেষ্ট তাপের উদ্ভব হয়, এবং এই তাপশক্তি সরাইয়া না লইলে উহা প্রভাবকের উষ্ণতা বাড়াইয়া দিতে পারে। এই কারণেই এবং তাপশক্তির অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই বহিঃপ্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়া উপাদান-গুলির মিশ্রণ প্রবাহিত করার ব্যবস্থা আছে। বিক্রিয়োদ্ভব তাপের সাহায্যেই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হইয়া বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে যায়। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া ও অবিকৃত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রণ খুব শীতল করিয়া অত্যধিক চাপে সঙ্কুচিত করিলে অ্যামোনিয়া তরলাকারে একটি পাত্রের ভিতর সঞ্চিত হয়। পাম্পের সাহায্যে অপরিবর্তিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনকে পুনরায় বিক্রিয়াপ্রকোষ্ঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

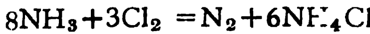


চিত্র ১৯চ

১৯-৪। অ্যামোনিয়ার আয়তন-সংযুক্তি : হফম্যান প্রণালী (Hoffman's method) : একটি লম্বা এবং শক্ত কাচের নলে এই পরীক্ষাটি করা হয়। নলটির দুইদিকে দুইটি স্টপকক যুক্ত থাকে এবং একপ্রান্তে একটি ফানেলও সংযুক্ত থাকে (চিত্র ১৯চ)। বাহির হইতে নলটিকে তিনটি সমান অংশে চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়। নলটি প্রথমে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাসে ভর্তি করিয়া লওয়া হয় এবং ফানেলে গাঢ় অ্যামোনিয়া রাখা হয়। স্টপককটি খুলিয়া ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেই

অ্যামোনিয়া ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডও তৈয়ারী হয়।


$$2NH_3+3Cl_2 = N_2+6HCl$$

$$6NH_3+6HCl=6NH_4Cl$$

$$8NH_3+3Cl_2 = N_2+6NH_4Cl$$

অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় যাহাতে সম্পূর্ণ ক্লোরিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হইতে পারে। অতঃপর অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড পূর্বোক্ত উপায়েই নলের ভিতর দেওয়া হয়। ইহাতে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট হইয়া যায়। গ্যাস অবস্থায় এখন শুধু নাইট্রোজেন থাকিতে পারে। নলটিকে অতঃপর একটি বড় জলের পাত্রে রাখিয়া সাধারণ উষ্ণতায় আনা হয় এবং জলের নীচে রাখিয়া স্টপককটি খুলিয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। নলটির ভিতরে ও বাহিরে জল একই সমতলে লইয়া গ্যাসের আয়তন স্থির করা হয়। এইভাবে নাইট্রোজেনটি পূর্বের চাপ ও উষ্ণতায় লইয়া আসিলে দেখা যায় নাইট্রোজেনের আয়তন সম্পূর্ণ নলের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অর্থাৎ, অ্যামোনিয়া হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহা ক্লোরিনের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু এই বিক্রিয়াতে সম্পূর্ণ ক্লোরিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমান আয়তনের হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইয়াছে। সেই হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ অ্যামোনিয়া হইতেই আবার উপরোক্ত নাইট্রোজেন পাওয়া গিয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে, তিনভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ। অর্থাৎ, তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন সহযোগে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প অনুযায়ী, মনে কর, প্রতি ঘনায়তন গ্যাসের অণুসংখ্যা $= n$

$\therefore$ ৩n হাইড্রোজেন অণু এবং n নাইট্রোজেন অণু সহযোগে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

অথবা, ৩টি হাইড্রোজেন অণু এবং ১টি নাইট্রোজেন অণু মিলিয়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে।

অর্থাৎ, ৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু মিলিয়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে।

অতএব অ্যামোনিয়ার স্থূল সঙ্কেত হইবে NH_3 এবং, উহার আণবিক সঙ্কেত হইবে $(NH_3)x$।

কিন্তু অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব=৮·৫, অর্থাৎ উহার আণবিক গুরুত্ব=২×৮·৫=১৭

∴ x×১৪+৩x×১=১৭ [∵ নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব=১৪

∴ x=১ হাইড্রোজেনের " " " ১]

∴ অ্যামোনিয়ার আণবিক সংকেত, NH_3।

১৯-৫। অ্যামোনিয়াম লবণঃ অ্যামোনিয়া ক্ষারক-জাতীয় পদার্থ। উহা বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হইয়া লবণের সৃষ্টি করে। এই লবণগুলিকে অ্যামোনিয়াম লবণ বলে। যেমন:—



$$NH_3+HCl=NH_4Cl\ ;\ 2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$$

এই সমস্ত লবণে "NH_4" যৌগ-মূলকটি থাকে এবং ইহাকে অ্যামোনিয়াম মূলক বলা হয়। অ্যামোনিয়াম লবণগুলি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় হয় এবং উহারা বিদ্যুৎপরিবাহী। জলীয় দ্রবণে উহারা NH_4^+ ক্যাটায়ন ও অন্যান্য অ্যানায়নে তড়িৎ-বিয়োজিত হইয়া থাকে।



$$NH_4Cl=NH_4^++Cl^-\ ;\ (NH_4)_2SO_4=2NH_4^++SO_4^{--}$$

অ্যামোনিয়াম লবণের ব্যবহার অনেকাংশে ক্ষার-ধাতুর লবণের মত। এইজন্য অ্যামোনিয়াম মূলককে ক্ষার-ধাতুর সমগোত্রীয় মনে করা হয়। ইহার যোজ্যতাও এক।

অ্যামোনিয়াম লবণগুলি ঈষৎ উদ্বায়ী এবং উত্তাপে উহারা অতি সহজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন অ্যামোনিয়াম লবণ তাপের সাহায্যে বিয়োজিত হইয়া অ্যামোনিয়া ও অ্যাসিডে পরিণত হয়। যেমন:—



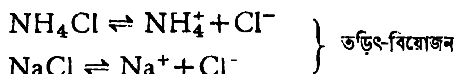
$$NH_4Cl \rightleftharpoons NH_3+HCl$$

তাপ সরাইয়া লইলে অর্থাৎ ঠাণ্ডা করিলে উহারা আবার যুক্ত হইয়া পুনরায় অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে। ইহাকে তাপ-বিয়োজন বলা হয়।

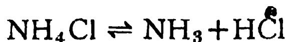
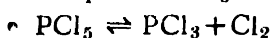
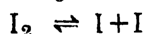
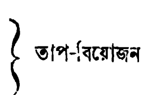
১৯-৬। তাপ-বিয়োজন ও তড়িৎ-বিয়োজনঃ তাপ-বিয়োজনে পদার্থটি ভাঙিয়া দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে। বার উষ্ণতা কমাইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেলে বিয়োজন-লব্ধ পদার্থগুলি পুনর্মিলিত হইয়া প্রাক্তন বস্তুটি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, পরিবর্তনটি উভমুখী।

তড়িৎ-বিয়োজনে পদার্থটি দুই বিপরীতধর্মী আয়নে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও

দ্রাবক সরাইয়া লইলে আয়নগুলি মিলিত হইয়া প্রাক্তন পদার্থটি পাওয়া যায়। অতএব, পরিবর্তনটি উভমুখী।




$$NH_4Cl \rightleftharpoons NH_4^+ + Cl^-$$
$$NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl^-$$
} তড়িৎ-বিয়োজন

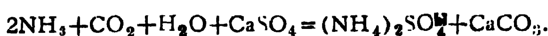
$$NH_4Cl \rightleftharpoons NH_3 + HCl$$
$$PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$$
$$I_2 \rightleftharpoons I + I$$
} তাপ-বিয়োজন

তাপ-বিয়োজন-উদ্ভূত পদার্থগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক করা সম্ভব। কিন্তু তড়িৎ-বিয়োজনের ফলে যে আয়ন পাওয়া যায়, তাহাদের পরস্পর হইতে পৃথক করা সম্ভব নয়। তড়িৎ-বিয়োজনে জল বা অন্য কোন দ্রাবক প্রয়োজন হয় কিংবা পদার্থটি গলিত অবস্থায় থাকা প্রয়োজন, কিন্তু তাপ-বিয়োজনে কোন দ্রাবকের প্রয়োজন নাই।

অ্যামোনিয়াম লবণসমূহের ভিতর অ্যামোনিয়াম সালফেট, ও ক্লোরাইড নাইট্রেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯-৭। অ্যামোনিয়াম সালফেট, $(NH_4)_2SO_4$: কয়লার অন্তর্ধূম-পাতন অথবা হেভার প্রণালী দ্বারা যে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় উহাকে সোজাসুজি লঘু সালফিউরিক আসিডের সহিত সংযুক্ত করিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী হয়।

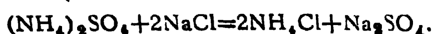
বিচূর্ণ ক্যালসিয়াম সালফেট জলের সহিত মিশাইয়া উহার ভিতর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এইরূপেই অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী হয়।



$$2NH_3 + CO_2 + H_2O + CaSO_4 = (NH_4)_2SO_4 + CaCO_3.$$

সস্তা অথচ ভাল সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম সালফেটের চাহিদা সর্বাধিক।

১৯-৮। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, NH_4Cl : অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংযোগে ইহা তৈয়ারী হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড একত্র ফুটাইয়া বিপরিবর্ত-ক্রিয়ার ফলেও ইহা প্রস্তুত করা হয়।



$$(NH_4)_2SO_4 + 2NaCl = 2NH_4Cl + Na_2SO_4.$$

জলে সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা কম; সেইজন্য উহা সহজেই কেলাসিত করিয়া পৃথক করা হয়। পরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিক প্রস্তুত করা যায়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন হয়। রঞ্জনশিল্পে প্রচুর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লাগে। কোন কোন সেল ও ব্যাটারীতেও ইহা ব্যবহার হয়।

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগসমূহ

অক্সিজেন সমন্বিত নাইট্রোজেনের যৌগগুলির ভিতর তিনটি অক্সাইড ও দুইটি অক্সি-অ্যাসিড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিষয় এখন আলোচনা করা হইল।

অক্সাইড :

(১) নাইট্রাস অক্সাইড, N

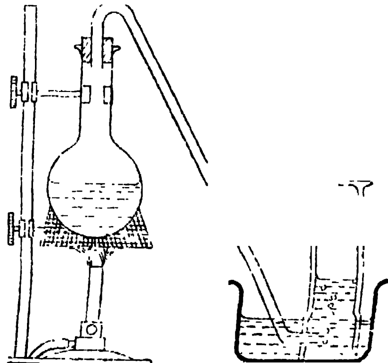
নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড, N_2O_4।

অক্সি-অ্যাসিড :—

(.) নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3, (২) নাইট্রাস অ্যাসিড, HNO_2।

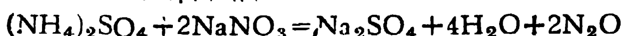
১৯-৯। নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O। প্রস্তুতি : (১) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এইভাবেই সাধারণতঃ নাইট্রাস অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। $NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$।

একটি গোল কূপীতে খানিকটা শুষ্ক বিচূর্ণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট লইয়া একটি তারজালির উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে গরম করা হয়। কূপীর মুখে একটি কর্কের সাহায্যে একটি বাঁকান নির্গম-নল যুক্ত থাকে। নির্গম-নলের অপর প্রান্তটি একটি গ্যাসদ্রোণীতে গরম জলে নিমজ্জিত থাকে। প্রায় ২০০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট গলিয়া যায় এবং উহা হইতে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হইতে থাকে। এই গ্যাস নির্গম-নল বাহিয়া গ্যাসদ্রোণীতে আসে। একটি গ্যাসজার গরম জলে পূর্ণ করিয়া নির্গম-নলের উপর ধরিলে নাইট্রাস অক্সাইড উহাতে সঞ্চিত হয়। শীতল জলে এই গ্যাস যথেষ্ট দ্রবণীয় বলিয়া গরম জল ব্যবহৃত হয়। গরম জলে উহার দ্রাব্যতা অনেক



চিত্র ১৯ছ—নাইট্রাস অক্সাইড প্রস্তুতি

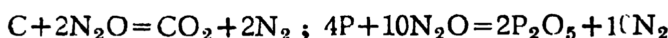
কম। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সতর্কতার সহিত উত্তপ্ত করা হয়, কারণ উহার উষ্ণতা ২৫০ ডিগ্রীর অধিক হইলে বিস্ফোরণ হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। NH_4NO_3এর পরিবর্তে $(NH_4)_2SO_4$ এবং $NaNO_3$এর মিশ্রণ হইলে বিস্ফোরণের সম্ভাব্যতা এড়ান যায় :—



$$(NH_4)_2SO_4 + 2NaNO_3 = Na_2SO_4 + 4H_2O + 2N_2O$$

১৯-১০। নাইট্রাস অক্সাইডের ধর্ম : নাইট্রাস অক্সাইড মৃদু মিষ্ট গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী। ঠাণ্ডা জলে ও কোহলে ইহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট। ইহা একটি প্রশম-অক্সাইড।

অক্সিজেনের মত নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসও নিজে অদাহ্য কিন্তু অপরের দহনে ও প্রজ্বলনে সহায়তা করে : শিখাহীন একটি প্রদীপ্ত কাষ্ঠ-শলাকা যদি এই গ্যাসের একটি জারে প্রবেশ করান হয় তবে উহা পুনরায় উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলিতে থাকে। প্রজ্বলিত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, কার্বন প্রভৃতি এই গ্যাসের ভিতর অধিকতর তীব্রতার সহিত জ্বলিতে থাকে। এই সকল দহনের ফলে সর্বদাই নাইট্রোজেন এবং ঐসকল পদার্থের অক্সাইড পাওয়া যায় :



$$C + 2N_2O = CO_2 + 2N_2 \; ; \; 4P + 10N_2O = 2P_2O_5 + 10N_2$$

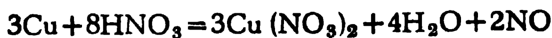
বস্তুত: নাইট্রাস অক্সাইড উত্তাপ-প্রয়োগে বিযোজিত হইয়া যায় এবং নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। এই উৎপন্ন অক্সিজেনই দহনে সহায়তা করে।

শরীরের উপর নাইট্রাস অক্সাইডের বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত স্বল্প পরিমাণে উহা গ্রহণ করিলে সাধারণত উহা হাসির উদ্রেক করে। এইজন্য উহাকে "লাফিং গ্যাস" (Laughing gas) বলে। অতিরিক্ত পরিমাণে ইহা গ্রহণ করিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। চেতনা-নাশক রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অক্সিজেনের সহিত নাইট্রাস অক্সাইডের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইডের সহিত মিলিত হইয়া তামাটে কোন গ্যাস উৎপন্ন করে না।

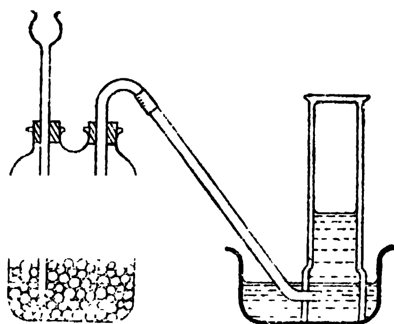
১৯-১১। নাইট্রিক অক্সাইড, NO_1 প্রস্তুতি :

(১) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি :—সাধারণতঃ কপারের উপর নাতিগাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করা হয়।



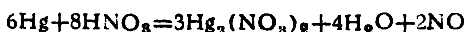
$$3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$$

একটি উলফ-বোতলে খানিকটা কপারের ছিলা (turnings) লওয়া হয়। উহার একটি মুখে কর্কসহ একটি দীর্ঘনাল-ফানেল এবং অপর মুখে কর্কের সাহায্যে একটি বাঁকান নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত সম-পরিমাণ জল মিশাইয়া উহাকে লঘু করিয়া দীর্ঘনাল-ফানেলের মধ্য দিয়া উলফ-বোতলে ঢালিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের প্রান্তটি অ্যাসিডে নিমজ্জিত থাকা প্রয়োজন। অ্যাসিড কপারের সংস্পর্শে আসিলেই উপরোক্ত বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। বিক্রিয়ালব্ধ অন্যান্য পদার্থগুলি অনুদ্বায়ী, কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস। উহা প্রথমতঃ বোতলের মধ্যস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া তামাটে লাল নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড সৃষ্টি করে। নির্গম-নল দিয়া উহা বাহির হইতে থাকে। অভ্যন্তরের সমস্ত অক্সিজেন এইভাবে নিঃশেষিত হইলে বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড নির্গম-নল দিয়া বাহির হয়। যথারীতি গ্যাসদ্রোণীতে জল রাখিয়া জলপূর্ণ গ্যাসজারে উহা সংগৃহীত করা হয় (চিত্র ১৯-জ)।



চিত্র ১৯জ—নাইট্রিক অক্সাইড প্রস্তুতি

আরও কোন কোন ধাতুর উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যাইতে পারে, যেমন :—

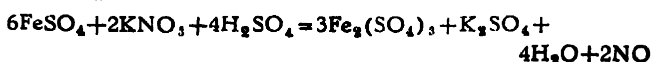


$$6Hg + 8HNO_3 = 3Hg_2(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$$



অথবা, $6Hg + 2HNO_3 + 3H_2SO_4 = 3Hg_2SO_4 + 4H_2O + 2NO.$

(২) ফেরাস সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড একত্র করিয়া উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ নাইট্রিক অক্সাইড সহজেই পাওয়া যায় :—



$$6FeSO_4 + 2KNO_3 + 4H_2SO_4 = 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 4H_2O + 2NO$$

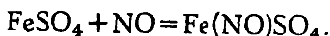
১৯-১২। নাইট্রিক অক্সাইডের ধর্ম : (১) নাইট্রিক অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ঈষৎ ভারী, বর্ণহীন একটি গ্যাস। জলে ইহা খুব অল্পই দ্রবীভূত হয়। শরীরের উপর এই গ্যাসের বিষক্রিয়া আছে।

(২) নাইট্রিক অক্সাইড একটি প্রশম অক্সাইড। গ্যাসটি নিজে দাহ্য নয় এবং অপরের দহনেও সহায়তা করে না। নাইট্রিক অক্সাইড-পূর্ণ গ্যাস-জারের ভিতর জলন্ত মোমবাতি, কাঠি বা সালফার দিলে উহারা নির্বাপিত হইয়া যায়। কিন্তু উত্তমরূপে প্রজ্বলিত ফসফরাস বা ম্যাগনেসিয়াম এই গ্যাসে স্বচ্ছন্দে জ্বলিতে থাকে। কারণ, অধিক উষ্ণতায় নাইট্রিক অ্যাসিড বিযোজিত হইয়া নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দেয় এবং এই অক্সিজেন দহনকার্যে সহায়তা করে।



$$2NO = N_2 + O_2 ; \qquad 4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$

(৩) নাইট্রিক অক্সাইড ফেরাস সালফেট দ্রবণে খুব সহজেই সাধারণ উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়। বস্তুতঃ ইহাতে একটি রাসায়নিক সংযোগ সম্পন্ন হয়। ফেরাস সালফেট ও নাইট্রিক অক্সাইড হইতে একটি যুত-যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। উত্তাপ দিলে আবার ইহা হইতে নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায়।



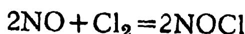
$$FeSO_4 + NO = Fe(NO)SO_4 .$$

তাপ প্রয়োগে, $Fe(NO)SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + NO$

এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে নাইট্রিক অক্সাইডকে বিশুদ্ধ করা হয়।

(৪) নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলেই লাল নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। $2NO + O_2 = N_2O_4$

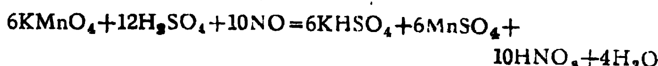
এবং ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাইট্রোসিল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।



$$2NO + Cl_2 = 2NOCl$$

নাইট্রাস অক্সাইড অক্সিজেনের সঙ্গে কোনরূপ বিক্রিয়া করে না।

(৬) আম্লিক পটাস পারম্যাঙ্গানেট বা আয়োডিন দ্রবণ আস্তে আস্তে নাইট্রিক অক্সাইড শোষণ করে ও উহাকে জারিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করে।

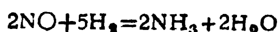


$$6KMnO_4 + 12H_2SO_4 + 10NO = 6KHSO_4 + 6MnSO_4 + 10HNO_3 + 4H_2O$$



$$3I_2 + 2NO + 4H_2O = 2HNO_3 + 6HI.$$

(৭) উত্তপ্ত প্লাটিনাম প্রভাবকের সাহায্যে নাইট্রিক অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ হইতে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়।



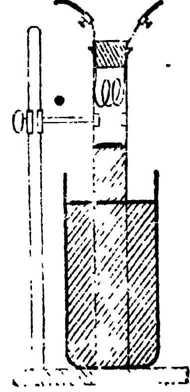
$$2NO + 5H_2 = 2NH_3 + 2H_2O$$

পরীক্ষা ঃ বাতাস বা অক্সিজেন সহযোগে লাল গ্যাস উৎপন্ন করা এবং ফেরাস সালফেট দ্রবণকে কালো করা—এই দুইটি পরিবর্তন দ্বারাই সাধারণতঃ নাইট্রিক অক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়।

কার্বন ডাইসালফাইড বাষ্পের সহিত নাইট্রিক অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে উহা নীল বর্ণের শিখাসহ জ্বলিতে থাকে। $2CS_2+10NO=2CO+4SO_2+5N_2$

১৯-১৩। নাইট্রিক অক্সাইডের সংযুক্তি ও সং

একটি শক্ত কাচের নলের একটি মুখ রবার কর্কের সাহায্যে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই কর্কের ভিতর দিয়া দুইটি সরু প্লাটিনাম শলাকা অতিক্রম করে। উহাদের ভিতরের প্রান্ত দুইটি একটি সরু কুণ্ডলাকার লোহার তার দ্বারা যুক্ত থাকে (spiral of iron wire)। নলটি তৎপর পারদ পূর্ণ করিয়া একটি পারদ-দ্রোণীর উপর উল্টাইয়া রাখা হয়। অতঃপর নলের ভিতর পারদের উপরে কিছু পরিমাণ শুষ্ক ও বিশুদ্ধ নাইট্রিক অক্সাইড সংগৃহীত করা হয় (চিত্র ১৯ঝ)। ভিতরে ও বাহিরে পারদ সমতল করিয়া এই নাইট্রিক অক্সাইডের আয়তন স্থির করা হয়। ইহার পর প্লাটিনাম শলাকা দুইটির সাহায্যে একটি ব্যাটারী হইতে লোহার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করা হয়। লোহার সরু তারটি শ্বেততপ্ত হইয়া উঠে এবং উত্তাপের ফলে নাইট্রিক অক্সাইড বিযোজিত হইয়া যায়। উৎপন্ন অক্সিজেন লোহার সহিত সংযুক্ত হইয়া আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয় এবং কেবল নাইট্রোজেন পড়িয়া থাকে।



চিত্র ১৯ঝ

যথেষ্ট সময় দিলে নাইট্রিক অক্সাইড সম্পূর্ণরূপে বিযোজিত হইয়া যায়। অতঃপর যন্ত্রটি ঠাণ্ডা করিয়া পূর্বের উষ্ণতায় আনিয়া আবার ভিতর ও বাহিরের পারদ সমতল করিয়া নাইট্রোজেনের আয়তন স্থির করা হয়। সর্বদাই দেখা যায়, উৎপন্ন নাইট্রোজেনের আয়তন নাইট্রিক অক্সাইডের আয়তনের ঠিক অর্ধেক। অর্থাৎ, দুই ঘনায়তন নাইট্রিক অক্সাইড হইতে এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

অতএব, অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প অনুসারে

২টি নাইট্রিক অক্সাইড অণুতে ১টি নাইট্রোজেন অণু থাকে।

∴ ১টি " " " ১/২ খানা নাইট্রোজেন অণু থাকে।

অর্থাৎ, ১টি ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে।

মনে কর, নাইট্রিক অক্সাইড অণুতে দ্বিতীয় মৌল অক্সিজেনের পরমাণুসংখ্যা $= x$

$\therefore$ নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্কেত হইবে, NO_x ;

এবং ইহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ১৪+x×১৬।

কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইডের ঘনত্ব=১৫ ; অথবা ইহার আণবিক গুরুত্ব

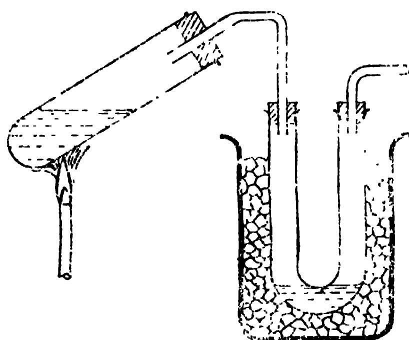
=২×১৫=৩০,

সুতরাং, ১৪+x×১৬=৩০, $\therefore$ x=১

$\therefore$ নাইট্রিক অক্সাইডের আণবিক সঙ্কেত, NO।

১৯·১৪। নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড, N_2O_4, [নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড] **প্রস্তুতি :** (১) সাধারণতঃ গুরু ধাতুর নাইট্রেট-সমূহের উপর উত্তাপের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড বা পার-অক্সাইড পাওয়া যায়। ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই লেড নাইট্রেট উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়।

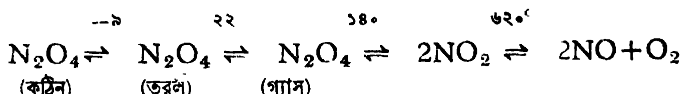

$$2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 2N_2O_4 + O_2$$


চিত্র ১৯ঞ—নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড প্রস্তুতি

একটি মোটা ও শক্ত কাচের টেস্ট-টিউবে শুষ্ক বিচূর্ণ লেড নাইট্রেট লওয়া হয়। টেস্ট-টিউবের মুখটি কর্ক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাতে একটি বাঁকান নির্গম-নল যুক্ত থাকে। নির্গম-নলটি আবার একটি U-নলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। U-নলটি চারিদিকে লবণ ও বরফের হিম-মিশ্রণ দ্বারা আবৃত থাকে। টেস্ট টিউবটি অতঃপর আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করা হয়। লাল নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড ও অক্সিজেন নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। শীতল U-নলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড ঘনীভূত হইয়া একটি হলুদ তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া যায় (চিত্র ১৯ঞ)।

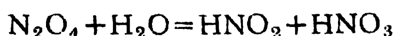
১৯·১৫। নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইডের ধর্ম : সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড একটি পিঙ্গলবর্ণের গ্যাস। কিন্তু

– ৯° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ইহা বর্ণহীন স্ফটিকাকার ধারণ করে। এই কঠিন পদার্থটিতে অণুগুলি N_2O_4 অবস্থায় থাকে। উষ্ণতা বাড়াইলে উহা ঈষৎ হলুদ একটি তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং ২২° সেন্টিগ্রেডে এই তরল পদার্থটি ফুটিতে থাকে এবং পিঙ্গল গ্যাসে পরিণত হয়। উষ্ণতা যতই বৃদ্ধি পায় ততই উহার বর্ণ অধিকতর লাল হইতে থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে N_2O_4 অণুগুলি বিয়োজিত হইতে থাকে এবং NO_2 অণুর উদ্ভব হয়। N_2O_4 অণুগুলি বর্ণহীন, কিন্তু NO_2 অণুগুলি লালবর্ণের। ১৪০° সেন্টিগ্রেডে N_2O_4 অণুসমূহ সম্পূর্ণ বিয়োজিত হইয়া NO_2 অণুতে রূপান্তরিত হয়। আরও উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার রঙ ফিকা হইতে থাকে। কারণ NO_2 অণু বিয়োজিত হইয়া অক্সিজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হইতে থাকে।



$$\underset{\text{(কঠিন)}}{N_2O_4} \xrightleftharpoons{-৯} \underset{\text{(তরল)}}{N_2O_4} \xrightleftharpoons{২২} \underset{\text{(গ্যাস)}}{N_2O_4} \xrightleftharpoons{১৪০} 2NO_2 \xrightleftharpoons{৬২০^\circ} 2NO+O_2$$

নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এইজন্য উহাকে অ্যাসিড দুইটির মিশ্র-নিরুদক বলা হয়।



$$N_2O_4+H_2O=HNO_2+HNO_3$$

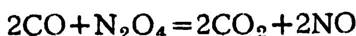
উষ্ণতা অধিক হইলে নাইট্রাস অ্যাসিড অবশ্য ভাঙিয়া যায় এবং নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায়।

$$3HNO_2=HNO_3+H_2O+2NO$$

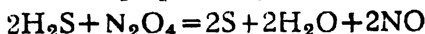
নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইডের জারণ-ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য। যথা :—



$$2CO+N_2O_4=2CO_2+2NO$$



$$2H_2S+N_2O_4=2S+2H_2O+2NO$$

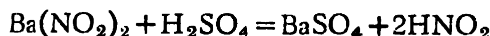


লোহিত-তপ্ত কপারের সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইডে সম্পূর্ণ নাইট্রোজেন পৃথক করা সম্ভব। $4Cu+N_2O_4=4CuO+N_2$।

১৯-১৬। নাইট্রাস অ্যাসিড, HNO_2 : নাইট্রাস অ্যাসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না, কিন্তু উহার জলীয় দ্রবণ এবং উহার বিভিন্ন লবণ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা যায়।

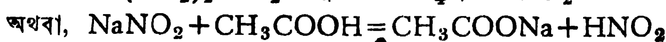
বেরিয়াম নাইট্রাইটের লঘু দ্রবণের সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড

মিশ্রিত করিলেই নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। বেরিয়াম সালফেট ছাঁকিয়া লইলেই নাইট্রাস অ্যাসিড দ্রবণ পাওয়া যায়।



$$Ba(NO_2)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2HNO_2$$

অথবা,



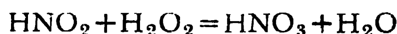
$$NaNO_2 + CH_3COOH = CH_3COONa + HNO_2$$

নাইট্রাস অ্যাসিডের দ্রবণটি দীর্ঘকাল রাখিয়া দিলে বা উহার উষ্ণতা বাড়াইলে উহার পরিবর্তন ঘটে এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



$$3HNO_2 = HNO_3 + 2NO + H_2O$$

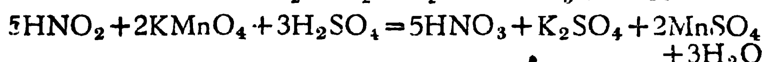
১৯-১৭। নাইট্রাস অ্যাসিডের ধর্ম ঃ নাইট্রাস অ্যাসিডের জারণ ও বিজারণ-ক্ষমতা দুই-ই আছে। আম্লিক পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভৃতির দ্রবণকে উহা বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হইয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।



$$HNO_2 + H_2O_2 = HNO_3 + H_2O$$

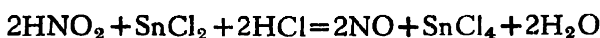


$$HNO_2 + Cl_2 + H_2O = HNO_3 + 2HCl$$

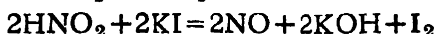


$$5HNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5HNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$$

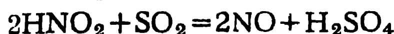
পক্ষান্তরে, নাইট্রাস অ্যাসিডের সাহায্যে স্ট্যানাস লবণের স্ট্যানিক লবণে পরিণতি, আয়োডাইড হইতে আয়োডিনের উদ্ভব, সালফার ডাই-অক্সাইডের সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিবর্তন ইত্যাদি উহার জারণ-ক্ষমতার পরিচায়ক। এই সকল জারণ-ক্রিয়াতে নাইট্রাস অ্যাসিড বিজারিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়।



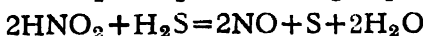
$$2HNO_2 + SnCl_2 + 2HCl = 2NO + SnCl_4 + 2H_2O$$



$$2HNO_2 + 2KI = 2NO + 2KOH + I_2$$

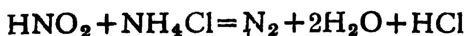


$$2HNO_2 + SO_2 = 2NO + H_2SO_4$$

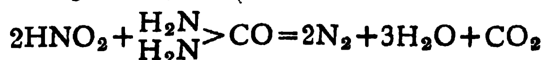


$$2HNO_2 + H_2S = 2NO + S + 2H_2O$$

অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়াম লবণ এবং $-NH_2$ মূলক বর্তমান এই রকম অ্যামিনো-যৌগের সহিত নাইট্রাস অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় :—



$$HNO_2 + NH_4Cl = N_2 + 2H_2O + HCl$$



$$2HNO_2 + \begin{matrix} H_2N \\ H_2N \end{matrix}\!\!>CO = 2N_2 + 3H_2O + CO_2$$

[ইউরিয়া]

১৯-১৮। নাইট্রাইট ও নাইট্রাস অ্যাসিডের পরীক্ষা: (১) নাইট্রাইট বা নাইট্রাস অ্যাসিডের দ্রবণে লঘু HCl দিলে লাল NO_2 গ্যাস বাহির হয়।

(২) পটাস আয়োডাইডের আম্লিক দ্রবণ হইতে উহারা আয়োডিন উৎপন্ন করে।

(৩) আম্লিক পটাস পারম্যাঙ্গানেট উহারা বিরঞ্জিত করে।

(৪) মেটাফিনিলিন-ডাই-অ্যামিনের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ উহারা পিঙ্গল করে।

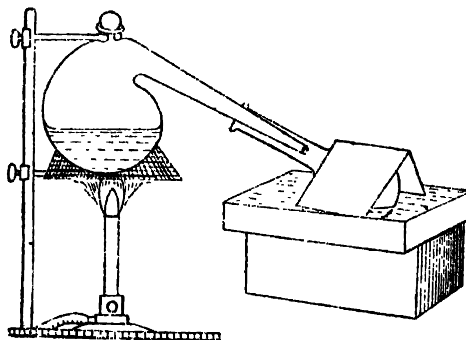
নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3

নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অ্যালকেমী যুগের বিজ্ঞানীরা নাইট্রিক অ্যাসিড "অ্যাকোয়া-ফর্টিস্" (Aqua fortis) অর্থাৎ "শক্তিশালী জল" হিসাবে ব্যবহার করিতেন। জাবের (Geber) ফটকিরি ও হিরাকসের সহিত নাইটার একত্রে পাতিত করিয়া অ্যাকোয়া-ফর্টিস্ প্রস্তুত করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্লবার (Glauber) নাইটার ও সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ল্যাভয়সিয়র কর্তৃক ইহার সংযুতি নির্ধারিত হয়।

১৯-১৯। প্রস্তুতি: ল্যাবরেটরী পদ্ধতি: পটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোডিয়াম নাইট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড সহ পাতিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী করা হয়।



$$KNO_3 + H_2SO_4 = KHSO_4 + HNO_3$$



চিত্র ১৯ট—নাইট্রিক অ্যাসিড

একটি কাচের ছিপিযুক্ত বকযন্ত্রে সমপরিমাণ ওজনের সালফিউরিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণ লওয়া হয়। বকযন্ত্রের শেষপ্রান্ত একটি

গোলকূপীর ভিতর ঢুকাইয়া রাখা হয়। গোলকূপীটি গ্রাহকরূপে ব্যবহৃত হয়। চারিদিকে শীতল জলের প্রবাহ দ্বারা এই গ্রাহকটির উষ্ণতা যথাসম্ভব কম রাখা হয়। অতঃপর বকযন্ত্রটির প্রায় ২০০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম করিলে উপরোক্ত বিক্রিয়াটি আরম্ভ হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড উদ্বায়ী বলিয়া উহা গ্যাসের আকারে বাহির হইয়া আসিয়া গোলকূপীতে ঘনীভূত হয় এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ তরল নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এইভাবেই সাধারণতঃ নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়।

পটাসিয়াম নাইট্রেট উদ্বৃত্ত থাকিলে এবং উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত বাড়াইলে আরও নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া সম্ভব।



$$KNO_3+KHSO_4=K_2SO_4+HNO_3$$ (৮০০° সেন্টি)

কিন্তু এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটি দুইটি কারণে সচরাচর সংঘটিত করানো হয় না। প্রথমতঃ অধিকতর উষ্ণতায় উৎপন্ন নাইট্রিক অ্যাসিডের কতকাংশ বিশ্লেষিত হইয়া যায়।



$$4HNO_3=4NO_2+2H_2O+O_2$$

এবং দ্বিতীয়তঃ পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ($KHSO_4$) গলিত অবস্থায় সহজেই পাত্র হইতে বাহির করা সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী বিক্রিয়াতে যে পটাসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয় তাহা কঠিন হইয়া গেলে সহজে বাহির করিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

পটাসিয়াম নাইট্রেটের পরিবর্তে অন্যান্য নাইট্রেট হইতেও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদাই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ কোন লবণ হইতে অ্যাসিড উৎপন্ন করিতে একটি তীব্রতর অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড একটি তীব্র অম্ল হইলেও নাইট্রিক অ্যাসিড অপেক্ষা উহার তীব্রতা (strength) কম। তথাপি সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়, কারণ উহা অনুদ্বায়ী এবং নাইট্রিক অ্যাসিড খুব সহজেই উদ্বায়ী হইয়া থাকে। এইজন্য উদ্বায়ী কোন অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে হইলেই অনুদ্বায়ী বা অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী কোন তীব্র অ্যাসিড, বিশেষতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড, প্রয়োগ করা হয়।

এইভাবে প্রস্তুত নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু জল মিশ্রিত থাকে এবং নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে। এই কারণে উহার রঙ হলদে হয়। অপেক্ষাকৃত কম চাপে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পুনরায় পাতিত করিয়া শতকরা ৯৮ ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। ৬০°-৭০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই অ্যাসিডের ভিতর বুদ্‌বুদের আকারে বাতাস পরিচালিত করিলে, N_2O_4 দূরীভূত হয় এবং উহা বর্ণহীন হইয়া যায়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড পাইতে হইলে ইহাকে $-৪২°$ ডিগ্রীতে শীতল করিয়া কঠিনাকারে পৃথক করিয়া লইতে হয়।

১৯-২০। শিল্প-পদ্ধতি: বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, বিশেষতঃ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতিতে, নাইট্রিক অ্যাসিডের চাহিদা খুব বেশী। প্রচুর

পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী করার জন্য সাধারণতঃ তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়।

(১) চিলি সল্টপিটার হইতে—"পাতন-প্রণালী",

(২) বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগে "আর্ক-প্রণালী",

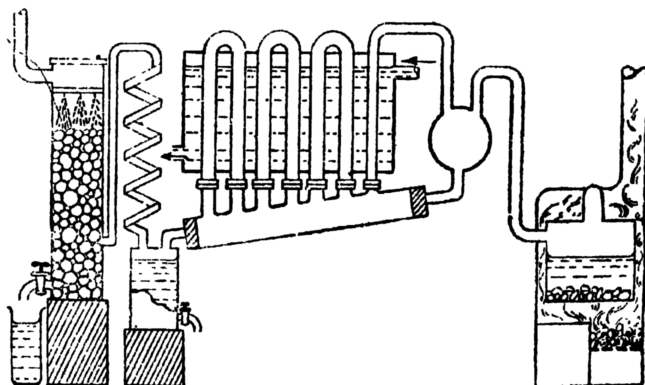
(৩) অ্যামোনিয়ার জারণ হইতে—"ওস্‌ওয়াল্ড-প্রণালী"।

১৯-২১। "পাতন-প্রণালী"—চিলির সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। ইহাকে চিলি সল্টপিটার বা চিলি শোরা বলে। চিলি সল্টপিটার গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পাতিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা হয়। অ্যাসিড ও সল্টপিটারের পরিমাণ এমন অনুপাতে লওয়া হয় যাহাতে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত তুল্যাঙ্ক পরিমাণ সোডিয়াম সালফেট ও অ্যাসিড সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।



$$3NaNO_3+2H_2SO_4=NaHSO_4+Na_2SO_4+3HNO_3$$

একটি বড় লোহার ট্যাঙ্কে প্রায় ৫০ মণ সোডিয়াম নাইট্রেটের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া কয়লার সাহায্যে ২০০-২৫০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। লোহার ট্যাঙ্কটি একটি ছোট



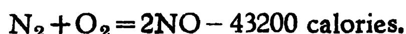
চিত্র ১৯১—পাতন প্রণালীতে HNO_3 প্রস্তুতি

ইষ্টকনির্মিত প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যাহাতে নীচের কয়লার চুল্লী হইতে তপ্ত গ্যাস ট্যাঙ্কের চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে সর্বদিকে সমভাবে

উত্তপ্ত করিতে পারে। ইহার ফলে, নাইট্রিক অ্যাসিড গ্যাস আর ট্যাঙ্কের ভিতর তরলিত হইতে পারে না। নাইট্রিক অ্যাসিড তরল অবস্থায় লোহা আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু গ্যাস অবস্থায় লোহার উপর উহার কোন ক্রিয়া নাই। এই কারণেই ট্যাঙ্কটিকে উত্তপ্ত রাখিয়া নাইট্রিক অ্যাসিডকে ঘনীভূত হইতে দেওয়া হয় না। নাইট্রিক অ্যাসিড গ্যাস উপরের একটি নির্গম-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া কতকগুলি পাথর বা মাটির তৈয়ারী শীতক-নলে প্রবেশ করে। উষ্ণতা কমিয়া যাওয়াতে গ্যাস ঘনীভূত হইয়া তরল নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই সকল শীতক হইতে তরলিত অ্যাসিড নিম্নস্থ পাথরের গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ১৯৫)। সর্বশেষে গ্যাসটি একটি সু-উচ্চ টাওয়ারের নীচে প্রবেশ করে এবং উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই টাওয়ারটি পাথর বা ইষ্টক পূর্ণ থাকে এবং উপর হইতে একটি জলস্রোত নীচের দিকে প্রবাহিত করা হয়। অবশিষ্ট নাইট্রিক অ্যাসিড-বাষ্প জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

এই উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে হইলে চিলির সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং যানবাহনের সমস্যার সমাধান করিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। এই সকল কারণে উপায়টি সহজ হইলেও সর্বদা এবং সর্বদেশে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভারতে এখন পর্যন্ত যেটুকু নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী হয়, তাহা অবশ্য এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে।

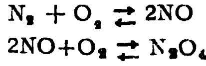
১৯-২২। "আর্ক-প্রণালী"—বাতাসের অফুরন্ত নাইট্রোজেনকে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করার কল্পনা বহুদিনের। বিক্রিয়াটি তাপগ্রাহী বলিয়া অত্যধিক উত্তাপের সাহায্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে নাইট্রিক অক্সাইড কিয়ৎ-পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্কল্যাণ্ড ও আইডের (Birkeland & Eyde) প্রচেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে এই সংযোগ সাধন এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদন সম্ভব হয়।



$$N_2 + O_2 = 2NO - 43200 \text{ calories.}$$

এই প্রণালীতে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩০০০° সেন্টিগ্রেডেরও অধিক উষ্ণতায় একটি বিদ্যুৎ-শিখার ভিতর দিয়া শুষ্ক বায়ুর প্রবাহ পরিচালিত করা হইত। প্রচণ্ড উত্তাপে বায়ুর শতকরা ১·৫ ভাগ অক্সিজেন নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হইত। উহাকে দ্রুত ঠাণ্ডা করিলে উহার সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপন্ন হইত। কয়েকটি পাথর-পূর্ণ টাওয়ারের উপর হইতে

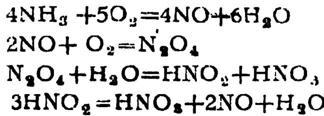
প্রবাহিত জলধারাতে এই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড শোষণ করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী করা হইত।



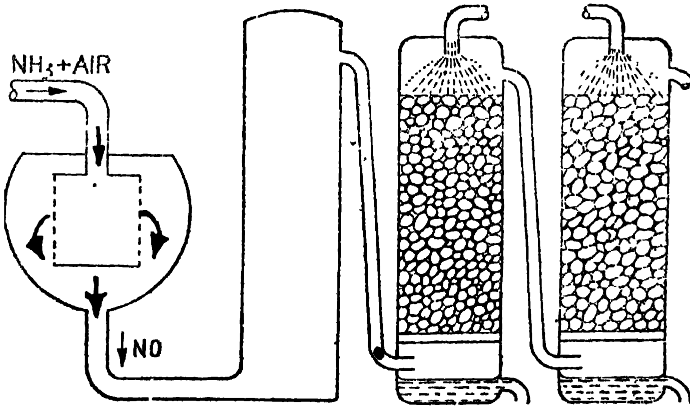
$$N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$$
$$2NO + O_2 \rightleftarrows N_2O_4$$

এই পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য কাঁচামাল, বায়ু এবং জল সর্বত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে সব দেশে জলপ্রপাত হইতে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করার উপায় নাই, সে সব দেশে এই প্রণালী কখনও প্রযোজ্য নয়। নরওয়ে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হইত, কিন্তু উহাতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। পরে অ্যামোনিয়ার জারণ হইতে অনেক সস্তায় ইহা তৈয়ারী সম্ভব হইয়াছে। এই কারণেই এই প্রণালীতে এখন আর কোথাও নাইট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারী হয় না।

১৯-২৩। "ওসওয়াল্ড-প্রণালী"—সহজে ও স্বল্পব্যয়ে হেভার-প্রণালীতে আজকাল অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। বাতাসের দ্বারা এই হেভার অ্যামোনিয়া জারিত করিয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত করা হয়। তাপিত প্লাটিনাম জালি প্রভাবকের সাহায্যে এই বিক্রিয়াটি অতি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে এত দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব যে বর্তমানে অধিকাংশ নাইট্রিক অ্যাসিড এই উপায়েই প্রস্তুত হয়।



$$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$$
$$2NO + O_2 = N_2O_4$$
$$N_2O_4 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$$
$$3HNO_2 = HNO_3 + 2NO + H_2O$$



চিত্র ১৯ড—ওস্ওয়াল্ড-প্রণালীতে HNO_3 প্রস্তুতি

১ : ৮ আয়তন অনুপাতের অ্যামোনিয়া ও বাতাসের একটি মিশ্রণ একটি তপ্ত প্লাটিনাম তারজালির ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়। প্লাটিনামের তারজালিটি একটি গোলাকার বাক্সের আকারে লওয়া হয়। উহার তলদেশ পর্সেলীন প্লেট দ্বারা বন্ধ থাকে (চিত্র ১৯ড)। বাক্সটির ব্যাস ৮" এবং উচ্চতা ১৩" থাকে। গ্যাস-মিশ্রণটি বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিয়া তারজালি অতিক্রম করে। প্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে তারজালিটি ৭০০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। পরে বিক্রিয়ার ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহাতেই প্লাটিনামটি তাপিত অবস্থায় থাকে। অ্যামোনিয়ার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী ইহাতে নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। যে গতিতে গ্যাস-মিশ্রণটিকে তারজালি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তাহার উপর এই বিক্রিয়াটি অনেকাংশে নির্ভর করে। আস্তে আস্তে গ্যাস পরিচালনা করিলে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। নির্গত নাইট্রিক অক্সাইডকে যথারীতি ঠাণ্ডা করিয়া বাতাসের সাহায্যে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করা হয়। জলে এই গ্যাস শোষণ করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা হয়। হেভার-প্রণালী-জাত অ্যামোনিয়ার মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশই নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে ব্যয়িত হয়।

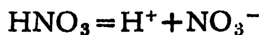
১৯-২৪। নাইট্রিক অ্যাসিডের ধর্ম : (১) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ, ঘনত্ব, ১·৫২। বাতাসে উন্মুক্ত থাকিলে উহা স্বতঃই ধূমায়িত হইতে থাকে। সাধারণ উষ্ণতাতেও নাইট্রিক অ্যাসিড অল্প-পরিমাণে বিযোজিত হইয়া থাকে। $2HNO_3 = N_2O_5 + H_2O$

নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক ৭৮° সেণ্টিগ্রেড, কিন্তু গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ফুটিবার সময় নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড, জল ও অক্সিজেনে বিশ্লেষিত হইয়া যায়। ইহার ফলে অ্যাসিডে জলের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড পাতিত করা সম্ভব নয়। জলের পরিমাণ বাড়িয়া যখন নাইট্রিক অ্যাসিড শতকরা ৬৮ ভাগে দাঁড়ায় তখন উহা ১২০·৫° সেণ্টিগ্রেডে ফুটিতে থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় পাতিত হইতে থাকে।

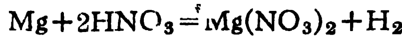
নাইট্রিক অ্যাসিডে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হয়। N_2O_4 দ্রবীভূত অ্যাসিডকে ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড বলা হয় (fuming nitric acid)।

(২) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি তীব্র অম্ল। ইহার হাইড্রোজেন ধাতুদ্বারা

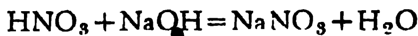
প্রতিস্থাপিত হয় এবং ক্ষারকের সহিত ক্রিয়ার ফলে ইহা লবণ ও জল উৎপাদন করে :—



$$HNO_3 = H^+ + NO_3^-$$

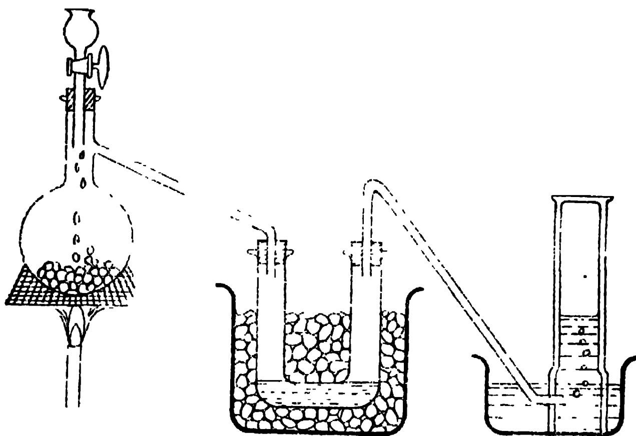


$$Mg + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2$$



$$HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$$

নাইট্রিক অ্যাসিড হইতে উদ্ভূত লবণকে নাইট্রেট বলা হয়। ধাতু বা ক্ষারক বস্তুর নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে নাইট্রেট প্রস্তুত করা যায়। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড, যদি উত্তপ্ত ঝামা পাথরের উপর ফোঁটা ফোঁটা ফেলা যায় তাহা হইলে উহা বিশ্লেষিত হইয়া নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড, অক্সিজেন



চিত্র ১৯চ—নাইট্রিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ

ও জলে পরিণত হয় (চিত্র ১৯চ)। হিমমিশ্র-আবৃত একটি U-নলের ভিতর দিয়া উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রণটি প্রবাহিত করিয়া N_2O_4 এবং জল তরলিত করিয়া লইলে অক্সিজেন জলপূর্ণ গ্যাসজারে যথারীতি সংগ্রহ করা যায়।

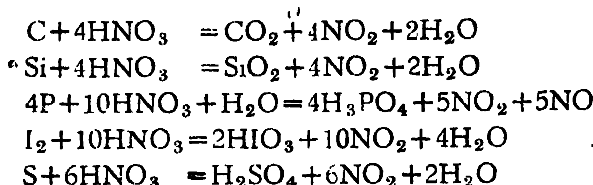


$$4HNO_3 = 2N_2O_4 + 2H_2O + O_2$$

(৩) নাইট্রিক অ্যাসিডের জারণ-শক্তি সমধিক।

(ক) অধিকাংশ অধাতব মৌল গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত ফুটাইলে উহারা জারিত হইয়া অক্সাইড বা অক্সি-অ্যাসিডে পরিণত হয়। যথা :— কার্বন ও সিলিকন হইতে যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সিলিকা পাওয়া

যায়। ফসফরাস, আয়োডিন, সালফার হইতে সেইরূপ ফসফরিক, আয়োডিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই সকল বিক্রিয়াতে নাইট্রিক অ্যাসিড বিজারিত হইয়া সর্বদাই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত হয়। Cl_2, Br_2, N_2 ও O_2-এর উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই।

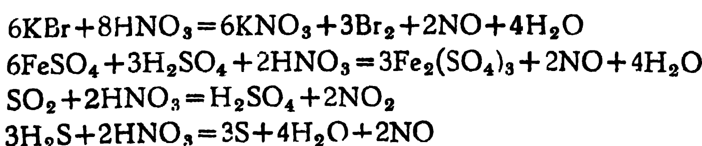


$$C+4HNO_3 = CO_2+4NO_2+2H_2O$$
$$Si+4HNO_3 = SiO_2+4NO_2+2H_2O$$
$$4P+10HNO_3+H_2O = 4H_3PO_4+5NO_2+5NO$$
$$I_2+10HNO_3 = 2HIO_3+10NO_2+4H_2O$$
$$S+6HNO_3 = H_2SO_4+6NO_2+2H_2O$$

পরীক্ষা ঃ একটি জারে অল্প পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিডের ভিতর একটি জ্বলন্ত কার্বনের টুকরা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে উহা আরও তীব্রভাবে জ্বলিতেছে।

পরীক্ষা ঃ একটি বেসিনে কিছু কাঠের গুঁড়া লইয়া বালিখোলাতে বেশ উত্তপ্ত করিতে হইবে। যখন উহা বেশ তপ্ত হইয়া উঠিবে, উহার উপর কয়েক ফোঁটা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড দিলেই উহা স্ফুলিঙ্গ সহকারে জ্বলিয়া উঠিবে।

(খ) মৌল ছাড়াও অনেক যৌগিক পদার্থও নাইট্রিক অ্যাসিডে জারিত হইয়া থাকে। যথা:—আয়োডাইড ও ব্রোমাইড যৌগসমূহ হইতে আয়োডিন ও ব্রোমিন নির্গত হয়; সালফার ডাই-অক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডে এবং ফেরাস সালফেট ফেরিক সালফেটে পরিণত হয়।

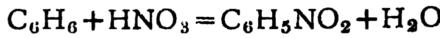


$$6KBr+8HNO_3 = 6KNO_3+3Br_2+2NO+4H_2O$$
$$6FeSO_4+3H_2SO_4+2HNO_3 = 3Fe_2(SO_4)_3+2NO+4H_2O$$
$$SO_2+2HNO_3 = H_2SO_4+2NO_2$$
$$3H_2S+2HNO_3 = 3S+4H_2O+2NO$$

(গ) গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড উহাদের তুল্যাঙ্কের ৩ : ১ অনুপাতে মিশ্রিত করিলে উহাকে অম্লরাজ বা aqua regia বলে। উহাতে গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুও দ্রাব্য। বস্তুতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই মিশ্রণে নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা জারিত হইয়া ক্লোরিন উৎপন্ন করে:—$3HCl+HNO_3 = Cl_2+NOCl+2H_2O$

(ঘ) অনেক জৈবজাতীয় যৌগকেও নাইট্রিক অ্যাসিড জারিত করে। তার্পিন তৈল, কোহল প্রভৃতি পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে জ্বলিয়া ওঠে এবং জারিত হইয়া যায়। কোন কোন জৈব-পদার্থের সহিত নাইট্রিক

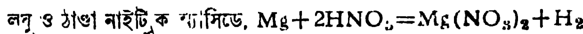
অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রো-যৌগ উৎপন্ন হয়। যেমন বেনজিনের সহিত নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রো-বেনজিন পাওয়া যায়।



$$C_6H_6 + HNO_3 = C_6H_5NO_2 + H_2O$$

(৫) বিভিন্ন ধাতুর উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুর উপর অবশ্য নাইট্রিক অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল ধাতুর সহিতই নাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা ধাতব নাইট্রেটে পরিণত হয়। দুই-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া, নাইট্রিক অ্যাসিড ও ধাতুর ক্রিয়ার ফলে প্রায়ই নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইড বা অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জাতীয় বিক্রিয়া হইতে কি কি উৎপন্ন হইবে তাহা নাইট্রিক অ্যাসিডের গাঢ়ত্ব, উষ্ণতা এবং ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। নিম্নে কয়েকটি ধাতুর সহিত নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হইল :—

(ক) ম্যাগনেসিয়ামের সহিত,



লঘু ও ঠাণ্ডা নাইট্রিক অ্যাসিডে, $Mg + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2$

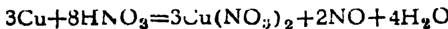
(খ) কপারের সহিত,

(i) গাঢ় ও উষ্ণ অ্যাসিডে,



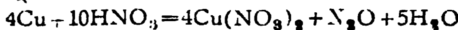
$$Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$$

(ii) নাতিগাঢ় ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



$$3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

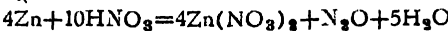
(iii) লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



$$4Cu + 10HNO_3 = 4Cu(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$$

(গ) জিঙ্কের সহিত,

(i) লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



$$4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$$

(ii) নাতিগাঢ় ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



$$4Zn + 10HNO_3 = 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$$

(iii) গাঢ় ও উষ্ণ অ্যাসিডে,



$$Zn + 4HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$$

(ঘ) মারকারির সহিত,

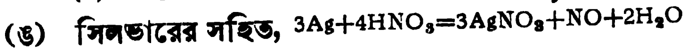
(i) লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



$$6Hg + 8HNO_3 = 3Hg_2(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

কিন্তু, অ্যাসিডের পরিমাণ ও গাঢ়ত্ব বেশী হইলে, মারকিউরাস নাইট্রেটের পরিবর্তে মারকিউরিক নাইট্রেট হয় :—


(ii) $3Hg+8HNO_3=3Hg(NO_3)_2+2NO+4H_2O$


(ঙ) সিলভারের সহিত, $3Ag+4HNO_3=3AgNO_3+NO+2H_2O$

(চ) আয়রনের সহিত,

(i) লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,


$4Fe+10HNO_3=4Fe(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$

(ii) গাঢ় ও উষ্ণ অ্যাসিডে,


$Fe+6HNO_3=Fe(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O$

(iii) অত্যন্ত গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডে একটি বিশুদ্ধ লৌহখণ্ড দিলে উহা দ্রবীভূত না হইয়া 'নিষ্ক্রিয় লৌহে' পরিণত হইয়া যায়। সাময়িকভাবে সেই লৌহের রাসায়নিক গুণ লোপ পায়।

(ছ) টিনের সহিত,

(i) গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা টিন β-স্ট্যানিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়া যায় :—

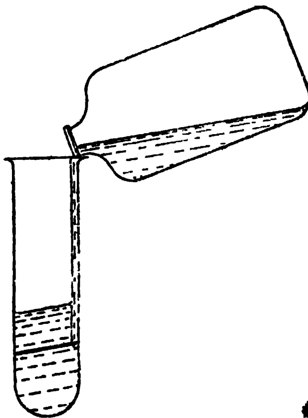

$5Sn+20HNO_3=(H_2SnO_3)_5+20NO_2+5H_2O$

(ii) লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,

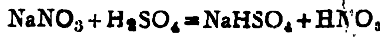
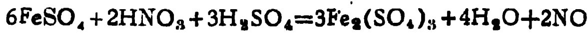
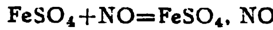

$4Sn+10HNO_3=4Sn(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$

১৯-২৫। নাইট্রিক অ্যাসিডের পরীক্ষা : নিম্নোক্ত পরীক্ষার দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড বা নাইট্রেটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(১) পদার্থটিকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও কপারের ছিলা সহ উত্তপ্ত করিলে পিঙ্গল বা লাল গ্যাস (NO_2) বাহির হইবে।


চিত্র ১৯৭—HNO_3-এর বলয়-পরীক্ষা

(২) পদার্থটির লঘু দ্রবণের সহিত ফেরাস-সালফেট দ্রবণ মিশাইয়া একটি টেস্ট-টিউবে লইতে হইবে। তারপর আস্তে আস্তে টেস্ট-টিউবের গা বাহিয়া কিছু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিতে হইবে। সালফিউরিক অ্যাসিড ভারী বলিয়া উহা দ্রবণের নীচে জমিবে। অ্যাসিড ও পূর্বোক্ত দ্রবণের সংযোগ-স্থলে একটি খয়েরী বা বাদামী রংয়ের বলয় বা চক্র হইতে দেখা যাইবে। ইহাতে নাইট্রেটের অস্তিত্ব বুঝা যায়, কারণ, নাইট্রেট ও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নাইট্রিক অ্যাসিড হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড ও ফেরাস সালফেট হইতে NO উৎপন্ন হয়। এই NO ফেরাস সালফেটের সহিত মিলিয়া $FeSO_4$, NO যৌগ উৎপন্ন করে।


$$NaNO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HNO_3$$

$$6FeSO_4 + 2HNO_3 + 3H_2SO_4 = 3Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O + 2NO$$

$$FeSO_4 + NO = FeSO_4 . NO$$

[খয়েরী]

ইহাকে নাইট্রেটের বলয়-পরীক্ষা (Ring test) বলে (চিত্র ১৯৭) ।

(৩) কয়েক ফোঁটা নাইট্রেট লবণ ও কিছু গাঢ় H_2SO_4 একটি বেসিনে লইয়া উহাতে অতি সামান্য ব্রুসিন (Brucine) দিলে মিশ্রণটি তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে।

১৯-২৬। নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার :

(১) ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষায় বিক্রিয়ক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। (২) নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রধান চাহিদা—নাইট্রোগ্লিসারিন, পিকরিক-অ্যাসিড, টি-এন-টি প্রভৃতি বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে। (৩) কৃত্রিম রঙ, কৃত্রিম সিল্ক, সেলুলয়েড প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেও নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। (৪) কোন কোন বৈদ্যুতিক ব্যাটারী বা সেলেও নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।

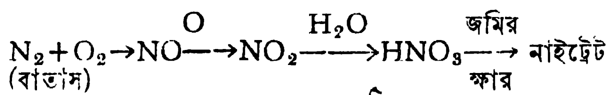
১৯-২৭। নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বিবর্তন-চক্র :

নাইট্রোজেন মৌল বাতাসে প্রচুর পরিমাণে আছে। আবার জীবজগতে প্রাণী-দেহে ও উদ্ভিদ-দেহেও প্রোটিন হিসাবে নাইট্রোজেন-যৌগ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রোটিন ব্যতীত প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধি মোটেই সম্ভব নয়। প্রোটিনের জন্যও প্রাণী ও উদ্ভিদের নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন। কিন্তু নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। সুতরাং বাতাসের এই নাইট্রোজেন সরাসরি কাজে লাগান বা জীবদেহে উহার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব হয় না।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে বাতাসের নাইট্রোজেন অন্যান্য উপায়ে জীবজগতের পক্ষে সহজলভ্য হইয়া থাকে।

(১) আকাশের মেঘে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে নাইট্রিক অক্সাইডের সৃষ্টি হয় এবং পরে উহা নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া উহা মাটিতে আসে এবং সেখানে উহা প্রশমিত হইয়া বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের সৃষ্টি করে। এই নাইট্রেট উদ্ভিদ্ গ্রহণ করে এবং প্রোটিনে রূপান্তরিত করে।

আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় ছয় লক্ষ মণ নাইট্রোজেন এই ভাবে বায়ু হইতে অপসারিত হয়।



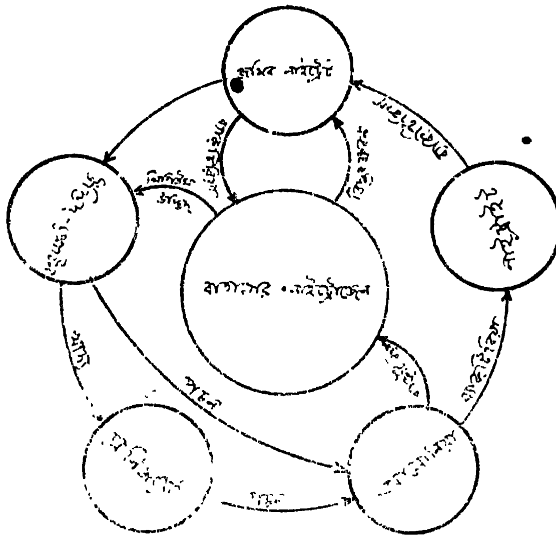
(২) লিগুইমিনাস্ জাতীয় গাছের শিকড়ের উপর একপ্রকার অঙ্কুর জন্মে, উহাকে নডিউল (nodule) বলে। এই নডিউলে অবস্থিত একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া সোজাসুজি বাতাসের নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করিয়া উদ্ভিদ-খাদ্যের উপযোগী করিয়া থাকে।

এই দুইটি উপায়ে উদ্ভিদ্ উহার প্রোটিন সংগ্রহ করে। জন্তুরা সর্বদাই উদ্ভিদ্ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রোটিন সঞ্চয় করে। জন্তুদের ভিতর যাহারা মাংসাশী উহারা আবার অপর জন্তুর মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি হইতেও নিজেদের প্রোটিন পায়। মানুষ উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য হইতে তাহার প্রোটিন তৈয়ারী করে।

এইভাবে সমস্ত জীবজগতে বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হইলেও মোটামুটি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে। তাহার কারণ, কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াও প্রকৃতিতে সদাসর্বদা ঘটিতেছে এবং উহার ফলে নাইট্রোজেন যৌগের উৎপাদন হইতেছে।

উদ্ভিদ্ বা জীবজন্তু ধ্বংসের পর উহার পচন সুরু হয়। ইহাতে উহাদের প্রোটিনসমূহ অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। জমিতে এই সকল পদার্থ বিভিন্নপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রেটের কতকাংশ উদ্ভিদ্ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু অপরাংশ আবার একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হইয়া বাতাসে ফিরিয়া যায়। এইভাবে নাইট্রোজেন বায়ু হইতে অপসারিত হইয়া জীবজগতে প্রবেশ করে, আবার জীবজগতের ধ্বংস ও পচনের ফলে উহা বায়ুতে ফিরিয়া আসে। ইহাকেই নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বিবর্তন-চক্র বলা হয়। প্রকৃতিতে এই বিপরীত পরিবর্তনগুলির ভিতর এমন একটি সঙ্গতি সর্বদা বর্তমান থাকে যে বায়ুতে নাইট্রোজেনের

অনুপাতটির কোন ব্যতিক্রম হয় না। নাইট্রোজেনের এই পরিক্রম-চক্রটিকে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রকাশ করিতে পারি :—



নাইট্রোজেন বিবর্তন-চক্র

১৯-২৮। নাইট্রোজেনের বন্ধন (Fixation of Nitrogen)—বর্তমান যুগে কিন্তু মানুষের নাইট্রোজেন-যৌগের প্রয়োজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার কয়েকটি কারণ আছে :—(১ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন বেশী হইয়াছে। অতএব জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়ান দরকার। এইজন্য বহু কৃত্রিম সারের প্রয়োজন। সুতরাং অ্যামোনিয়াম লবণের বিস্তর চাহিদা। (২) বর্তমান যুগের জীবনযাত্রার বহু উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রয়োজন। (৩) বর্তমান সমরোপকরণের একটি প্রধান প্রয়োজন বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অধিকাংশ বিস্ফোরকই নাইট্রিক অ্যাসিড হইতে তৈয়ারী।

এই সকল প্রয়োজনে মানুষকে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রকৃতির দানে ইহার সঙ্কুলান হয় না এবং উহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের পক্ষে সহজলভ্য নয়। অতএব বাতাসের অফুরন্ত নাইট্রোজেনের কিয়দংশ যৌগে পরিণত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই

শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা চারিটি উপায়ে বায়ুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছেন। ইহাকেই নাইট্রোজেন-বন্ধন বলা হয়।

(ক) বার্কল্যাণ্ড ও আইড প্রণালীতে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন ও উহাকে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করা সম্ভব। অতিরিক্ত ব্যয় ও প্রভূত বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় বলিয়া উহা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। (পৃঃ ২৫৬)

(খ) সারপেক প্রণালীতে বক্সাইট খনিজ (Al_2O_3) ও কোক নাইট্রোজেনের পরিবেশে ১৮০০° সেণ্টি. উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইডে পরিণত করা হয়। উহাকে পরে স্টীমের সাহায্যে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করিলে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই পদ্ধতির আর প্রচলন নাই :


$$Al_2O_3 + N_2 + 3C = 2AlN + 2CO$$


$$2AlN + 3H_2O = Al_2O_3 + 2NH_3$$

(গ) হেভার প্রণালীতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ এই প্রণালীতেই প্রায় সমগ্র নাইট্রোজেন-বন্ধন সম্পন্ন হইতেছে। (পৃঃ ২৩৮)

(ঘ) সায়নামাইড প্রণালীতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাইট্রোজেনে উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোলাইম পাওয়া যায়। উহার আর্দ্র-বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। এই উপায়েও কিছু নাইট্রোজেন-বন্ধন করা হয়। (পৃঃ ২৩৭)

বিংশ অধ্যায়

হ্যালোজেন গোষ্ঠী

সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্লবার (Glauber) সমুদ্রজাত লবণ [সোডিয়াম ক্লোরাইড] ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ পাতিত করিয়া একটি গ্যাস প্রস্তুত করেন। উহাকে তখন "লবণের স্পিরিট বা গ্যাস" বলা হইত। ১৭৭২ সালে প্রিস্টলী লক্ষ্য করেন যে এই গ্যাসটি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং উহার জলীয় দ্রবণ অম্লাত্মক। ইহার নামকরণ করা হয়, "মিউরিয়াটিক অ্যাসিড"। অম্লত্ব হেতু ল্যাভয়সিয়র গ্যাসটিকে কোন অধাতব অক্সাইড মনে করিতেন। শীলে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত এই মিউরিয়াটিক

অ্যাসিড উত্তপ্ত করিয়া একটি হরিতাভ গ্যাস পান। মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের জারিত পদার্থ মনে করিয়া ইহার নামকরণ হয় অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড। বস্তুতঃ ইহাই ক্লোরিন। ডেভি (Davy) এই গ্যাসটির সম্যক পরীক্ষা করেন এবং দেখেন উহাতে অক্সিজেন নাই। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, এই তথাকথিত অক্সি-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড একটি মৌলিক পদার্থ। গ্রীক্ chloros শব্দের অর্থ হরিতাভ। এইজন্য তিনি এই গ্যাসীয় মৌলের নাম দেন—ক্লোরিন। মিউরিয়াটিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের যৌগ, সেইজন্য উহাকে বলা হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

ক্লোরিন সমুদ্রের লবণ হইতে প্রথম পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় hals অর্থে সামুদ্রিক লবণ বুঝায়, এবং যাহার দ্বারা সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে হ্যালোজেন (halogen) বলা যাইতে পারে। অতএব ক্লোরিন একটি হ্যালোজেন। পরে আরও তিনটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়,—ফ্লুরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন। ইহাদের ধর্ম ও প্রকৃতি ক্লোরিনের অনুরূপ। ইহাদের সোডিয়াম যৌগগুলিও সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ সামুদ্রিক লবণের মত ব্যবহার করে। তদুপরি ব্রোমাইড ও আয়োডাইড লবণগুলি সমুদ্রেই পাওয়া যায়। সুতরাং অনুরূপধর্মী এই চারিটি মৌলকে একই পরিবারভুক্ত মনে করা যাইতে পারে এবং ইহারা হ্যালোজেন নামে অভিহিত হয়। হ্যালোজেন হইতে উৎপন্ন দ্বিযৌগিক পদার্থগুলিকে হ্যালাইড বলা হয়।

ফ্লুরিন

চিহ্ন, F ; পারমাণবিক গুরুত্ব=১৯·০০ ; ক্রমাঙ্ক=৯।

২০-১। **ফ্লুরিন**—ফ্লুরিন সর্বাধিক সক্রিয় মৌল এবং প্রায় সমস্ত পদার্থের সহিত ক্রিয়াশীল বলিয়া উহাকে মৌল অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। বিভিন্ন যৌগরূপে ফ্লুরিন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটি খনিজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। ফ্লুয়োরস্পার (Fluorspar), CaF_2

২। ফ্লুয়োর-অ্যাপেটাইট (Fluor-Apatite), $CaF_2, 3Ca_3(PO_4)_2$

৩। ক্রায়োলাইট (Cryolite), Na_3AlF_6

কোন কোন গাছে এবং জন্তুর দাঁতে ও হাড়ে স্বল্প পরিমাণ ফ্লোরাইড থাকে।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে শীলে প্রথমে ফ্লুয়োরস্পার ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফুটাইয়া হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। ডেভিই প্রমাণ করেন যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মত হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ও একটি অজ্ঞাত মৌল ফ্লুরিনের যৌগিক পদার্থ। কিন্তু ডেভি উহা হইতে ফ্লুরিন মৌলটি পৃথক করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী বিজ্ঞানীদের ফ্লুরিন আবিষ্কার করার সমস্ত চেষ্টাই বিফলতায় পর্যবসিত হয়। তাহার কারণ, ফ্লুরিন এত সক্রিয় যে উহা উৎপন্ন হইলেও জল বা যে পাত্রে উহা উৎপন্ন হয় তাহারই সহিত বিক্রিয়া করিয়া যৌগে পরিণত হয়। বিদ্যুৎবিশ্লেষণের দ্বারা যৌগ হইতে মৌল প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেও হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড হইতে ফ্লুরিন পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। আর অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড আদৌ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়, উপরন্তু উহা অত্যন্ত উদ্বায়ী এবং বিষাক্ত।

গোর (Gore) প্রথমে দেখান যে অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে পটাসিয়াম হাইড্রোজেন-ফ্লোরাইড (KHF_2) দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবণটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী। প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতুর পাত্রে উক্ত দ্রবণকে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষিত করিয়া ময়সাঁ (Moissan) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ফ্লুরিন আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

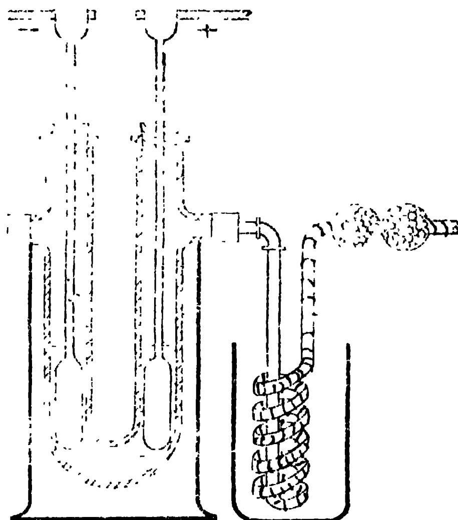
২০-২। ময়সাঁর পরীক্ষা ঃ ময়সাঁর ফ্লুরিন প্রস্তুতির পরীক্ষাটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতুর একটি U-নলে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। U-নলটির দুইটি মুখ ফ্লুয়োরস্পার নির্মিত কর্ক দ্বারা বন্ধ করা হয়। এই কর্কের ভিতর দিয়া সেই একই সঙ্কর-ধাতুর দুইটি তড়িদ্দ্বার প্রবেশ করান হয়। তড়িদ্দ্বার দুইটি নীচের দিকে অনেকটা চ্যাপ্টা করা ছিল। কর্ক-দুইটির চারিদিকে উত্তমরূপে গালাদ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে কোনরূপ ছিদ্র না থাকে। উৎপন্ন গ্যাস বাহির হওয়ার জন্য U-নলের দুই পাশে দুইটি সরু নির্গম-নল ছিল। একটি বড় পাত্রে এই U-নলটি তরল মিথাইল-ক্লোরাইডে (স্ফুটনাঙ্ক $= -২৩^\circ$) নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয় (চিত্র ২০ক)।

পটাসিয়াম হাইড্রোজেন-ফ্লোরাইড অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিয়া U-নলে লওয়া হয়। তড়িদ্দ্বার দুইটি ব্যাটারীর সহিত সংযোগ করিয়া দিলেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ সুরু হয় এবং পরা-প্রান্তে (অ্যানোডে) ফ্লুরিন পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ তরল মিথাইল ক্লোরাইডে U-নলটি নিমজ্জিত রাখিয়া উহাকে খুব শীতল রাখা হয়; নতুবা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড উবিয়া যাইবে।



$$2KHF_2 = 2KF + H_2 + F_2$$

U-নলের যে বাহুতে অ্যানোড থাকিবে তাহার পার্শ্বস্থিত নল দিয়া ফ্লুরিন বাহির হইয়া আসে। এই ফ্লুরিনের সহিত হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড অবশ্যই মিশ্রিত থাকে। অতঃপর ইহা একটি প্লাটিনাম নির্মিত সর্পিল শীতকনলে প্রবেশ করে। এই নলটিও মিথাইল-ক্লোরাইডে রাখা হয়। ইহাতে অধিকাংশ



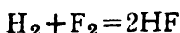
চিত্র ২০ক—ফ্লুরিন প্রস্তুতি

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড তরলিত হইয়া যায়। তৎপর গ্যাসটি শুষ্ক সোডিয়াম ফ্লোরাইড-পূর্ণ দুইটি প্লাটিনাম-বালবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। ফলে, গ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ ফ্লুরিন গ্যাস পাওয়া যায়। বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা উহাকে প্লাটিনাম পাত্রে সংগৃহীত করা হয়।

২০-৩। **ফ্লুরিনের ধর্ম ঃ** ফ্লুরিন একটি তীব্রগন্ধযুক্ত ঈষৎ-পীত বর্ণের গ্যাস। গ্যাসটি বিষাক্ত এবং বায়ু অপেক্ষা ভারী।

ফ্লুরিনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সকলের চেয়ে বেশী। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত সমস্ত মৌলের সহিত ইহা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়।

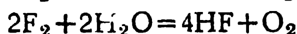
হাইড্রোজেনের সহিত ইহা সাধারণ উষ্ণতায় এবং আলোর অভাবেও বিস্ফোরণপূর্বক মিলিত হয়। এমন কি, ইহার হাইড্রোজেন-আসক্তি এত বেশী যে অপর কোন হাইড্রোজেন-যৌগ হইতে ইহা হাইড্রোজেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে :—



$H_2+F_2=2HF$



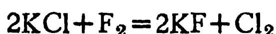
$F_2+2HCl=2HF+Cl_2$



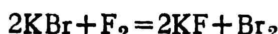
$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$

অধিকাংশ ধাতুই ইহার সংস্পর্শে ফ্লোরাইডে পরিণত হয়। গোল্ড, প্লাটিনাম ও কপারের ক্ষেত্রে একটু বেশী উষ্ণতা প্রয়োজন হয়। ফসফরাস, সালফার, আয়োডিন, ব্রোমিন, কার্বন, সিলিকন, অ্যান্টিমনি, পটাসিয়াম প্রভৃতি ফ্লুরিন-গ্যাসে জ্বলিয়া উঠে ও স্ব স্ব ফ্লোরাইডে পরিণত হয়।

ফ্লুরিন অন্যান্য হ্যালাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হ্যালোজেন উৎপন্ন করে ও ফ্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায় :—



$2KCl+F_2=2KF+Cl_2$



$2KBr+F_2=2KF+Br_2$

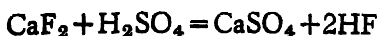
প্রায় সমস্ত জৈব পদার্থই ফ্লুরিনে আক্রান্ত হয় এবং কার্বন টেট্রাফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ইত্যাদি যৌগ গঠিত হয়। কোহল, তার্পিন তেল প্রভৃতি ফ্লুরিনের সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

ফ্লুরিন গ্যাস ও কষ্টিক সোডার দ্রবণের বিক্রিয়াতে ফ্লুরিন অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় :—$2F_2+2NaOH=F_2O+H_2O+2NaF$

২০-৪। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড HF : হাইড্রোজেন ও ফ্লুরিনের যৌগকে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড বলে। ইহা একটি অম্ল-জাতীয় পদার্থ। ইহার জলীয় দ্রবণ হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড নামে অভিহিত হয়।

প্রস্তুতি : মৌল উপাদান দুইটির প্রত্যক্ষ সংযোগেই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড পাওয়া যাইতে পারে। $H_2+F_2=2HF$

কিন্তু সচরাচর সীসার বকযন্ত্রে ফ্লুয়োরস্পারের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড পাতিত করিয়া হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তৈয়ারী করা হয়।

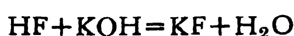
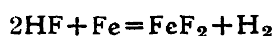


$$CaF_2+H_2SO_4=CaSO_4+2HF$$

পাতিত গ্যাসটি জলে দ্রবীভূত করিলে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। উহা মোম বা গ্যাটাপার্চার বোতলে রাখা হয়। কাচের বোতল ব্যবহার করা যায় না, কারণ ইহার সহিত কাচের বিক্রিয়া হয়।

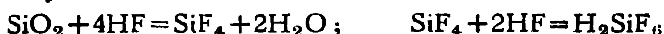
প্লাটিনামের পাত্রে শুষ্ক পটাসিয়াম-হাইড্রোজেন-ফ্লোরাইড উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া যায় এবং হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসটিকে প্লাটিনাম নীতকে ঠাণ্ডা করিয়া তরল করা হয় এবং একটি প্লাটিনামের পাত্রে রাখা হয়। এইভাবে বিশুদ্ধ অনার্দ্র হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড প্রস্তুত করা যায়। $KHF_2 = KF + HF$

২০-৫। হাইড্রোজেন-ফ্লোরাইডের ধর্মঃ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহা জলে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড একটি মৃদু অম্ল। গোল্ড, সিলভার, প্লাটিনাম, মারকারি ও লেড ব্যতীত প্রায় সমস্ত ধাতুই হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

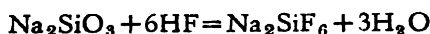

$$HF + KOH = KF + H_2O \qquad 2HF + Fe = FeF_2 + H_2$$
$$2HF + Zn = ZnF_2 + H_2$$

সিলিকার (বালু) সহিত বিক্রিয়া হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের বিশেষ ধর্ম। সিলিকা সিলিকন-টেট্রাফ্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায়, কিন্তু অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকিলে উহা হাইড্রোফ্লুয়ো-সিলিসিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।



$$SiO_2 + 4HF = SiF_4 + 2H_2O\,; \qquad SiF_4 + 2HF = H_2SiF_6$$

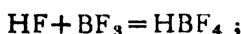
কাচের ভিতর সিলিকা এবং অন্যান্য সিলিকেট লবণ আছে। হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে উহারা আক্রান্ত হইয়া ফ্লুয়োসিলিকেটে রূপান্তরিত হয়। এইজন্যই হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড কাচের পাত্রে রাখা হয় না।



$$Na_2SiO_3 + 6HF = Na_2SiF_6 + 3H_2O$$

এই ক্রিয়ার সাহায্যে কাচের উপর দাগ কাটা বা অঙ্কন সম্ভব। কাচের উপরিভাগ পরিষ্কার করিয়া একটি মোমের আবরণ দেওয়া হয়। অতঃপর মোমের উপর একটি সরু কলম দ্বারা প্রয়োজনীয় লেখা বা অঙ্কন খোদাই করা হয়। ইহার উপর হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অঙ্কিত স্থানে অ্যাসিড কাচের সংস্পর্শে আসে ও উহাকে আক্রমণ করে, অন্যান্য স্থান মোমে আবৃত থাকে বলিয়া অক্ষত থাকে। মোমের উপর অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই। যখন খানিকটা কাচ দ্রবীভূত হইয়া যায়, অ্যাসিড ধুইয়া ফেলা হয় এবং মোম তুলিয়া ফেলা হয়। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড গ্যাস দ্বারাও কাচের উপর দাগ কাটা সম্ভব। কিন্তু উহাতে অঙ্কনগুলি অনচ্ছ হইয়া থাকে।

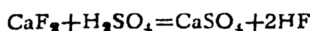
হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড বিভিন্ন অধাতব ফ্লোরাইডের সহিত যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে।

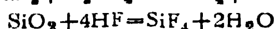

$HF + BF_3 = HBF_4$;

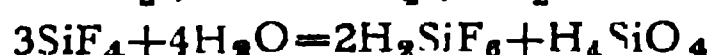

$2HF + SiF_4 = H_2SiF_6$

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড একটি তীব্র বিষ। উহা শরীরের উপর পড়িলে যন্ত্রণাদায়ক ঘা হয়। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বাক্‌শক্তি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২০-৬। হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা : কোন ফ্লোরাইডের পরীক্ষা করিতে হইলে উহা একটি কাচের টেস্ট-টিউবে সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করা হয়। টেস্ট-টিউবের মুখে একটি কাচ-দণ্ডে এক ফোঁটা জল ধরিলে উহা প্রথমে ঘোলা হইয়া পরে শক্ত হইয়া যাইবে। যেমন :


$$CaF_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2HF$$


$$SiO_2 + 4HF = SiF_4 + 2H_2O$$


$$3SiF_4 + 4H_2O = 2H_2SiF_6 + H_4SiO_4$$

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড টেস্ট-টিউবের কাচের সহিত ক্রিয়ার ফলে SiF_4 উৎপন্ন করে। ইহা গ্যাস অবস্থায় বাহিরের জলের সংস্পর্শে আসিলেই H_4SiO_4-এর উৎপত্তি হয়। H_4SiO_4 জলে জমিয়া কঠিন হয়।

ব্যবহার : (ক) কাচের উপর লেখার জন্য ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয়। (খ) কোহল-শিল্পে বীজবারক হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে। (গ) সোডিয়াম ও জিঙ্ক ফ্লোরাইড কাষ্ঠশিল্পে প্রয়োজন।

ক্লোরিন

চিহ্ন, Cl ; পারমাণবিক গুরুত্ব = ৩৫.৫ ; ক্রমাঙ্ক = ১৭

মৌলাবস্থায় ক্লোরিন প্রকৃতিতে থাকে না। উহার প্রকৃতিলব্ধ যৌগগুলির মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের জলে ও লবণের খনিতে যথেষ্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। জার্মানীর স্টাস্‌ফার্ট স্তূপে পটাসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

২০-৭। প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জারিত করিয়া ক্লোরিন তৈয়ারী করা হয়।


$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$

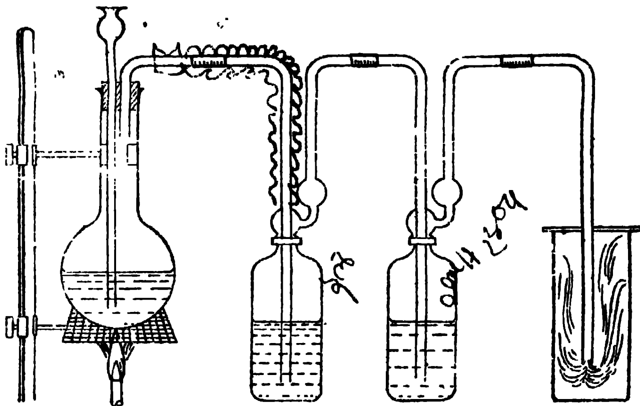
একটি কূপীতে কিছু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড [বা পাইরোলুসাইট খনিজ (MnO_2)] এবং গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লওয়া হয়। কূপীটি একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ থাকে। এই কর্কের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গম-নল লাগান থাকে। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের প্রান্তটি অ্যাসিডে ডুবান থাকে। কূপীটিকে অতঃপর তারজালির উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে তাপিত করা হয়। ইহাতে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই-ক্লোরাইডে পরিণত হয়, পরে উত্তাপে উহা ভাঙিয়া ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইডে রূপান্তরিত হয়।



$$2MnO_2+8HCl=2MnCl_3+Cl_2+4H_2O$$



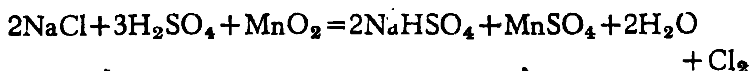
$$2MnCl_3=2MnCl_2+Cl_2$$



চিত্র ২০খ—ল্যাবরেটরীতে ক্লোরিন-প্রস্তুতি

উৎপন্ন ক্লোরিন একটি গ্যাস। উহা নির্গম-নল দিয়া বাহির হইতে থাকে। উহার সহিত কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। নির্গত গ্যাসটিকে অতঃপর জল এবং H_2SO_4 পূর্ণ দুইটি গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। ইহাতে উহার HCl এবং জলীয় বাষ্প দূরীভূত হয়। ইহার পর ক্লোরিন বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাস-জার বা অন্য কোন পাত্রে সংগৃহীত করা হয় (চিত্র ২০খ)।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করিলেও ক্লোরিন পাওয়া যাইবে। কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড NaCl হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং উহা MnO_2 দ্বারা জারিত হয়—

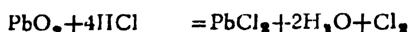


$$2NaCl+3H_2SO_4+MnO_2=2NaHSO_4+MnSO_4+2H_2O+Cl_2$$

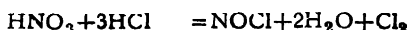
এই পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বারা জারিত হইয়াছে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন বিচ্যুত করিয়া এই জারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য জারক-দ্রব্যের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করিলেও অনুরূপ জারণ-দ্বারা ক্লোরিন পাওয়া যায়। পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট, লেড ডাই-অক্সাইড নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি এইজন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে :—



$$K_2Cr_2O_7+14HCl=2KCl+2CrCl_3+7H_2O+3Cl_2$$



$$PbO_2+4HCl=PbCl_2+2H_2O+Cl_2$$

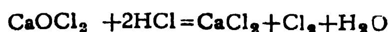


$$HNO_3+3HCl=NOCl+2H_2O+Cl_2$$

স্বাভাবিক উষ্ণতায় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (কঠিন অবস্থায়), ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে জারিত করে—



$$2KMnO_4+16HCl=2KCl+2MnCl_2+8H_2O+5Cl_2$$

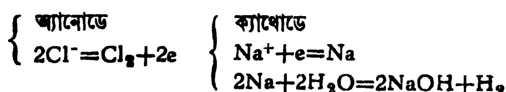


$$CaOCl_2+2HCl=CaCl_2+Cl_2+H_2O$$

(২) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য ধাতব ক্লোরাইডের দ্রবণের বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ দ্বারাও ক্লোরিন পাওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ বর্তমানে অধিক পরিমাণ ক্লোরিন প্রয়োজন হইলে সর্বদাই উহা সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ-বিযোজন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।



$$NaCl=Na^++Cl^-$$



অ্যানোডে
$$2Cl^-=Cl_2+2e$$

ক্যাথোডে
$$Na^++e=Na$$
$$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2$$

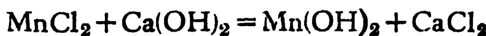
শিল্প-পদ্ধতি : অনেক রকম রাসায়নিক শিল্পে ক্লোরিনের প্রয়োজন হয়। এইজন্য প্রচুর পরিমাণে ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। অধিক পরিমাণ ক্লোরিন উৎপাদনে তিনটি বিভিন্ন প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়াছে।

২০৮। (১) **ওয়েলডন প্রণালী (Weldon Process):** ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে পাইরোলুসাইট খনিজ দ্বারা জারিত করা হয়।

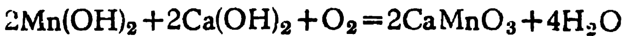


$$MnO_2+4HCl=MnCl_2+Cl_2+2H_2O$$

এই বিক্রিয়াতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অর্ধেকটা ক্লোরিন মৌল হিসাবে পাওয়া যায়। অপর অর্ধেক $MnCl_2$এ পরিণত হইয়া যায়। $MnCl_2$কে পুনরায় জারক পদার্থে পরিণত করিতে পারায় এই প্রণালীটি ক্লোরিনের শিল্প হিসাবে সার্থক হইয়াছে। উৎপন্ন $MnCl_2$ দ্রবীভূত থাকে। উহাকে প্রথমে একটি ট্যাঙ্কে লইয়া উহার সহিত চুনাপাথর (Limestone, $CaCO_3$) মিশান হয়। ইহাতে উহার সঙ্গে যে সমস্ত অ্যাসিড থাকে তাহা প্রশমিত হইয়া যায় এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ (যেমন, $FeCl_3$) অধঃক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ট্যাঙ্কের উপর হইতে পরিষ্কার $MnCl_2$ দ্রবণটিকে অপর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া আসা হয় এবং উহাতে যথেষ্ট গোলা-চুন (milk of lime) মিশান হয়। সঙ্গে সঙ্গে উহার ভিতরে বাতাস ও ষ্টীম পরিচালনা করা হয়। ইহাতে $MnCl_2$ জারিত হইয়া শেষ পর্যন্ত ক্যালসিয়াম-ম্যাঙ্গানাইটে পরিণত হয় এবং কাদের মত নীচে জমিতে থাকে। ইহাকে "ওয়েলডন-মাড" বলা হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জারিত করার জন্য উহা পুনরায় ব্যবহৃত হয়।



$$MnCl_2+Ca(OH)_2=Mn(OH)_2+CaCl_2$$



$$2Mn(OH)_2+2Ca(OH)_2+O_2=2CaMnO_3+4H_2O$$

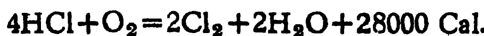


$$CaMnO_3+6HCl=CaCl_2+MnCl_2+Cl_2+3H_2O$$

সর্বদাই $MnCl_2$কে ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানাইটে পরিণত করিয়া লওয়ার ফলে পাইরোলুসাইটের ব্যয় অনেক কম হয়।

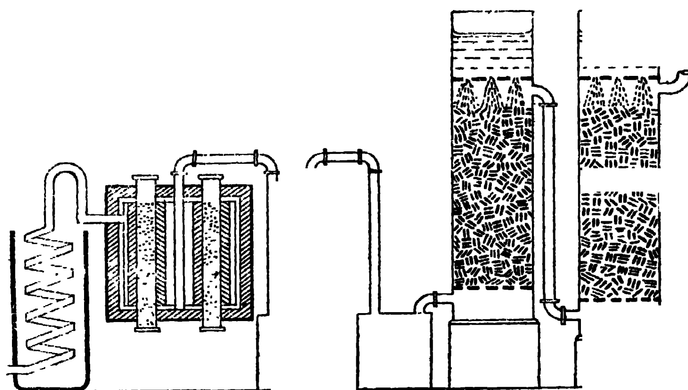
এই প্রণালীতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং গাঢ় ক্লোরিন পাওয়া গেলেও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ক্লোরিন মৌল অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। উপজাত $CaCl_2$এর কোন ব্যবহার নাই। এই কারণেই বর্তমানে এই প্রণালীটির আর প্রচলন নাই।

২০৯। (২) **ডিকনের প্রণালী (Deacon's Process):** এই পদ্ধতিতে কপার ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে জারিত করিয়া ক্লোরিন প্রস্তুত করা হয়।



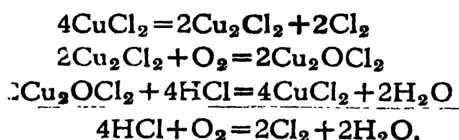
$$4HCl+O_2=2Cl_2+2H_2O+28000\ Cal.$$

সালফিউরিক অ্যাসিড ও খাদ্যলবণ উত্তপ্ত করিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের সহিত উহার চারিগুণ আয়তন বাতাস মিশ্রিত করা হয়। গ্যাস-মিশ্রণটিকে অতঃপর একটি তপ্ত-প্রকোষ্ঠে কতকগুলি সরু লোহার নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া উহার উষ্ণতা ২০০° সেন্টিগ্রেড করা হয়। ইহার পর, আংশিক উত্তপ্ত গ্যাসমিশ্রণটি বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এই বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠগুলিতে কিউপ্রিক-ক্লোরাইড দ্রবণে সিক্ত ঝামাপাথর ৪৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। ইহার সংস্পর্শে আসিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড



চিত্র ২০গ—ডিকনের ক্লোরিন

বাতাসের অক্সিজেনে জারিত হয়। নিম্নলিখিত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটনের ফলেই ক্লোরিন উৎপন্ন হইয়া থাকে।



$$4CuCl_2 = 2Cu_2Cl_2 + 2Cl_2$$
$$2Cu_2Cl_2 + O_2 = 2Cu_2OCl_2$$
$$2Cu_2OCl_2 + 4HCl = 4CuCl_2 + 2H_2O$$
$$4HCl + O_2 = 2Cl_2 + 2H_2O.$$

ডিকনের প্রণালীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রায় সমস্তটুকু ক্লোরিনই মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়। এই জন্যই ওয়েলডন প্রণালীর তুলনায় ডিকনের ক্লোরিন স্বল্পব্যয়ে পাওয়া সম্ভব। তবে এই ক্লোরিন সেরূপ বিশুদ্ধ নয়।

ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারীর পক্ষে ডিকনের ক্লোরিন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২০-১০। তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি : বর্তমানে সমস্ত ক্লোরিনই সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল আংশিক বাষ্পীভূত করিয়া ফেলিলে লবণের একটি গাঢ় দ্রবণ পাওয়া যায়। ইহাকে লবণোদক বা "ব্রাইন" বলে। ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ দিলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিযোজিত হইয়া অ্যানোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। এই ক্লোরিন বিশুদ্ধ, গাঢ় এবং সহজপ্রাপ্য। কাঁচামালও বেশ সুলভ। এইজন্যই ওয়েলডন ও ডিকন প্রণালী লোপ পাইয়াছে। কস্টিক সোডার প্রসঙ্গে এই পদ্ধতিটির বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

২০-১১। ক্লোরিনের ধর্ম : ক্লোরিন একটি হরিতাভ-পীত বর্ণের গ্যাস। বাতাস অপেক্ষা উহা অনেক ভারী, বাষ্প ঘনত্ব=৩৫.৫। গ্যাসটির একটি তীব্র অপ্রীতিকর গন্ধ আছে এবং উহা একটি বিষ। শরীরের ত্বক বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে ইহা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। ইহা জলে অনতিদ্রবণীয়। শীতল অবস্থায় অল্প চাপেই ক্লোরিন তরলীভূত হয়।

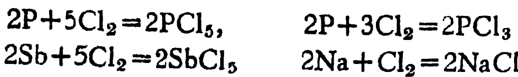
ক্লোরিনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক।

(১) বহু মৌলের সহিত ক্লোরিন প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হইয়া ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। আয়রন, মারকারি, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি উহাদের ক্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায়।



$$2Fe+3Cl_2=2FeCl_3 \qquad 2Al+3Cl_2=2AlCl_3$$

ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, কপার, সোডিয়াম প্রভৃতি ক্লোরিন গ্যাসের সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং উহাদের ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। আলো ও তাপ সহকারে এই সকল বিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং ইহাদের দহন-ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। ক্লোরিন গ্যাসটি নিজে অবশ্য দাহ্য নয়।



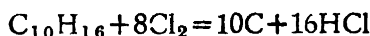
$$2P+5Cl_2=2PCl_5, \qquad 2P+3Cl_2=2PCl_3$$
$$2Sb+5Cl_2=2SbCl_5 \qquad 2Na+Cl_2=2NaCl$$

(২) ক্লোরিনের হাইড্রোজেন-আসক্তি খুব বেশী।

একেবারে অন্ধকারে স্বাভাবিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগ ঘটে না। কিন্তু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ যদি স্বল্পালোকে রাখা যায়

তবে আস্তে আস্তে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সূর্যালোকে এই সংযোগটি বিস্ফোরণ পূর্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। একটি হাইড্রোজেনের জ্বলন্ত শিখা ক্লোরিনের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা জ্বলিতে থাকে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে থাকে। সমায়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দিলে, বিস্ফোরণ হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। $H_2+Cl_2=2HCl$

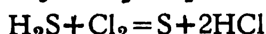
ক্লোরিন অন্যান্য যৌগের মধ্যস্থিত হাইড্রোজেনের সহিতও সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। যেমন, একটি তার্পিন-তৈলসিক্ত ফিল্টার কাগজ ক্লোরিন গ্যাসের ভিতর ছাড়িয়া দিলে উহা জ্বলিয়া উঠে এবং কার্বনে পরিণত হয়। বিক্রিয়ার ফলে HCl পাওয়া যায়।



$$C_{10}H_{16}+8Cl_2=10C+16HCl$$

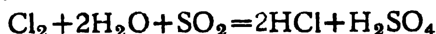
(৩) হাইড্রোজেনের প্রতি এই আসক্তির ফলে ক্লোরিনের জারণগুণ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লোরিন সোজাসুজি যুক্ত হইয়া পদার্থকে জারিত করে :—$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$; $SnCl_2+Cl_2=SnCl_4$.

আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনকে স্থানচ্যুত করিয়া ক্লোরিন পদার্থটিকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় :—$2NH_3+3Cl_2=N_2+6HCl$



$$H_2S+Cl_2=S+2HCl$$

ক্লোরিন জলের সাহায্যে কোন কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন যুক্ত করিয়াও উহাদিগকে জারিত করিতে পারে :—



$$Cl_2+2H_2O+SO_2=2HCl+H_2SO_4$$

(৪) ক্লোরিন ব্রোমাইড ও আয়োডাইড হইতে যথাক্রমে ব্রোমিন ও আয়োডিন উৎপাদন করিতে পারে :



$$2KBr+Cl_2=2KCl+Br_2 \quad \| \quad 2KI+Cl_2=2KCl+I_2$$

(৫) কোন কোন অধাতব অক্সাইডের সহিত ইহা সোজাসুজি যুক্ত হইয়া যুত-যৌগিক উৎপাদন করে :



$2NO+Cl_2=2NOCl$……(নাইট্রোসিল ক্লোরাইড)



$SO_2+Cl_2=SO_2Cl_2$……(সালফিউরিল ক্লোরাইড)



$CO+Cl_2=COCl_2$……(ফস্‌জিন)

[প্রাণিজ অঙ্গার প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিলে সংযোগটি সহজে নিষ্পন্ন হয়।]

(৬) ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে ক্রমশঃ হাইড্রোক্লোরিক ও হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডে পরিণত হয়। সূর্যালোকে ইহা অধিকতর দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং তীব্র আলোক সম্পাতে জল হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়।



$$Cl_2+H_2O=HCl+HOCl. \quad HCl+HOCl=2HCl+O.$$

অথবা, আলোকের সাহায্যে, $2Cl_2+2H_2O=4HCl+O_2$

বরফের মত শীতল জলে ক্লোরিন দিলে উহা হইতে ক্লোরিন হাইড্রেট $Cl_2,8H_2O$ কেলাসিত হয়।

(৭) বিভিন্ন ক্ষারক দ্রব্যের সহিত ক্লোরিনের বিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষারকের লঘু দ্রবণের সহিত ক্লোরিন স্বাভাবিক উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট উৎপন্ন করে। কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণ স্বাভাবিক উষ্ণতায় ক্লোরিনের সাহায্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইটে পরিণত হয়:



$$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaOCl+H_2O$$

কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে হাইপোক্লোরাইট লবণগুলি বিযোজিত হইয়া ক্লোরেট লবণে রূপান্তরিত হইয়া যায়।



$$3NaOCl=NaClO_3+2NaCl.$$

সুতরাং অধিকতর উষ্ণতায় অতিরিক্ত ক্লোরিন যদি ক্ষারকের গাঢ় দ্রবণে প্রবাহিত করা যায় তাহা হইলে ক্লোরাইড ও ক্লোরেট লবণের উৎপত্তি হয়। হাইপোক্লোরাইট পাওয়া যায় না।



$$3Cl_2+6NaOH=5NaCl+NaClO_3+3H_2O$$

হাইপোক্লোরাইট ও ক্লোরেট লবণসমূহ সাধারণতঃ এইভাবেই তৈয়ারী করা হয়।

চুনের জলও ক্ষারকের দ্রবণ। সুতরাং ক্লোরিনের সহিত উহারও ঐরূপ বিক্রিয়া ঘটে।



$$2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(OCl)_2+2H_2O \quad \text{(কম উষ্ণতায়)}$$



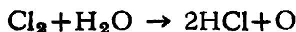
$$6Cl_2+6Ca(OH)_2=5CaCl_2+Ca(ClO_3)_2+6H_2O. \quad \text{(অধিক উষ্ণতায়)}$$

প্রায় 40° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কলিচুনের উপর ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত করিলে ইহা ব্লীচিং পাউডারে পরিণত হয়:



$$Cl_2+Ca(OH)_2=Ca(OCl)Cl+H_2O$$

(৮) সাধারণ জৈব রঙসমূহকে ক্লোরিন বিরঞ্জিত করিয়া থাকে। রঙীন ফুল বা পাতা অথবা রঙীন বস্ত্রখণ্ড ক্লোরিনপূর্ণ গ্যাসজারে রাখিয়া দিলে উহারা সাদা হইয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ ক্লোরিনের বিরঞ্জন-ক্ষমতা নাই। সম্পূর্ণ নির্জল ক্লোরিনের এই ধর্মটি নাই। ক্লোরিন বস্তুতঃ প্রথমে জল হইতে জায়মান অক্সিজেন উৎপাদন করে। এই জায়মান অক্সিজেন রঙসমূহকে জারিত করিয়া সাদা করে। সুতরাং ক্লোরিন জারণ-ক্রিয়া দ্বারা বিরঞ্জন করে।



$$Cl_2+H_2O \rightarrow 2HCl+O$$

ছাপা কালি অবশ্য ক্লোরিনে বিরঞ্জিত হয় না, কারণ ছাপাকালিতে কার্বন থাকে, উহা জায়মান অক্সিজেনের দ্বারাও জারিত হয় না।

২০.১২। ক্লোরিনের পরীক্ষা ঃ স্টার্চ ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণে সিক্ত একটি কাগজের টুকরা ক্লোরিন গ্যাসে বা উহার জলীয় দ্রবণে দিলে উহা নীল হইয়া যায়। ইহা দ্বারাই সাধারণতঃ ক্লোরিনের পরীক্ষা করা হয়।

ব্যবহার ঃ (১) ব্লীচিং পাউডার প্রস্তুতিতে ক্লোরিনের বহুল ব্যবহার হয়, বর্তমানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন সংযোগে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত ক্লোরোফর্ম, ব্রোমিন, ক্লোরেট প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। (২) ফসজিন গ্যাস, মাস্টার্ড গ্যাস প্রভৃতি যুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিষাক্ত গ্যাস তৈয়ারী করিতেও ক্লোরিনের প্রয়োজন। (৩) খনিজ হইতে স্বর্ণ-নিষ্কাশনে এবং কাগজ শিল্পে, কাঠ, খড় ইত্যাদির বিরঞ্জনেও ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। (৪) বীজবারক হিসাবে উহার ব্যবহার আছে। পানীয় জল অনেক সময় ক্লোরিনের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

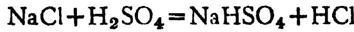
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

(হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl)

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের এই দ্বিযৌগিক পদার্থটিকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় একটি গ্যাসরূপে পাওয়া যায়। উহা অম্ল জাতীয় এবং জলে অতীব দ্রবণীয়। গ্যাস অবস্থায় ইহাকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস বলে। জলীয় দ্রবণটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

২০.১৩। প্রস্তুতি ঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ—সাধারণতঃ ল্যাবরেটরীতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের

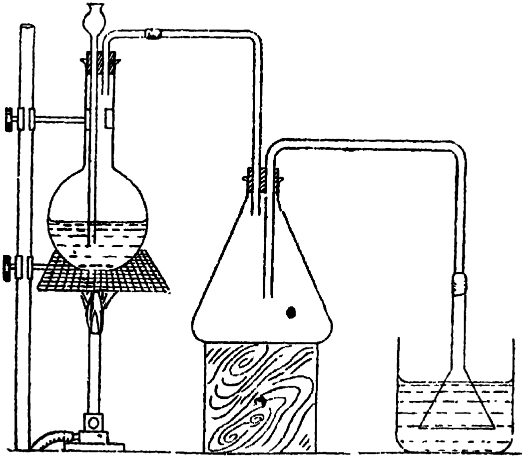
বিক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়। একটি কুপীতে খানিকটা খাদ্য লবণ লওয়া হয়, কুপীটির মুখ কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই কর্কে একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গম-নল সংযুক্ত থাকে। দীর্ঘনাল-ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সমস্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড উহাদ্বারা আবৃত হইয়া যায় এবং ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডে নিমজ্জিত থাকে। পদার্থ দুইটি মিশ্রিত হইলেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। ইহার পর কুপীটিকে তারজালিতে রাখিয়া অল্প অল্প তাপিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্যাস প্রস্তুত করা যায়।



$$NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$$

নির্গম-নল দিয়া যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে উহাকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড-পূর্ণ একটি গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া অনার্দ্র করা হয়। পারদের উপর অথবা বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে এই অনার্দ্র গ্যাস সংগৃহীত হয়।

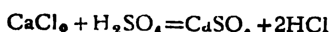
পক্ষান্তরে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণের প্রয়োজন থাকিলে কুপী হইতে নির্গত গ্যাসটি একটি খালি বোতলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া নল-যোগে একটি জলের পাত্রে প্রবেশ করান হয় (চিত্র ২০ঘ)। এই নলের শেষে একটি



চিত্র ২০ঘ—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি

ফানেল যুক্ত থাকে এবং ফানেলটি জলের সমতলে রাখা হয়। ইহার কারণ, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। যে গতিতে গ্যাসটি উৎপন্ন হয় তাহার চেয়ে দ্রুতগতিতে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। সুতরাং নল বাহিয়া জল উপরের দিকে উঠিয়া উত্তপ্ত কূপীতে ঢুকিতে পারে। তাহাতে কাচের কূপীটি ফাটিয়া যাইবে। ফানেলটি থাকিলে অত সহজে জল উঠিতে পারে না। তবুও সতর্কতা হিসাবে মধ্যস্থলে একটি খালি বোতল রাখা হয়। যদি কোনক্রমে জল উঠিয়া যায় তবু উহা সোজাসুজি কূপীতে না গিয়া মধ্যস্থিত বোতলে জমিবে।

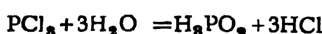
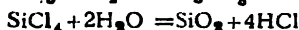
খাদ্য লবণের পরিবর্তে অন্যান্য কোন কোন ধাতব ক্লোরাইড হইতেও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুত করা যায়। সুলভ বলিয়াই সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়।


$$CaCl_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2HCl$$

$$KCl + H_2SO_4 = KHSO_4 + HCl$$

$$2AlCl_3 + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 6HCl \text{ ইত্যাদি।}$$

অধাতব কোন কোন ক্লোরাইড ও অক্সিক্লোরাইডের আর্দ্র-বিশ্লেষণেও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় :—


$$PCl_3 + 3H_2O = H_3PO_3 + 3HCl$$

$$SiCl_4 + 2H_2O = SiO_2 + 4HCl$$

$$POCl_3 + 3H_2O = H_3PO_4 + 3HCl$$

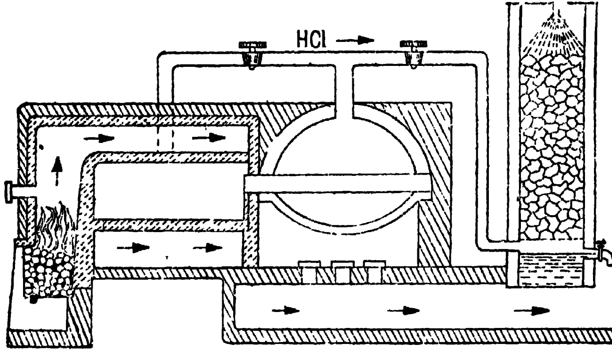
$$SOCl_2 + 2H_2O = H_2SO_3 + 2HCl$$

শিল্প-পদ্ধতি ঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বহুল প্রয়োগের জন্য প্রচুর পরিমাণে উহা প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়। এইজন্য মোটামুটি দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়।

২০-১৪। লে-ব্লাঙ্ক প্রণালী ঃ ইহা বস্তুতঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতিরই বৃহৎ-সংস্করণ। পরপর দুইটি সংবৃত-চুল্লীতে (muffle furnace) লবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিড একত্র লোহিত-তপ্ত করিয়া, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস তৈয়ারী করা হয়।

প্রথম চুল্লীটি ঢালাই লোহার তৈয়ারী, অনেকটা বড় একটি কড়াইয়ের মত। দ্বিতীয়টি চতুষ্কোণাকৃতি একটি বাক্সের অনুরূপ এবং অগ্নিসহ মৃত্তিকায় প্রস্তুত। দুইটি চুল্লীরই পাথর বা অগ্নিসহ-মৃত্তিকানির্মিত ঢাকনী আছে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের বহির্গমনের জন্য পাথর বা মাটির নির্গম-নল আছে। ধাতুর নল

বা ঢাক্‌নী অ্যাসিড-বাষ্পে অব্যবহার্য। দ্বিতীয় চুল্লীটির শেষপ্রান্তে কয়লা প্রজ্বলিত করিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। উহার উত্তপ্ত গ্যাস প্রথমে দ্বিতীয় সংবৃত চুল্লীর চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। পরে উহা বাহির হইয়া যাওয়ার পথে প্রথম চুল্লীটিকে উত্তপ্ত করিয়া যায়। ফলে, প্রথম চুল্লীটির আভ্যন্তরিক উষ্ণতা প্রায় ২০০° সেন্টিগ্রেড এবং দ্বিতীয়টির প্রায় ৬০০° সেন্টিগ্রেড থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ লবণ ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড প্রথম



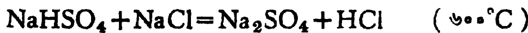
চিত্র ২০৩

চুল্লীতে দেওয়া হয়। এখানে খানিকটা সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেটে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উত্থিত হয়।



$$NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl \quad (২০০^\circ C)$$

বিক্রিয়া-শেষে লবণ ও অ্যাসিড সালফেটের তপ্ত মিশ্রণটি একটি দ্বারের ভিতর দিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বিতীয় চুল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এইখানে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া আরও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে :



$$NaHSO_4 + NaCl = Na_2SO_4 + HCl \quad (৬০০^\circ C)$$

এইরূপে বিক্রিয়াটি শেষ হইলে উত্তপ্ত অবস্থাতেই গলিত সোডিয়াম সালফেট এই চুল্লী হইতে বাহির করিয়া সংগ্রহ করা হয়। চুল্লীর অভ্যন্তর ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা জমিয়া যায়; ফলে উহা বাহির করা সুকঠিন হয়। বাজারে ইহা "গ্লবার লবণ" নামে পরিচিত এবং কাচ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য বাজারে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। বস্তুতঃ এই লে'-ব্লাঙ্ক পদ্ধতিটি সোডিয়াম সালফেট প্রস্তুতির জন্যই উদ্ভাবিত হয়।

দুইটি চুল্লী হইতে যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয় উহা একটি কোকপূর্ণ টাওয়ার অতিক্রম করে। ইহাতে গ্যাসটি ভাসমান ধূলিকণা বা অন্যান্য কঠিন পদার্থ হইতে মুক্ত ও পরিস্রুত হইয়া যায়। এই গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত করা হয়। (চিত্র ২০চ)

চিত্র ২০চ—HCl

২০-১৫। সংশ্লেষণ পদ্ধতি: বর্তমানে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়সাধন করিয়াও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়।

অনেক দেশেই ক্ষারশিল্পে প্রচুর হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। হাইড্রোজেন-পূর্ণ সিলিকা-নির্মিত চুল্লীর মধ্যস্থিত একটি সরু নল হইতে নিঃস্রিয়মাণ ক্লোরিনকে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। এই দহনের ফলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। $H_2+Cl_2=2HCl$

যথারীতি এই গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিয়া বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। সুলভ বিদ্যুৎ-সরবরাহের উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভর করে।

২০-১৬। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ধর্ম: হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটি বর্ণহীন শ্বাসরোধক ঝাঁঝাল গ্যাস। সিক্ত বাতাসে উহা ধূমায়িত অবস্থায় থাকে। ইহা দাহ্য নয়, অপর বস্তুর দহনেও সহায়তা করে না। জলে এই গ্যাসের দ্রাব্যতা সমধিক। ০° সেণ্টি. উষ্ণতায় এক ঘনসেণ্টিমিটার জলে প্রায় ৪৫৮ ঘনসেণ্টিমিটার গ্যাস দ্রবীভূত হয়। অ্যামোনিয়ার মত "ফোয়ারা পরীক্ষা"র সাহায্যে ইহার দ্রাব্যতা সহজেই দেখান যাইতে পারে। ইহার জলীয় দ্রবণকেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বলা হয়।

(১) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অম্ল জাতীয় যৌগ। উহার জলীয় দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করে। দ্রবীভূত অবস্থায় ইহার অণুগুলি তাড়িত-বিয়োজিত হয়।

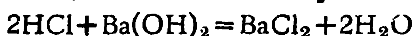


$$HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$$

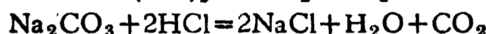
অ্যাসিডের ধর্মানুযায়ী ইহা সমস্ত ক্ষার-জাতীয় বস্তুর সহিত বিক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন লবণ উৎপন্ন করিয়া থাকে:



$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$



$$2HCl+Ba(OH)_2=BaCl_2+2H_2O$$



$$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2$$

জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি অনেক ধাতুই এই অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



$$Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2 \qquad Sn+2HCl=SnCl_2+H_2$$



$$2Al+6HCl=2AlCl_3+3H_2$$

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুর উপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু অক্সিজেন ও অ্যাসিডের একত্র সমাবেশে সিলভার ধীরে ধীরে আক্রান্ত হইয়া থাকে: $4Ag+4HCl+O_2=4AgCl+2H_2O$



(২) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, পটাস-পারম্যাঙ্গানেট, লেড ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন জারক দ্রব্যের সহিত উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জারিত হইয়া ক্লোরিনে পরিণত হয়ঃ

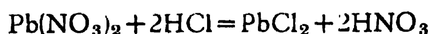


$$MnO_2+4HCl=MnCl_2+Cl_2+2H_2O$$

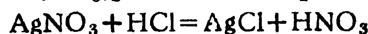


$$PbO_2+4HCl=PbCl_2+Cl_2+2H_2O$$

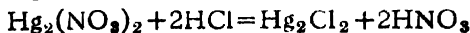
(৩) লেড, সিলভার ও মারকিউরিয়াস লবণের জলীয় দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে ঐ সকল ধাতুর সাদা ক্লোরাইড তৎক্ষণাৎ অধঃক্ষিপ্ত হয়ঃ



$$Pb(NO_3)_2+2HCl=PbCl_2+2HNO_3$$



$$AgNO_3+HCl=AgCl+HNO_3$$



$$Hg_2(NO_3)_2+2HCl=Hg_2Cl_2+2HNO_3$$

২০-১৭। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরীক্ষাঃ (১) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাসের সংস্পর্শে আসিলে সাদা ঘন ধোঁয়া উৎপন্ন হয় (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)।

(২) ম্যাঙ্গানিজ ডাই–অক্সাইড সহযোগে উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে পীতাভ ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয়।

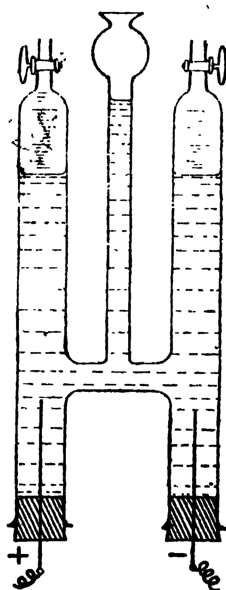
(৩) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ঢালিলে উহা হইতে সিলভার ক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। সিলভার ক্লোরাইড অ্যামোনিয়াতে দ্রবণীয়।

ব্যবহারঃ অন্যতম বিকারক হিসাবে ইহা ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজন। ঔষধ হিসাবেও ইহার প্রয়োগ আছে। রঞ্জন শিল্পে, লোহার উপর টিন অথবা জিঙ্কের আস্তরণ দেওয়ার সময়, বিভিন্ন ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তুতিতে এবং ক্লোরিন উৎপন্ন করিতে, সর্বদাই ইহার প্রয়োজন হয়।

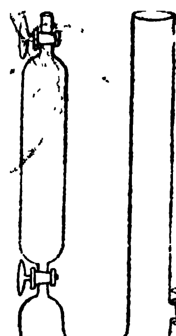
২০-১৮। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংযুতিঃ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংশ্লেষণ অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ —এই দুইরকম পরীক্ষার সাহায্যেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংযুতি নির্ণীত হইয়াছে।

বৈশ্লেষিক পদ্ধতিঃ (১) একটি বিশেষ রকমের ভল্টামিটার যন্ত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া উহার সংযুতি নির্ধারণ করা যাইতে পারে। এই কাচের ভল্টামিটার ত্র্যবয়বী অর্থাৎ উহার তিনটি বাহু আছে (চিত্র ২০ছ)। উহার দুই পার্শ্বের দুইটি বাহু সমান এবং অংশাঙ্কিত এবং

উহাদের প্রত্যেকের উপরের প্রান্তে একটি স্টপকক যুক্ত থাকে। এই বাহুদুইটির নীচে কর্কের সাহায্যে দুইটি কার্বনের তড়িদ্দ্বার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উৎপন্ন ক্লোরিনে ধাতব তড়িদ্দ্বার আক্রান্ত হয় বলিয়াই কার্বনের তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করা হয়। মধ্যস্থিত বাহুর ভিতর দিয়া গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয় এবং উহা পাশের দুইটি বাহুতে গিয়া সঞ্চিত হয়। এইভাবে অংশাঙ্কিত বাহুদুইটি অ্যাসিডে ভরিয়া লওয়া হয় এবং যথেষ্ট অতিরিক্ত অ্যাসিড মধ্যস্থিত বাহুতে থাকে। অতঃপর কার্বনের তড়িদ্দ্বার দুইটি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া অ্যাসিডের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে অ্যাসিড বিশ্লেষিত হইয়া হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন উবিয়া যায়, কিন্তু ক্লোরিন অ্যাসিডেই অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়। এইভাবে অ্যাসিড দ্রবণটি সম্পূর্ণরূপে ক্লোরিনদ্বারা সম্পৃক্ত করা হয়। অতঃপর স্টপকক দুইটি খুলিয়া পাশের দুইটি বাহুই ক্লোরিন-সম্পৃক্ত অ্যাসিডে সম্পূর্ণ-



চিত্র ২০ছ—HCl সংযুতি



চিত্র ২০জ—HCl সংযুতি

রূপে ভরিয়া লইয়া উহাদের স্টপককগুলি আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর আরও বিদ্যুৎ-প্রবাহ অ্যাসিডের ভিতর পরিচালনা করা হয়।

তখন ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হইয়া অংশাঙ্কিত বাহু দুইটিতে সঞ্চিত হয়। সর্বদাই দেখা যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের আয়তন সমান। অতএব দেখা যাইতেছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমায়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত।

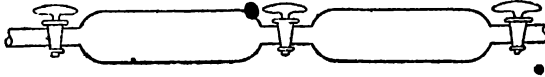
(২) উপরোক্ত পরীক্ষায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন কি অনুপাতে আছে, তাহাই শুধু জানা যায়। কিন্তু কত পরিমাণ অ্যাসিডে উক্ত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন থাকে তাহা জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য আরও একটি পরীক্ষার প্রয়োজন। এই পরীক্ষার জন্য একটি বিশেষ রকমের U-নল প্রয়োজন হয়; U-নলটির একটি বাহুর উপরের ও নীচের দিকে দুইটি স্টপকক সংযুক্ত থাকে (চিত্র ২০জ)। এই স্টপকক দুইটির মধ্যবর্তী নলটুকু অংশাঙ্কিত। U-নলের অপর বাহুটির নীচের দিকে একটি স্টপককযুক্ত নির্গম-নল থাকে। প্রথম বাহুটির স্টপককদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু শুষ্ক ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। এই বাহুর বাকী অংশ ও অপর বাহুটি সোডিয়ামের তরল পারদসংকরে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গ্যাসের নীচের স্টপককটি খুলিয়া দিলে সোডিয়াম পারদসংকর গ্যাসের সংস্পর্শে আসে এবং অ্যাসিড ও সোডিয়ামের বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্ত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণতি লাভ করে। সর্বদাই দেখা যায় এই উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন বিশ্লেষিত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের অর্ধেক। অর্থাৎ, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উহার অর্ধায়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন হইতে উদ্ভূত।

দুইটি পরীক্ষার ফল এখন একত্রিত করিয়া সহজেই বলা যাইতে পারে, V ঘন-সেন্টি. হাইড্রোজেন ক্লোরাইড V/২ ঘন-সেন্টি. হাইড্রোজেন এবং V/২ ঘন-সেন্টি. ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত।

সাংশ্লেষিক পদ্ধতি ঃ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংশ্লেষণদ্বারাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

পরীক্ষা ঃ (১) ঠিক সমায়তন দুইটি কাচের নল মধ্যবর্তী একটি স্টপকক দ্বারা যুক্ত করিয়া লওয়া হয়, নল দুইটির অপর প্রান্তেও দুইটি স্টপকক থাকে

(চিত্র ২০ঝ)। একই উষ্ণতা ও চাপে একটি নলে হাইড্রোজেন এবং অপরটিতে ক্লোরিন ভরিয়া লওয়া হয়। অতঃপর মধ্যবর্তী স্টপককটি খুলিয়া ঘরের ভিতর মৃদু আলোতে উহা রাখিয়া দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পরিণত হয়। কয়েক



চিত্র ২০ ঝ—HCl-এর সংযুতি নির্ণয়

ঘণ্টাতেই এই বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া যায। তৎপব এই যন্ত্রটির একটি প্রান্ত পাবদে ডুবাইয়া সেই দিকেব স্টপককটি খুলিলে পারদ ভিতবে প্রবেশ কবে না অথবা কোন গ্যাস বাহিব হইয়া যায না। পারদেব পবিবর্তে এই স্টপককটি জলেব নীচে বাখিয়া খুলিলে তৎক্ষণাৎ জল উপবে উঠিতে থাকে এবং নল দুইটি সম্পূর্ণ জলে ভবিয়া যায়। অতএব, স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, সমপবিমাণ আয়তনের হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন মিলিত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হয় এবং এই উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোবাইডেব আয়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সম্মিলিত আয়তনের সমান।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সঙ্কেত : এই সকল পবীক্ষা হইতে দেখা যায যে নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায x ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন ক্লোবাইডে $\frac{x}{২}$ ঘন সেন্টি. হাইড্রোজেন এবং $\frac{x}{২}$ ঘন সেন্টি ক্লোবিন আছে। সুতরাং, অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পানুযায়ী, যদি x ঘন সেন্টিমিটাব কোন গ্যাসে p অণু বতমান থাকে, তবে p অণু হাইড্রোজেন ক্লোবাইডে $\frac{p}{২}$টি হাইড্রোজেন অণু এবং $\frac{p}{২}$টি ক্লোরিন অণু থাকে।

∴ ১টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুতে $\frac{১}{২}$টি হাইড্রোজেন অণু এবং $\frac{১}{২}$টি ক্লোরিন অণু থাকে। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন অণু উভয়েই দ্বিপরমাণুক।

∴ হাইড্রোজেন ক্লোবাইডের একটি অণুতে ১টি হাইড্রোজেন পবমাণু এবং ১টি ক্লোরিন পরমাণু থাকে।

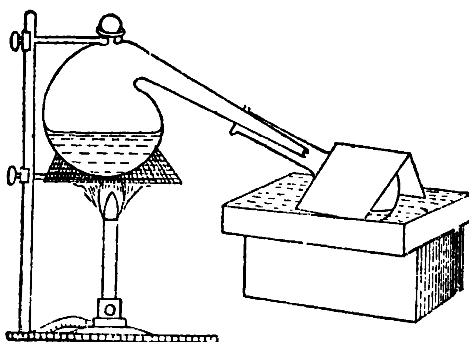
∴ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সঙ্কেত, HCl।

ব্রোমিন

চিহ্ন, Br। পারমাণবিক গুরুত্ব, ৭৯.৯। ক্রমাঙ্ক, ৩৫।

ব্রোমিনও মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রজল হইতে খাদ্য লবণ কেলাসিত করিয়া লইলে যে অবশেষ থাকে, তাহাতে ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড ($MgBr_2$) থাকে। স্টাস্‌ফার্ট স্তূপে, প্যালেস্টাইনের মরুসাগরে ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম ব্রোমাইড পাওয়া যায়। ব্রোমারজাইরাইট [Bromargyrite, AgBr] নামক দুষ্প্রাপ্য খনিজও ব্রোমিনের যৌগ-পদার্থ।

২০-১৯। **প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরী পদ্ধতি :** একটি কাচের বকযন্ত্রে পটাসিয়াম ব্রোমাইড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ (১ : ৫) অপেক্ষাকৃত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিলেই ব্রোমিন উৎপন্ন হয়। শীতল জলে আংশিক নিমজ্জিত একটি কাচের গোলকূপী গ্রাহক হিসাবে বকযন্ত্রের নলের শেষপ্রান্তে রাখা হয়। বাষ্পাকারে ব্রোমিন বকযন্ত্রের নল বাহিয়া আসিয়া এই কূপীর ভিতরে ঘনীভূত হয় এবং গাঢ় লাল তরল পদার্থে পরিণত হয় [চিত্র ২০এঃ]।

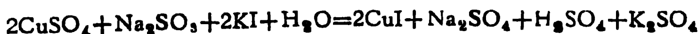


চিত্র ২০এঃ—ব্রোমিন প্রস্তুতি

$$MnO_2+2KBr+3H_2SO_4=MnSO_4+2KHSO_4+Br_2+2H_2O$$

যদিও পটাসিয়াম ব্রোমাইড সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য ব্রোমাইড হইতেও এই উপায়ে ব্রোমিন পাওয়া সম্ভব।

ব্রোমাইডে সর্বদাই ক্লোরাইড ও আয়োডাইড থাকে বলিয়া এই ব্রোমিনের সহিত কিছু ক্লোরিন ও আয়োডিন মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ ব্রোমিন পাইতে হইলে পাতিত করার পূর্বেই পটাসিয়াম ব্রোমাইডকে কপার সালফেট এবং সোডিয়াম সালফাইট দ্বারা আয়োডাইড-মুক্ত করা হয়।



$$2CuSO_4+Na_2SO_3+2KI+H_2O=2CuI+Na_2SO_4+H_2SO_4+K_2SO_4$$

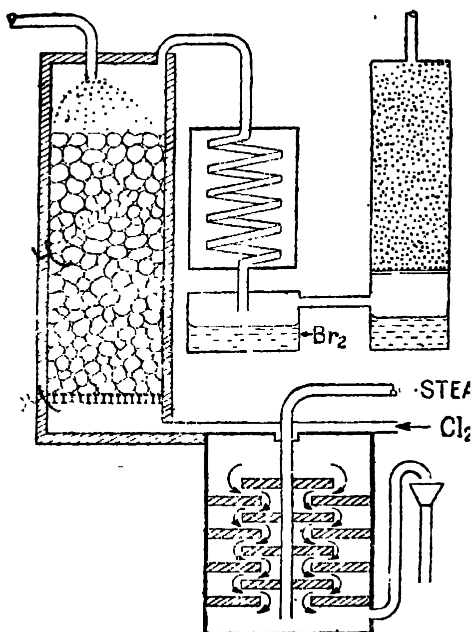
অদ্রবণীয় কপার আয়োডাইড অধঃক্ষিপ্ত হইলে উহা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। উৎপন্ন ব্রোমিনকে পরে পটাসিয়াম ব্রোমাইডের সহিত আবার পাতিত করিলে ক্লোরিন-মুক্ত ব্রোমিন পাওয়া সম্ভব।



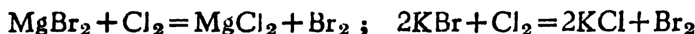
$$2KBr+Cl_2=2KCl+Br_2.$$

২০-২০। **শিল্প-পদ্ধতি :** স্টাস্‌ফার্ট লবণ হইতে ক্লোরাইড কেলাসিত করার পর যে শেষদ্রব পড়িয়া থাকে অথবা খাদ্য-লবণ-শিল্পে যে শেষদ্রব পাওয়া যায় উহাতে প্রায় শতকরা ০·২৫ ভাগ ব্রোমাইড লবণ থাকে।

অধিক পরিমাণে ব্রোমিন পাইতে হইলে এই সকল শেষদ্রব ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিনের সাহায্যে ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন উৎপাদন করা হয়। ঐ সকল শেষদ্রব পর্সেলীন বা পোড়ামাটির ছোট ছোট বল পূর্ণ একটি টাওয়ারের উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচের দিকে প্রবাহিত করা হয়। টাওয়ারের ভিতরে নীচ হইতে উপরের দিকে ষ্টীম ও ক্লোরিন গ্যাস চালনা করা হয়। ক্লোরিনের সংস্পর্শে আসিলেই ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন উৎপন্ন হয় এবং বাষ্পাকারে উহা টাওয়ারের উপর দিকে একটি নির্গম-নলের সাহায্যে বাহির হইয়া যায় (চিত্র ২০ট)।



চিত্র ২০ট—অধিক পরিমাণ ব্রোমিন উৎপাদন



$$MgBr_2 + Cl_2 = MgCl_2 + Br_2 ; \quad 2KBr + Cl_2 = 2KCl + Br_2$$

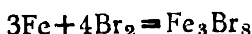
নির্গত ব্রোমিন বাষ্পকে (Bromine vapour) একটি সর্পিল শীতক-নলের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়। উহাতেই অধিকাংশ ব্রোমিন তরলিত হইয়া যায়। যদি কোন সামান্য ব্রোমিন বাষ্পাবস্থায় থাকে, একটি সিক্ত লৌহচূরপূর্ণ টাওয়ারের ভিতর চালনা করিয়া উহাকে আয়রন ব্রোমাইডে পরিণত করা হয়। এই আয়রন ব্রোমাইডকে পুনরায় পটাস-ব্রোমাইডে

রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমানে সমুদ্র-জল হইতেও উক্ত উপায়ে ব্রোমিন তৈয়ারী করা সম্ভব।

২০-২১। ব্রোমিনের ধর্ম : সাধারণ অবস্থায় ব্রোমিন একটি গাঢ় লাল (প্রায় কৃষ্ণবর্ণ) তরল পদার্থ। যদিও ইহার স্ফুটনাঙ্ক ৫৯ সেণ্টিগ্রেড, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বায়ী বলিয়া সর্বদাই ইহা হইতে লাল বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। তরল ব্রোমিন বেশ ভারী, ঘনত্ব ৩.১৫। পদার্থটি তীব্র বিষ এবং ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে। জলে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। আলোকে রাখিয়া দিলে ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণ হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডে পরিণত হইয়া থাকে :— $2Br_2+2H_2O=4HBr+O_2$

কোহল, ক্লোরোফর্ম, কার্বন-ডাইসালফাইড প্রভৃতি জৈব-দ্রাবকে ব্রোমিন অধিকতর দ্রবীভূত হইয়া থাকে। ব্রোমিনের রাসায়নিক গুণাবলী ঠিক ক্লোরিনের মত, যদিও সক্রিয়তা অনেকটা কম।

(১) বহু মৌলের সহিত ব্রোমিন সোজাসুজি যুক্ত হয় এবং ব্রোমাইড উৎপন্ন করে।


$3Fe+4Br_2=Fe_3Br_8$

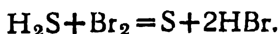

$2P+3Br_2=2PBr_3$


$2K+Br_2=2KBr.$


$2P+5Br_2=2PBr_5$

(২) উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেনের সহিত ব্রোমিনের সহজেই সংযোগ সাধিত হয়, $H_2+Br_2=2HBr$

(৩) ব্রোমিনেরও অল্লাধিক জারণ-ক্ষমতা আছে। H_2S, SO_2 প্রভৃতিকে উহা স্বচ্ছন্দেই জারিত করে :—


$$H_2S+Br_2=S+2HBr.$$


$$SO_2+2H_2O+Br_2=2HBr+H_2SO_4$$

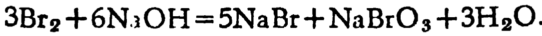
(৪) আয়োডাইড হইতে ব্রোমিন আয়োডিন উৎপাদন করে :—


$$2KI+Br_2=2KBr+I_2$$

(৫) ব্রোমিন ক্ষারক-জাতীয় পদার্থের লঘু-দ্রবণের সহিত ক্রিয়া করিয়া ব্রোমাইড ও হাইপোব্রোমাইট উৎপন্ন করে :—


$$2NaOH+Br_2=NaBr+NaBrO+H_2O.$$

কিন্তু অধিকতর উষ্ণতায় হাইপোব্রোমাইটের পরিবর্তে ব্রোমেট পাওয়া যায় (ক্লোরিনের ধর্ম দ্রষ্টব্য)।

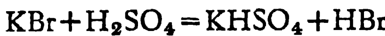


$$3Br_2+6NaOH=5NaBr+NaBrO_3+3H_2O.$$

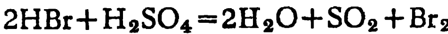
২০-২২। ব্রোমিনের পরীক্ষা : ব্রোমিনের অস্তিত্ব অবশ্যই উহার বিশিষ্ট রং ও গন্ধের সাহায্যেই জানা সম্ভব। স্টার্চ ও পটাস-আয়োডাইড দ্রবণে সিক্ত কাগজ ব্রোমিন গ্যাসে নীল হইয়া যায়। ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণের সহিত কার্বন ডাইসালফাইড উত্তমরূপে ঝাঁকাইলে কার্বন ডাইসালফাইড পীত রং ধারণ করে। এই সব পরীক্ষাদ্বারা ব্রোমিনের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।

ব্যবহার : (১) ঔষধ ও ফটোগ্রাফীতে প্রয়োজনীয় ব্রোমাইডসমূহ তৈয়ারী করিতে ব্রোমিনের প্রয়োজন হয়। (২) বহু রকম জৈবপদার্থ ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করিতে ব্রোমিনের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন রং, লেড টেট্রাইথাইল (জ্বালানী পেট্রোলে ব্যবহৃত) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৩) কোন কোন কাঁদুনে গ্যাস উৎপাদনেও উহার ব্যবহার আছে। বীজবারক হিসাবেও ইহা কিছু প্রয়োগ করা হয়।

২০-২৩। হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, HBr. প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরী পদ্ধতি :—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মত ব্রোমাইড লবণের উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডকে জারিত করিয়া ব্রোমিনে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।



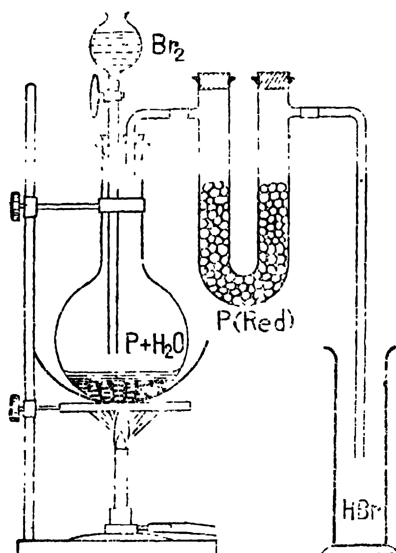
$$KBr+H_2SO_4=KHSO_4+HBr$$



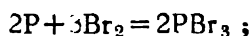
$$2HBr+H_2SO_4=2H_2O+SO_2+Br_2$$

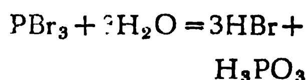
সুতরাং ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিতে একটি পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য লইতে হয়। একটি কাচের গোলকূপীতে খানিকটা লাল ফসফরাস ও প্রায় উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল লওয়া হয়। কূপীটির মুখ একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ থাকে এবং উহাতে ব্রোমিন-পূর্ণ একটি বিন্দুপাতী-ফানেল এবং একটি নির্গম-নল যুক্ত থাকে ; নির্গম-নলটি একটি U-নলের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই U-নলে লাল-ফসফরাস মাখান কতকগুলি কাচের টুকরা রাখা হয় (চিত্র ২০ঠ)। বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা ব্রোমিন কূপীতে ফেলা হয় (প্রয়োজন হইলে বিক্রিয়ার জন্য কূপীটি একটু গরম করা বিধেয়)। ব্রোমিনের সহিত নিম্নলিখিত ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাস

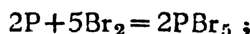
উৎপন্ন হয় উহা নির্গম-নল দিয়া আসিয়া U-নলে প্রবেশ করে। যদি ইহার সহিত কোন ব্রোমিন মিশ্রিত থাকে, তাহা লাল ফসফরাস শোষণ করিয়া লয় এবং হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাস-জারে বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

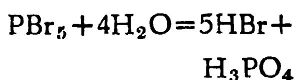


চিত্র ২০৮—হাইড্রোজেন ব্রোমাইড প্রস্তুতি


$2P + 3Br_2 = 2PBr_3$;


$PBr_3 + 3H_2O = 3HBr + H_3PO_3$

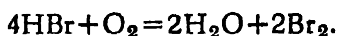

$2P + 5Br_2 = 2PBr_5$;


$PBr_5 + 4H_2O = 5HBr + H_3PO_4$

গ্যাসটিকে শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

২০-২৪। হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের ধর্ম : হাইড্রোজেন ব্রোমাইড বর্ণহীন তীব্র-গন্ধযুক্ত গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের ধর্ম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অনুরূপ। ইহা যথেষ্ট অম্লগুণসম্পন্ন এবং বহু ধাতু এবং ক্ষারক পদার্থের সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণের উৎপত্তি করে। কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তুলনায় ইহা অনেক কম স্থায়ী ; এমন কি, সূর্যালোকে ইহা বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হইয়া যায়।


$4HBr + O_2 = 2H_2O + 2Br_2$.

ব্রোমাইড ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের পরীক্ষা : (১) হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড বা ধাতব ব্রোমাইডসমূহ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে ব্রোমিন গ্যাস পাওয়া যায়।

(২) ক্লোরিন হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের বা ধাতব ব্রোমাইডের জলীয় দ্রবণ হইতে ব্রোমিন নির্গত করে। এই ব্রোমিন CS_2এ দ্রবীভূত হইয়া উহাকে পীতাভ করিয়া থাকে।

(৩) ইহাদের জলীয় দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ঢালিলে তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হলুদ সিলভার ব্রোমাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহা নাইট্রিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়, কিন্তু অ্যামোনিয়াতে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়। $HBr + AgNO_3 = AgBr + HNO_3$

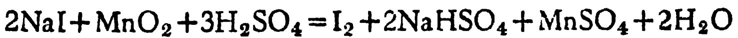
আয়োডিন

চিহ্ন, I। পারমাণবিক গুরুত্ব, ১২৬.৯। ক্রমাঙ্ক, ৫৩।

সমুদ্রের জলে খানিকটা আয়োডাইড লবণ থাকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ এই আয়োডাইড গ্রহণ করিয়া থাকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ পোড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যায়, তাহাকে সাধারণতঃ কেল্প্ (kelp) বলা হয় এবং বস্তুতঃ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এই কেল্প্ হইতেই কুরতয় (Courtois) প্রথমে আয়োডিন আবিষ্কার করেন। সমুদ্র ছাড়াও চিলির উপকূলে যে সোডিয়াম নাইট্রেট বা ক্যালিচি (caliche) পাওয়া যায় তাহাতেও কিয়ৎপরিমাণ সোডিয়াম আয়োডেট ($NaIO_3$) মিশ্রিত থাকে। জীবদেহের গ্রন্থিতে বিশেষতঃ থাইরয়ড গ্রন্থিতে, কডলিভার তেলে, দুধে খুব সামান্য পরিমাণ আয়োডিন আছে।

২০-২৫। প্রস্তুতি ঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ ল্যাবরেটরীতে আয়োডিন উহার সমগোত্রীয় ক্লোরিন ও ব্রোমিনের মত একই উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত সোডিয়াম আয়োডাইড উত্তপ্ত করিলেই আয়োডিন উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ, ব্রোমিন যেরূপ যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, তাহাতেই ইহাও তৈয়ারী করা যাইতে পারে। উত্তাপে আয়োডিন সুন্দর বেগনী রঙের বাষ্পের আকারে পাতিত হইয়া থাকে। শীতল গ্রাহকে আসিয়া উহা উজ্জ্বল কৃষ্ণ স্ফটিকে পরিণত হয়।

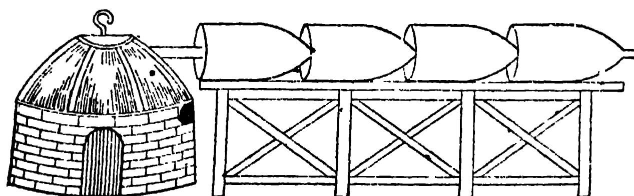
$$2NaI + MnO_2 + 3H_2SO_4 = I_2 + 2NaHSO_4 + MnSO_4 + 2H_2O$$



২০-২৬। শিল্পপদ্ধতি ঃ বহুরকম প্রয়োজনে আয়োডিন ব্যবহৃত হয় বলিয়া অধিক পরিমাণে এই মৌলটি প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য বিভিন্ন উপায়ের প্রচলন আছে।

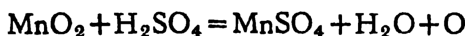
(১) সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভস্ম কেল্পের ভিতর অন্যান্য লবণের সঙ্গে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়োডাইড আছে। এই ভস্ম জলের সহিত প্রথমে ফুটান হয়, ইহাতে আয়োডাইডগুলি এবং অন্যান্য অনেক লবণ দ্রবীভূত হইয়া যায়। অদ্রব পদার্থগুলি ছাঁকিয়া লইয়া স্বচ্ছ দ্রবণটি যথাসম্ভব গাঢ় করা

হয়। শীতল অবস্থায় এই গাঢ় দ্রবণ হইতে অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণসমূহ কেলাসিত হয়। উহাদিগকে পরিস্রুত করিয়া লইলে যে শেষদ্রব পাওয়া যায় তাহাতে আয়োডাইড থাকিয়া যায়। এই শেষদ্রব, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড সহ উত্তপ্ত করা হয়। এই ক্রিয়ার ফলে আয়োডাইড জারিত হইয়া আয়োডিন উৎপন্ন করে। বাষ্পাকারে আয়োডিন পাতিত হইয়া থাকে। পাতন-ক্রিয়াটি সাধারণতঃ সীসার ঢাকনীবিশিষ্ট একটি ঢালাই-লোহার বকযন্ত্রে সম্পাদিত হয় এবং উড়েল

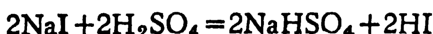


চিত্র ২০ড—কেল্‌প্‌ হইতে আয়োডিন প্রস্তুতি

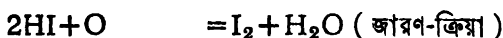
(udells) নামক বোতলাকৃতি সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ পাথরের গ্রাহকে আয়োডিন সংগৃহীত হয় (চিত্র ২০ড)।



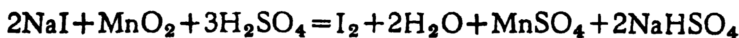
$$MnO_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + H_2O + O$$



$$2NaI + 2H_2SO_4 = 2NaHSO_4 + 2HI$$

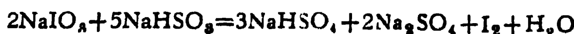


$$2HI + O \qquad = I_2 + H_2O \text{ (জারণ-ক্রিয়া)}$$



$$2NaI + MnO_2 + 3H_2SO_4 = I_2 + 2H_2O + MnSO_4 + 2NaHSO_4$$

(২) চিলির ক্যালিচির ($NaNO_3$) দ্রবণ গাঢ় করিয়া শীতল করিলে উহা হইতে প্রথমে অধিকাংশ সোডিয়াম নাইট্রেট কেলাসিত হইয়া যায়। তাহার পর যে শেষদ্রব পাওয়া যায় তাহাতে কিছু সোডিয়াম আয়োডেট থাকে। ইহাকে সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইটের সহিত মিশ্রিত করিলে আয়োডেট বিজারিত হইয়া আয়োডিনে পরিণত হয়।



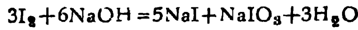
$$2NaIO_3 + 5NaHSO_3 = 3NaHSO_4 + 2Na_2SO_4 + I_2 + H_2O$$

(৩) কোন কোন পেট্রোলিয়াম-খনিতে প্রথমাবস্থায় অল্পাধিক পেট্রোলিয়াম মিশ্রিত প্রচুর লবণ-জল পাওয়া যায়, ইহাতে কিয়ৎপরিমাণ আয়োডাইড থাকে। সোডিয়াম নাইট্রাইট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ইহা হইতে আয়োডিন প্রস্তুত করা হয়।



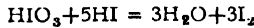
$$2NaNO_2 + 4H_2SO_4 + 2NaI = I_2 + 4NaHSO_4 + 2NO + 2H_2O$$

এই আয়োডিনের পরিমাণ খুব কম বলিয়া উহা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বলাহিত অঙ্গার (activated charcoal) সাহায্যে উহাকে শোষণ করিয়া লওয়া হয় এবং এই কার্বন ছাঁকিয়া লইয়া ক্ষার-পদার্থের সহিত মিশান হয়। আয়োডিন ক্ষারে দ্রবীভূত হইয়া যায়।



$$3I_2+6NaOH=5NaI+NaIO_3+3H_2O$$

সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা অম্লীকৃত করিলেই আয়োডিন নির্গত হয়। পরে যথারীতি ছাঁকিয়া লইয়া উর্ধ্বপাতন দ্বারা বিশুদ্ধ করা হয়।



$$HIO_3+5HI=3H_2O+3I_2$$

২০-২৭। আয়োডিনের ধর্ম: (১) স্বাভাবিক উষ্ণতায় আয়োডিন চক্‌চকে ধূসর রংয়ের স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। উহার ঘনত্ব ৪.৯। উত্তাপ প্রয়োগে গলিবার বহু পূর্বেই উহা বাষ্পীভূত হইয়া বেগনী গ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা সহজেই উর্ধ্বপাতিত করা সম্ভব। বেশী উত্তপ্ত করিলে আয়োডিন গ্যাস বিয়োজিত হইয়া উহার দ্বিপরমাণুক অণুগুলি এক-পরমাণুক অণুতে পরিণত হয়। $I_2 \rightleftharpoons 2I$

আয়োডিন জলে সামান্য দ্রবণীয়, কিন্তু বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে [কোহল, কার্বন ডাই-সালফাইড প্রভৃতিতে] ইহা বেশ দ্রবীভূত হয়।

(২) আয়োডিন অনেক মৌলের সহিত সোজাসুজি যুক্ত হয় এবং আয়োডাইড উৎপন্ন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপ ব্যতিরেকেই এই সংযোজনা হয়। যেমন ফসফরাস, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতির সহিত ইহার সংযোগ :



$$2P+3I_2=2PI_3 \qquad I_2+Cl_2=2ICl$$

পারদ ও আয়োডিন একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই মারকারি আয়োডাইড প্রস্তুত হয়—



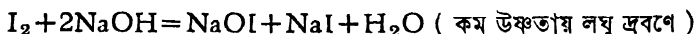
$$2Hg+I_2 = Hg_2I_2 \qquad Hg+I_2 = HgI_2.$$

যদিও আয়োডিনের রাসায়নিক ধর্ম অন্যান্য হ্যালোজেনের অনুরূপ, কিন্তু ইহার সক্রিয়তা উহাদের চেয়ে অনেক কম।

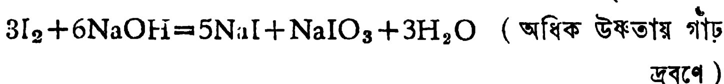
ক্লোরিন ও ব্রোমিনের মত আয়োডিনেরও হাইড্রোজেনের প্রতি আসক্তি আছে, কিন্তু মাত্রায় অনেক কম। প্লাটিনাম, টান্‌স্টেন্‌ জাতীয় প্রভাবকের উপস্থিতিতে অধিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও আয়োডিনের সংযোগ আংশিকভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$

(৩) আয়োডিন পটাসিয়াম আয়োডাইড জলীয় দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং একটি নূতন যুক্ত-যৌগিক সৃষ্টি করে। $KI + I_2 \rightleftharpoons KI_3$
(পটাসিয়াম ট্রাই-আয়োডাইড)

(৪) ক্লোরিন ও ব্রোমিনের মত আয়োডিন ক্ষারপদার্থের দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করে এবং আয়োডাইড, হাইপো-আয়োডাইট ও আয়োডেট লবণের উৎপত্তি করে ঃ—



$I_2 + 2NaOH = NaOI + NaI + H_2O$ (কম উষ্ণতায় লঘু দ্রবণে)



$3I_2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO_3 + 3H_2O$ (অধিক উষ্ণতায় গাঢ় দ্রবণে)

হাইপো-আয়োডাইটগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী ধরণের এবং সহজেই আয়োডেটে পরিণত হইয়া যায়। $3NaOI = NaIO_3 + 2NaI$

(৫) আয়োডিন মৃদু জারণগুণসম্পন্ন। সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি আয়োডিন দ্বারা সহজেই জারিত হয়।



$I_2 + SO_2 + 2H_2O = 2HI + H_2SO_4$



$I_2 + Na_2SO_3 + H_2O = Na_2SO_4 + 2HI$



$I_2 + H_2S = 2HI + S$

(৬) সোডিয়াম থায়ো-সালফেট দ্রবণের সহিত আয়োডিন সংস্পর্শ মাত্রেই বিক্রিয়া করে এবং সোডিয়াম টেট্রাথায়োনেটে পরিণত হইয়া থাকে।



$2Na_2S_2O_3 + I_2 = 2NaI + Na_2S_4O_6$
(সোডিয়াম থায়োসালফেট) (সোডিয়াম টেট্রাথায়োনেট)

এই বিক্রিয়াটির সাহায্যেই সচরাচর আয়োডিনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

(৭) আয়োডিন কোন ক্লোরাইড বা ব্রোমাইড হইতে ক্লোরিন বা ব্রোমিন প্রতিস্থাপিত করে না। কিন্তু, ক্লোরেট বা ব্রোমেট-এর মধ্যস্থিত ক্লোরিন বা ব্রোমিন আয়োডিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া সম্ভব। যথা ঃ—



$2KClO_3 + I_2 = 2KIO_3 + Cl_2$



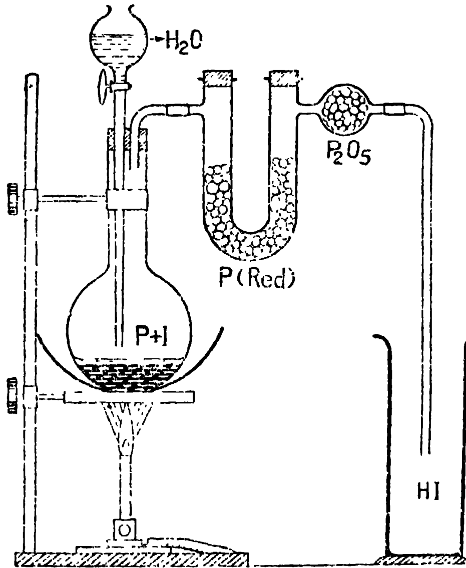
$2KBrO_3 + I_2 = 2KIO_3 + Br_2$

২০-২৮। আয়োডিনের পরীক্ষা ঃ স্বাভাবিক রং এবং বেগনী বাষ্পের দ্বারাই আয়োডিনকে চেনা সম্ভব। SC_2, CCl প্রভৃতি দ্রাবকেও উহা বেগনী রং ধারণ

করে। ইহা ছাড়া, স্টার্চের ক্বাথের সংস্পর্শে আসিলেই ইহা একটি নীল যৌগিকের সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষাটিই সচরাচর প্রয়োগ করা হয়। এমন কি, পঞ্চাশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ আয়োডিন থাকিলেও ইহা দ্বারা আয়োডিনের অস্তিত্ব ধরা সম্ভব।

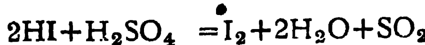
ব্যবহার ঃ বীজবারক ঔষধ হিসাবে আয়োডিন প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, KI, CHI_3 (আয়োডোফর্ম) প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য আয়োডিন-যৌগ প্রস্তুতিতে আয়োডিনের প্রয়োজন। মৃদু জারক রূপে জৈব রসায়নের অনেক বিক্রিয়াতে এবং কোন কোন রঞ্জক-প্রস্তুতিতে আয়োডিন আবশ্যক।

২০-২৯। হাইড্রোজেন আয়োডাইড, HI. প্রস্তুতি—ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ (১) কোন আয়োডাইড লবণের উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড পাওয়া সম্ভব



চিত্র ২০ট—হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্তুতি

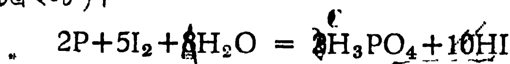
নয়; কারণ হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মত আয়োডাইডও সালফিউরিক অ্যাসিডে জারিত হইয়া আয়োডিনে পরিণত হইয়া যায়।



$$2HI+H_2SO_4 = I_2+2H_2O+SO_2$$

সুতরাং ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্তুত করার পদ্ধতিটি হাইড্রোজেন ব্রোমাইডেরই অনুরূপ। আয়োডিন ও লাল ফসফরাস উপযুক্ত

পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয় এবং একটি বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল এই মিশ্রণে ঢালা হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহা একটি নির্গম-নলদ্বারা কূপী হইতে বাহির হইয়া আসে (চিত্র ২০চ)।



$$2P+5I_2+8H_2O = 2H_3PO_4+10HI$$

এই গ্যাসটি যথেষ্ট ভারী। ইহাকে প্রথমে লাল ফসফরাস ও শুষ্ক ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের উপর দিয়া পরিচালিত করিয়া (আয়োডিন ও জলীয় বাষ্প হইতে মুক্ত করার জন্য) লইয়া বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চিত করা হয়।

গ্যাসটিকে ঠাণ্ডাজলে দ্রবীভূত করিয়া হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

২০-৩০। হাইড্রোজেন আয়োডাইডের ধর্ম: ইহা একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন গ্যাস। সিক্ত বাতাসে ইহা ধূমায়িত হয়। ইহা বাতাস অপেক্ষা ভারী। জলে ইহা অত্যন্ত দ্রবণীয়।

ইহার রাসায়নিক গুণাবলী হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের অনুরূপ, কিন্তু ইহা ঐ দুইটি অ্যাসিড অপেক্ষা অনেক সহজেই বিয়োজিত হয়। উত্তাপে ইহা উপাদান মৌল দুইটিতে পরিণত হইতে থাকে।



$$2HI \rightleftharpoons H_2+I_2$$

হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড অম্লাত্মক এবং যথারীতি বিভিন্ন ধাতু ও ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করে।

হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিডের বিজারণগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু রকম পদার্থকে ইহা বিজারিত করে এবং সর্বদাই উহা নিজে জারিত হইয়া আয়োডিনে পরিণত হয়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উহার বিভিন্ন প্রকারের বিক্রিয়া হয়।



$$H_2SO_4+2HI = I_2+2H_2O+SO_2$$



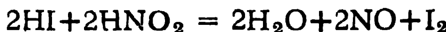
$$H_2SO_4+6HI = 3I_2+4H_2O+S$$



$$H_2SO_4+8HI = 4I_2+4H_2O+H_2S$$

(খ) বাতাসে অক্সিজেন দ্বারাও আলোর উপস্থিতিতে সহজেই HI জারিত হয় :— $4HI+O_2=2I_2+2H_2O$.

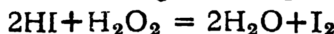
(গ) উহার অন্যান্য বিজারণ ক্রিয়া :—



$$2HI+2HNO_2 = 2H_2O+2NO+I_2$$



$$2HI+2FeCl_3 = 2FeCl_2+2HCl+I_2$$



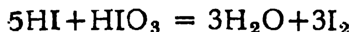
$$2HI+H_2O_2 = 2H_2O+I_2$$



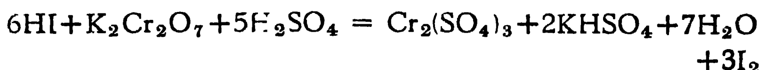
$$2HI+O_3 = H_2O+O_2+I_2$$



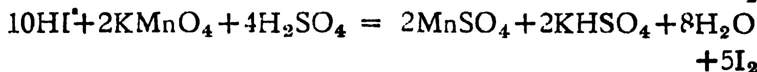
$$4HI+2CuSO_4 = Cu_2I_2+2H_2SO_4+I_2$$



$$5HI+HIO_3 = 3H_2O+3I_2$$



$$6HI+K_2Cr_2O_7+5H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3+2KHSO_4+7H_2O+3I_2$$



$$10HI+2KMnO_4+4H_2SO_4 = 2MnSO_4+2KHSO_4+8H_2O+5I_2$$

বস্তুতঃ, হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড বিজারক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

২০-৩১। হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড ও অন্যান্য আয়োডাইডের পরীক্ষা :

নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহের সাহায্যে হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিড ও উহার বিভিন্ন লবণ নির্ণয় সম্ভব :

(১) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিলে এই সমস্ত পদার্থ হইতে আয়োডিন উৎপন্ন হয়। এই সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দিলে আরও সহজে আয়োডিন নির্গত হয়।

(২) আয়োডাইডের দ্রবণে ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণ দিলে আয়োডিন নির্গত হয়। উহাকে ক্লোরোফর্মের সহিত ঝাঁকাইয়া লইলে ক্লোরোফর্ম বেগনী রং ধারণ করে। অথবা, স্টার্চ দিলে উহা নীল হইয়া আয়োডিনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

(৩) আয়োডাইডের দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ঢালিলে ঈষৎ পীতাভ সিলভার আয়োডাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। সিলভার আয়োডাইড অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উভয়েই অদ্রবণীয়।

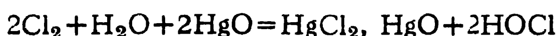
অক্সি-অ্যাসিড

হ্যালোজেনগুলির নানারকমের অক্সি-অ্যাসিড আছে। এখানে আমরা মাত্র একটি অক্সি-অ্যাসিডের কথা উল্লেখ করিতেছি।

২০-৩২। হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড, HOCl : হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়, জলীয় দ্রবণেই শুধু উহার

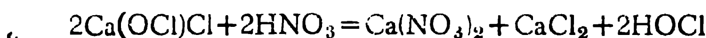
অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। খুব কম উষ্ণতায় অবশ্য উহার সোদক স্ফটিক ইদানীং কেলাসিত করা সম্ভব হইয়াছে।

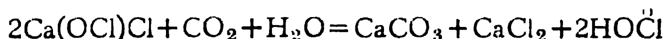
প্রস্তুতিঃ (১) ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণের সহিত সদ্য প্রস্তুত পীত মারকিউরিক অক্সাইড ঝাঁকাইয়া লইলে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডের দ্রবণ পাওয়া যায়। অথবা জলে ভাসমান চর্কের গুঁড়ার ভিতর ক্লোরিন গ্যাস চালনা করিলেও উহা হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডের দ্রবণে পরিণত হয়।


$$2Cl_2+H_2O+2HgO=HgCl_2, HgO+2HOCl$$

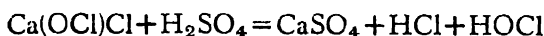

$$2Cl_2+H_2O+CaCO_3=CaCl_2+CO_2+2HOCl$$

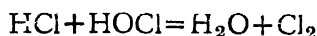
(২) বিরঞ্জক-চূর্ণের (ব্লীচিং পাউডার) উপর লঘু অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলেও খুব সহজে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড পাওয়া যায়। এমন কি, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মত মৃদু-আম্লিক অক্সাইড সাহায্যেও হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড উৎপন্ন করা সম্ভব।


$$2Ca(OCl)Cl+2HNO_3=Ca(NO_3)_2+CaCl_2+2HOCl$$

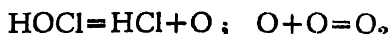

$$2Ca(OCl)Cl+CO_2+H_2O=CaCO_3+CaCl_2+2HOCl$$

কিন্তু ক্লোরাইড হইতে HCl উৎপন্ন করিতে সক্ষম এরূপ তীব্র কোন অ্যাসিড প্রয়োগে উৎপন্ন হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড ক্লোরিনে পরিণত হইয়া যাইবে, যথা :—


$$Ca(OCl)Cl+H_2SO_4=CaSO_4+HCl+HOCl$$


$$HCl+HOCl=H_2O+Cl_2$$

হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। ইহার জলীয় দ্রবণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগের বেশি গাঢ় করা সম্ভব নয়। লঘু দ্রবণ মোটা-মুটি স্থায়ী হইলেও ইহার গাঢ় দ্রবণ, বিশেষতঃ আলোর প্রভাবে, বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন এবং ক্লোরিনে পরিণত হইয়া যায় :—

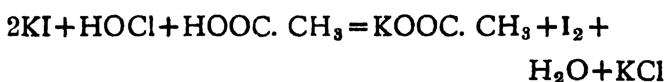

$$HOCl=HCl+O ; \quad O+O=O_2$$


$$HCl+HOCl=H_2O+Cl_2$$

এত সহজে অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়াই হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড বেশ তীব্র-জারকের কাজ করে। বস্তুতঃ, উহা হইতে যে জায়মান অক্সিজেন সঞ্জাত হয়, তাহাই জারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে।



$$Na_2SO_3 + HOCl = Na_2SO_4 + HCl$$



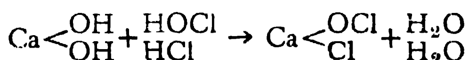
$$2KI + HOCl + HOOC.\,CH_3 = KOOC.\,CH_3 + I_2 + H_2O + KCl$$

হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড দ্রবণ বিরঞ্জকরূপে এবং বীজবারক রূপে ব্যবহারের হেতু উহার জায়মান অক্সিজেন প্রদান-ক্ষমতা। ক্লোরিনের মত, ইহাও জারণ-ক্রিয়ার দ্বারা বিরঞ্জন করে।

ম্যাগনেসিয়ামের সহিত হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে :— $Mg + 2HOCl = Mg(OCl)_2 + H_2$

২০-৩৩। বিরঞ্জক-চূর্ণ, ব্লীচিং পাউডার, Ca (OCl)Cl

—সাধারণতঃ ব্লীচিং পাউডার বা বিরঞ্জক-চূর্ণ নামে যাহা পরিচিত, উহার রাসায়নিক নাম, "ক্যালসিয়াম-ক্লোরো-হাইপোক্লোরাইট", $Ca{<}^{OCl}_{Cl}$। ইহাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড উভয়ের যুগ্ম-লবণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।



$$Ca{<}^{OH}_{OH} + {}^{HOCl}_{HCl} \rightarrow Ca{<}^{OCl}_{Cl} + {}^{H_2O}_{H_2O}$$

বিরঞ্জন-কার্যে এবং সংক্রামক জীবাণুর প্রতিষেধক হিসাবে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ইহার প্রস্তুতিতে নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। এখানে দুইটি প্রণালী বিবৃত করা হইল।

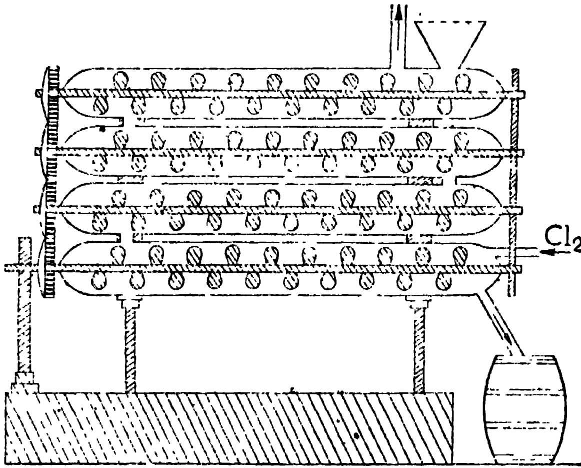
(১) সীসা নির্মিত প্রকোষ্ঠের সিমেণ্ট বা শিলাজতুর মেঝেতে প্রথমে প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া কলিচুন রাখা হয়। এই কলিচুন বেশ চূর্ণ অবস্থায় থাকা প্রয়োজন এবং উহাতে শতকরা ২৬ ভাগের অধিক জল থাকা উচিত নয়। উপরের দিকে একটি প্রবেশ-নলের সাহায্যে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে অনার্দ্র ক্লোরিন গ্যাস চালিত করা হয়। এই ক্লোরিন গ্যাসে সচরাচর আয়তন হিসাবে শতকরা ৪০ ভাগ ক্লোরিন বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে। কলিচুন ক্লোরিন শোষণ করে এবং ধীরে ধীরে বিরঞ্জক-চূর্ণে পরিবর্তিত হয়। যাহাতে যথাসাধ্য ক্লোরিন বিশোষিত হয় সেইজন্য মধ্যে মধ্যে কাঠের হাতা দ্বারা কলিচুন নাড়িয়া দিতে হয়। প্রকোষ্ঠটির উষ্ণতা ৪০° সেন্টিগ্রেডের অনধিক রাখা হয়। অধিকতর উষ্ণতায় বিরঞ্জক-চূর্ণ বিযোজিত হইয়া যায়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা এইরূপে রাখিয়া

দিলে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। বিক্রিয়া-শেষে প্রকোষ্ঠের দুয়ার খুলিয়া কিছু কলিচুনের গুঁড়া ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহা অবশিষ্ট ক্লোরিন টানিয়া লয়। তৎপর এই বিরঞ্জক-চূর্ণ কাঠের বা আলকাতরা মাখান লোহার পিপেতে করিয়া চালান দেওয়া হয়।



$$Ca(OH)_2 + Cl_2 = Ca(OCl)Cl + H_2O.$$

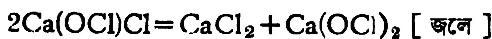
(২) হেজেনক্লেভারের যন্ত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত লঘু ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যেও কলিচুন হইতে বিরঞ্জক-চূর্ণ প্রস্তুত করা সম্ভব (চিত্র ২০৭)। ইহাতে কয়েকটি লৌহনির্মিত অনুভূমিক প্রশস্ত নল বা সিলিণ্ডার থাকে। উহাদের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে "স্ক্রু"র মত একটি দীর্ঘ আলোড়ক আছে।



চিত্র ২০৭—হেজেনক্লেভার যন্ত্রে বিরঞ্জক-চূর্ণ প্রস্তুতি

সকলের উপরে যে নলটি আছে উহাতে কলিচুন দেওয়া হয়। আলোড়ক-গুলি আস্তে আস্তে ঘুরিতে থাকে। আলোড়কের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলিচুন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে থাকে এবং অবশেষে নির্গম-পথে দ্বিতীয় নলে প্রবেশ করে। এইভাবে কলিচুন চারিটি নল অতিক্রম করে। ইত্যবসরে সর্বশেষ নলের ভিতর লঘু ক্লোরিন গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই ক্লোরিন কলিচুনের পথেই বিপরীত মুখে পরিচালিত হয়। সুতরাং কলিচুন ও ক্লোরিন নিবিড় সংস্পর্শে আসে এবং বিরঞ্জক-চূর্ণ উৎপন্ন হয়। সকলের নীচের নল হইতে বিরঞ্জক-চূর্ণ কাঠের পিপেতে ভরিয়া লওয়া যায়।

বিরঞ্জক-চূর্ণ একটি অনিয়তাকার পদার্থরূপে পাওয়া যায়। উহা জলে দ্রবীভূত হইয়া ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট মিশ্রণে পরিণত হয়।

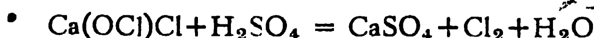


$$2Ca(OCl)Cl = CaCl_2 + Ca(OCl)_2 \text{ [জলে]}$$

মৃদু অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে বিরঞ্জক-চূর্ণ হইতে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড পাওয়া যায়। কিন্তু তীব্র অ্যাসিডের দ্রবণে ক্লোরিন নির্গত হয়।



$$2Ca(OCl)Cl + H_2CO_3 = CaCO_3 + CaCl_2 + 3HOCl$$

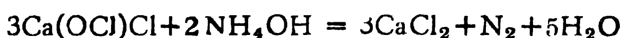


$$Ca(OCl)Cl + H_2SO_4 = CaSO_4 + Cl_2 + H_2O$$



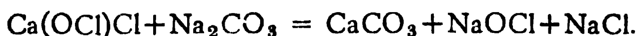
$$Ca(OCl)Cl + 2HCl = CaCl_2 + Cl_2 + H_2O$$

বলা বাহুল্য, এই নির্গত ক্লোরিনের জন্যই ইহার বিরঞ্জন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিরঞ্জক-চূর্ণের উপর গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণ করিলে, উহা হইতে নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয়।



$$3Ca(OCl)Cl + 2NH_4OH = 3CaCl_2 + N_2 + 5H_2O$$

সোডিয়াম কার্বনেট বিরঞ্জক-চূর্ণের সহিত বিক্রিয়া করে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট পাওয়া যায় :—



$$Ca(OCl)Cl + Na_2CO_3 = CaCO_3 + NaOCl + NaCl.$$

বিরঞ্জক-চূর্ণের জারণক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পটাসিয়াম আয়োডাইড হইতে উহা আয়োডিন উৎপাদন করে।



$$Ca(OCl)Cl + 2KI + 2HCl = CaCl_2 + 2KCl + H_2O + I_2$$

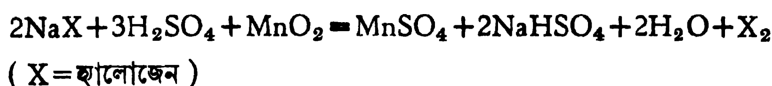
কোবাল্টের যৌগসমূহের উপস্থিতিতে বিরঞ্জক-চূর্ণ হইতে অক্সিজেন পাওয়া যায় :—



$$2Ca(OCl)Cl = 2CaCl_2 + O_2$$

বিরঞ্জন-প্রণালী : বস্ত্রাদি বিরঞ্জক-চূর্ণ সাহায্যে পরিষ্কৃত করিতে হইলে প্রথমে অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি বিরঞ্জক-চূর্ণের দ্রবণে ভিজাইয়া লইতে হয় এবং পরে উহাকে অত্যন্ত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে ধোয়া হয়। ইহাতে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। উহাই বিরঞ্জন করিয়া থাকে। অতঃপর অ্যাসিড দূরীভূত করার জন্য বস্ত্রগুলি সোডাতে ধুইয়া লওয়া হয় এবং পরে সোডিয়াম সালফাইট বা থায়োসালফেট দ্রবণে ধৌত করিয়া ক্লোরিন-মুক্ত করা হয়।

২০-৩৮। হ্যালোজেনসমূহের তুলনা: হ্যালোজেন চতুষ্টয় এবং উহাদের কয়েকটি সরল যৌগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। উহারা পর্যায় সারণীতে একই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে এবং বস্তুতঃ উহাদের ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। উহাদের প্রায় সমস্ত ধর্মই অনুরূপ, কেবল ফ্লোরিন অত্যধিক সক্রিয় বলিয়া উহার কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক ধর্ম দেখা যায়। এই সকল ধর্মের মাত্রা অবশ্য পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে বা কমিতে থাকে। ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন আবার একই উপায়ে প্রস্তুত করাও হয়:—



$$2NaX + 3H_2SO_4 + MnO_2 = MnSO_4 + 2NaHSO_4 + 2H_2O + X_2$$

(X = হ্যালোজেন)

ইহারা সকলেই অধাতব মৌল, সুতরাং অপরাবিদ্যুৎগুণসম্পন্ন মৌলিক-পদার্থ। এই অপরাবিদ্যুৎগুণ অবশ্য ক্লোরিন হইতে আয়োডিন পর্যন্ত ক্রম-পর্যায়ে হ্রাস পাইতে থাকে। প্রত্যেকটি হ্যালোজেনই জারণগুণসম্পন্ন এবং বিরঞ্জকরূপে কাজ করে। পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এই গুণগুলি কমিয়া যায়। উহাদের হাইড্রোজেন যৌগসমূহের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ৩০৭-৩০৮ পৃষ্ঠায় উহাদের ধর্মগুলির একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল:—

ধর্ম	ফ্লুরিন	ক্লোরিন	ব্রোমিন	আয়োডিন
১। পারমাণবিক গুরুত্ব	১৯	৩৫.৫	৮০	১২৭
২। সাধারণ অবস্থা, বর্ণ প্রভৃতি	ঈষৎ পীত গ্যাস	ঈষৎ সবুজ-পীত গ্যাস	ঘন-লাল তরল পদার্থ	কাল কঠিন পদার্থ, বাষ্পাকারে বেগনী
৩। ঘনত্ব (তরল অবস্থায়)	১.১১	১.৫৫	৩.১৯	৪.৯ (কঠিন)
৪। স্ফুটনাঙ্ক	—১৮৭°	—৩৪°	৫৯°	১৮৪°
৫। জলের উপর ক্রিয়া	HF এবং O_3 উৎপন্ন হয়	আস্তে আস্তে HCl এবং O_2 গ্যাসে পরিণত হইতে থাকে	HBr এবং O_2 গ্যা'স পরিণত হয়, বিশেষতঃ সূর্যালোকে	কোন ক্রিয়া হয় না
৬। জৈবপদার্থের উপর ক্রিয়া	বিনষ্ট হইয়া থাকে	হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে	হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে	কোন ক্রিয়া দেখা যায় না
৭। হাইড্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া	বিস্ফোরণপূর্বক সংযোগ সংঘটিত হয়	তীব্র আলোকপাতে বিস্ফোরণ হয় বটে, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ধীরে ধীরে HCl উৎপন্ন হয়	তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া HBr উৎপন্ন হয়	আংশিক HI অ্যাসিড তাপ ও প্রভাবক সাহায্যে উৎপন্ন করা সম্ভব

ধর্ম	ফ্লুরিন	ক্লোরিন	ব্রোমিন	আয়োডিন
৮। মৌল পদার্থের সহিত ধাতু—	সকল ধাতুই আক্রান্ত হয় এবং প্রজ্বলিত হইয়া থাকে।	সকল ধাতুই আক্রান্ত হয় এবং অধিকাংশই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে।	অধিকাংশ ধাতুই আক্রান্ত হয়।	অনেক ধাতুর সহিত সরাসরি মিলিত হয়।
অধাতু—	N_2, O_2, C ব্যতীত সবাই আক্রান্ত হয়	N_2, O_2, এবং C ছাড়া সবাই আক্রান্ত হয়।	N_2, O_2, C, Si ছাড়া সবাই আক্রান্ত হয়	কেবলমাত্র P, As, halogens-এর সহিত যুক্ত হয়
৯। ক্ষারের সহিত বিক্রিয়া :— (ক) লঘু দ্রবণ	ফ্লোরাইড, ক্লোরিন মনোক্সাইড ইত্যাদি পাওয়া যায়।	Cl', OCl' ও জল উৎপন্ন হয়	Br', OBr' ও জল উৎপন্ন হয়।	I', OI' এবং জল পাওয়া যায়।
(খ) গাঢ় দ্রবণ	ফ্লোরাইড, অক্সিজেন ইত্যাদি পাওয়া যায়	Cl' ও ClO_3' এবং জল উৎপন্ন হয়	Br', BrO_3' ও জল উৎপন্ন হয়	I', IO_3' এবং জল পাওয়া যায়।
১০। উহাদের হাইড্রোজেন যৌগসমূহ :—	HF	HCl	HBr	HI
(ক) স্থায়িত্ব	উত্তাপে কিছুই হয় না	১৫০০° সেণ্টি. বিয়োজন শুরু হয়	৮০০° উপরে বিযোজন আরম্ভ হয়	সূর্যালোকে বা ১৮০° বিযোজন আরম্ভ হয়
(খ) জলে দ্রাব্যতা (০° উষ্ণতায়)	৪০%	৪৩%	৬০%	৯০%

বিভিন্ন হ্যালোজেনের অক্সিজেন যৌগসমূহ অবশ্য বিভিন্ন রকমের। ফ্লুরিনের কোন অক্সি-অ্যাসিড নাই। অপর তিনটির অক্সি-অ্যাসিড সব একরূপ নহে।

একবিংশ অধ্যায়

ফসফরাস

সঙ্কেত, P_4।   পারমাণবিক গুরুত্ব, ৩০.৯৮।   ক্রমাঙ্ক, ১৫।

হ্যামবুর্গের চিকিৎসক ব্র্যাণ্ড (Brand) ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মূত্র হইতে ফসফরাস আবিষ্কার করেন। উহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে গ্যান (Gahn) প্রমাণ করেন যে অস্থিতেও ফসফরাস বিদ্যমান। উহার পরের বৎসরেই শীলে অস্থিচূর্ণ হইতে ফসফরাস প্রস্তুত করার উপায়টি উদ্ভাবন করেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাভয়সিয়র কর্তৃক উহার মৌলত্ব প্রমাণিত হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলো বিকিরণ করে, অর্থাৎ অনুপ্রভ, এই জন্য উহার নামকরণ হয় ফসফরাস (Phos, আলো : pheres, ধারণ করা)।

প্রকৃতিতে ফসফরাস মৌলাবস্থায় পাওয়া যায় না। উহার বিভিন্ন যৌগের ভিতর ক্যালসিয়াম ফসফেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাড়ের ভিতর শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে। এতদ্ব্যতীত বহু খনিজ পদার্থেও ফসফেট যৌগ থাকে :

(১) ফ্লুর-অ্যাপেটাইট (Flour-apatite) $3Ca_3(PO_4)_2, CaF_2$

(২) ক্লোর-অ্যাপেটাইট (Chlor-apatite), $3Ca_3(PO_4)_2, CaCl_2$

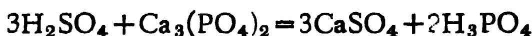
(৩) ফসফোরাইট (Phosphorite), $Ca_3(PO_4)_2$ ইত্যাদি

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের ফসফো-প্রোটিন যৌগে ফসফরাস আছে। দুধের ক্যাজেইন, ডিমের ভাইটেলীন উহার দৃষ্টান্ত।

২১-১। অস্থিভস্ম হইতে ফসফরাস প্রস্তুতি :

প্রথমতঃ অস্থিসমূহ ছোট ছোট টুকরা করিয়া জলে ফুটাইয়া পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। তৎপর CS_2 দ্রাবকদ্বারা উহা হইতে স্নেহ ও চর্বিজাতীয় পদার্থগুলি নিষ্কাশিত করা হয় এবং অতিতপ্ত স্টীমের ভিতর অস্থিগুলি সিদ্ধ করিয়া লইলে উহার আঠা ও জিলাটিন জাতীয় জৈবপদার্থগুলি দূর হয়। অতঃপর একটি আবদ্ধ লৌহপাত্র হইতে উহার অন্তর্ধূমপাতন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে অস্থিসমূহ একটি কালো বিচূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে প্রাণীজ অঙ্গার বলে। ইহা কার্বন ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের মিশ্রণ। প্রাণীজ অঙ্গারটিকে বাতাসে ভস্মীভূত করিলে ইহা একটি শ্বেতাভ পদার্থে পরিণত হয়—ইহাই "অস্থিভস্ম" (Bone ash)। ইহাতে ৮০% ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে।

মোটামুটি রকমের গাঢ় ও তপ্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া বিচূর্ণ অস্থিভস্মকে ক্যালসিয়াম সালফেট ও ফসফরিক অ্যাসিডে পরিণত করা হয়।

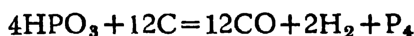


$$3H_2SO_4+Ca_3(PO_4)_2=3CaSO_4+2H_3PO_4$$

অদ্রব $CaSO_4$ ছাঁকিয়া সরাইয়া লওয়া হয় এবং ফসফরিক অ্যাসিডের দ্রবণ পাওয়া যায়। অতঃপর ক্রমাগত বাষ্পীভবনদ্বারা গাঢ় করিয়া ঐ দ্রবণটিকে সিরাপে পরিণত করা হয়। এই সিরাপটির সহিত কার্বন বা চারকোলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মিশ্রণটিকে লোহার কড়াইতে সম্পূর্ণ বিশুষ্ক করা হয়। অগ্নিসহ মৃত্তিকার বকযন্ত্রে এই শুষ্ক অবশেষটি শ্বেততপ্ত করা হয়। বকযন্ত্রের মুখটি জলের নীচে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। উত্তাপে ফসফরিক অ্যাসিড বিযোজিত হইয়া প্রথমে মেটা-ফসফরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং পরে উহা কার্বনদ্বারা বিজারিত হইয়া ফসফরাসে পরিবর্তিত হয়। H_2, CO এবং ফসফরাস—বিক্রিয়াজাত এই তিনটি পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় নির্গত হয়। জলের সংস্পর্শে আসিয়া ফসফরাস ঘনীভূত হইয়া কঠিনাকার ধারণ করে, কিন্তু H_2 এবং CO বাহির হইয়া চলিয়া যায়।



$$H_3PO_4=HPO_3+H_2O$$



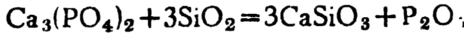
$$4HPO_3+12C=12CO+2H_2+P_4$$

ফসফরাস বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই অক্সাইডে পরিণত হইতে থাকে। সুতরাং, সর্বদা ইহাকে জলের ভিতরে রাখা হয়।

২১-২। খনিজ ফসফরাইট হইতে ফসফরাস প্রস্তুতি ঃ এই পদ্ধতিটিকে সচরাচর "বৈদ্যুতিক প্রণালী" বলে। আবার প্রবর্তনকারীদের নামানুযায়ী পদ্ধতিটিকে রীডম্যান-পার্কার-রবিনসন প্রণালীও বলা হয়। খনিজ ক্যালসিয়াম ফসফেটকে বালু (সিলিকা) এবং কার্বনের সহিত উত্তপ্ত করিলে ফসফরাস পাওয়া যায়। ইহাতে অত্যধিক উষ্ণতার প্রয়োজন এবং এই তাপ প্রয়োগের জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়।

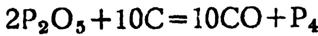
অগ্নিসহ-ইষ্টক নির্মিত একটি আবদ্ধ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এই বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। চুল্লীটির নীচের দিকে কার্বনের দুইটি তড়িদ্দ্বার আছে। এই তড়িদ্দ্বার দুইটির ভিতর তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ বা আর্ক দ্বারা উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়।

চুল্লীর উপরিস্থিত একটি চোঙ্গের ভিতর দিয়া খনিজ ফসফেট, কার্বন ও সিলিকার একটি মিশ্রণ বিচূর্ণ অবস্থায় দেওয়া হয়। উহা একটি "স্ক্রু"-প্রবেশ-পথের মধ্য দিয়া চুল্লীর অভ্যন্তরে যায় এবং উত্তপ্ত হয়। ১২০০ সেণ্টিগ্রেডেরও অধিক উষ্ণতায় ক্যালসিয়াম ফসফেট ও সিলিকার বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইহার ফলে ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড উৎপন্ন হয় (চিত্র ২১ক)।

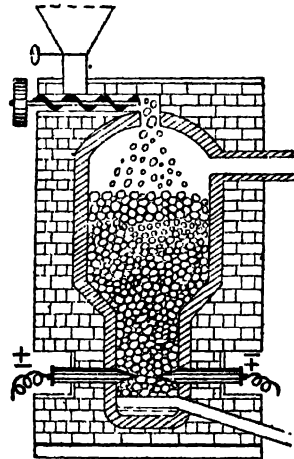


$$Ca_3(PO_4)_2+3SiO_2=3CaSiO_3+P_2O_5$$

ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড পরে কার্বনদ্বারা বিজারিত হইয়া CO এবং ফসফরাস মৌলে পরিণত হয়। উত্তপ্ত বলিয়া এই ফসফরাস বাষ্পীয় অবস্থায় CO-এর সহিত চুল্লীর উপরের একটি নির্গম-পথে বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস জলের ভিতর পরিচালিত করা হয়। ফসফরাস কঠিনাকারে জলের নীচে সঞ্চিত হয়, কার্বন-মনোক্সাইড বাহির হইয়া যায়।



$$2P_2O_5+10C=10CO+P_4$$



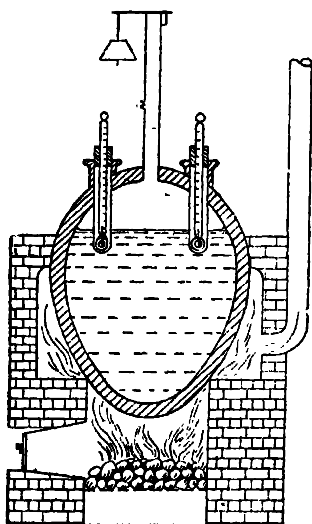
চিত্র—২১ক

উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সিলিকেট এই উষ্ণতায় গলিয়া যায় এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বস্তুসহ একটি ধাতুমলের সৃষ্টি করে। ইহা চুল্লীর নীচে সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজন মত একটি সরু নির্গমপথে নিষ্ক্রামিত হয়।

এইভাবে যে ফসফরাস পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং ইহাকে ক্রোমিক অ্যাসিডের দ্রবণে রাখিয়া গলান হয়। ক্রোমিক অ্যাসিড ফসফরাসের সহিত মিশ্রিত অপদ্রব্যগুলিকে জারিত করিয়া দূর করে। পরে এই গলান ফসফরাস জলের নীচে ক্যানভ্যাস বা chamois leather সাহায্যে ছাঁকিয়া ছোট ছোট যষ্টির আকারে ঢালাই করিয়া লওয়া হয়। এইভাবে বিশুদ্ধতর ফসফরাস প্রস্তুত হয়।

২১-৩। ফসফরাসের বহুরূপতা: উপরি-বর্ণিত উপায়ে যে ফসফরাস প্রস্তুত হয় তাহাকে শ্বেত বা কখনও পীত ফসফরাস বলা হয়। ফসফরাস একটি বহুরূপী মৌল। উহার একাধিক রূপভেদ আছে, তন্মধ্যে

শ্বেত ও লোহিত ফসফরাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রকারের ফসফরাসের মধ্যে অবস্থাগত ধর্মের পার্থক্য ত আছেই, রাসায়নিক ধর্মেরও অনৈক্য বিদ্যমান।



চিত্র ২১খ
লোহিত ফসফরাস প্রস্তুতি

লোহিত-ফসফরাস সর্বদাই শ্বেত ফসফরাস হইতে প্রস্তুত হয়। একটি আবদ্ধ লৌহ-পাত্রে নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া শ্বেত ফসফরাস ২৪০ -২৫০° পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে উহা লোহিত ফসফরাসে পরিণত হয়। পরিবর্তনটি সহজসাধ্য করার জন্য প্রভাবক হিসাবে একটু আয়োডিন মিশ্রিত করা হয় (চিত্র ২১খ)।

$$P\ (\text{শ্বেত}) \xrightarrow{২৫০} P\ (\text{লোহিত})$$

এই বিক্রিয়াটি তাপ-উদ্গারী, এবং দ্রুত নিষ্পন্ন হইলে অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হইয়া বিস্ফোরণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া এই প্রক্রিয়ার সময় উষ্ণতা কখনও ২৫০° সেণ্টিগ্রেডের অধিক করা হয় না। উৎপন্ন কঠিন লোহিত ফসফরাসের সহিত কিছু শ্বেত ফসফরাস মিশ্রিত থাকে। সেই জন্য উহাকে চূর্ণ করিয়া কষ্টিক সোডার গাঢ় দ্রবণের সহিত ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে লোহিত ফসফরাসের কিছু হয় না, কিন্তু শ্বেত ফসফরাস ফসফিন ও সোডিয়াম হাইপোফসফাইটে পরিণত হইয়া যায়। জলে ধুইয়া ও শুকাইয়া লোহিত ফসফরাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহা বায়ুতে সহজে জারিত হয় না। সুতরাং, জলের নীচে রাখার প্রয়োজন নাই।

লোহিত ফসফরাসকে ৫০০° ডিগ্রীরও অধিক উষ্ণতায় বাষ্পীভূত করিয়া পাতিত করিলে উহা আবার শ্বেত ফসফরাসে পরিণত হয়।

২১-৪। ফসফরাসের ধর্ম: শ্বেত ফসফরাস :—
(১) ইহা শ্বেত বা পীতাভ নিয়তাকার কঠিন পদার্থ। কিন্তু ইহার কাঠিন্য খুব কম এবং মোমের মত ইহাকে ছুরির সাহায্যে কাটা যায়। জলে ইহা অদ্রাব্য,

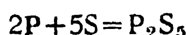
কিন্তু কার্বন ডাইসালফাইড, বেনজিন, তার্পিন ও অলিভ তেলে ইহা দ্রবীভূত হয়। শ্বেত ফসফরাস একটি বিষ।

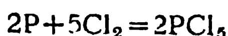
(২) অক্সিজেন বা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই শ্বেত ফসফরাস জারিত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যদি ৩০° সেণ্টিগ্রেডের অধিক হয় তাহা হইলে এই জারণের সময় ফসফরাস জ্বলিয়া ওঠে এবং একটি ঈষৎ সবুজ শিখার সৃষ্টি করে। জারণের ফলে সাধারণতঃ ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ইহার দহনের সময় যে আলোক-শিখা উৎপন্ন হয় তাহা কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা; ইহা স্পর্শ করিলেও কোন তাপ অনুভূত হয় না। অন্য বস্তুর সহিত স্বল্প পরিমাণে (লক্ষভাগে একভাগ) মিশ্রিত থাকিলেও এই আভা হইতে ফসফরাসের উপস্থিতি জানা সম্ভব। ইহাকেই ফসফরাসের অনুপ্রভা বলে। বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে মনে হয়, ফসফরাসের এই স্বতঃদহনের (auto-oxidation) সময় বাতাসে কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি প্রয়োজন। অত্যন্ত শুষ্ক অক্সিজেনে ফসফরাসের জারণ হইতে চায় না। তার্পিন তেল, কোহল প্রভৃতি থাকিলেও ফসফরাসের জারণ অনেকটা নিবারিত হয়। অতএব ইহারা বাধকের কাজ করে।

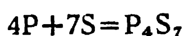
শ্বেত ফসফরাস যদি বাতাসে উত্তপ্ত করা হয় তাহা হইলে ফসফরাস-পেণ্টোক্সাইডের ধূম নির্গত হইতে থাকে। $4P+5O_2=2P_2O_5$.

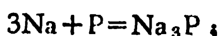
(৩) বিভিন্ন হ্যালোজেন ও সালফারের সহিত সোজাসুজি যুক্ত হইয়া শ্বেত ফসফরাস ভিন্ন ভিন্ন যৌগের সৃষ্টি করে। কোন কোন ধাতুর সহিতও ইহার রাসায়নিক সংযোগ হইতে দেখা যায়। এই সকল বিক্রিয়াকালে প্রায়ই উহা জ্বলিয়া ওঠে এবং তাপ ও আলো উদ্গীরণ করে।

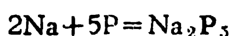

$2P+3Cl_2=2PCl_3$


$2P+5S=P_2S_5$

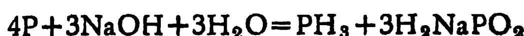

$2P+5Cl_2=2PCl_5$


$4P+7S=P_4S_7$


$3Na+P=Na_3P$;

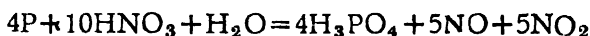

$2Na+5P=Na_2P_5$

(৪) কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাস ইত্যাদি তীক্ষ্ণক্ষারের দ্রবণের সহিত শ্বেত ফসফরাস ফুটাইলে উহা ফসফিন গ্যাস ও হাইপোফসফাইট লবণে পরিণত হয়:—


$$4P+3NaOH+3H_2O=PH_3+3H_2NaPO_2$$

(এই ফসফিন গ্যাসের ধর্ম অনেকাংশে অ্যামোনিয়ার মত। এই গ্যাসটিও ক্ষারধর্মী।)

(৫) শ্বেত ফসফরাস বিজারক হিসাবেও ক্রিয়া করে। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও শ্বেত ফসফরাস একত্র ফুটাইলে অ্যাসিড বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন অক্সাইডে পরিণত হয়, এবং ফসফরাস জারিত হইয়া ফসফরিক অ্যাসিড হয়।

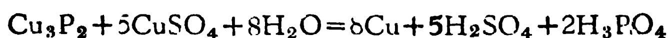


$$4P+10HNO_3+H_2O=4H_3PO_4+5NO+5NO_2$$

কপার, সিলভার ও গোল্ডের লবণের দ্রবণে শ্বেত ফসফরাস দিলে ঐ সমস্ত লবণ বিজারিত হইয়া উহাদের ধাতু অধঃক্ষিপ্ত হয়।



$$4P+3CuSO_4+6H_2O=Cu_3P_2+2H_3PO_3+3H_2SO_4$$



$$Cu_3P_2+5CuSO_4+8H_2O=8Cu+5H_2SO_4+2H_3PO_4$$

লোহিত ফসফরাস ঃ ইহা একটি লাল রঙের মোটামুটি অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। খুব সম্ভবতঃ ইহা বিভিন্ন প্রকারের ফসফরাস মৌলের মিশ্রণ। ইহার ঘনত্ব ২·১৬, ইহার কোন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই, তবে ৫৯০° ডিগ্রীর উপর ইহা নরম হইতে থাকে এবং আরও অধিক উষ্ণতায় পাতিত হইয়া শ্বেত-ফসফরাসে পরিণতি লাভ করে। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না এবং অন্যান্য (CS_2 ইত্যাদি জৈবদ্রাবকেও অদ্রবণীয়। শ্বেত ফসফরাসের মত ইহার বিষক্রিয়া নাই।

বাতাসে লোহিত ফসফরাস সহজে জারিত হয় না। ২৬০ সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় অবশ্য ইহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় এবং যথারীতি ফসফরাস পেন্টোক্সাইড উৎপাদন করে। হ্যালোজেনের সহিত লোহিত ফসফরাস সহজেই যুক্ত হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণক্ষার ($NaOH$) দ্রবণের সহিত ইহার কোন বিক্রিয়া হয় না। লোহিত ফসফরাসের কোন উল্লেখযোগ্য বিজারণ দেখা যায় না।

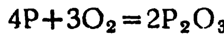
ফসফরাসের ব্যবহার ঃ শ্বেত ফসফরাসের অধিকাংশই লোহিত ফসফরাস তৈয়ারী করিতে ব্যবহার করা হয়। সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম হাইপোফসফাইট, ফসফরাস পেন্টোক্সাইড প্রভৃতি ফসফরাসের বিভিন্ন যোগ প্রস্তুত করিতেও শ্বেত ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত যোগপদার্থের বাজারে চাহিদা আছে।

লোহিত ফসফরাস বর্তমানে সমস্ত দিয়াশলাইতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে অবশ্য লুসিফার 'দীপ-শলাকাতে' শ্বেত ফসফরাসও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলিয়া ঐরূপ দিয়াশলাই বর্তমানে প্রস্তুত হয় না।

২১-৫। ফসফরাসের অক্সাইড ও অক্সি-অ্যাসিড-সমূহঃ ফসফরাসের অনেক অক্সাইড এবং অক্সি-অ্যাসিড আছে, তন্মধ্যে যে কয়টি সহজলভ্য ও সচরাচর ব্যবহৃত শুধু তাহাদের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

অক্সাইড	অক্সি-অ্যাসিড
(১) ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড, P_2O_3	(১) ফসফরাস অ্যাসিড, H_3PO_3
(২) ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড, P_2O_5	(২) অর্থো-ফসফরিক অ্যাসিড, H_3PO_4
	(৩) পাইরো-ফসফরিক অ্যাসিড, $H_4P_2O_7$
	(৪) মেটাফসফরিক অ্যাসিড, HPO_3

২১-৬। ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড, P_2O_3ঃ একটি কাচের নলে শ্বেত ফসফরাস লইয়া উহার উপর দিয়া খুব আস্তে আস্তে একটি বায়ুপ্রবাহ পরিচালনা করা হয় এবং ফসফরাসটি জ্বলিতে থাকে। বায়ুপ্রবাহটি সতর্কতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাহাতে অধিক অক্সিজেন না থাকে। জারণের ফলে ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড বাষ্প উৎপন্ন হয়। উহার সহিত অবশ্য কিছু ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডও মিশ্রিত থাকে। বায়ুস্রোতের সহিত অক্সাইড বাষ্প একটি শীতক-নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। শীতক-নলটির চারিদিকে ঈষৎ গরম জল পরিচালিত করা হয় (৬০°C)। শীতক-নলের মধ্যে উহার শেষপ্রান্তে একটু কাচের উল থাকে। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড ঘনীভূত হইয়া কঠিন গুঁড়াতে পরিণত হয় এবং কাচের উলে আটকাইয়া থাকে। অধিকতর উদ্বায়ী ট্রাই-অক্সাইড গ্যাস কাচের উল অতিক্রম করিয়া একটি অত্যন্ত শীতল U-নলে প্রবেশ করে ও সেইখানে ঘনীভূত হয়। এইভাবে ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায় (চিত্র ২১গ)।



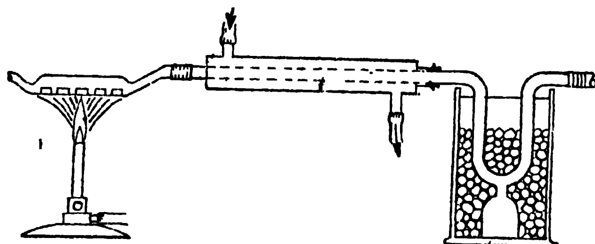
$$4P+3O_2=2P_2O_3$$

সাধারণ অবস্থায় ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড কঠিন বর্ণহীন স্ফটিকাকার। ইহা অম্লজাতীয় অক্সাইড এবং শীতল জলে দ্রবীভূত হইয়া ফসফরাস অ্যাসিডের সৃষ্টি করে :—



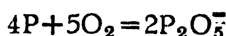
$$P_2O_3+3H_2O=2H_3PO_3$$

কিন্তু গরম জলে ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইড দিলে ছোটখাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয় এবং ফসফিন পাওয়া যায়, $2P_2O_3+6H_2O=PH_3+3H_3PO_4$



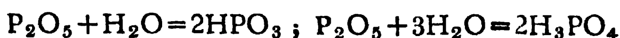
চিত্র ২১ গ—P_2O_3 প্রস্তুতি

২১-৭। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড, P_2O_5 : একটি বড় কাচের পাত্রে ছোট লোহার চামচে করিয়া অল্প অল্প শ্বেত ফসফরাস অতিরিক্ত বায়ুতে পোড়াইলেই ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড পাওয়া যায়। ইহা পাত্রটির তলদেশে সঞ্চিত হয়। পরে উহাকে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধতর করা যাইতে পারে।



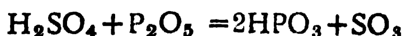
$$4P+5O_2=2P_2O_5$$

ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড সাধারণতঃ বিচূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। ২৫০° সেণ্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় ইহা ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া থাকে। ইহাও অম্ল-জাতীয় অক্সাইড। শীতলজলে দ্রবীভূত হইলে মেটা-ফসফরিক অ্যাসিড, কিন্তু গরম জলে দ্রবীভূত করিলে অর্থোফসফরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় :



$$P_2O_5+H_2O=2HPO_3 \;;\; P_2O_5+3H_2O=2H_3PO_4$$

বস্তুতঃ, জলের প্রতি ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের আসক্তি খুব বেশী। সুতরাং অন্য কোন বস্তু হইতে জল শোষণ করিয়া লইতে বা কোন গ্যাস হইতে জলীয় বাষ্প সরাইয়া লইতে ইহা উৎকৃষ্ট নিরুদকের কাজ করে। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি হইতে ইহার নিরুদনক্ষমতা অনেক বেশী। শুধু জলীয় বাষ্প নয়, কোন কোন অণু হইতেও ইহা জল টানিয়া লয় এবং উহাদের বিযোজিত করিয়া দেয়; যথা :—



$$H_2SO_4+P_2O_5=2HPO_3+SO_3$$



$$2HNO_3+P_2O_5=2HPO_3+N_2O_5$$

কাগজ, কাঠ ও অনেক জৈব পদার্থ P_2O_5 দ্বারা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

২১-৮। ফসফরাস অ্যাসিড, H_3PO_4: ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইডকে শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া অথবা ফসফরাস ট্রাই-ক্লোরাইডের আর্দ্র-বিশ্লেষণ দ্বারা ফসফরাস অ্যাসিড পাওয়া যায়।

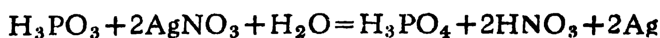


$$P_2O_3+3H_2O=2H_3PO_3, \quad PCl_3+3H_2O=H_3PO_3+3HCl$$

দ্রবণ হইতে ফসফরাস অ্যাসিড কঠিন সাদা স্ফটিকাকারে পাওয়া যাইতে পারে। উহার গলনাঙ্ক ৭৩°। ইহার বিজারণ গুণই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অক্সিজেন দ্বারা ইহা সহজেই জারিত হইয়া ফসফরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। কপার, সিলভার প্রভৃতির লবণের দ্রবণ হইতে ইহা ঐসকল ধাতু নিষ্কাশন করে।



$$2H_3PO_3+O_2=2H_3PO_4$$

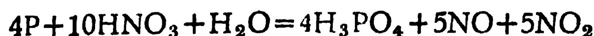


$$H_3PO_3+2AgNO_3+H_2O=H_3PO_4+2HNO_3+2Ag$$

২১-৯। অর্থো-ফসফরিক অ্যাসিড, H_3PO_4: ইহাকে সচরাচর ফসফরিক অ্যাসিডই বলা হয়। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া ফসফরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, কিন্তু গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত ফসফরাস ফুটাইয়া ইহা তৈয়ারী করাই ল্যাবরেটরীর সাধারণ রীতি।

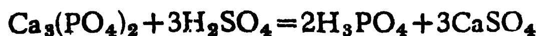


$$P_2O_5+3H_2O=2H_3PO_4$$



$$4P+10HNO_3+H_2O=4H_3PO_4+5NO+5NO_2$$

বেশী পরিমাণে সস্তায় ফসফরিক অ্যাসিড তৈয়ারী করিতে হইলে খনিজ ফসফরাইট অথবা অস্থিভস্মচূর্ণ নাতিগাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডসহ লৌহ-নির্মিত কড়াইতে ফুটাইয়া প্রস্তুত করা হয়। এই বিক্রিয়াতে যে ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়, তাহা অদ্রবণীয়। উহা ছাঁকিয়া পৃথক করিলেই ফসফরিক অ্যাসিডের দ্রবণ পাওয়া যায়। তাপ-সাহায্যে ইহাকে গাঢ় করিয়া ফসফরিক অ্যাসিডের সিরাপে পরিণত করা হয়।



$$Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4=2H_3PO_4+3CaSO_4$$

২১-১০। ফসফরিক অ্যাসিডের ধর্ম: বিশুদ্ধ ফসফরিক অ্যাসিড বর্ণহীন স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়। গলনাঙ্ক ৩৯° C। উহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ফসফরিক অ্যাসিডের অণু হইতে ধীরে ধীরে জল দূরীকৃত হইয়া যায় এবং ইহা বিভিন্ন অ্যাসিডে পরিণত হইতে থাকে। ২১৩° সেণ্টিগ্রেডে দুইটি-ফসফরিক অ্যাসিড অণু হইতে একটি জলের অণু নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহা পাইরো-ফসফরিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। এই ভাবেই পাইরো-ফসফরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়।



$$2H_3PO_4 \rightleftharpoons H_2O + H_4P_2O_7 \quad (২১৩° সেণ্টি.)$$

পাইরো-ফসফরিক অ্যাসিড আরও উত্তপ্ত করিলে (৩১৬° C) উহা হইতে আবার একটি জলের অণু বাহির হইয়া যায় এবং মেটা-ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



$$H_4P_2O_7 = H_2O + 2HPO_3 \quad (৩১৬° সেণ্টি.)$$

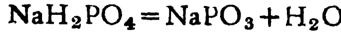
এই বিক্রিয়াগুলি প্রায়ই উভমুখী অর্থাৎ জলের সহিত মিলিয়া আবার পূর্বের ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফসফরিক অ্যাসিডের তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুই ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। অর্থাৎ, ইহা ত্রিক্ষারীয় অ্যাসিড। অতএব, ইহা হইতে তিন রকমের লবণ পাওয়া যাইতে পারে, NaH_2PO_4, Na_2HPO_4 এবং Na_3PO_4। একটি মাত্র হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলে প্রাইমারী, দুইটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলে সেকেণ্ডারী ও তিনটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন দ্বারা টারসিয়ারী ফসফেট পাওয়া যায়।

প্রাইমারী ফসফেট, যেমন,	NaH_2PO_4,	সোডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট,
	$Ca(H_2PO_4)_2$,	প্রাইমারী ক্যালসিয়াম ফসফেট।
সেকেণ্ডারী ফসফেট, যেমন,	Na_2HPO_4,	ডাই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট,
	$CaHPO_4$,	সেকেণ্ডারী ক্যালসিয়াম ফসফেট।
টারসিয়ারী ফসফেট, যেমন,	Na_3PO_4	ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট,
	$Ca_3(PO_4)_2$	ক্যালসিয়াম ফসফেট, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, ফসফরিক অ্যাসিডের দ্রবণকে ফিনলথ্যালিনের সাহায্যে তীক্ষ্ণ-ক্ষার দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করিলে উহার দুইটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় এবং সেকেণ্ডারী ফসফেট পাওয়া যায়। উহার সহিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্ষারদ্রবণ মিশ্রিত করিয়া টারসিয়ারী লবণ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাইমারী লবণগুলি অম্লজাতীয়, টারসিয়ারী লবণগুলি ক্ষারজাতীয় এবং সেকেণ্ডারী লবণগুলি প্রায় প্রশম অবস্থায় থাকে।

প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী ফসফেটগুলি তাপিত করিলে উহারা ভাঙিয়া যায় এবং যথাক্রমে মেটা-ফসফেট ও পাইরো-ফসফেটে পরিণত হয়।



$$NaH_2PO_4 = NaPO_3 + H_2O$$



$$2Na_2HPO_4 = Na_4P_2O_7 + H_2O$$

ফসফরিক অ্যাসিডের পরীক্ষা: (১) যে কোন ফসফরিক অ্যাসিড বা যে কোন ফসফেট গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ সহ ঈষৎ উষ্ণ করিলেই চমৎকার পীত অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।

(২) যে কোন ফসফেট লবণ কার্বনের উপর কোবাণ্ট নাইট্রেটসহ ফুৎশিখাতে উত্তপ্ত করিলে উহা গাঢ় নীল পদার্থে পরিণত হয়।

২১-১১। কৃত্রিম ফসফেট সার: প্রাণী ও উদ্ভিদ্ মাত্রেরই অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য ফসফরাসের নিতান্ত প্রয়োজন। উদ্ভিদ্ই ফলমূল, শাকসব্জী, বীজ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণতঃ প্রাণীজগৎকে এই ফসফরাস পরিবেশন করিয়া থাকে। তবে, মানুষ এবং অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী অবশ্য দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি প্রাণীজাত দ্রব্য হইতেও ফসফরাস গ্রহণ করে। উদ্ভিদ্ আবার মাটি হইতেই উহার প্রয়োজনীয় ফসফরাস সংগ্রহ করে। ফসফরাইট, অ্যাপেটাইট ইত্যাদি খনিজের কিয়দংশ মাটির সহিত মিশ্রিত থাকে। এই ফসফরাসের পরিমাণের উপর জমির উর্বরতা বিশেষ নির্ভর করে। ফসফরাস না থাকিলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। উদ্ভিদ্ মাটির ফসফেট গ্রহণ করিয়া উহাকে প্রোটিনে পরিণত করে। যে সকল উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জমির ফসফেট এই ভাবে অপসারিত করে, উহারা যদি সেই জমিতেই লয় বা ধ্বংস পাইত, তাহা হইলে অবশ্য জমির ফসফরাসের তারতম্য ঘটিত না। কিন্তু মানুষ একই জমিতে পুনঃ পুনঃ শস্য, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদন করে ও স্থানান্তরে প্রাণীজগতে তাহা বিস্তারিত করে। ফলে শস্য-উৎপাদনী জমির উর্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং জমিতে কৃত্রিম ফসফেট সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অস্থিভস্ম, ক্ষারক-ধাতুমল, কোন কোন ফসফরাস-খনিজ অবশ্য অনেক সময় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানে "সুপার ফসফেট" সার (Superphosphate of lime) ব্যবহার করা হয়। ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী এবং এই জন্য একটি রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

সমপরিমাণ ফসফরাইট খনিজ চূর্ণ ও সালফিউরিক অ্যাসিড (ঘনত্ব, ১·৫) একত্র মিশ্রিত করিলে উহাদের ভিতর বিক্রিয়া হয়। প্রাইমারী ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট ও ফসফরিক অ্যাসিডের একটি মিশ্রণ পাওয়া যায়। ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজন হয় এবং বিক্রিয়ার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে মিশ্রণের উষ্ণতা প্রায় ১০০°–১০৫° হয়। উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ একটি শুষ্ক কঠিন পদার্থরূপে পাওয়া যায়। ইহাকেই সুপার ফসফেট বলে। এই মিশ্রণটিকেই বিচূর্ণ করিয়া সার হিসাবে জমিতে দেওয়া হয়।



$$5Ca_3(PO_4)_2 + 11H_2SO_4 = 4CaH_4(PO_4)_2 + 2H_3PO_4 + 11CaSO_4$$

২১-১২। দিয়াশলাই: বলা বাহুল্য, ফসফরাস মৌলহিসাবে সকলের চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় দিয়াশলাই শিল্পে। পূর্বে অবশ্য দিয়াশলাই প্রস্তুতিতে শ্বেত ফসফরাসও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিষাক্ত বলিয়া উহার ব্যবহার এখন আইনবিরুদ্ধ। আজকাল দুই প্রকার দীপশলাকা প্রস্তুত হয়: (১) 'লুসিফার' জাতীয় দীপশলাকা—ইহাতে কাঠির মাথায় ফসফরাস সালফাইড ও লেড ডাই-অক্সাইড (PbO_2) কাচের গুঁড়া ও আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। যে কোন কঠিন জায়গায় ঘসিয়া উহাকে প্রজ্বলিত করা যায়। আমাদের দেশে এরকম দিয়াশলাই-এর প্রচলন বিশেষ নাই। (২) সাধারণের ব্যবহৃত দিয়াশলাইকে "সেফটি ম্যাচ" বা "নিরাপদ দীপশলাকা" বলা যাইতে পারে। উহার চলতি নাম, 'বিলাতী দিয়াশলাই'। ইহাদের জ্বালাইতে হইলে বিশেষভাবে প্রস্তুত রাসায়নিক মিশ্রণের সহিত ঘর্ষণ করা প্রয়োজন। ইহাদের কাঠির মাথায় অ্যান্টিমনি ট্রাই-সালফাইড (Sb_2S_3), লেড ডাই-অক্সাইড বা পটাস ক্লোরেট ও সালফার থাকে এবং ঘর্ষণ করার জন্য বাক্সের গায়ে লোহিত ফসফরাস, কাচ-চূর্ণ আঠার সাহায্যে মাখান থাকে।

এই সমস্ত দীপশলাকাতে P_4S_3 বা Sb_2S_3 বিজারকের কাজ করে এবং PbO_2, $KClO_3$ ইত্যাদি জারকের কার্য সম্পন্ন করে।

২১-১৩। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সাদৃশ্য: পর্যায়-সারণীতে এই দুইটি মৌল একই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে এবং বস্তুতঃ ইহাদের ভিতর অনেকটা মিল দেখা যায়।

(১) দুইটি মৌলিক পদার্থই অধাতব। সাধারণ অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাস এবং ফসফরাস কঠিনাকার। নাইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতিতে মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু ফসফরাস অত্যন্ত সক্রিয়, উহা কখনও মৌলরূপে প্রকৃতিতে থাকিতে পারে না। নাইট্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক, ফসফরাস চতুর্পরমাণুক।

(২) উভয়েই একাধিক রূপভেদে থাকিতে পারে, অর্থাৎ উহাদের বহুরূপতা আছে। *নাইট্রোজেন—সাধারণ ও সক্রিয়। ফসফরাস—শ্বেত ও লোহিত।*

(৩) উভয় মৌলই বহুযোজী। উহাদের প্রধান যোজ্যতা তিন ও পাঁচ। অন্যান্য যোজ্যতাও দেখা যায়:—NH_3, N_2O_5 ; PCl_3, P_2O_5।

(৪) উভয়ই প্রায় একইরূপ বিভিন্ন হাইড্রোজেন-যৌগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ।

নাইট্রোজেন—NH_3, N_2H_4, N_3H

ফসফরাস —PH_3, P_2H_4, $P_{12}H_6$

অ্যামোনিয়া ও ফসফিনের মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য বর্তমান এবং এই দুইটি হাইড্রোজেন যৌগই ক্ষারধর্মী।

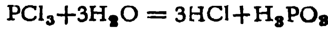
(৫) দুইটি মৌলেরই একাধিক অক্সাইড ও অক্সি-অ্যাসিড আছে। অক্সাইডসমূহের দুই-একটি প্রশম বটে, কিন্তু আর সবই অম্লজাতীয়, উহাদের ভিতরেও অনেকটা মিল দেখা যায়।

	নাইট্রোজেন	ফসফরাস
অক্সাইড,	N_2O, NO, N_2O_3 N_2O_4, N_2O_5	P_2O_3, P_2O_4 P_2O_5
অ্যাসিড,	HNO_2, HNO_3	H_3PO_2, H_3PO_3, H_3PO_4, HPO_3

(৬) উভয়েরই ক্লোরাইড অস্থায়ী ধরণের এবং খুব সহজেই আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া থাকে : —

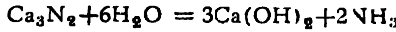


$$NCl_3+3H_2O = NH_3+3HOCl$$

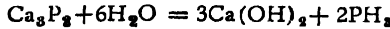


$$PCl_3+3H_2O = 3HCl+H_3PO_3$$

(৭) ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সহিত উহারা যুক্ত হইয়া যে সকল যৌগ উৎপন্ন হয়, সেগুলিও আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া থাকে এবং অ্যামোনিয়া বা ফসফিন উৎপাদিত হয় :—



$$Ca_3N_2+6H_2O = 3Ca(OH)_2+2NH_3$$



$$Ca_3P_2+6H_2O = 3Ca(OH)_2+2PH_3$$

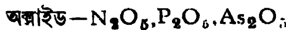
আর্সেনিক

সঙ্কেত As_4 । পারমাণবিক গুরুত্ব, ৭৪.৯, । ক্রমাঙ্ক, ৩৩।

আর্সেনিক মৌলটির ধর্মও অনেকটা নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অনুরূপ। তবে আর্সেনিকে সামান্য ধাতব গুণ বর্তমান, সেইজন্য আর্সেনিককে ধাতুকল্প বলা হয়। আর্সেনিকও বহুরূপী মৌল,—পীত, কালো এবং ধূসর—তিনরকম প্রকারভেদ আছে। আর্সেনিকও বহুযোজী—প্রধান যোজ্যতা তিন এবং পাঁচ। উহার নানাবিধ যৌগের সঙ্কেত ও ধর্মের বিচারেও আর্সেনিক নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের একপরিবারযুক্ত। যথা :—



হাইড্রাইড—NH_3, PH_3, AsH_3



অক্সাইড—N_2O_5, P_2O_5, As_2O_5



ক্লোরাইড—$NCl_3, PCl_3, AsCl_3$



অ্যাসিড—HNO_3, H_3PO_4, H_3AsO_4 ইত্যাদি।

আর্সেনিক যৌগাবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়া যায়। আর্সেনিক পাইরাইটিস, $FeAsS$; রিয়ালগার (মোমছাল), AsS ; অর্পিমেণ্ট (হরিতাল) As_2S_3 ; ইহার প্রধান আকরিক। পাইরাইটিস উত্তপ্ত করিলে ঊর্ধ্বপাতিত অবস্থায় আর্সেনিক মৌল পাওয়া যায়।



$$FeSAs=FeS+As$$

সাধারণ উষ্ণতায় উহা কঠিনাকার অবস্থায় থাকে এবং উহার একটি ধাতব দ্যুতি আছে। আর্সেনিক এবং উহার অধিকাংশ যৌগেরই শরীরের উপর তীব্র বিষক্রিয়া আছে। কোন কোন আর্সেনিক যৌগ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিক অক্সাইড হইতে নানারূপ রঙ প্রস্তুত হয়। সোডিয়াম আর্সেনাইট বস্ত্ররঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেতের আগাছা বিনষ্ট করিবার জন্য এবং কীটবিনাশক হিসাবে আর্সেনেট যৌগের ব্যবহার আছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সালফার

[গন্ধক]

সঙ্কেত, S। পারমাণবিক গুরুত্ব, ৩২·০৬। ক্রমাঙ্ক, ১৬।

আমাদের দেশে সালফার 'গন্ধক' নামেই পরিচিত এবং ইহার ব্যবহারও বহু প্রাচীন। হিন্দুসভ্যতার যুগেও ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং অন্যান্য শিল্পে গন্ধকের ব্যবহার হইত।

প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই সালফার পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। সিসিলি ও জাপানে যথেষ্ট সালফার আছে, কিন্তু সালফারের সর্বাপেক্ষা বড় খনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সালফারের প্রায় $\frac{8}{৫}$ অংশ আমেরিকা হইতে আসে। বিভিন্ন সালফাইড ও সালফেট রূপেও যথেষ্ট সালফার প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। যথা:—

(১) আয়রন পাইরাইটিস, FeS_2।

(২) কপার পাইরাইটিস, Cu_2S, Fe_2S_3।

(৩) গেলেনা, PbS। (৪) জিপসাম, $CaSO_4, 2H_2O$।

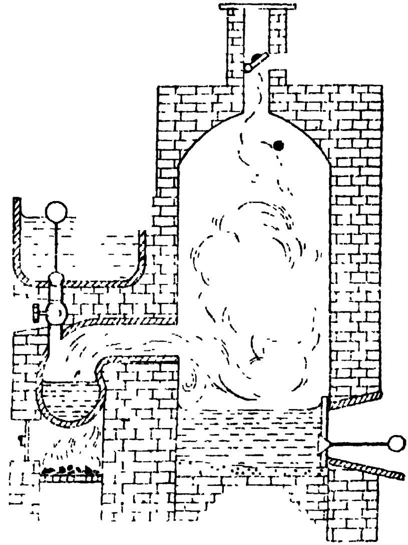
(৪) কাইসেরাইট, $MgSO_4, H_2O$।

অনেক জৈব-প্রোটিনেও সালফার বিদ্যমান। ভারতবর্ষে খনিজ সালফার-যৌগ আছে বটে, কিন্তু মৌল-অবস্থায় সালফার পাওয়াই যায় না। বেলুচিস্থানে সামান্য সালফার আছে। সুতরাং ভারতকে বিদেশ হইতে সালফার আমদানী করিতে হয়।

২২-১। **সালফার উৎপাদন:** মৌলাবস্থায়ই প্রকৃতিতে সালফার পাওয়া যায়। উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। প্রধানতঃ, সিসিলি ও আমেরিকা—এই দুই অঞ্চলে সালফার পাওয়া যায়। এই দুই অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।

(১) **সিসিলীয় পদ্ধতি:** সিসিলি দ্বীপে যে সালফার পাওয়া যায় উহাতে চুনাপাথর, জিপসাম, মাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে এবং সালফারের পরিমাণ শতকরা ২০-২৫ ভাগ মাত্র। সালফার-মিশ্রিত পাথরসমূহ প্রকাণ্ড ইটের চুল্লীতে স্তূপীকৃত করিয়া উহার উপরের অংশে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এই চুল্লীগুলি পাহাড়ের গায়ে তৈয়ারী করা হয় এবং উহার তলের

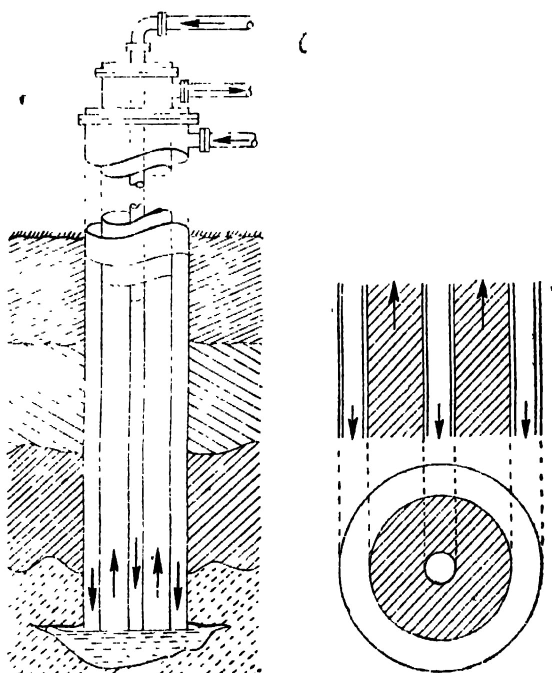
মেঝে একদিকে ঢালু থাকে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সালফার পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু এই উত্তাপে বাকী সালফার গলিয়া যায় এবং ঢালু মেঝে দিয়া গড়াইয়া আসিয়া নিম্নস্থ একটি চৌবাচ্চায় জমা হয়। পোড়ানর ফলে যথেষ্ট সালফার অপচয় হয় বটে, কিন্তু কয়লা ও জ্বালানী-কাঠ ইতালীতে এত মহার্ঘ যে ইহা ছাড়া আর উপায় নাই। উক্ত উপায়ে যে সালফার পাওয়া যায় উহাতে শতকরা ৫-৭ ভাগ মাটি ও অন্যান্য অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। পাতন-দ্বারা ইহাকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন, কিন্তু ইন্ধন-ব্যয়ের আধিক্য হেতু ইতালীতে তাহা করা সম্ভবপর নয়। ফরাসীর মার্সাই (Marseilles) বন্দরে উক্ত সালফার চালান দেওয়া হয়। সেখানে উহা বড় বড় লোহার কড়াইতে গলান হয়। গলিত গন্ধক অতঃপর একটি লোহার বকযন্ত্রে চুল্লীর উপর উত্তপ্ত করা হয়। বাষ্পীভূত হইয়া বকযন্ত্র হইতে একটি বিরাট ইষ্টক-প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে প্রথমে সালফার কঠিনাকারে জমে। পরে উষ্ণতা বাড়িয়া গেলে এই সমস্ত পাতিত বিশুদ্ধ সালফার গলিয়া তরলাকারে প্রকোষ্ঠের নীচে সঞ্চিত হয়। একটি নির্গমদ্বার দিয়া উহাকে বাহির করিয়া লইয়া ছোট ছোট বেলনের আকারে ঢালাই করিয়া লওয়া হয়। (চিত্র ২২ক)।



চিত্র ২২ক—সিসিলীয় সালফার

(২) **আমেরিকান পদ্ধতিঃ** আমেরিকায় সালফার ভূপৃষ্ঠ হইতে কয়েকশত ফিট নীচে পাওয়া যায়। ইহাকে তুলিবার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ব্যাসের তিনটি ঐককেন্দ্রীয় নল মাটির নীচে সালফার খনিতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (চিত্র ২২খ)। বহিঃস্থ নলটি দিয়া প্রায় ১০ অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপে অতিতপ্ত জল ১৮০° সেন্টিগ্রেডে পাম্পের সাহায্যে

প্রবেশ করান হয়। মধ্যস্থলে যে নলটি থাকে তাহার ভিতর দিয়া অত্যন্ত বেশী চাপে বাতাস ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে আসিয়া



চিত্র ২২খ—ফ্র্যাস প্রণালী

সালফার গলিয়া যায়। গলিত সালফারের ভিতর দিয়া অতিরিক্ত চাপে বাতাস যখন বুদ্‌বুদের আকারে পরিচালিত করা হয়, তখন সালফার ফেনায়িত হইয়া উঠে। মধ্যবর্তী তৃতীয় নলটি দিয়া এই সালফার-ফেনা উপরে উঠিয়া আসে। বড় বড় কাঠের চৌবাচ্চায় উহাদের শীতল করা হয়। এইভাবে সালফার সংগৃহীত করা হয়। ইহার বিশুদ্ধতা শতকরা প্রায় ৯৯.৫ ভাগ। এই পদ্ধতিটিকে 'ফ্র্যাস-প্রণালী' (Frasch Process) বলা হয়।

(৩) অনেক রাসায়নিক শিল্পে সালফারের যৌগ উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য হইতেও কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার প্রস্তুত করা হয়।

কয়লার অন্তর্ধূমপাতনের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে কোল-গ্যাস বলে। অনেক সময় ইহার সহিত হাইড্রোজেন সালফাইড মিশ্রিত থাকে। আর্দ্র ফেরিক অক্সাইডের উপর দিয়া কোল-গ্যাস পরিচালিত করিলে উহা হাইড্রোজেন সালফাইড শোষণ করিয়া লইয়া আয়রন সালফাইডে পরিণত হয়।



$$2Fe(OH)_3+3H_2S=Fe_2S_3+6H_2O$$

ফেরিক সালফাইড বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া পুনরায় পূর্বতন ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয় ও সালফার উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে সালফার সংগ্রহ করা যাইতে পারে :



$$2Fe_2S_3+3O_2+6H_2O=4Fe(OH)_3+6S$$

২২-২। সালফারের বহুরূপতা : সালফার মৌলটির বিভিন্ন রূপভেদ দেখা যায়। রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য বিশেষ না থাকিলেও উহাদের ভিতর অবস্থাগত ধর্মের যথেষ্ট বিভেদ আছে। নিম্নলিখিত রূপভেদগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) নিয়তাকার সালফার—(ক) α-সালফার বা অষ্টপলা গন্ধক।
(খ) β-সালফার বা প্রিজম্-সালফার।

(২) অনিয়তাকার সালফার—(ক) নমনীয় (Plastic) সালফার।
(খ) শ্বেত সালফার।
(গ) কলয়েড সালফার।

(৩) তরল সালফার— (ক) λ-সালফার।
(খ) μ-সালফার।

α-সালফার : সাধারণ অবস্থায় যে পীতাভ গন্ধক পাওয়া যায় উহাই α-সালফার। ইহা নিয়তাকার এবং উহার স্ফটিকে আটটি পৃষ্ঠ-তল আছে। ইহাকে অবশ্য রম্বিক (Rhombic) বা অষ্ট-পলা সালফারও বলা হয়। সালফারের অন্যান্য রূপভেদসমূহও সাধারণ অবস্থায় রাখিয়া দিলে উহা α-সালফারে পরিণত হইয়া যায়। ইহা কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত হয়। ইহার ঘনত্ব ২.০৬। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত করিলে ইহা ১১২.৮ সেন্টিগ্রেডে গলিয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে α-সালফার ৯৫.৫° ডিগ্রীতে β-সালফারে পরিণত হইতে থাকে।

β-সালফার : ইহাও নিয়তাকার গন্ধক। α-সালফার ৯৫.৫ ডিগ্রীর চেয়ে অল্প বেশী উষ্ণতায় রাখিয়া দিলে উহা β-সালফারে পরিণত হইয়া যায়।

সাধারণতঃ বিচূর্ণ ∝-সালফার একটি খর্পরে লইয়া গলান হয়। ইহা ১১৯.৫ ডিগ্রীতে গলিয়া একটি হলুদ তরল পদার্থ হয়। এই গলিত গন্ধক আস্তে আস্তে শীতল করিলে প্রথমে উহার উপরিভাগে একটি সর পড়ে। এই অবস্থায় উপরে একটি ছিদ্র করিয়া নিম্নস্থ তরল গন্ধকটুকু আস্তে আস্তে ঢালিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। খর্পরের ভিতরে সূচের মত দীর্ঘাকৃতি স্বচ্ছ হলুদ স্ফটিকের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যাইবে। ইহাই β সালফার (ঘনত্ব ১.৯৬)।

∝-সালফারের উষ্ণতা ৯৫.৫° ডিগ্রীর অধিক হইলেই উহা β-সালফারে পরিণত হয়, আবার β-সালফার এই উষ্ণতার নীচে আসিলেই ∝-সালফারে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অর্থাৎ, এই রূপান্তর উভমুখী। অবশ্য ৯৫.৫° ডিগ্রী এই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ∝ এবং β-উভয় সালফারের অস্তিত্বই সম্ভব। যে উষ্ণতায় এইরূপ উভমুখী রূপান্তর সংঘটিত হয় এবং যে উষ্ণতার ঊর্ধ্বে রূপভেদ-দ্বয়ের একটি এবং নিম্নে অপরটি স্থায়ী হয়, সেই উষ্ণতাকে পরিবর্তাঙ্ক (transition temp) বলা হয়। সালফারের পরিবর্তাঙ্ক ৯৫.৫°। $S\alpha \rightleftharpoons S\beta$।

β-সালফার ১১৯.৫ ডিগ্রীতে গলিয়া তরল হইয়া যায়। অতএব ইহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ—৯৫.৫° হইতে ১১৯.৫° এই দুইটি উষ্ণতার মধ্যেই β-সালফার পাওয়া যাইতে পারে। β-সালফারও কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবণীয়।

নমনীয় সালফার (Plastic Sulphur)ঃ সালফারের উপর উত্তাপের ক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ∝-সালফার লইয়া উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ৯৫.৫° ডিগ্রী উষ্ণতায় উহা β-সালফারে পরিবর্তিত হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া ১১৯.৫ ডিগ্রীতে উহা গলিয়া ঈষৎ হলুদ তরল সালফারে পরিণতি লাভ করে। আরও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে উহার রং গাঢ় হইতে থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরল সালফারের সান্দ্রতাও বাড়িতে থাকে এবং ১৮০° ডিগ্রীতে একটি গাঢ় কমলা রংয়ের অত্যন্ত সান্দ্র পদার্থ পাওয়া যায়। ২৩০° ডিগ্রীতে এই সান্দ্র পদার্থটি গাঢ়তর হইয়া প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থায় ইহার সান্দ্রতা এত বেশী থাকে যে পাত্রটি উপুড় কবিয়া দিলেও সালফার সহজে গড়াইয়া পড়ে না। আরও অধিক উষ্ণতায় উহার রংয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না, কিন্তু উহার সান্দ্রতা কমিয়া সচলতা (nobility) বাড়িয়া যায় এবং পরিশেষে উষ্ণতা ৪৪৪° ডিগ্রীতে পৌছাইলে উহা ফুটিতে থাকে এবং লাল রংয়ের সালফার বাষ্প উৎপন্ন করে। অর্থাৎ ইহার স্ফুটনাঙ্ক ৪৪৪° সেন্টিগ্রেড।

ফুটন্ত সালফারকে আবার আস্তে আস্তে শীতল করিতে থাকিলে বিপরীত দিকে এই পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন হয়। তরল অবস্থায় উহার ভিতর দুই প্রকারের সালফার অণু থাকে S_λ এবং S_μ। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের অনুপাত পরিবর্তিত হয় বলিয়াই তরল সালফারের বিভিন্ন সান্দ্রতা ও রংয়ের বিকাশ দেখা যায়।

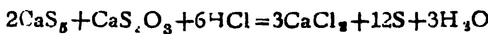
ফুটন্ত সালফার বা ২০০° ডিগ্রীর অধিক উত্তপ্ত তরল সালফারকে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ঢালিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে রবারের মত নমনীয় একটি সালফারের রূপভেদ পাওয়া যায়। ইহাকে নমনীয় গন্ধক বা প্লাস্টিক-সালফার বলা হয়। কেহ কেহ ইহার নামকরণ করেন, γ-সালফার। ইহাকে টানিয়া সহজেই লম্বা করা যায়। সাধারণ উষ্ণতায় রাখিয়া দিলে ইহা ধীরে ধীরে α-সালফারে পরিণত হয়। ইহা কার্বন ডাই-সালফাইডে অদ্রবণীয়।

শ্বেত-সালফার ঃ ফুটন্ত সালফার হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, উহা শীতল গ্রাহকের গায়ের সংস্পর্শে আসিয়া ছোট ছোট গুচ্ছ বা স্তবকে জড় হয়। ফুলের মত এই ঘনীভূত সালফারকে 'গন্ধক স্তবক' বা "গন্ধকরজ" (flowers of sulphur) বলে। এই স্তবকসমূহ কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত করিতে গেলে উহার একটি অংশ অদ্রবণীয় থাকিয়া যায়। তাহার রং প্রায় সাদা এবং উহা অনিয়তাকার। ইহাকেই শ্বেত-সালফার বলে।

আর এক প্রকার অনিয়তাকার শ্বেত-সালফারও তৈয়ারী করা যায়। উহাকে "মিল্ক অব সালফার" নাম দেওয়া হইয়াছে। কলিচুন ও সালফার চূর্ণ জলের সহিত একত্র ফুটাইয়া লইলে একটি লাল রংয়ের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে ক্যালসিয়াম পলিসালফাইড ও থায়োসালফেট থাকে। এই দ্রবণটি অপরিবর্তিত চুন ও সালফার হইতে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে অ্যাসিড দিলে সালফার উৎপন্ন হয়। ইহাও দেখিতে সাদা, কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবণীয়। ইহাই "মিল্ক অব সালফার"।



$$12S+3Ca(OH)_2=2CaS_5+CaS_2O_3+3H_2O$$



$$2CaS_5+CaS_2O_3+6HCl=3CaCl_2+12S+3H_2O$$

কলয়েড সালফার ঃ α-সালফার কোহলে প্রথমে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণটি যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে উহাতে সালফার খুব সূক্ষ্ম কণিকার আকারে বাহির হইয়া আসে। জল দুধের মত ঘোলাটে সাদা রং ধারণ করে। এই সালফার যদিও জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে না তবুও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া নীচে আসিয়া জমে না। কণাগুলি এত ছোট যে উহারা জলেই প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে এবং ফিলটার কাগজের সাহায্যেও

উহাদের ছাঁকিয়া লওয়া সম্ভব নয়। ইহাকে কলয়েড সালফার বলে (পৃ ৩২৯)। সোডিয়াম থায়োসালফেটের লঘু দ্রবণকেও কোন অ্যাসিড দ্বারা অম্লীকৃত করিলে কলয়েড সালফার উৎপন্ন হয়।



$$Na_2S_2O_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+H_2O+S+SO_2$$

২২-৩। সালফারের ধর্ম : (১) সালফার মৌলটি অ-ধাতু ; ইহা তাপ অথবা বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। ইহা জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু অনেক জৈবদ্রাবকে (CS_2, কোহল ইত্যাদি) ইহা বেশ দ্রবীভূত হয়। বহুরূপতাই এই মৌলটির প্রধান বিশেষত্ব। নিয়তাকার, অনিয়তাকার অথবা তরল, সব অবস্থাতেই ইহার একাধিক রূপভেদ দেখা যায়। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, ৯৫.৫ ডিগ্রীর অধিক উষ্ণতায় β-সালফার স্থায়ী হয়, কম উষ্ণতায় আবার α-সালফার স্থায়ী হয়। এই জন্য সালফারকে "বহুবৃত্তি মৌল" (enantiotorpic substance) বলা হয়।

যে সকল পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদে থাকে, তাহারাই বহুবৃত্তি-পদার্থ। আবার অনেক পদার্থের বিভিন্ন রূপভেদ থাকিলেও একটি মাত্র রূপভেদ স্থায়ী হয়। অপর রূপভেদসমূহ অস্থায়ী ধরণের এবং ঐ সব রূপভেদ সকল অবস্থাতেই স্থায়ী প্রকারে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই রকম পদার্থকে 'একবৃত্তি পদার্থ' (monotropic substance) বলে। যেমন, ফসফরাস।

(২) সালফার বাতাসে বা অক্সিজেনে নীলশিখাসহ পুড়িয়া থাকে। ইহাতে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। $S+O_2=SO_2$

(৩) অনেক মৌলের সহিত উহা উত্তপ্ত অবস্থায় সংযুক্ত হইয়া সালফাইড উৎপন্ন করে।



$$2S+Cl_2=S_2Cl_2$$



$$Cu+S=CuS$$



$$C+2S=CS_2$$

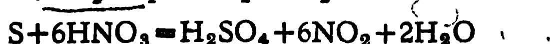


$$2Na+S=Na_2S$$

(৪) লঘু অ্যাসিড দ্রবণে সালফার আক্রান্ত হয় না বটে, কিন্তু গাঢ় অক্সি-অ্যাসিডের সহিত সালফার ফুটাইয়া লইলে উহা জারিত হইয়া যায় :

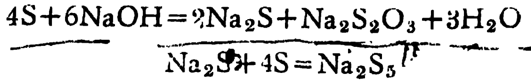


$$S+2H_2SO_4=3SO_2+2H_2O$$



$$S+6HNO_3=H_2SO_4+6NO_2+2H_2O$$

(৫) ক্ষারক দ্রবণের সহিত সালফার-চূর্ণ ফুটাইলে ধাতব সালফাইড ও থায়োসালফেট উৎপন্ন হয়। সালফারের পরিমাণ বেশী থাকিলে পলিসালফাইডও হইয়া থাকে।



$$4S + 6NaOH = 2Na_2S + Na_2S_2O_3 + 3H_2O$$

$$Na_2S + 4S = Na_2S_5$$

চুনের সহিতও এইরূপ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সালফারের ব্যবহার ঃ এই অধাতব মৌলটির ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। ইহার প্রধান উপযোগিতা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে। রবার প্রস্তুতিতেও ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকগণ মলম ও বিভিন্ন ঔষধ-প্রস্তুতিতে সালফার ব্যবহার করেন। বারুদের জন্যও ইহার প্রচুর প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনীয় বহু সালফার-যোগ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়, যেমন,

(১) কার্বন ডাই-সালফাইড (জৈবদ্রাবক), (২) সালফাইড রঞ্জক, (৩) ফসফরাস সালফাইড (দীপশলাকার জন্য), (৪) সোডিয়াম থায়োসালফেট (ফটোগ্রাফীর জন্য), (৫) ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট (বিরঞ্জক) ইত্যাদি।

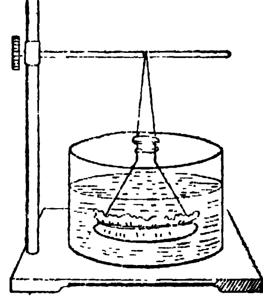
কীট-বিনাশক হিসাবেও শস্যক্ষেত্রে কখন কখন সালফার ব্যবহৃত হয়।

কলয়েড (Colloid) ঃ দ্রবণ বলিতে আমরা দ্রাব এবং দ্রাবকের সমসত্ত্ব মিশ্রণ বুঝি। বাস্তবিক পক্ষে দ্রবণীয় পদার্থের সহিত দ্রাবকের কোন রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না। কিন্তু একত্র হইলে দ্রাব পদার্থ ভাঙিয়া ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে এবং ওতঃপ্রোতভাবে দ্রাবকের সহিত মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণটি এত সুনিবিড় যে বাহ্যতঃ দ্রাব এবং দ্রাবকের প্রভেদ বুঝা যায় না। বস্তুতঃ দ্রাব পদার্থটি ভাঙিয়া উহার অণুতে পরিণত হয় এবং এই অদৃশ্য অণুগুলি সমানভাবে সমস্ত পরিমাণ দ্রাবকের সহিত মিশিয়া যায়। অণুর ব্যাসের পরিমাণ $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার বা অনুরূপ মাত্রার। অতএব কোন পদার্থ যখন দ্রবীভূত হয় তখন উহার কণাগুলির ব্যাস $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার বা তদনুরূপ মাত্রার হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিনি, লবণ প্রভৃতি যখন জলে দ্রবীভূত হয়, উহাদের যে সকল কণা জলের সহিত মিশিয়া থাকে তাহাদের ব্যাসের পরিমাণ মোটামুটি ১×১০^{-৮}, ২×১০^{-৮}, ৫×১০^{-৮} ইত্যাদি এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব, যদি কোন পদার্থ কোন দ্রাবকের সহিত মিশ্রণের ফলে ভাঙিয়া $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার ব্যাসের কণায় অর্থাৎ অণুতে পরিণত হয় তাহা হইলে উহা দ্রবীভূত হইয়াছে বলিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, কোন অদ্রবণীয় পদার্থ কোন দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে সাধারণতঃ উহা থিতাইয়া পাত্রের নীচে সঞ্চিত হয়। কিন্তু অদ্রাব্য পদার্থটি যদি খুব ছোট ছোট কণার আকারে থাকে যাহাদের ব্যাস ১০$^{-৪}$ সেন্টিমিটারের চেয়ে কম তবে উহা থিতাইয়া যাইতে পারে না। অদ্রাব্য পদার্থের সূক্ষ্মকণাগুলি দ্রাবকের ভিতরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে। কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে চোখে বা সাধারণ অণুবীক্ষণে উহাদিগকে দেখা যায় না। মনে হয় পদার্থটি দ্রবীভূত হইয়াছে। কিন্তু আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ নামক বিশেষ অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব এবং সঞ্চরণ-শীলতা সহজেই ধরা যায়। অথচ এই কণাগুলি অণুও নয় এবং উহাদের আকারও ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার ব্যাসের নয় যে মিশ্রণটিকে দ্রবণ মনে করা যাইতে পারে। কোন দ্রাবকে যখন অপর কোন পদার্থের সূক্ষ্মকণা এইরূপ প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে অথচ দ্রবীভূত হয় না, তখন এইরূপ পদার্থ দুইটির অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে কলয়েড বা সল (Sol) বলা হয়। এই কণাগুলির ব্যাসের পরিমাণ মোটামুটি ১০$^{-৫}$ – ১০$^{-৭}$ সেন্টিমিটার হইয়া থাকে। সুতরাং, প্রত্যেকটি কণাতে ১০ হইতে ১০,০০০ অণু থাকিবার সম্ভাবনা। যে কোন পদার্থ এইরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া কোন মাধ্যমে ভাসমান থাকিলেই উহার সল পাওয়া যাইবে। নদীর ঘোলা জলে যে ভাসমান কাদামাটি থাকে বা বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা বস্তুতঃ উহাদের কলয়েড অবস্থা। গোল্ড, সিলভার, সালফার, ফেরিক হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি জলে এই অবস্থায় লইয়া উহাদের কলয়েড তৈয়ারী করা যাইতে পারে। অবশ্য এরূপ সূক্ষ্মকণায় আনিতে কোন সময় কৃত্রিম ভৌত উপায়, আবার অনেক সময় রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। জলের নীচে দুইটি সরু সোনার তারের ভিতর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ করিয়া গোল্ড-সল পাওয়া যায়। এখানে শুধু অবস্থাগত পরিবর্তনের সাহায্যে কলয়েড প্রস্তুত হইল। আবার ফুটন্ত জলের উপর ফোঁটা ফোঁটা ফেরিক ক্লোরাইড দিলে উহা হইতে রাসায়নিক পরিবর্তনে যে ফেরিক হাইড্রক্সাইড পাওয়া যায় তাহা কলয়েড অবস্থায় থাকে।

একটি তরল পদার্থ যদি অপর একটি তরল দ্রাবকে অনুরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে অথচ দ্রব হয় না তখন উহাও একটি কলয়েড। ইহার একটি বিশেষ নাম আছে, ইমালসন বা অবদ্রব। দুধের ভিতর স্নেহজাতীয় বস্তু এইরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় জলের সহিত মিশিয়া থাকে। সুতরাং দুধ একটি ইমালসন।

কলয়েড বা সলগুলির আর একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ দ্রবণ ফিল্টার কাগজ বা অন্যান্য সব রকম ফিল্টার বা ছাঁকনীর ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু সল সাধারণ ফিল্টার কাগজের ভিতর দিয়া দ্রবণের মত সহজেই অতিক্রম করে বটে, কিন্তু অন্যান্য কতগুলি ফিল্টার যেমন, পার্চমেণ্ট কাগজ ইত্যাদির ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটি পার্চমেণ্ট কাগজের থলিতে যদি কোন কলয়েড এবং দ্রবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইয়া জলের ভিতর ঝুলাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে দ্রবীভূত পদার্থটি পার্চমেণ্ট কাগজের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, কিন্তু সল বাহির হইবে না। পার্চমেণ্ট কাগজের পরিবর্তে আরও নানারূপ ফিল্টার, যেমন কলডিয়ন, ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ফিল্টারগুলিকে বিশ্লেষক-ঝিল্লী বলা হয়। দ্রবণ হইতে এইভাবে সল পৃথক করার নামই ঝিল্লী-বিশ্লেষণ (Dialysis)।



চিত্র ২২গ—ঝিল্লী-বিশ্লেষণ

জিলাটিন, আগর-আগর (চায়না ঘাস), সাবুদানা প্রভৃতি জলের সহিত ফুটাইলে উহাদের সল তৈয়ারী হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা হইলে এই সকল সল জমাট বাঁধিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। কঠিন হইলেও ইহাদের ছুরির সাহায্যে কাটা যায় এবং উহাদের যথেষ্ট নমনীয়তা থাকে। এইরূপ কোন কোন কলয়েডের ভাসমান কণাগুলি জল বা দ্রাবক শোষণ করিয়া জেলির মত সান্দ্র পদার্থ বা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে, এই সকল কলয়েডকে "জেল" (Gel) বলা হয়। পূর্বোক্ত 'সিলিকা জেল' এই শ্রেণীর কলয়েড।

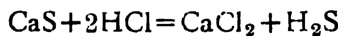
উদাহরণঃ সিলিসিক অ্যাসিড সল ও জেলঃ যদি সাধারণ উষ্ণতায় সোডিয়াম সিলিকেটের একটি লঘু দ্রবণ অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সিলিসিক অ্যাসিড অধঃক্ষিপ্ত না হইয়া প্রলম্বিত অবস্থায় অ্যাসিড দ্রবণেই থাকে। ঝিল্লীবিশ্লেষণের (dialysis) সাহায্যে উহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে পৃথক করা যায় বটে, কিন্তু তবুও উহা জল হইতে থিতাইয়া যায় না। ইহাকেই সিলিসিক অ্যাসিড সল বলে। আপাতদৃষ্টিতে উহাকে সিলিসিক অ্যাসিডের দ্রবণ বলিয়াই মনে হয়।

যদি সোডিয়াম সিলিকেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে উহাকে ঠাণ্ডা করিলে একটি জেলির মত প্রায় কঠিনাকার সিলিসিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। ইহাতে ওজনের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ সিলিকা থাকে। ইহাকে সিলিসিক অ্যাসিড জেল বা সিলিকা জেল বলা হয়। অত্যন্ত জলাকর্ষী বলিয়া ইহা বিভিন্ন গ্যাসের নিরুদনে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

২২-৪। হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, H_2S''

হাইড্রোজেনের সহিত সালফারের দ্বিযৌগিক পদার্থটি গ্যাসীয় এবং ইহাকেই হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বলে। কোন কোন প্রস্রবণের জলে, আগ্নেয়গিরির গ্যাসে, এবং পচনশীল অনেক জৈবপদার্থে এই গ্যাসটি থাকে। পচা ডিম, মাছ, চামড়া প্রভৃতির দুর্গন্ধ প্রধানতঃ এই গ্যাসটির জন্যই।

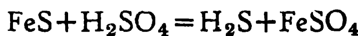
হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতি : সচরাচর ধাতব সালফাইডের উপর হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা হয়। যথা :—



$$CaS + 2HCl = CaCl_2 + H_2S$$



$$PbS + H_2SO_4 = PbSO_4 + H_2S$$



$$FeS + H_2SO_4 = H_2S + FeSO_4$$

কোন কোন ক্ষেত্রে জায়মান হাইড্রোজেন $(Zn + H_2SO_4)$ দ্বারা ধাতব সালফাইড হইতে H_2S উৎপাদন করা হয় :



$$As_2S_3 + 12H = 2AsH_3 + 3H_2S$$

২২-৫। ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই ফেরাস সালফাইড ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা হয়। একটি উলফ বোতলে ফেরাস সালফাইড লওয়া হয়। উহার মুখ দুইটিতে একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথমে কিছু জল ভিতরে দেওয়া হয় যাহাতে দীর্ঘনাল-ফানেলের প্রান্তটি জলে নিমজ্জিত থাকে এবং যন্ত্রটির সব জোড়াগুলি নিশ্ছিদ্র কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। অতঃপর ফানেলের ভিতর দিয়া কিছু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালা হয়। ফেরাস সালফাইড অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইতে থাকে। গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা

অনেক ভারী, সুতরাং, বায়ু প্রতিস্থাপিত করিয়া গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়।

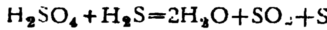


$$FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$$

পারদের উপরে এই গ্যাস সঞ্চয় করা যায় না, কারণ ইহা পারদের সহিত বিক্রিয়া করে।

প্রয়োজনানুরূপ এবং অধিক পরিমাণে এই গ্যাস পাইতে হইলে কিপ-যন্ত্রে হাইড্রোজেনের মত ইহা উৎপাদন করা হয়।

ফেরাস-সালফাইড হইতে উৎপন্ন গ্যাস বিশুদ্ধ নহে। প্রায়ই উহার সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে; কারণ, ফেরাস-সালফাইডে কিছু লৌহ মৌলাবস্থায় থাকে। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে জলীয় বাষ্প হইতে মুক্ত করাও একটু কষ্টসাধ্য। গাঢ় H_2SO_4 বা $CaCl_2$ ব্যবহার করা যায় না। কারণ, উহাদের সহিত H_2S গ্যাস নিজেই বিক্রিয়া করে:



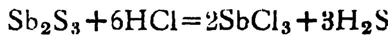
$$H_2SO_4 + H_2S = 2H_2O + SO_2 + S$$



$$CaCl_2 + H_2S \rightleftharpoons CaS + 2HCl$$

অনার্দ্র অ্যালুমিনার (Al_2O_3) সাহায্যে ইহাকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে।

(২) অ্যান্টিমনি সালফাইডের উপর গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড পাওয়া যায়:



$$Sb_2S_3 + 6HCl = 2SbCl_3 + 3H_2S$$

২২-৬। হাইড্রোজেন সালফাইডের ধর্ম:

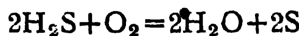
(১) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা ভারী এবং জলে কিছু দ্রবণীয়। গ্যাসটির বিষক্রিয়া উল্লেখযোগ্য এবং বহুক্ষণ ধরিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে মারাত্মক হইতে পারে।

হাইড্রোজেন সালফাইড অপর বস্তুর দহন সমর্থন করে না বটে, কিন্তু ইহা নিজে দাহ্য। অক্সিজেনে বা বাতাসে উহা একটি নীল শিখা সহকারে জ্বলিতে থাকে এবং জল ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে:—



$$2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2$$

কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকিলে সালফার পাওয়া যায়।



$$2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$$

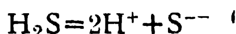
বিদ্যুৎক্ষরণে বা অতিরিক্ত উত্তাপে গ্যাসটি উহার মৌলদুইটিতে বিযোজিত হইয়া যায়:

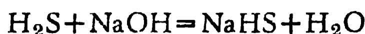


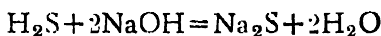
$$H_2S = H_2 + S$$

(২) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করিয়া দেয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইড একটি অম্ল'জাতীয় গ্যাস।

বিভিন্ন ক্ষারক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে। উহার দুইটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপন করা যাইতে পারে।

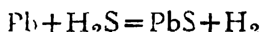

$$H_2S = 2H^+ + S^{--}$$


$$H_2S + NaOH = NaHS + H_2O$$


$$H_2S + 2NaOH = Na_2S + 2H_2O$$

অতএব হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বিক্ষারী-অম্ল। ইহা অধিকাংশ ধাতুকেই আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে ধাতব-সালফাইডে পরিণত করে। সোনা ও প্লাটিনাম অবশ্য আক্রান্ত হয় না।


$$2Ag + H_2S = Ag_2S + H_2, \qquad Sn + H_2S = SnS + H_2,$$

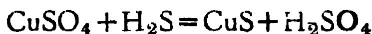

$$Pb + H_2S = PbS + H_2$$

ল্যাবরেটরীতে রূপা বা নিকেলের ঘড়ি প্রায়ই কালো হইয়া যায়। কারণ H_2S ধীরে ধীরে উহাদের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহাদের উপর একটি কালো সালফাইডের আবরণ সৃষ্টি করে।

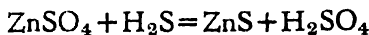
(৩) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন অনেক ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করে এবং ধাতব সালফাইডসমূহ অধঃক্ষিপ্ত করে। এই সকল সালফাইড অনেক ক্ষেত্রেই অদ্রবণীয় এবং উহাদের অনেকের বিশিষ্ট রং থাকে। এই কারণে উহাদের সহজেই চিনিতে পারা যায়।


$$2SbCl_3 + 3H_2S = Sb_2S_3 + 6HCl$$

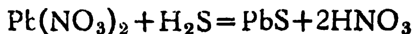
(নারঙ্গ)


$$CuSO_4 + H_2S = CuS + H_2SO_4$$

(কালো)


$$ZnSO_4 + H_2S = ZnS + H_2SO_4$$

(সাদা)

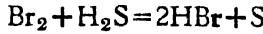

$$Pb(NO_3)_2 + H_2S = PbS + 2HNO_3$$

(কালো)

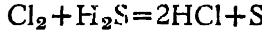
অজৈব লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই বিক্রিয়াসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের বিজারণ-ক্রিয়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সহজে হাইড্রোজেন বিযোজন সম্ভব বলিয়াই ইহা বিজারকের কাজ করিতে পারে। হ্যালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড,

পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদির দ্রবণের ভিতর গ্যাসটি পরিচালিত করিলেই উহারা বিজারিত হইয়া যায়:



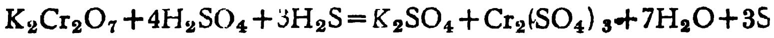
$$Br_2+H_2S=2HBr+S$$



$$Cl_2+H_2S=2HCl+S$$



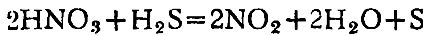
$$2FeCl_3+H_2S=2FeCl_2+2HCl+S$$



$$K_2Cr_2O_7+4H_2SO_4+3H_2S=K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+7H_2O+3S$$



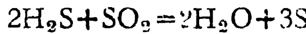
$$2KMnO_4+4H_2SO_4+5H_2S=2KHSO_4+2MnSO_4+8H_2O+5S$$



$$2HNO_3+H_2S=2NO_2+2H_2O+S$$

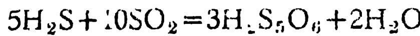
বিজারক H_2S অবশ্য প্রতিক্ষেত্রেই নিজে জারিত হইয়া সালফারে পরিণত হইয়া যায়।

সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনও পরস্পরের ভিতর ক্রিয়ার ফলে সালফার উৎপাদন করে। ইহাও একটি জারণ-বিজারণ ক্রিয়া।



$$2H_2S+SO_2=2H_2O+3S$$

কিন্তু শীতল অবস্থায় (০° সেন্টিগ্রেডে) এই দুইটি গ্যাসের জলীয় দ্রবণ মিশ্রিত করিলে বিভিন্ন থায়োনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত দ্রবণকে "ভ্যাকেনরদার দ্রবণ" (Wackenroder's solution) বলা হয়:—



$$5H_2S+10SO_2=3H_2S_5O_6+2H_2O$$

[পেণ্টা-থায়োনিক অ্যাসিড]

২২-৭। হাইড্রোজেন সালফাইড ও ধাতব সালফাইডের পরীক্ষা:

(১) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি উহার গন্ধ হইতেই অতি সহজে চেনা যায়। অথবা গ্যাসটিকে লেড অ্যাসিটেট দ্রবণে সিক্ত একটি কাগজের সংস্পর্শে আনিলেই কাগজটি কালো হইয়া যায়। ইহা হাইড্রোজেন সালফাইডের একটি নিশ্চিত পরীক্ষা। লেড সালফাইড উৎপন্ন হওয়ার জন্যই কাগজটি কালো হয়।



$$PbAc_2+H_2S=PbS+2HAc$$

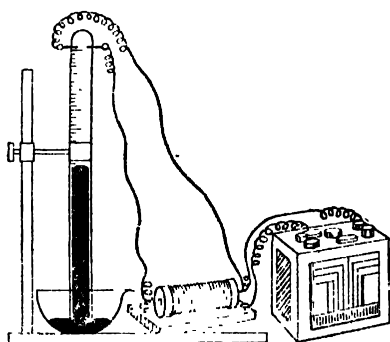
(২) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি কস্টিকসোডার লঘু দ্রবণে শোষণ করিয়া উহাতে একটু সোডিয়াম নাইট্রো-প্রুসাইড দ্রবণ মিশাইলে সুন্দর বেগনী রংয়ের সৃষ্টি হয়।

(৩) ধাতব সালফাইড পরীক্ষা করিতে হইলে উহাকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিয়া প্রথমে H_2S উৎপন্ন করা হয় এবং তৎপর এই উৎপন্ন H_2S-এর পরীক্ষা করা হয়। $ZnS+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2S$। কখনও কখনও এই H_2S উৎপন্ন করিতে জায়মান-হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়।

২২-৮। হাইড্রোজেন সালফাইডের সংযুতি ও সঙ্কেত ঃ

একটি গ্যাসমান যন্ত্রে পারদের উপর খানিকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস লইয়া উহার ভিতর বিদ্যুৎ-ক্ষরণ করা হয়। ইহাতে গ্যাসটি বিযোজিত হইয়া হাইড্রোজেন ও সালফারে পরিণত হয়। ঠাণ্ডা করিয়া গ্যাসটিকে পূর্ব উষ্ণতায় এবং পূর্বতন চাপে লইয়া আবার উহার আয়তন নির্ধারণ করা হয়। সর্বদাই দেখা যায়, বিযোজনের পূর্বে ও পরে গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য হয় না। এই বিযোজনের ফলে যেটুকু সালফার উৎপন্ন হয় তাহা কঠিন অবস্থায় থাকে এবং উহার আয়তন নগণ্য। অতএব হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সম-আয়তনের হাইড্রোজেন পাওয়া যায় (চিত্র ২২ঘ)।

সঙ্কেত ঃ x ঘন সেণ্টিমিটার হাইড্রোজেন সালফাইডে x ঘন সেণ্টিমিটার হাইড্রোজেন আছে। মনে কর, x ঘন সেণ্টি-মিটার কোন গ্যাসের অণু-সংখ্যা, p (অ্যাভোগাড্রো)।



চিত্র ২২ঘ—H_2S-এর সংযুতি নির্ণয়

∴ p সংখ্যক হাইড্রোজেন সালফাইড অণুতে p সংখ্যক হাই-ড্রোজেন অণু আছে। অর্থাৎ, ১টি হাইড্রোজেন সালফাইড অণুতে ১টি হাইড্রোজেন অণু আছে।

∴ ১টি হাইড্রোজেন সালফাইডের অণুতে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।

যদি হাইড্রোজেন সালফাইডের অণুতে n-সংখ্যক সালফার অণু থাকে, তাহা হইলে উহার অণুর সঙ্কেত হইবে, H_2S_n।

এই সঙ্কেত অনুযায়ী উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ২×১+n×৩২।

[∵ S=৩২]

কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইডের ঘনত্ব = ১৭ ; অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব = ৩৪।

∴ ২×১+n×৩২=৩৪।

∴ n = ১।

অতএব, হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্কেত হইবে, H_2S.

২২·৯। হাইড্রোজেন সালফাইডের ব্যবহার ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিজারক রূপে হাইড্রোজেন সালফাইড ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু অজৈবপদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণেই উহার প্রয়োগ সর্বাধিক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা গিয়াছে, ধাতব সালফাইডগুলি তিন রকমের। উহাদের কতকগুলি যেমন HgS, CuS, SnS ইত্যাদি অ্যাসিডে অদ্রাব্য। পরন্তু অপর কতকগুলি যেমন ZnS, MnS প্রভৃতি অ্যাসিডে দ্রবণীয়, কিন্তু ক্ষারে অদ্রবণীয়। আবার CaS, Na_2S ইত্যাদি জলেই দ্রবীভূত হয়, অ্যাসিড ও ক্ষারে ত' হইবেই।

সুতরাং যদি কতকগুলি অজৈব লবণ একত্র মিশ্রিত থাকে, তবে উহার জলীয় দ্রবণে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পরিচালিত করিয়া উহাদিগকে উক্ত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। একটি উদাহরণ হইতেই ইহা সম্যক বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি মিশ্রণে $ZnSO_4$, $CuSO_4$ এবং K_2SO_4 আছে। প্রথমে উহাকে জলে দ্রবীভূত করিয়া একটু HCl দিয়া অম্লীকৃত করা হয় এবং এই আম্লিক দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করা হয়। ইহাতে মিশ্রণ হইতে শুধু কালো CuS (কপার সালফাইড) সম্পূর্ণরূপে অধঃক্ষিপ্ত হইবে, অপর দুইটি ধাতব লবণের পরিবর্তন হইবে না। CuS ছাঁকিয়া লইয়া পরিস্রুৎটির সহিত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া উহার অম্লত্ব দূর করিয়া ক্ষারীয় করা হয়। ইহাতে পুনরায় H_2S গ্যাস পরিচালনা করা হয়। এখন মিশ্রণ হইতে সাদা ZnS অধঃক্ষিপ্ত হইবে, কিন্তু পটাসিয়াম লবণের কিছু হইবে না; উহা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিবে। ZnS ছাঁকিয়া মিশ্রণ হইতে সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। পরিস্রুতের ভিতর পটাসিয়াম লবণ থাকিয়া যাইবে। এই ভাবে তিনটি ধাতব লবণ পৃথক করা গেল। বিশ্লেষণটি এইভাবে লেখা যাইতে পারে।

মিশ্রণ : ZnSO ,$CuSO_4$,K_2SO_4

অম্লীকৃত দ্রবণে H_2S দেওয়া হইলে যে অধঃক্ষেপ পাওয়া যাইবে, তাহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

↓

কালো CuS অধঃক্ষিপ্ত হইবে। — পরিস্রুৎ—$ZnSO_4$ এবং K_2SO_4

ইহাকে NH_4OH দ্বারা ক্ষারীয় করিয়া আবার H_2S দিতে হইবে এবং অধঃক্ষেপটি ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

↓

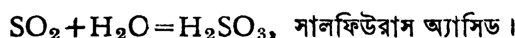
সাদা ZnS অধঃক্ষেপ থাকিবে। — **পরিস্রুৎ—K_2SO_4 দ্রবীভূত থাকিবে।**

অতএব H_2S সাহায্যে ধাতব লবণগুলিকে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং উহাদের পৃথক্ করা সম্ভব। অনেক সময় বিশিষ্ট রংয়ের জন্য, যেমন সাদা ZnS, পীত As_2S_3 প্রভৃতি, ধাতব সালফাইডের স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব। বস্তুতঃ, অজৈব লবণের রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণে H_2S গ্যাস অপরিহার্য।

সালফার অক্সাইড-সমূহ

সালফারের বহু অক্সাইড আছে। ইহাদের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় এবং উহাদের আলোচনাই এখানে করা হইবে।

সালফারের অক্সি-অ্যাসিডের সংখ্যাও এক ডজনের অধিক। সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড হইতে উদ্ভূত যথাক্রমে সালফিউরাস ও সালফিউরিক অ্যাসিডের কথাই এখানে বিবৃত করা হইতেছে।


$SO_2 + H_2O = H_2SO_3$, সালফিউরাস অ্যাসিড।

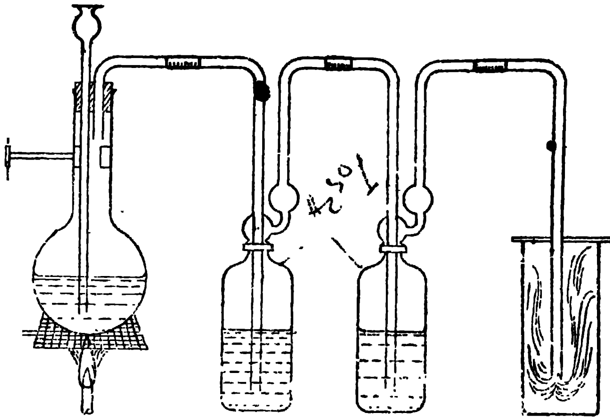

$SO_3 + H_2C = H_2SO_4$, সালফিউরিক অ্যাসিড।

২২-১০। সালফার ডাই-অক্সাইড, SO_2 ও সালফিউরাস অ্যাসিড, H_2SO_3

আগ্নেয়গিরির গ্যাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে। কয়লা পোড়ানোর ফলে যে গ্যাস হয় তাহাতেও কিছু কিছু সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে।

প্রস্তুতি: (১) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি: একটি গোল কূপীতে খানিকটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও কপারের ছিলা লওয়া হয়। কূপীর মুখটি কর্ক বন্ধ করিয়া উহাতে একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘনাল-ফানেলের সরু প্রান্তটি অ্যাসিডে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে। নির্গম-নলটি একটি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড-পূর্ণ গ্যাস-ধাবকের সহিত যুক্ত থাকে। অতঃপর তারজালির উপর গোল কূপীটি তাপিত করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড ফুটন্ত অবস্থায়, কপার দ্বারা বিজারিত হয় এবং সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কপার সালফেট উপজাত হয়। গ্যাসটি অত্যন্ত ভারী, সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির করিয়া

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে ধৌত করিয়া সহজেই বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চয় করা হয় (চিত্র ২২৬)।

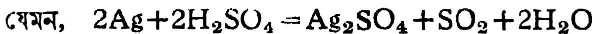


চিত্র ২২৬—SO_2-গ্যাস প্রস্তুতি



$$Cu+2H_2SO_4=CuSO_4+SO_2+2H_2O$$

অনুরূপ অবস্থায় কপারের পরিবর্তে অন্যান্য ধাতু বা অধাতুর দ্বারা উক্ত সালফিউরিক অ্যাসিড বিজারণ করিয়া SO_2 গ্যাস পাওয়া সম্ভব।



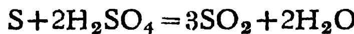
যেমন, $2Ag+2H_2SO_4=Ag_2SO_4+SO_2+2H_2O$



$$Hg+2H_2SO_4=HgSO_4+SO_2+2H_2O$$

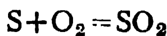


$$C+2H_2SO_4=2SO_2+CO_2+2H_2O$$

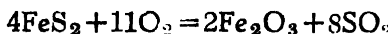


$$S+2H_2SO_4=3SO_2+2H_2O$$

(২) অধিক পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হইলে সালফার পোড়াইয়া অথবা আয়রন-পাইরাইটিস্ খনিজের তাপজারণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

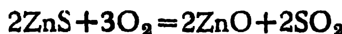


$$S+O_2=SO_2$$



$$4FeS_2+11O_2=2Fe_2O_3+8SO_2$$

অনেক খনিজ সালফাইড অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই সব খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন-কালে সালফার ডাই-অক্সাইড উপজাত হয়।

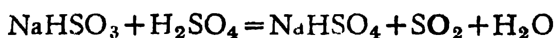


$$2ZnS+3O_2=2ZnO+2SO_2$$



$$HgS+O_2=Hg+SO_2$$

(৩) সোডিয়াম বাই-সালফাইটের গাঢ় দ্রবণের উপর বিন্দু বিন্দু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফেলিলে সালফার ডাই-অক্সাইড সহজেই পাওয়া যায় :—



$$NaHSO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + SO_2 + H_2O$$

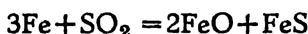
অনেক সময়েই ল্যাবরেটরীতে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ দেখা যায়।

২২-১১। সালফার ডাই-অক্সাইডের ধর্ম : (১) সালফার ডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি তীব্র ঝাঁঝালো শ্বাসনিরোধী গন্ধ আছে। বাতাস অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী ভারী (ঘনত্ব = ৩২)। ইহাকে খুব সহজে তরল করা যায়। সাধারণ উষ্ণতায় একটু বেশী চাপ দিলেই ইহা তরলিত হইয়া থাকে। তরল সালফার ডাই-অক্সাইডে অনেক মৌল এবং কোন কোন লবণ দ্রবীভূত হয়।

(২) সালফার ডাই-অক্সাইড নিজে দাহ্য নয় এবং অপরের দহনেও সহায়তা করে না ; তবে জ্বলন্ত পটাসিয়াম বা লৌহচূর উহাতে জ্বলিতে থাকে :



$$4K + 3SO_2 = K_2SO_3 + K_2S_2O_3$$



$$3Fe + SO_2 = 2FeO + FeS$$

(৩) সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে, অর্থাৎ এই অক্সাইডটি অম্লজাতীয়। বস্তুতঃ এই জলীয় দ্রবণটিই **সালফিউরাস অ্যাসিড-দ্রবণ।**

বিশুদ্ধ অবস্থায় সালফিউরাস অ্যাসিড পাওয়া যায় না, যদিও উহার লবণগুলি সবই বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং কঠিন স্ফটিকাকারে পাওয়া সম্ভব। সালফিউরাস অ্যাসিড শুধু দ্রব অবস্থাতেই পরিচিত। $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$

সালফিউরাস অ্যাসিড দ্বিক্ষারী-অম্ল। ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ইহা দুই জাতীয় লবণ উৎপন্ন করে। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুই ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে প্রশম-লবণ হইয়া থাকে, কিন্তু একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইলে অম্লজাতীয় লবণ উৎপন্ন হয় ; যথা :—

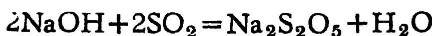


$H_2SO_3 + NaOH = H_2O + NaHSO_3$ (অম্লজাতীয় ; সোডিয়াম বাই-সালফাইট)



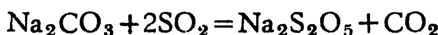
$H_2SO_3 + 2NaOH = 2H_2O + Na_2SO_3$ (প্রশম ; সোডিয়াম সালফাইট)

সাধারণ উষ্ণতায় কস্টিক সোডার দ্রবণের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণ SO_2 গ্যাস পরিচালিত করিলে সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট অধঃক্ষিপ্ত হয়।



$$2NaOH+2SO_2=Na_2S_2O_5+H_2O$$

কঠিন সোডিয়াম কার্বনেটও সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উক্ত মেটা-বাই-সালফাইট উৎপন্ন করে।



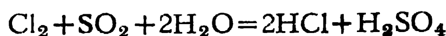
$$Na_2CO_3+2SO_2=Na_2S_2O_5+CO_2$$

(৪) সালফার ডাই-অক্সাইড অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অথবা ওজোন দ্বারা জারিত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

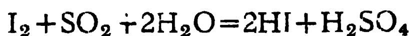


$$2SO_2+O_2=2SO_3\ ;\quad 3SO_2+O_3=3SO_3$$

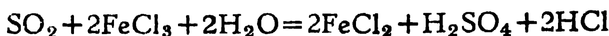
বস্তুতঃ, এই অক্সিজেন-গ্রহণ-ক্ষমতার জন্যই সালফার ডাই-অক্সাইড বিজারণ-গুণসম্পন্ন হইয়াছে। হ্যালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট প্রভৃতি বহু বস্তুকে ইহা সহজেই বিজারিত করে।



$$Cl_2+SO_2+2H_2O=2HCl+H_2SO_4$$



$$I_2+SO_2+2H_2O=2HI+H_2SO_4$$

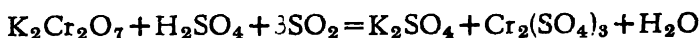


$$SO_2+2FeCl_3+2H_2O=2FeCl_2+H_2SO_4+2HCl$$

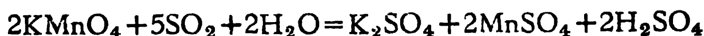


$$H_2O_2+SO_2=SO_3+H_2O=H_2SO_4$$

সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিলে লাল পটাস পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন এবং পীত পটাস ডাই-ক্রোমেট দ্রবণ সবুজ হইয়া থাকে। উভয়েই বিজারিত হইয়া যায়ঃ—



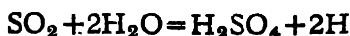
$$K_2Cr_2O_7+H_2SO_4+3SO_2=K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+H_2O$$



$$2KMnO_4+5SO_2+2H_2O=K_2SO_4+2MnSO_4+2H_2SO_4$$

এই সকল বিজারণের ফলে SO_2 সর্বদাই সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

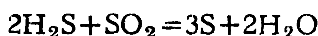
অনেক জৈবজাতীয় রঙীন পদার্থকেও সালফার ডাই-অক্সাইড বিরঞ্জিত করিয়া থাকে। সেই জন্য সালফার ডাই-অক্সাইড বা সালফিউরাস অ্যাসিড বিরঞ্জক হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই বিরঞ্জন-ক্রিয়া জল ব্যতিরেকে হইতে পারে না। খুব সম্ভবতঃ SO_2 প্রথমে জলের সহিত ক্রিয়ার ফলে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, এবং এই জায়মান হাইড্রোজেনই প্রকৃত বিরঞ্জক।



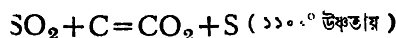
$$SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2H$$

অর্থাৎ বিজারণ-গুণের জন্যই সালফার ডাই-অক্সাইড বিরঞ্জন-ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। কয়েকটি রঙীন ফুলের পাপড়ি সিক্ত অবস্থায় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসে রাখিয়া দিলে কয়েক মিনিটেই উহা সাদা হইয়া যায়। ক্লোরিন বা বিরঞ্জক-চূর্ণ সিল্ক, উল প্রভৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং, সালফার ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে উহাদিগকে পরিষ্কৃত করা হয়।

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সালফার ডাই-অক্সাইড জারক হিসাবেও ক্রিয়া করে। যেমন :-



$$2H_2S + SO_2 = 3S + 2H_2O$$

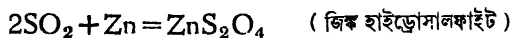


$$SO_2 + C = CO_2 + S \text{ (১১০০° উষ্ণতায়)}$$

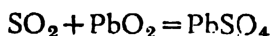
(৬) সালফার ডাই-অক্সাইডের যুত-যৌগিক তৈয়ারী করারও যথেষ্ট ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মৌল ও যৌগের সহিত উহা যুক্ত হইতে পারে :—



$$SO_2 + Cl_2 = SO_2Cl_2 \text{ (প্রখর সূর্যালোকে)}$$

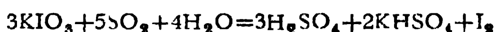


$$2SO_2 + Zn = ZnS_2O_4 \text{ (জিঙ্ক হাইড্রোসালফাইট)}$$



$$SO_2 + PbO_2 = PbSO_4$$

২২·১২। সালফার ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা ও ব্যবহার : এই গ্যাসটি উহার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ হইতেই বুঝা যায়। পটাসিয়াম ডাই ক্রোমেটে সিক্ত কাগজ উহার সংস্পর্শে আসিলেই সবুজ হইয়া যায়। এই পরীক্ষাটিই সর্বদা ল্যাবরেটরীতে প্রয়োগ করা হয়। পটাসিয়াম আয়োডেট ও স্টার্চ-এর মিশ্রিত দ্রবণ এই গ্যাসে নীল হইয়া যায়।

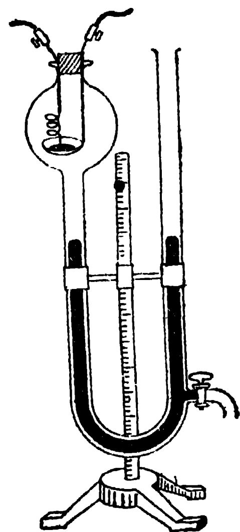


$$3KIO_3 + 5SO_2 + 4H_2O = 3H_2SO_4 + 2KHSO_4 + I_2$$

সালফার ডাই-অক্সাইডের বিবিধ ব্যবহার প্রচলিত। সাধারণ বিরঞ্জক হিসাবে ইহার প্রয়োগ আছে। চিনি উৎপাদনেও ইহা বিরঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রোগ-জীবাণুনাশক বলিয়া ইহা বীজঘ্ন (disinfectant) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রভৃতির পচন ও ছাতা-পড়া নিবারণ করার জন্যও ইহা ব্যবহার হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড ও সালফাইট প্রস্তুতিতেই সালফার ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার সর্বাধিক। ক্লোরিন যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেখানে অতিরিক্ত ক্লোরিন দূরীভূত করিতেও সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়।

২২-১৩। সালফার ডাই-অক্সাইডের সংযুক্তি ও সঙ্কেত : একটি অংশাঙ্কিত U-নলের সাহায্যে সালফার ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয় করা হয়। U-নলের একটি বাহুর শেষ প্রান্ত একটি প্রশস্ত গোলকে পরিণত

করিয়া লওয়া হয় (চিত্র ২২চ)। এই গোলকের একটি কাচের ছিপি থাকে। এই ছিপির ভিতর দিয়া দুইটি শক্ত কপারের তার ভিতরে প্রবেশ করান থাকে। একটি তার গোলকের প্রায় মধ্যস্থলে গিয়া একটি চামচেতে শেষ হইয়াছে। একটি সরু প্লাটিনাম তারের কুণ্ডলীর দ্বারা এই চামচেটি কপারের অপর তারটির সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। চামচের ভিতরে একটুখানি সালফার লওয়া হয়। U-নলের অপর বাহুটির নীচের দিকে একটি স্টপকক থাকে। সম্পূর্ণ গোলকটি এবং U-নলের কিয়দংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। এই অক্সিজেন পারদের উপরে থাকে। অপর বাহুর স্টপককটির সাহায্যে উভয় বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া ভিতরের অক্সিজেনকে বাহিরের বায়ুচাপেই রাখা হয়। অতঃপর কপারের তার দুইটির বাহিরের প্রান্তদ্বয় একটি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া প্লাটিনাম কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হয়। প্লাটিনাম লোহিততপ্ত হইয়া উঠে এবং এই তাপে সালফারের টুকরাটি প্রজ্বলিত হইয়া অক্সিজেন সহযোগে সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। বিক্রিয়াটি শেষ হইয়া গেলে ব্যাটারী হইতে মুক্ত করিয়া যন্ত্রটিকে শীতল করিয়া পূর্বতন উষ্ণতায় ফিরাইয়া আনা হয়। পারদ-তল উভয় বাহুতে একই রাখিলে দেখা যায় সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের ফলে গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। অথচ খানিকটা অক্সিজেন ব্যয় হইয়াছে ও তৎপরিবর্তে খানিকটা সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং ব্যয়িত অক্সিজেন এবং উৎপন্ন সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আয়তন সমান। অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্সাইডে উহার সমায়তন অক্সিজেন আছে।


চিত্র ২২চ—সালফার ডাই-অক্সাইডের সংযুতি নির্ণয়

অতএব, x ঘন সেন্টি. সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসে x ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেন আছে।

অর্থাৎ ১ ঘন সেন্টি. সালফার ডাই-অক্সাইডে ১ ঘন সেন্টি. অক্সিজেন আছে।

অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পানুযায়ী মনে কর, প্রতি ঘন সেণ্টি. যে কোন গ্যাসের অণু-সংখ্যা, n।

∴ n-সংখ্যক সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে n-সংখ্যক অক্সিজেন অণু আছে।

∴ ১টি সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে ১টি অক্সিজেন অণু আছে।

∴ ১টি সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে ২টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।

অতএব, এই দ্বিযৌগিক পদার্থের সঙ্কেত ধরা যাইতে পারে S_xO_2

তাহা হইলে, উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, $x\times৩২+১৬\times২$

কিন্তু সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব=৩২ ;

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব=২×৩২

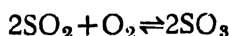
∴ $x\times৩২+১৬\times২=২\times৩২$

∴ $x=১$

সুতরাং সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত হইবে, SO_2।

অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্সাইড ওজনানুপাতে সালফার ও অক্সিজেনের পরিমাণ=৩২ : ৩২, অথবা ১ : ১

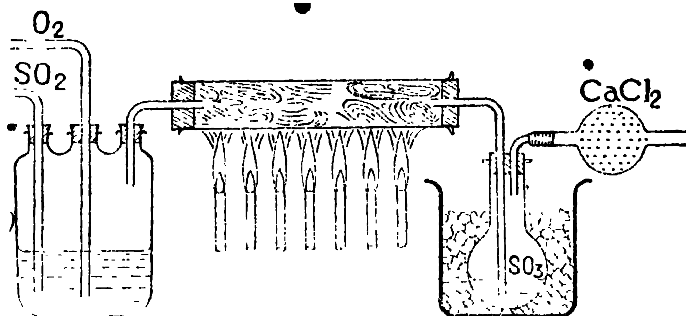
২২-১৪। সালফার ট্রাই-অক্সাইড, SO_3। প্রস্তুতি : (১) সাধারণতঃ সালফার ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সাক্ষাৎ সংযোগ হইতেই সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়।



$$2SO_2+O_2\rightleftharpoons 2SO_3$$

কিন্তু এই মিলনটি এত ধীরে ধীরে ঘটে যে কোন প্রভাবক ব্যতিরেকে ইহা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ প্লাটিনাম প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অক্সিজেন প্রথমতঃ সালফিউরিক-অ্যাসিডপূর্ণ গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর এই দুইটি গ্যাসের মিশ্রণ একটি নলের ভিতর তাপিত প্লাটিনামের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে উহারা সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যাস্‌বেস্‌টসের উপর খুব সূক্ষ্ম কালো প্লাটিনাম চূর্ণ প্রথমে জমাইয়া লওয়া হয়। এই প্লাটিনাম-যুক্ত অ্যাস্‌বেস্‌টসই প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহার উষ্ণতা মোটামুটি ৪৪০° সেণ্টিগ্রেড রাখা হয়। বিক্রিয়াটি উভমুখী, কিন্তু মিশ্রণের ভিতর সর্বদাই অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী দেওয়া হয়। ইহাতে প্রায় সম্পূর্ণ সালফার ডাই-অক্সাইড ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্সাইড বরফ ও লবণ দ্বারা আবৃত একটি শীতল গ্রাহকে সংগ্রহ করা হয়। কম উষ্ণতায় সালফার ট্রাই-

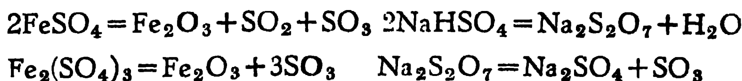
অক্সাইড জমিয়া কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করে। জলের সংস্পর্শে আসিলেই ইহা সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হইয়া যায় বলিয়া সতর্কতার সহিত উহাকে জলীয় বাষ্প হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।



চিত্র ২২ছ—সালফার ট্রাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

প্লাটিনামের পরিবর্তে অন্যান্য প্রভাবকও ব্যবহার করা যাইতে পারে, মন, কপার, আয়রন বা ভ্যানাডিয়ামের অক্সাইড।

(২) কোন কোন ধাতব সালফেট উত্তপ্ত করিলেও সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়:—



$$2FeSO_4 = Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3 \quad 2NaHSO_4 = Na_2S_2O_7 + H_2O$$
$$Fe_2(SO_4)_3 = Fe_2O_3 + 3SO_3 \quad Na_2S_2O_7 = Na_2SO_4 + SO_3$$

২২-১৫। সালফার ট্রাই-অক্সাইডের ধর্ম: সাধারণ উষ্ণতায় সালফার ট্রাই-অক্সাইড কঠিন স্ফটিকাকারে থাকে।

সালফার ট্রাই-অক্সাইডের জলের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত বেশী। আর্দ্র বাতাসে সালফার ট্রাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়িয়া দিলে একটি অত্যন্ত ঘন সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ, এই ধোঁয়াটি খুব ছোট ছোট সালফিউরিক অ্যাসিড-কণার সমষ্টি। $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$

সালফার ট্রাই-অক্সাইড গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় এবং পাইরো-সালফিউরিক অ্যাসিড বা ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে:



$$H_2SO_4 + SO_3 = H_2S_2O_7$$

ক্ষারক অক্সাইডের সহিত যুক্ত হইয়া উহা সালফেটে পরিণত হয়। BaO-

এর সহিত ইহার বিক্রিয়ার সময় এত তাপ-বিকিরণ হয় এবং অক্সাইডটি ভাস্বর হইয়া উঠে। $BaO+SO_3=BaSO_4$

২২-১৬। সালফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4 ঃ সালফিউরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন ধাতব লবণ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাসিড অবস্থায় উহা প্রকৃতিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কখনও কখনও সহরের বৃষ্টির জলে খুব অল্প পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। $CaSO_4$, $2H_2O$; $MgSO_4$, H_2O প্রভৃতি খনিজ অবশ্য প্রচুর পাওয়া যায়।

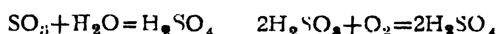
প্রস্তুতি ঃ হীরাকস [ফেরাস সালফেট] উত্তপ্ত করিয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় য়্যালকেমীবিদ্‌গণ তাহা হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতেন। উহাকে তখন 'অয়েল অব্ ভিট্রিয়ল' (oil of vitriol) বলা হইত।


$$2FeSO_4=Fe_2O_3+SO_2+SO_3 ;$$

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4$$

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সালফার পোড়াইয়া সালফার ডাই-অক্সাইড করিয়া উহা হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারী করার প্রণালী প্রবর্তিত হয়।

ল্যাবরেটরীতে সালফার ট্রাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিলেই সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যাইতে পারে। অথবা সালফিউরাস অ্যাসিডকে বাতাস, ক্লোরিন, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতির দ্বারা ধীরে ধীরে জারিত করিয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত করা যাইতে পারে।

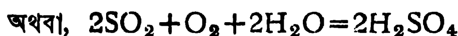

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4 \qquad 2H_2SO_3+O_2=2H_2SO_4$$

$$H_2SO_3+H_2O+Cl_2=H_2SO_4+2HCl$$

কিন্তু এই সব পদ্ধতির বিশেষ কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই। কারণ সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা এত বেশী এবং বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে উহার প্রয়োজন এত অধিক যে সর্বদা উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়।

২২-১৭। সালফিউরিক অ্যাসিড শিল্প ঃ সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত করিলে সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। সালফার ট্রাই-অক্সাইড জলের সহিত মিলিত হইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যেই প্রস্তুত হয়।


$$2SO_2+O_2=2SO_3 ; \quad SO_3+H_2O=H_2SO_4$$


অথবা, $2SO_2+O_2+2H_2O=2H_2SO_4$

বেশী পরিমাণে এই অ্যাসিড প্রস্তুত করার দুইটি প্রণালী আছে। (১) প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি (lead chamber process) (২) স্পর্শ পদ্ধতি (contact process), এই দুই প্রণালীর প্রকরণ-ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

সালফার ডাই-অক্সাইডের জারণ-ক্রিয়াটি সত্বর সম্পন্ন করার জন্য প্রভাবক ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সর্বদাই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাস প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের উপস্থিতিতে, সাধারণ চাপে এবং এমন কি, সাধারণ উষ্ণতাতে সালফার ডাই-অক্সাইড খুব সহজে সম্পূর্ণরূপে জারিত হইয়া থাকে।

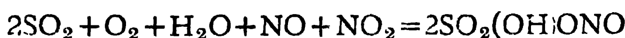
নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড বিক্রিয়াটিকে কি ভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে বহুরকম মতবাদ আছে।

(১) সাধারণতঃ মনে করা যাইতে পারে যে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সালফার ডাই-অক্সাইডকে জারিত করে এবং স্বয়ং বিজারিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। পরে অক্সিজেনের সহিত নাইট্রিক অক্সাইড যুক্ত হইয়া নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

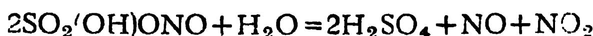

$$SO_2+NO_2=SO_3+NO \quad SO_3+H_2O=H_2SO_4$$


$$2NO+O_2=2NO_2$$

(২) আবার কেহ কেহ মনে করেন, নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড এবং উহা বিজারণে যে নাইট্রিক-অক্সাইড হয়, উভয়েই প্রভাবকের কাজ করে। প্রভাবক প্রথমে বিক্রিয়কের সহিত যুক্ত হইয়া নাইট্রোসো-সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। উহা জলের সংস্পর্শে আসিলে বিশ্লেষিত হইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণতি লাভ করে।


$$2SO_2+O_2+H_2O+NO+NO_2=2SO_2(OH)ONO$$

(নাইট্রোসো-সালফিউরিক অ্যাসিড)


$$2SO_2(OH)ONO+H_2O=2H_2SO_4+NO+NO_2$$

আভ্যন্তরিক বিক্রিয়ার স্বরূপ যাহাই হউক, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার পর, প্রভাবক সম্পূর্ণ পরিমাণেই আবার পূর্বাবস্থায় পাওয়া যায় এবং উহাকে পুনঃ পুনঃ একই কাজে ব্যবহার করা সম্ভব।

অতএব, প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির সাহায্যে সালফিউরিক-অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে সালফার ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন (বায়ু), জল এবং প্রভাবক হিসাবে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড এই চারিটি বস্তুর প্রয়োজন। বাতাস এবং জলের

প্রশ্ন অবশ্য উঠে না, কিন্তু সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

প্রক্রিয়ার বিবরণ ঃ বিক্রিয়াটি সহজ হইলেও ইহার জন্য বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এই যান্ত্রিক-সরঞ্জামের প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে এবং উহাদের প্রয়োজন ও কার্যক্রমও বিভিন্ন।

(১) সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতির ব্যবস্থা।

(২) সালফার ডাই-অক্সাইডের জারণ ও অ্যাসিডে পরিণত করার ব্যবস্থা। [গ্লভার স্তম্ভ ও সীসক প্রকোষ্ঠ]

(৩) প্রভাবক পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা। [গে-লুসাক স্তম্ভ]

যন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলি এবং অধিকাংশ নল ইত্যাদি সীসার তৈয়ারী, কারণ সীসা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না। সীসক প্রকোষ্ঠে ইহা প্রস্তুত হয় বলিয়া 'প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি' নামটির প্রচলন হইয়াছে।

সালফার ডাই-অক্সাইড ঃ আয়রন পাইরাইটিস খনিজ অথবা সালফার বাতাসে পোড়াইয়া সালফার ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয় :—

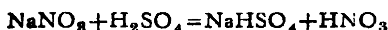


$$S+O_2=SO_2$$



$$4FeS_2+11O_2=2Fe_2O_3+8SO_2$$

নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড ঃ সোডিয়াম নাইট্রেট ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড তাপিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। উত্তাপে এই নাইট্রিক অ্যাসিড ভাঙিয়া যায় এবং নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। অবশ্য, সালফার ডাই-অক্সাইড দ্বারা বিজারিত হওয়ার ফলেও নাইট্রিক অ্যাসিড হইতে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



$$NaNO_3+H_2SO_4=NaHSO_4+HNO_3$$



$$4HNO_3=2H_2O+O_2+4NO_2$$



$$SO_2+2HNO_3=SO_3+H_2O+2NO_2$$

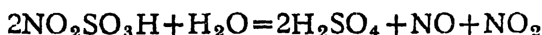
বর্তমানে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে অ্যামোনিয়াকে জারিত করিয়া যে নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায় তাহাই ব্যবহৃত হয়।

সালফার ডাই-অক্সাইডের জারণ ঃ চুল্লীতে সালফার পোড়ান হয়। উত্তপ্ত সালফার ডাই-অক্সাইড এবং অতিরিক্ত বায়ু চুল্লী হইতে বাহির হইয়া আসিলে উহার সহিত প্রভাবক নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড মিশ্রিত করা হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড, বায়ু ও নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের মিশ্রণটি অতঃপর একটি ছোট খালি স্তম্ভের ভিতর দিয়া আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত

করা হয়। ইহার ফলে গ্যাসে যদি কোন ধূলিকণা থাকে তাহা থিতাইয়া যায় এবং গ্যাসটি বিশুদ্ধতর হয় এবং উহার উষ্ণতাও কিছুটা হ্রাস পায়। ইহার পর গ্যাসটি একটি নলের ভিতর দিয়া একটি উঁচু স্তম্ভের নীচের দিকে প্রবেশ করে। ইহাকেই "গ্লভার স্তম্ভ" (Glover's tower) বলে।

"গ্লভার স্তম্ভ": ইহা সীসার পাত দ্বারা তৈয়ারী এবং উহার দেওয়ালের ভিতরের দিক অম্লসহ-ইট দ্বারা আবৃত। স্তম্ভটির ভিতরের অধিকাংশই ফ্লিণ্ট কাচ বা স্ফটিকের টুকরাতে (Quartz) ভরিয়া রাখা হয়। গ্যাস-মিশ্রণটি স্তম্ভের তলদেশে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। স্তম্ভটির উপরে দুইটি ট্যাঙ্ক থাকে। একটি ট্যাঙ্ক হইতে নাতিগাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (৬৫%) একটি স্টপককের সাহায্যে আস্তে আস্তে এই স্তম্ভের ভিতর দিয়া পড়িতে থাকে। (এই অ্যাসিড স্তম্ভটির পরবর্তী প্রকোষ্ঠেই উৎপন্ন হয়।) অপর ট্যাঙ্কটি হইতে অনুরূপভাবেই নাইট্রোসিল-সালফিউরিক অ্যাসিড (NO_2HSO_3) স্তম্ভের ভিতর দিয়া পড়িতে দেওয়া হয়। (এই অ্যাসিডটিও এই প্রণালীরই শেষের দিকে গে-লুসাক স্তম্ভ হইতে পাওয়া যায়।) স্তম্ভের ভিতর নিম্নগামী শীতল অ্যাসিড দুইটি উর্ধ্বগামী উষ্ণতর গ্যাস-মিশ্রণের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হয়। কাচ বা স্ফটিকের টুকরাগুলি উহাদের ঘনিষ্ঠ মিশ্রণের সুবিধা করে মাত্র। ইহাতে কয়েকটি পরিবর্তন সাধিত হয়।

(১) নাইট্রোসিল সালফিউরিক অ্যাসিডে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভাবকটি থাকে। উষ্ণতর গ্যাসের উত্তাপে উহা নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভাবকটি পুনরুৎপাদন করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

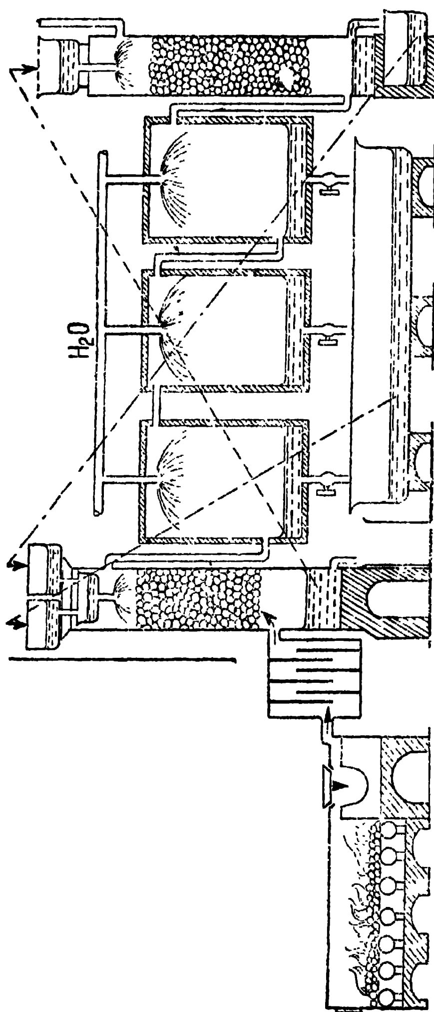


$$2NO_2SO_3H + H_2O = 2H_2SO_4 + NO + NO_2$$

(২) অপেক্ষাকৃত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (৬৫%) উষ্ণতর গ্যাসের সংস্পর্শে তাপিত হওয়ায় উহার জল বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং স্তম্ভের নীচে সীসার ট্যাঙ্কে গাঢ়তর সালফিউরিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়। ইহা ৭৮% অ্যাসিড, ঘনত্ব ১.৭২।

(৩) প্রভাবকের সাহায্যে খানিকটা SO_2 গ্যাস এই স্তম্ভের ভিতরেই জারিত হইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

গ্যাস-মিশ্রণটি অতঃপর ৩০°-৩৫°C উষ্ণতায় বড় বড় কয়েকটি সীসার তৈয়ারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে।



চিত্র ২২জ—প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি

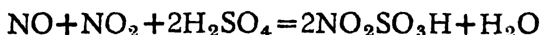
সীসক-প্রকোষ্ঠ: সীসার পাত গলাইয়া জোড়া দিয়া চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠগুলি তৈয়ারী করা হয়। তিন-চারিটি প্রকোষ্ঠের সম্পূর্ণ ঘনায়তন প্রায় ৭৫০০০ ঘনফিট হইবে। উপর হইতে শীতল জলের ঝরণার ধারা প্রকোষ্ঠের

ভিতর সর্বদা দেওয়া হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরে বাকী সমস্ত SO_2 গ্যাস জারিত হয় এবং পরে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। প্রকোষ্ঠ-গুলির নীচে এই অ্যাসিড জমা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বাহির করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে শতকরা ৬৫ ভাগ অ্যাসিড থাকে (ঘনত্ব ১'৫৫)।

প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন সমস্তটুকু অ্যাসিডই গ্লভার স্তম্ভের উপর হইতে উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান হয়, যাহাতে অ্যাসিডটি গাঢ়তর হইয়া ৭৮% হয়।

শেষ প্রকোষ্ঠ হইতে যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে, তাহাতে স্বল্প পরিমাণ অপরিবর্তিত SO_2 গ্যাস, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভাবক ইত্যাদি থাকে। এই গ্যাস-মিশ্রণটিকে অতঃপর আর একটি স্তম্ভের ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম "গে-লুসাক" স্তম্ভ।

"গে-লুসাক স্তম্ভ ঃ" এই গোলাকার স্তম্ভটিও সীসার তৈয়ারী। স্তম্ভটি কোক ও অম্লসহ ইষ্টকে ভরিয়া রাখা হয়। স্তম্ভের উপরে একটি ট্যাঙ্কে গ্লভার স্তম্ভ হইতে যে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (৭৮%) পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ রাখা হয়। এই অ্যাসিড স্তম্ভের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে নীচে প্রবাহিত করা হয়। ঊর্ধ্বগামী গ্যাসের সংস্পর্শে থাকিলে এই গাঢ় অ্যাসিড উহার নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ শোষণ করিয়া লয় এবং নাইট্রোসিল-সালফিউরিক অ্যাসিড বা নাইট্রো-সালফনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।



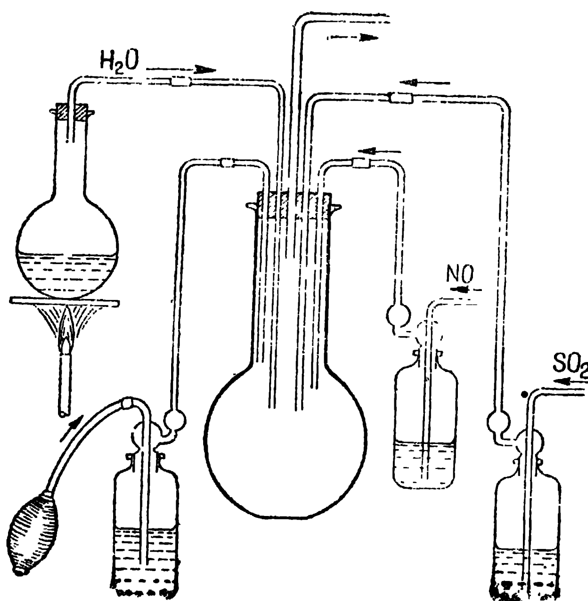
$$NO + NO_2 + 2H_2SO_4 = 2NO_2SO_3H + H_2O$$

অন্যান্য গ্যাস স্তম্ভের বাহিরে গিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়। স্তম্ভের নীচে একটি ট্যাঙ্কে এই নাইট্রোসিল-সালফিউরিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয় এবং পাম্পের সাহায্যে উহাকে গ্লভার স্তম্ভের উপরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

অতএব, প্রভাবকটির অপচয় বন্ধ করার জন্যই গে-লুসাক স্তম্ভটি বিশেষ মূল্যবান। বস্তুতঃ গে-লুসাক ও গ্লভার স্তম্ভ দুইটির উপযুক্ত ব্যবহারের উপরই এই শিল্পের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

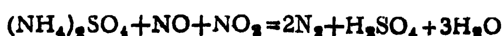
এই প্রণালীতে প্রস্তুত সমস্ত অ্যাসিড শেষ পর্যন্ত গ্লভার স্তম্ভের নীচেই জমা হয়। এখান হইতে অ্যাসিড বিভিন্ন প্রয়োজনে চালান দেওয়া হয়, অল্প একটু অংশ কেবল গে-লুসাক স্তম্ভের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরিক অ্যাসিডের গাঢ়ীকরণ : প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতিতে যে অ্যাসিড পাওয়া যায় তাহার সর্বাধিক গাঢ়ত্ব শতকরা ৭৮ ভাগ। সুপার-ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে এই অ্যাসিডই উপযুক্ত। কিন্তু অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পে অধিকতর গাঢ় অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। এই অ্যাসিড অপেক্ষাকৃত অনুদ্বায়ী, সুতরাং গ্যাস-চুল্লীতে তাপিত করিয়া উহার জল উড়াইয়া দিয়া অ্যাসিডকে ৯৮% গাঢ় করা হয়।



চিত্র ২২খ—সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি

প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতিতে উৎপন্ন অ্যাসিডে অবশ্য নানা অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যদিও উহাদের পরিমাণ বেশী নয়। ইহাদের মধ্যে লেড সালফেট, আর্সেনিক অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধ অ্যাসিড পাইতে হইলে উহাকে প্রথমে জল মিশাইয়া লঘু করা হয়। তাহাতে লেড সালফেট প্রায় সবটুকু অধঃক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তৎপর উহাতে H_2S গ্যাস পরিচালিত করিয়া আর্সেনিক ও অবশিষ্ট লেড হইতে উহাকে মুক্ত করা হয়। As_2S_3 এবং PbS অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তৎপর অ্যামোনিয়াম সালফেটের সহিত অ্যাসিডটিকে কাচের পাত্রে বা সিলিকার পাত্রে পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ অ্যাসিড সংগ্রহ করা হয় :



$$(NH_4)_2SO_4 + NO + NO_2 = 2N_2 + H_2SO_4 + 3H_2O$$

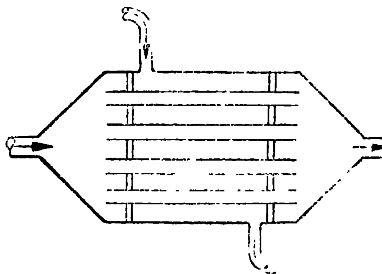
প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির প্রক্রিয়াটি সহজেই সাধারণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করিয়া দেখান যাইতে পারে। একটি বেশ বড় শক্ত কাচের কূপীর মুখটি কর্কদ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে পাঁচটি নল লাগাইয়া দেওয়া হয়। চারিটি নলের সাহায্যে কূপীর ভিতরে নাইট্রিক-অক্সাইড, অক্সিজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড ও স্টীম প্রবেশ করান সম্ভব। প্রথমোক্ত তিনটি গ্যাস গ্যাস-ধাবকের গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়া শীত করিয়া পাঠান হয় যাহাতে উহাদের সহিত জলীয় বাষ্প না থাকে (চিত্র ২২ জ)। প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড ও অক্সিজেন ভিতরে দেওয়া হয়। উহারা মিলিত হইয়া লাল নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সৃষ্টি করে। ইহার পরে সালফার ডাই-অক্সাইড পাঠান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের ভিতর দিয়া অক্সিজেন বুদ্বুদিত করিয়া কিছু জলীয় বাষ্পসহ ভিতরে দেওয়া হয়। ইহার ফলে ক্রমশঃ ভিতরের নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের লাল রংটি ফিকা হইয়া যায় এবং কূপীর গায়ে বর্ণহীন নাইট্রোসো-সালফিউরিক অ্যাসিডের স্ফটিক জমিতে দেখা যায়। এই সময় বেশী অক্সিজেন প্রবাহ দিয়া ভিতরের গ্যাস বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয় এবং জল ফুটাইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ স্টীম ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। নাইট্রোসো-সালফিউরিক অ্যাসিড স্টীমের সংস্পর্শে আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া যায়। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড কূপীর নীচে সঞ্চিত হয় এবং নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড পুনরায় উৎপন্ন হয়। ইহাতেই প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির বিক্রিয়াটি বেশ বুঝা যায়।

২২-১৮। "স্পর্শ-পদ্ধতি": এই প্রণালীতে সর্বদাই কোন কঠিন প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্ম প্লাটিনাম-চূর্ণ অথবা কোন কোন বিশেষ ধাতব অক্সাইড উৎকৃষ্ট প্রভাবকের কাজ করে। উপযুক্ত উষ্ণতায় সালফার ডাই-অক্সাইড ও বাতাসের মিশ্রণ যদি এই সকল কঠিন প্রভাবকের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে অতি সহজেই সালফার ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণরূপে জারিত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। প্রভাবক কঠিন অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার জন্য স্বল্পায়তন স্থানের প্রয়োজন হয়, বড় বড় প্রকোষ্ঠের দরকার হয় না। এই পদ্ধতিতে প্রভাবকের মূল্য অধিক এবং কোনমতেই উহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া চলে না। কিন্তু গ্যাস-মিশ্রণের সহিত যদি আর্সেনিক অক্সাইড বা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে তবে উহাদের প্রভাবন-ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে যে গ্যাস-মিশ্রণটি প্রভাবকের উপর দিয়া প্রবাহিত করা হয়, উহাকে পূর্বেই সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রভাবকের উষ্ণতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। $2SO_2+O_2=2SO_3+$ ৪৫২০০ ক্যালোরি এই জারণ ক্রিয়াটি তাপ-উদ্গারী। তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়াসমূহ উষ্ণতা যত কম হয় তত বেশী পরিমাণে সম্পাদিত হয়। এই রীতি অনুসারে কম উষ্ণতায় বেশী সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া সম্ভব। কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলেও কম উষ্ণতায় পরিবর্তনটি সম্পন্ন হইতে অতি দীর্ঘ

সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, উহার গুরুত্ব খুবই কমিয়া যায়। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিমাণে কম হইলেও বিক্রিয়াটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে প্লাটিনাম চূর্ণ প্রভাবকের উষ্ণতা যদি ৪৪০° সেন্টিগ্রেডে রাখা যায়, তবে আশানুরূপ দ্রুত এবং শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ SO_3 পাওয়া যায়। অতএব, সর্বদা প্রভাবক এবং বিক্রিয়ক গ্যাস-মিশ্রণটি ৪০০-৪৫০° ডিগ্রী উষ্ণতায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

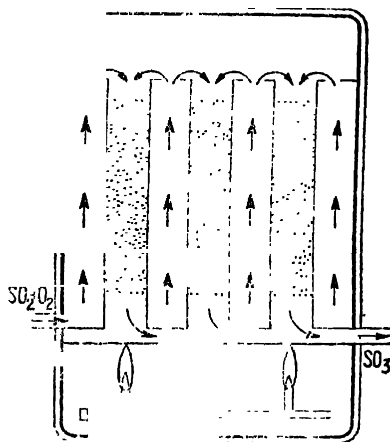
প্রক্রিয়ার বিবরণ ঃ স্পর্শ-পদ্ধতিতে সব সময়েই অতিরিক্ত বায়ু-প্রবাহে সালফার পোড়াইয়া বিশুদ্ধতর সালফার ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। চুল্লী হইতে যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে তাহাতে মোটামুটি ৭% SO_2, ১০% O_2 এবং ৮৩% N_2 থাকে। এই গ্যাসটিকে প্রথমেই একটি ধূলিরোধক স্তম্ভের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। তারপর গ্যাসটিকে যথাসম্ভব শীতল করা হয়। ইহার পর অপদ্রব্য-সমূহ দূর করার জন্য গ্যাসটি ধৌত করা হয়।



এইজন্য গ্যাসটিকে পরপর কয়েকটি স্তম্ভের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়। প্রত্যেকটি স্তম্ভই কোক বা স্ফটিক খণ্ড (Quartz) দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। প্রথম স্তম্ভ কয়টির উপর হইতে জলের ধারা নামাইয়া দেওয়া হয় এবং পরবর্তী স্তম্ভের উপর হইতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ধারা দেওয়া হয়। গ্যাসটি প্রত্যেক স্তম্ভের নীচে প্রবেশ করে এবং বিপরীতগামী জল বা অ্যাসিড দ্বারা ধৌত হইয়া থাকে। ইহার ফলে গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি দূর হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা শুষ্ক হইয়া বিশুদ্ধ গ্যাসটি শেষ স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে। এই সময় ইহার উষ্ণতা খুব কমিয়া যায়। কিন্তু প্রভাবকের সংস্পর্শে জারণ-ক্রিয়ার জন্য ৪৪০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা দরকার। অতএব এই গ্যাসটিকে আবার তাপিত করা প্রয়োজন। সেই জন্য বাহির হইতে তাপ দেওয়ার দরকার হয় না, বিক্রিয়া-উদ্ভূত তাপেই ইহাকে উষ্ণতর করা হয়।

সালফিউরিক অ্যাসিড স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া ইহা একটি তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। প্রকোষ্ঠের সরু নলগুলির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত SO_3 গ্যাস যাইতে থাকে এবং উহার সাহায্যে বাহিরের এই বিশুদ্ধ SO_2 গ্যাস-মিশ্রণ তাপিত হইতে থাকে। এই তাপিত বিশুদ্ধ SO_2 এবং বাতাসের মিশ্রণটি অতঃপর বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ করে।

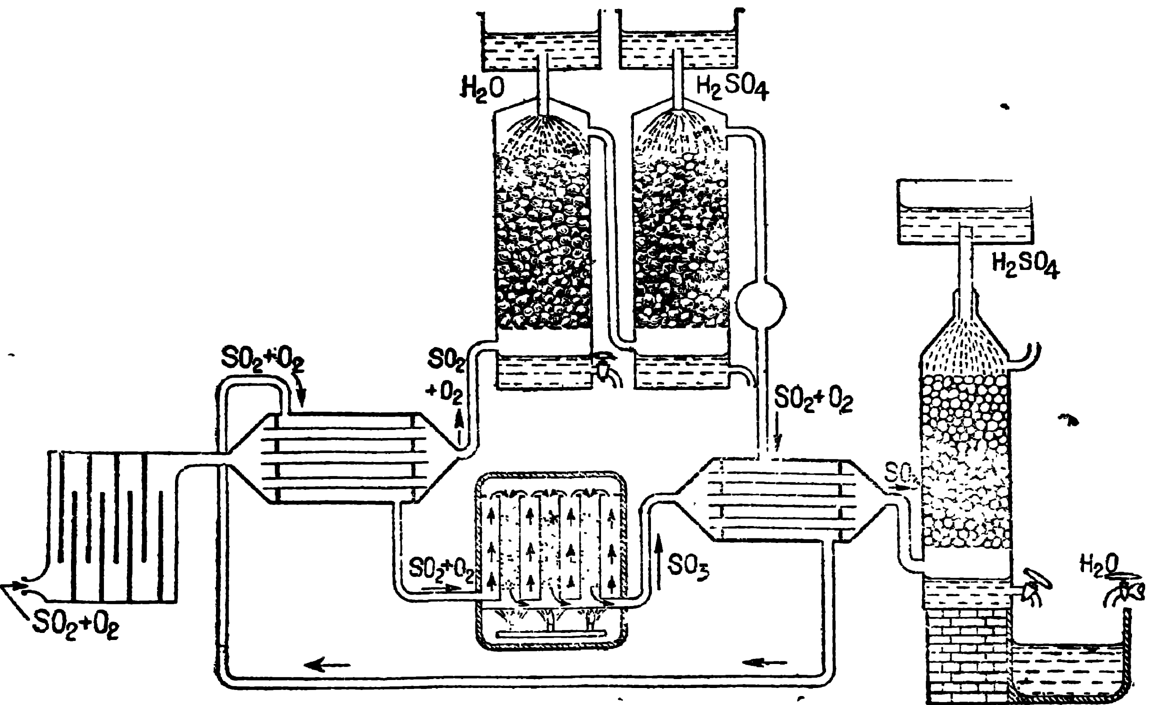
বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠ: লোহার তৈয়ারী বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে কয়েকটি খাড়া লোহার নলের ভিতর প্রভাবক রাখা হয়। কঠিন প্রভাবকগুলির বিশেষত্বই যে যত বেশী আয়তনে উহারা বিক্রিয়কের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে ততই বেশী বিক্রিয়া নিস্পন্ন হইবে। এই জন্য প্লাটিনাম প্রভাবক অতি সূক্ষ্ম চূর্ণাবস্থায় অ্যাস্‌বেস্‌টসের আঁশের উপর জমাইয়া লওয়া হয়। এই প্লাটিনাম-যুক্ত অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ই প্রভাবক রূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় "সিলিকা-জেলের" উপরে অথবা ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের উপরে প্লাটিনাম-চূর্ণ জমাইয়া প্রভাবক তৈয়ারী করা হয়। প্লাটিনামের বদলে আয়রন ও কপার অক্সাইডের মিশ্রণ (Fe_2O_3+CuO) এবং ভ্যানাডিয়াম পেণ্টোক্সাইডও প্রভাবক হিসাবে আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকোষ্ঠটি প্রভাবকসহ প্রথমে বড় গোলাকার দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু একবার বিক্রিয়া সুরু হইলে উহা হইতে যে তাপ উদ্ভূত হয় তাহাতেই প্রভাবক তাপিত হইয়া থাকে, অন্য কোন তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না (চিত্র ২২এ)।



চিত্র ২২এ—বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠ

বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠের নীচের দিকে SO_2 এবং বাতাসের মিশ্রণটি প্রবেশ করে। উহার উত্তাপ তখন প্রায় ৪০০° সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে।

প্রভাবকের সংস্পর্শে SO_2 জারিত হইয়া SO_3 হয় এবং প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপ অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ বিক্রিয়ক গ্যাস শোষণ করিয়া লয়,



চিত্র ২২ট—স্পর্শ-পদ্ধতিতে H_2SO_4 প্রস্তুতি

তাই প্রভাবকের উষ্ণতা বাড়িতে পারে না। তাহা না হইলে তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়ার ফলে প্লাটিনামের উষ্ণতা খুবই বৃদ্ধি পাইত এবং উহাতে SO_2 পরিমাণ হ্রাস পাইত। এইভাবে শতকরা ৯৮ ভাগ SO_2 জারিত হয়। উৎপন্ন উষ্ণ SO_3 গ্যাস ও বাতাস অতঃপর তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠের নলের ভিতর দিয়া অতিক্রম করে (চিত্র ২২ট)। ফলে ইহার উষ্ণতা অনেকটা কমিয়া যায়।

সালফার ট্রাই-অক্সাইড অন্যান্য গ্যাসসহ অতঃপর স্ফটিক-খণ্ড-পূর্ণ স্তম্ভের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্তম্ভগুলির উপর হইতে ৯৮% গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড নীচের দিকে প্রবাহিত করা হয়। এই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে SO_3 দ্রবীভূত হয় এবং উহাকে ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিডে ($H_2S_2O_7$) পরিণত করে। নীচে একটি ট্যাঙ্কে এই অ্যাসিড সঞ্চিত হয় এবং ইহাতে ধীরে ধীরে প্রয়োজনানুরূপ জল মিশান হইতে থাকে যাহাতে অ্যাসিডের গাঢ়ত্ব সর্বদা শতকরা ৯৮ ভাগ থাকে। সোজাসুজি জলে সালফার ট্রাই-অক্সাইড সম্পূর্ণরূপে শোষণ করা কষ্টসাধ্য বলিয়াই উক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়।



$$H_2S_2O_7 + H_2O = 2H_2SO_4$$

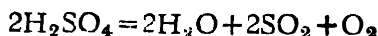
অধিকাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড এখন পর্যন্ত প্রকোষ্ঠপদ্ধতিতেই প্রস্তুত হইলেও স্পর্শ-পদ্ধতির প্রচলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। যদিও প্রাথমিক ব্যয় অধিক, তবুও স্পর্শ-পদ্ধতিতে যে অ্যাসিড পাওয়া যায় তাহা প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির অ্যাসিড অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় ও বিশুদ্ধ। তাহা ছাড়া, স্পর্শ-পদ্ধতিতে অ্যাসিডকে পুনরায় গাঢ়ীকরণের হাঙ্গামা নাই।

সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার ঃ ল্যাবরেটরী ছাড়াও বহু রকম রাসায়নিক শিল্পে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা হইতেই দেশের শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। মাত্র কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পের নাম এখানে করা যাইতে পারে :—(১) হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড, (২) বহুরকমের বিস্ফোরক, (৩) সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি, (৪) নানারকমের রঞ্জক, (৫) পেট্রোলিয়ামের শোধন।

২২-১৯। সালফিউরিক অ্যাসিডের ধর্ম ঃ (১) সচরাচর আমরা যে অত্যন্ত গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড দেখিতে পাই, উহাতে শতকরা ২ ভাগ জল থাকে। বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড পাইতে হইলে

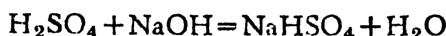
এই ৯৮ ভাগ অ্যাসিডে সালফার ট্রাই-অক্সাইড শোষণ করাইয়া ঠাণ্ডাতে জমাইয়া লইতে হয়। তখন বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড কেলাসিত হইয়া থাকে। উহার গলনাঙ্ক ১০.৫০° সেন্টিগ্রেড। সাধারণ অবস্থায় বিশুদ্ধ অ্যাসিড তেলের মত কিন্তু খুব ভারী বর্ণহীন তরল পদার্থ। উহার ঘনত্ব ১.৮৪৮ [১৫° সেণ্টি.]। শতকরা ৯৮.৩ ভাগ অ্যাসিড ও ১.৭ ভাগ জল, এইরূপ মিশ্রণটিকেই "গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড" বলা হয়। ইহার স্ফুটনাঙ্ক ৩৩৮° সেন্টিগ্রেড এবং ইহাকে পাতিত করিলেও উহাদের অনুপাতের কোন পরিবর্তন হয় না।

লোহিত-তপ্ত সিলিকা-নলের ভিতর দিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্পাবস্থায় পরিচালিত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া যায়।

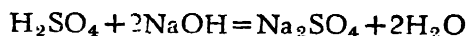


$$2H_2SO_4 = 2H_2O + 2SO_2 + O_2$$

(২) সালফিউরিক অ্যাসিড একটি তীব্র দ্বিক্ষারী অম্ল। উহা দুই রকম লবণ ও জল উৎপাদন করে।

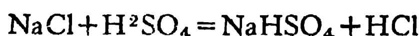


$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$

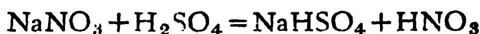


$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$$

ক্লোরাইড, নাইট্রেট প্রভৃতি অন্যান্য উদ্বায়ী অ্যাসিডের লবণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে ঐ সকল অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

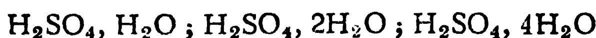


$$NaCl + H^2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$$



$$NaNO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HNO_3$$

(৩) সালফিউরিক অ্যাসিডের জলের প্রতি আসক্তি খুব বেশী। কম উষ্ণতায় উহা জলের সহিত বিভিন্ন সোদক স্ফটিকের সৃষ্টি করে –

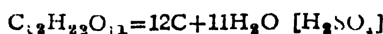


$$H_2SO_4, H_2O \,;\, H_2SO_4, 2H_2O \,;\, H_2SO_4, 4H_2O$$

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সর্বদাই জলীয় বাষ্প শোষণ করে। এই জন্যই শোষকাধারে উহা ব্যবহৃত হয়। অনেক গ্যাসও শুষ্ক করার জন্য উহার ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়।

শুধু ইহাই নয়, অনেক জৈব-পদার্থের অণু হইতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড জল শোষণ করিয়া লইয়া উহাকে বিযোজিত করিয়া দেয়। চিনি, স্টার্চ প্রভৃতি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে দিলে কার্বনে পরিণত হইয়া যায়। ফর্মিক

অ্যাসিড হইতে কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সালিক অ্যাসিড হইতে CO এবং CO_2 পাওয়া যায়ঃ -



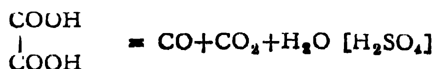
$$C_{12}H_{22}O_{11} = 12C + 11H_2O \; [H_2SO_4]$$

চিনি



$$HCOOH = CO + H_2O \; [H_2SO_4]$$

ফর্মিক অ্যাসিড



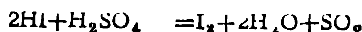
$$\begin{matrix} COOH \\ | \\ COOH \end{matrix} = CO + CO_2 + H_2O \; [H_2SO_4]$$

(অক্সালিক অ্যাসিড)

(৪) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের জারণ-ক্ষমতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পটাসিয়াম আয়োডাইড ও পটাসিয়াম ব্রোমাইড হইতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড যথাক্রমে আয়োডিন ও ব্রোমিন উৎপন্ন করে।



$$2KI + H_2SO_4 = 2HI + K_2SO_4$$



$$2HI + H_2SO_4 = I_2 + 2H_2O + SO_2$$



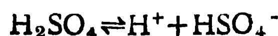
$$2KBr + 2H_2SO_4 = K_2SO_4 + Br_2 + 2H_2O + SO_2$$

কার্বন, সালফার প্রভৃতি অধাতব মৌল এবং কপার, সিলভার, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতব মৌলকেও যদি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ফুটান হয় তাহা হইলে উহারা জারিত হইয়া থাকে এবং সালফিউরিক অ্যাসিড বিজারিত হইয়া সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতু সালফিউরিক অ্যাসিডে আক্রান্ত হয় না।

(৫) সালফিউরিক অ্যাসিডের অত্যন্ত লঘু দ্রবণ নিম্নলিখিত রূপে বিয়োজিত হয়। $H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_4^{--}$

কিন্তু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের তাড়িত-বিয়োজন অন্যরূপ



$$H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$$

উহার তাড়িত বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও পার-ডাই-সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2S_2O_8$) পাওয়া যায়।



ক্যাথোডে : $H^+ + e = H$; $H + H = H_2$



অ্যানোডে : $HSO_4^- - e = HSO_4$; $2HSO_4 = H_2S_2O_8$

২২-২০। সালফিউরিক অ্যাসিড ও সালফেটের পরীক্ষা : কোন সালফেট বা সালফিউরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের সহিত বেরিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ মিশ্রিত

করিলে সাদা বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হইবেই। এই বেরিয়াম সালফেট গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়। $Na_2SO_4+Ba(NO_3)_2=BaSO_4+2NaNO_3$

যদি কোন সালফেট জলে অদ্রব হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রথমে কঠিন সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করিয়া গলাইয়া লইতে হইবে। পরে উহার জলীয় দ্রবণ ছাকিয়া লইয়া অম্লীকৃত করিয়া বেরিয়াম নাইট্রেট দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে।

২২-২১। অ্যামোনিয়াম সালফেট, $(NH_4)_2SO_4$: আমাদের দেশের জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কৃত্রিম-সার প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞেরা এজন্য অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অ্যামোনিয়াম সালফেট সাধারণতঃ অ্যামোনিয়া ও সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভারতে কোন সালফারের খনি নাই এবং প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা সুকঠিন। সেজন্য অপর দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমাদের দেশে জিপসাম, $CaSO_4.2H_2O$ বা অ্যানহাইড্রাইট $CaSO_4$ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম সালফেট খনিজ প্রচুর পাওয়া যায়। এই জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

স্টীম, বায়ু ও বিহারের কোক হইতে হেভার প্রণালী অনুযায়ী অ্যামোনিয়া তৈয়ারী করা যাইতে পারে। এই অ্যামোনিয়া কার্বনিক অ্যাসিড সহযোগে (CO_2+H_2O), অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত করা হয়। অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণ বিচূর্ণ জিপসামের সহিত উপযুক্ত উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়।



$$2NH_4HCO_3+CaSO_4=Ca(HCO_3)_2+(NH_4)_2SO_4$$



$$Ca(HCO_3)_2=CaCO_3+H_2O+CO_2$$

এই ভাবে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করিলে সালফারের প্রয়োজন হয় না এবং আমাদের দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। উপজাত ক্যালসিয়াম কার্বনেটও খানিকটা সার হিসাবে এবং অধিকাংশই সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ধানবাদের নিকটবর্তী সিন্ধ্রীতে এই জন্য কৃত্রিম সারের প্রথম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

সূচী

মৌলিক পদার্থ	ক্রমাঙ্ক	ইলেকট্রন K—L—M—N	মৌলিক পদার্থ	ক্রমাঙ্ক	ইলেকট্রন K—L—M—N
H	১	১	Na	১১	২+৮+১
He	২	২	Mg	১২	২+৮+২
Li	৩	২+১	Al	১৩	২+৮+৩
Be	৪	২+২	Si	১৪	২+৮+৪
B	৫	২+৩	P	১৫	২+৮+৫
C	৬	২+৪	S	১৬	২+৮+৬
N	৭	২+৫	Cl	১৭	২+৮+৭
O	৮	২+৬	A	১৮	২+৮+৮
F	৯	২+৭	ইত্যাদি—		
Ne	১০	২+৮			

বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রত্যেকটি পরমাণু তাহার বেষ্টনীগুলিকে যথাসাধ্য ইলেকট্রনদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহে। যে সমস্ত পরমাণুর বেষ্টনীগুলি ইলেকট্রনদ্বারা পূর্ণ, রাসায়নিক দিক হইতে তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। হিলিয়ম, নিয়ন, আরগন প্রভৃতি গ্যাসের পরমাণুতে বেষ্টনীগুলি ইলেকট্রন-পূর্ণ এবং ইহাদের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে দেখা যায় না।

	K L M N
হিলিয়াম—	২
নিয়ন—	২ + ৮
আরগন—	২ + ৮ + ৮
ক্রিপ্টন—	২ + ৮ + ১৮ + ৮

কার্বন বা নাইট্রোজেন অথবা সোডিয়াম প্রভৃতি যে সমস্ত পরমাণুর শেষ বেষ্টনীতে আটের অনধিক ইলেকট্রন থাকে, তাহারাও নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর মত গঠন আকাঙ্ক্ষা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

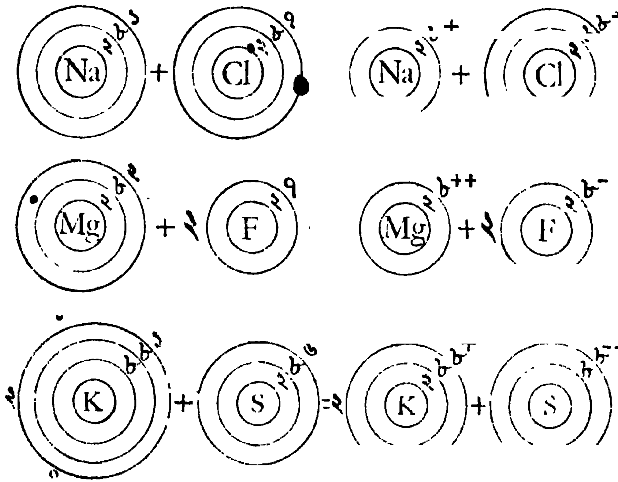
দুইটি পরমাণুর যখন রাসায়নিক মিলন হয় তখন বস্তুত: উহাদের ইলেকট্রন-গুলির স্বাভাবিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। যে ইলেকট্রনগুলি সবচেয়ে বাহিরের বেষ্টনীতে থাকে তাহারাই কেবল এই সংযোজনা বা রাসায়নিক মিলনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরমাণুর যোজন-ক্ষমতা বা যোজ্যতা এই সর্ববহিঃস্থ

বেষ্টনীর ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রাসায়নিক মিলনের সময় পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অনুরূপ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস বা কাঠামো পাইতে চেষ্টা করে এবং তদনুযায়ী উহাদের বহিঃপ্রান্তের ইলেকট্রনগুলির কিছু স্থান পরিবর্তন হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজনকালে এই পরিবর্তন সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সাধিত হয়ঃ

১। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি পরমাণুর মিলনের সময় একটি পরমাণু হইতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন অপর পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়। একটি পরমাণু উহার শেষ স্তর হইতে ইলেকট্রন দান করে এবং অপর পরমাণু উহা গ্রহণ করে এবং স্বীয় শেষ বেষ্টনীতে রাখে। ইলেকট্রনের এই দেওয়া-নেওয়া এমনভাবে সম্পন্ন হয় যে উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু কাঠামো বা গঠন পাইয়া থাকে। এইরূপ 'যোজ্যতাকে 'ইলেকট্রনীয় যোজ্যতা' (Electrovalency) বলা হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় ধাতব পদার্থসমূহের বহিঃপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত কম ইলেকট্রন থাকে (১ হইতে ৩)। এই সব মৌলিক পদার্থ সহজেই উক্ত ইলেকট্রনগুলি অপরকে দান করিয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো ধারণ করে। অন্যদিকে অক্সিজেন, ক্লোরিন, ইত্যাদি অধাতুসমূহে শেষ বেষ্টনীতে অধিক ইলেকট্রন থাকে এবং দুই একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিলেই উহারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পাইতে পারে। সুতরাং সাধারণ নিয়মে ধাতুসকল ইলেকট্রন দেয় এবং অধাতুসমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে। ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ না-ধর্মী; অতএব ইলেকট্রন দান বা ত্যাগের ফলে ধাতুর পরমাণুটি পরাবিদ্যুৎসম্পন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকেই আমরা আয়ন বলি। আবার সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে অধাতুর পরমাণুর বিদ্যুৎভার না-ধর্মী হইয়া পড়ে; অর্থাৎ, উহারা নেগেটিভ বা অপরাবিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন সৃষ্টি করে। এই বিপরীতধর্মী ধাতু এবং অধাতুর আয়নগুলি পরস্পরের আকর্ষণে মিলিত থাকে এবং যৌগিক অণুর সৃষ্টি করে। কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থায় তাড়িত-আকর্ষণের হ্রাসহেতু যুক্ত-আয়নগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

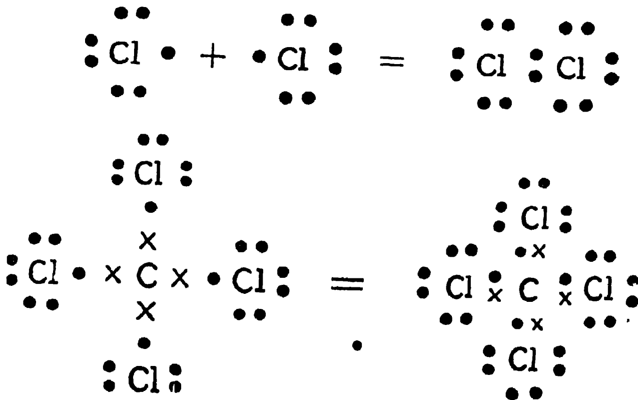
২। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি পরমাণু যখন সংযোজিত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণু হইতে একটি করিয়া ইলেকট্রন আসিয়া এক ইলেকট্রন-যুগল সৃষ্টি করে। এই ইলেকট্রন-যুগল পরমাণু দুইটির মধ্যস্থলে আসিয়া তাহাদের রাসায়নিক মিলন ঘটায়। এই দুইটি ইলেকট্রনকে প্রত্যেক পরমাণুরই অন্তর্ভুক্ত

বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহার ফলে উভয় পরমাণুর বাহিরের পরিধিতে পূর্ণ সংখ্যক (৮টি) ইলেকট্রনের অবস্থিতি ঘটে। এইরূপে দুইটি পরমাণুই



ইলেকট্রনীয় যোজ্যতা

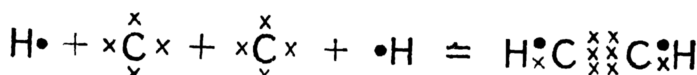
(ন)িষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর কাঠামো পায়। দুইটি পরমাণু পরস্পরের নিকট (হ)ইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না এবং পরমাণুগুলির বিদ্যুৎমাত্রার কোন তারতম্য (হ)য় না। ইহাকে 'সমযোজ্যতা' (Covalency) বলা হয়। যেমন :—



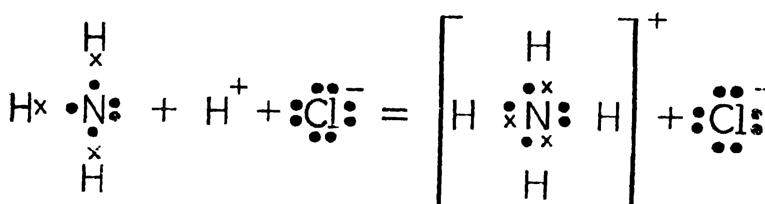
পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি শুধু দেখান হইয়াছে।

স্পষ্টতঃই দেখা যায়, যদি বন্ধনী ইলেকট্রনদ্বয়কে উভয় পরমাণুর সঙ্গেই যুক্ত আছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে যৌগ পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর বেষ্টনীতেই ৮টি ইলেকট্রন থাকিবে। আমরা পূর্বে যে যোজক বা ব[ন্ধনী] কল্পনা করিয়াছি, তাহা এই যুগ্ম-ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুই[টি] পরমাণুর ভিতর যে যোজক থাকে তাহা দুইটি ইলেকট্রনের সমবায় নির্দে[শ] করে মাত্র।

কোন কোন সময় দুইটি পরমাণু যখন মিলিত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণু একাধিক ইলেকট্রন দিয়া উহাদের মধ্যকার মিলন-সেতু বা বন্ধনী রচনা করে। যেমন, অ্যাসিটিলিনের দুইটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে ৬টি ইলেকট্রন যোজকের কাজ করে :—



৩। দুইটি বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজনার সময় যে দুইটি ইলেকট্রন যোজকের কাজ করে তাহারা যদি একই পরমাণু হইতে আসে, তাহা হইলে সেইরূপ যোজ্যতাকে 'অসমযোজ্যতা' (Co-ordinate Covalency) বলা হয়। **যেমন :—**



নাইট্রোজেনের দুইটি ইলেকট্রনই হাইড্রোজেন আয়নকে যুক্ত করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

জৈব-রসায়ন

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কার্বন (অঙ্গারক)

সঙ্কেত, C. পারমাণবিক গুরুত্ব, ১২·০১। ক্রমাঙ্ক, ৬।

প্রকৃতিতে প্রচুর কার্বন মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়। হীরক, গ্র্যাফাইট, কয়লা প্রভৃতিতে কার্বন মৌলিক অবস্থায় আছে। কার্বনের বহুরকম যৌগিক পদার্থও প্রকৃতিতে প্রচুর দেখা যায়। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অধিকাংশ পদার্থই কার্বনের যৌগ। জীবদেহের প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট্, স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি কার্বনের যৌগ। খনিজ পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর প্রভৃতিও কার্বনের যৌগ।

২৩-১। কার্বনের বহুরূপতা : কার্বন বহুরূপী মৌল, সুতরাং উহা নানা অবস্থায় থাকিতে পারে। উহার বিভিন্ন রূপভেদের দুইটি স্ফটিকাকার এবং অপরগুলি অনিয়তাকার। ডায়মণ্ড (হীরক) এবং গ্র্যাফাইট স্ফটিকাকার। অনিয়তাকার কার্বন মোটামুটি পাঁচ রকমের :

(১) প্রাণিজ অঙ্গার (Animal charcoal)

(২) উদ্ভিজ্জ অঙ্গার (Wood charcoal)

(৩) ভুসা কয়লা (Lampblack)

(৪) গ্যাস কার্বন (Gas carbon)

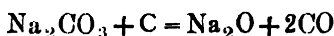
(৫) কোক (Coke)

বাহ্যতঃ এই বিভিন্ন রকমের কার্বনের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হীরক ও ভুসাকয়লার ভিতরে কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু সমপরিমাণ ওজনে বিভিন্ন প্রকারের কার্বন লইয়া যদি জারিত করা হয় তবে সবক্ষেত্রেই কেবলমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় এবং উহার পরিমাণও একই হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন পদার্থগুলি যে একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ মাত্র ইহাই তাহার প্রমাণ।

২৩-২। ডায়মণ্ড (হীরক)ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ (গোলকুণ্ডা), ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে হীরক পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক মাটির নীচে পাথরের সহিত মিশ্রিত থাকে। খনি হইতে পাথরগুলি তুলিয়া আনিয়া প্রথমে ফেলিয়া রাখা হয়। জলবায়ুতে এই সব পাথর খানিকটা ভাঙিয়া যায়। পরে উহাকে চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চর্বিমাখান টেবিলের উপর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। ভারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের টুকরাগুলি নীচে থিতাইয়া গিয়া চর্বিতে আটকাইয়া থাকে, এইভাবে মাটি হইতে হীরক উদ্ধার করা হয়। ভারতবর্ষে কোন কোন নদী-তীরস্থ বালুকার সঙ্গে ছোট ছোট হীরক থাকে, এবং অনুরূপ উপায়েই উহা সংগৃহীত হয়। হীরক স্ফটিকগুলি অষ্টতল অথবা সমকোণী ষট্‌তল স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্ফটিকগুলি খুবই ছোট থাকে, কিন্তু কখন কখন খুব বড় হীরকও দেখা যায়, যেমন কোহিনূর (১৮৬ ক্যারাট), কুলিয়ান (৩০৩২ ক্যারাট), হোপ (৪৪·৫ ক্যারাট), ইত্যাদি। হীরকের ওজন ক্যারাট হিসাবে মাপা হয়; এক ক্যারাট =০·২০০ গ্রাম। বিশুদ্ধ হীরক অবশ্য অতিশয় স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন, কিন্তু প্রায়ই হীরকের সহিত অন্যান্য পদার্থ স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বলিয়া স্বচ্ছ হইলেও উহারা নানাবর্ণের হইয়া থাকে। বর্ণহীনতা ও স্বচ্ছতার দ্বারাই হীরকের মূল্য নির্ধারিত হয়। হীরকের টুকরাগুলি কাটিয়া বহুতল করিলে কোণ বৃদ্ধির সঙ্গে উহার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এইভাবে সাধারণ হীরক বহুমূল্য রত্নে পরিণত হয়। সময় সময় কাল হীরকও পাওয়া যায়, উহাদিগকে কার্বনাডা এবং বোর্ট (Carbonado and Bort) বলে। রত্ন হিসাবে ইহাদের কোন দাম নাই। বিচূর্ণ অবস্থায় ইহারা পাথর কাটার কাজে অথবা পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়।

কার্বনের রূপভেদগুলির মধ্যে হীরক সর্বাপেক্ষা ভারী, ইহার ঘনত্ব, ৩·৫; ইহার প্রতিসরাঙ্কও খুব বেশী। হীরক তাপ অথবা বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে পারে না। হীরক অত্যন্ত শক্ত এবং হীরকের অপেক্ষা অধিকতর শক্ত বস্তু আর নাই। রঞ্জনরশ্মি হীরকের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম কাচ প্রভৃতির ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। ইহার সাহায্যেই হীরক ও অন্যান্য স্বচ্ছ কাচের পার্থক্য ধরা পড়ে। রাসায়নিক বিকারক দ্বারা হীরক বিশেষ আক্রান্ত হয় না। অক্সিজেনে অত্যধিক উষ্ণতায় অবশ্য ইহা জারিত হইয়া

কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। গলিত সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা ইহা আক্রান্ত হয় :—



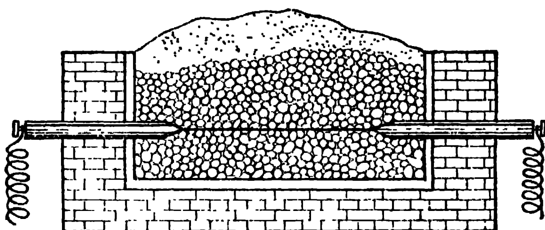
$$Na_2CO_3 + C = Na_2O + 2CO$$

হীরকের ব্যবহার। শক্ত বলিয়া হীরক কাচ এবং অন্যান্য অনেক জিনিস কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। হীরকচূর্ণ পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাল হীরকই রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২৩-৩। গ্র্যাফাইট : গ্র্যাফাইট নামটি গ্রীক "গ্র্যাফো" (grapho) শব্দ হইতে উদ্ভূত [grapho অর্থাৎ [write—"যে লেখে"]। উহা কাগজে দাগ দিতে পারে বলিয়া এই নামকরণ। বস্তুতঃ, সাধারণ "সীস পেনসিল" বা কাঠের পেনসিলে সীসা নাই, উহার ভিতরে গ্র্যাফাইট কার্বন আছে।

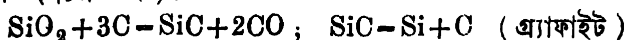
সিংহল, সাইবেরিয়া, যুক্তরাজ্য ও ইতালীতে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায়। কাল ষট্‌কোণী স্ফটিকাকারে ইহা থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইহার চাহিদা এত বেশী যে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে গ্র্যাফাইট তৈয়ারী করা হয়।

"অ্যাকেসন্ পদ্ধতি" : অগ্নিসহ-ইষ্টক নির্মিত একটি প্রকাণ্ড চুল্লীতে বিচূর্ণ কোক এবং সিলিকার (বালু) মিশ্রণ অত্যধিক উষ্ণতায় তাপিত করা হয়। বিপরীত দিক হইতে চুল্লীর ভিতর গ্র্যাফাইটেরই দুইটি তড়িৎ-দ্বার প্রবেশ করান



চিত্র ২৩ক—অ্যাকেসন্ পদ্ধতিতে গ্র্যাফাইট প্রস্তুতি

থাকে এবং তড়িৎ-বহনের জন্য এই তড়িৎ-দ্বার দুইটির ভিতর কয়েকটি দীর্ঘ গ্র্যাফাইট দণ্ড দেওয়া হয়। উহাদের ভিতর দিয়া পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করা হয়। এইরূপে সমগ্র মিশ্রণটিকে প্রায় ৪০০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। বিক্রিয়ার ফলে প্রথমে সিলিকন কার্বাইড উৎপন্ন হয়, পরে অতিরিক্ত উষ্ণতায় উহা বিযোজিত হইয়া গ্র্যাফাইট কার্বনে পরিণত হয়। (চিত্র ২৩ক)।



$$SiO_2 + 3C = SiC + 2CO \; ; \quad SiC = Si + C \quad (\text{গ্র্যাফাইট})$$

গ্র্যাফাইট গাঢ় ধূসরবর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। উহার কিন্তু ধাতুর মত একটি দ্যুতি আছে। গ্র্যাফাইট বেশ নরম এবং স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বা তৈলাক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহার ঘনত্ব ২'২। গ্র্যাফাইট অধাতব হইলেও উহা বিদ্যুৎ ও তাপ বহন করিতে সক্ষম।

অক্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে অবশ্য গ্র্যাফাইট পুড়িয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক বিকারক ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

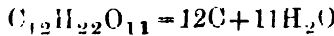
গ্র্যাফাইটের ব্যবহার: (১) অনেক যন্ত্রে তেল অথবা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্র্যাফাইটচূর্ণ পিচ্ছিলকারক (lubricant) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (২) গ্র্যাফাইটের সাহায্যে এখন বড় বড় খর্পর তৈয়ারী করা হয়। উহারা অত্যধিক উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে। (৩) সীস-পেনসিল তৈয়ারী করার জন্য গ্র্যাফাইট প্রয়োজন হয়। (৪) বিদ্যুৎ-চুল্লীতে এবং অনেক বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণে গ্র্যাফাইট-দণ্ড তড়িৎ-দ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২৩-৪। অনিয়তাকার কার্বন ঃ

(১) **উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার (কাঠ কয়লা)ঃ** কাঠ আংশিকভাবে পোড়ান হইলে উহা হইতে কাল অঙ্গার পাওয়া যায়। ইহাকে কাঠকয়লা বলে—স্পষ্টতঃই ইহা উদ্ভিদ-জাত অঙ্গার। সচরাচর কাঠের অন্তর্ধূমপাতনের দ্বারা উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার প্রস্তুত করা হয়। মাটির ভিতর বড় গর্ত করিয়া উহা কাঠের টুকরা দ্বারা পূর্ণ করা হয়। উপরেও উহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়, কেবলমাত্র গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য একটি পথ রাখা হয়। তৎপর কাঠে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। খানিকটা কাঠ পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তাপে বাকী কাঠ হইতে উদ্বায়ী বস্তুসকল বাহির হইয়া আসে এবং কাঠ অঙ্গারে পরিণত হয়। বর্তমানে আরও উন্নত প্রণালীতে কাঠের অন্তর্ধূমপাতন করা হয়। আবদ্ধ লোহার বকযন্ত্রে কাঠের টুকরা বোঝাই করিয়া উহাকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। বাতাস উহার সংস্পর্শে আসিতে পারে না। বকযন্ত্রটির উপরে একটি নির্গম-নল থাকে, সেই পথ দিয়া বিযোজনের ফলে যে সকল উদ্বায়ী বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা বাহির হইয়া যায় এবং বকযন্ত্রের ভিতর অঙ্গার পড়িয়া থাকে। উদ্বায়ী পদার্থসমূহকে ঠাণ্ডা করিলে উহার খানিকটা ঘনীভূত হইয়া তরল হয়; বাকী গ্যাস সঞ্চয়

করিয়া রাখা হয়। তরল পদার্থটুকুর দুইটি অংশ থাকে—(১) জলীয় অংশ, ইহাকে পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড বলে। ইহা হইতে মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোন প্রভৃতি পাওয়া যায়। (২) আলকাতরার অংশ, ইহা হইতে ফিনোল জাতীয় মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। যে গ্যাস ঘনীভূত হয় নাই, উহা জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। কাঠের বিযোজিত পদার্থগুলির মোটামুটি পরিমাণ: কাঠ কয়লা—২৫%, গ্যাস—২০%-২৫%, জলীয় পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড—৫০%-৫২%, আলকাতরা—৪%-৫%।

নারিকেলের মালাও অনুরূপভাবে বাতাসের অনুপস্থিতিতে অন্তর্ধূমপাতন করিলে অনিয়তাকার অঙ্গারে পরিণত হয়। স্বল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার প্রয়োজন হইলে চিনির অন্তর্ধূমপাতনদ্বারা তৈয়ারী করা হয়। অতিরিক্ত উষ্ণতায় চিনি বিযোজিত হইয়া যায়।



$$C_{12}H_{22}O_{11} = 12C + 11H_2O$$

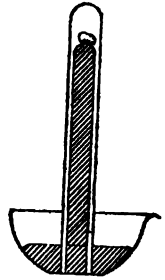
উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার কালো অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। কিন্তু পদার্থটি সরন্ধ্র, ফলে ইহার অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু থাকে। সেইজন্য জল অপেক্ষা ভারী হওয়া সত্ত্বেও ইহা জলে ভাসে। ইহার ঘনত্ব ১.৪-১.৯। ইহার বিদ্যুৎ বা তাপ বহন ক্ষমতা মোটেই নাই।

গ্যাসীয় পদার্থগুলি অনেক সময় কঠিন বস্তুর গায়ে আসিয়া জড়ীভূত হইয়া থাকে। এই গ্যাসগুলি বস্তুতঃ কঠিন পদার্থে দ্রবীভূত হয় না, কিংবা অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে না, কেবলমাত্র পৃষ্ঠদেশে আকৃষ্ট হইয়া লাগিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বহির্ধৃতি (adsorption) বলে।

গ্যাস ছাড়াও এই সকল কঠিন পদার্থ কোন দ্রবণ হইতে দ্রাবটিকে বহির্ধৃত করিয়া রাখিতে পারে। বহির্ধৃতিতে অবস্থানগত সংযোগ ঘটে বটে, কিন্তু কোন রাসায়নিক সংযোগ হয় না। কাঠ-কয়লার বহির্ধৃতি-ক্ষমতা খুব বেশী। ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসকে উহা বিভিন্ন পরিমাণে বহির্ধৃত করিয়া রাখে। যেমন এক গ্রাম নারিকেলের অঙ্গারে, ০°ডিগ্রী উষ্ণতায় ও প্রমাণ চাপে অ্যামোনিয়া —১৭২ ঘনায়তন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড—৬৮ ঘনায়তন, ইথিলীন—৭৫ ঘনায়তন ইত্যাদি পরিমাণ গ্যাস বহির্ধৃত হইয়া থাকে।

একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারাই কাঠ-কয়লার বহির্ধৃতি বুঝা যাইতে পারে।

পরীক্ষা : পারদের উপরে একটি টেস্টটিউবে খানিকটা অ্যামোনিয়া লও। এক টুকরা কাঠ-কয়লা বেশ উত্তমরূপে গরম করিয়া পারদের ভিতর দিয়া গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও (চিত্র ২৩খ)। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যাইবে গ্যাসটি অন্তর্হিত হইয়া সম্পূর্ণ নলটি প্রায় পারদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কার্বনের বহির্ধৃতির ফলেই ইহা সম্ভব।



চিত্র ২৩খ -কাঠ-কয়লার বহির্ধৃতি

নারিকেলের অঙ্গার যদি অল্প একটু বাতাসে বা স্টীমে ৮০০°-৯০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয় তবে উহার বহির্ধৃতি-ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। উহাকে 'সক্রিয় অঙ্গার' (activo charcoal) বলে। 'গ্যাস মাস্কে' (Gas-mask) ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঠ-কয়লা অবশ্যই জ্বালানী হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(২) প্রাণিজ অঙ্গার : জীবজন্তুর হাড়ের ছোট ছোট টুকরা প্রথমে জলে ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে উহার চর্বি দূর হয়। তৎপর এই হাড়গুলি বাতাসের অবর্তমানে অন্তর্ধূমপাতন করা হয়। উদ্বায়ী পদার্থগুলি গ্যাস হইয়া বাহির হইয়া যায়। এই গ্যাস ঘনীভূত করিয়া 'বোন-অয়েল' (Bone oil) ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। হাড়গুলি ঘন কালো একটি অনিয়তাকার চূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই প্রাণিজ-অঙ্গার। ইহার আর একটি নাম বোন-ব্ল্যাক (Bone black)। ইহাতে অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফসফেট মিশ্রিত থাকে। এই উপায়ে রক্তের অন্তর্ধূমপাতন করিলেও ঐরূপ কালো অঙ্গারচূর্ণ পাওয়া যায়। প্রাণিজ-অঙ্গারের বাহির্ধৃতি-ক্ষমতা খুব বেশী।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রাণিজ-অঙ্গারের ফসফেট দ্রবীভূত করিয়া পৃথক করিলে খুব কালো কার্বন পড়িয়া থাকে—উহাকে আইভরি ব্ল্যাক (Ivory balck) বলে।

পরীক্ষা : একটি টেস্টটিউবে নীলের লঘু দ্রবণ লও। উহাতে সামান্য-একটু অঙ্গারচূর্ণ মিশাইয়া দ্রবণটি ফুটাইয়া লও। তৎপর উহাকে ফিল্টার কাগজে ছাঁকিলে দেখিবে পরিস্রুতটি বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ অঙ্গার নীলকে দ্রবণ হইতে বহির্ধৃত করিয়া লইয়াছে। এইভাবে অঙ্গারের সাহায্যে বাজারের চিনি বা লবণের সহিত মিশ্রিত অপদ্রব্য বা রঙও দূর করা সম্ভব।

(৩) ভুসা কয়লা : তার্পিন তেল, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, বেনজিন প্রভৃতি জৈব-জাতীয় যৌগ (যাহাতে কার্বনের পরিমাণ সমধিক) অনতিরিক্ত

বায়ুতে পোড়াইলে এক প্রকার কালো ধূম নির্গত হয়। ঠাণ্ডা কোন দেওয়ালে বা পাত্রের গায়ে উহা জমিয়া ঝুল বা ভূসার সৃষ্টি করে। ইহাই ভূসা কয়লা। ইহা অনিয়তাকার। ছাপার কালি, জুতার কালি প্রভৃতিতে ইহা প্রয়োজন হয়। সাইকেলের রঙ ও পালিশেও ইহা দেওয়া হয়।

(৪) **কোক কয়লা ও গ্যাস কার্বন :** প্রকৃতিতে যে কয়লা পাওয়া যায় উহাতে কার্বনের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ অন্যান্য জৈব-জাতীয় যৌগ মিশ্রিত থাকে। লোহার বকযন্ত্রে অথবা অগ্নিসহ ইটের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কয়লার অন্তর্ধূমপাতন করা হয়। ইহার ফলে জৈব-জাতীয় যৌগসমূহ বিযোজিত হইয়া যায় এবং সমস্ত উদ্বায়ী পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। বকযন্ত্রে যে কালো অনুদ্বায়ী কার্বন পড়িয়া থাকে তাহাকেই কোক-কয়লা বলা হয়। অত্যধিক উষ্ণতায় অন্তর্ধূমপাতন করিলে হার্ড-কোক (Hard coke) পাওয়া যায়। ইহা ধাতু-নিষ্কাশনে প্রয়োজন হয়। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় অন্তর্ধূমপাতনের ফলে যে কোক পাওয়া যায় উহা সফ্‌ট-কোক (Soft coke)। উহা সাধারণ রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কয়লার অন্তর্ধূমপাতনের সময়ে বকযন্ত্রের উপরের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে খানিকটা কার্বন ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া জমিয়া থাকে। এই শক্ত, কালো, কঠিন অঙ্গার গ্যাস-কার্বন নামে পরিচিত। ইহার ঘনত্ব, ২.৫৫। ইহা তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী। তড়িৎ-বিশ্লেষণে তড়িৎদ্বার রূপে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। অনেক ব্যাটারীতে ক্যাথোড রূপে এবং আর্ক-দীপের তড়িৎদ্বার হিসাবে 'গ্যাস কার্বন' ব্যবহৃত হয়।

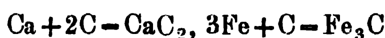
২৩-৫। অঙ্গারের রাসায়নিক ধর্ম : কার্বনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত কম। অধিকতর উষ্ণতায় কার্বন অক্সিজেন বা বাতাসে পুড়িয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে জারিত হয়। সালফার নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সহিত উহা অধিক উষ্ণতায় সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে :—


$C+2S=CS_2$ [কার্বন ডাই-সালফাইড]


$2C+N_2=C_2N_2$ [সায়ানোজেন]


$2C+H_2=C_2H_2$ [অ্যাসিটিলিন]

উত্তপ্ত ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন ধাতব কার্বাইড উৎপাদন করে :—



$$Ca + 2C = CaC_2,\ 3Fe + C = Fe_3C$$

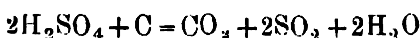
লোহিত-তপ্ত অঙ্গার স্টীম বিয়োজিত করে এবং অধিক উষ্ণতায় অক্সিজেন-যৌগসমূহকে বিজারিত করে :—



$$C + H_2O = CO + H_2,\quad CuO + C = Cu + CO$$



$$Fe_2O_3 + 3C = 2Fe + 3CO,\quad Na_2SO_4 + 4C = Na_2S + 4CO$$



$$2H_2SO_4 + C = CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$$

কার্বনের অক্সাইডদ্বয়

কার্বনের দুইটি অক্সাইড আছে : কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2 এবং কার্বন-মনোক্সাইড, CO ।

২৩-৬। কার্বন ডাই-অক্সাইড : পরিমাণে সামান্য হইলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের একটি অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপাদান। বাতাসে ইহার পরিমাণ মাত্র শতকরা ০·০৩ ভাগ। জীবজন্তুর নিঃশ্বাস হইতে এবং কাঠ, খড় প্রভৃতি জৈবজাতীয় পদার্থের জারণের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চারিত হয় এবং এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যেই উদ্ভিদ-জগতের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি বজায় থাকে। কোন কোন প্রস্রবণের জলের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইতে দেখা যায়। জাভা ও ইতালীর কোন কোন অংশে ভূগর্ভ হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

২৩-৭। প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : ধাতব কার্বনেট লবণের সহিত খনিজ অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করাই সাধারণ রীতি। সমস্ত কার্বনেটই অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। যথা :—



$$MgCO_3 + 2HCl = MgCl_2 + H_2O + CO_2$$



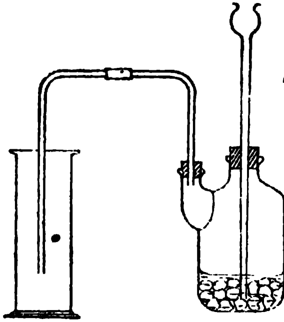
$$Na_2CO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$$



$$PbCO_3 + 2HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$$

সাধারণতঃ মার্বেল-পাথরের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। খানিকটা ছোট্ট ছোট মার্বেল টুকরা

একটি উলফ-বোতলে লইয়া উহার মুখ দুইটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করা হয়। একটি কর্কের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল এবং অপরটিতে একটি নির্গম-নল থাকে। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। অ্যাসিড মার্বেল পাথরের সংস্পর্শে আসিলেই বিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া থাকে। ইহা বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী এবং বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাস-জারে ইহা সঞ্চয় করা হয় (চিত্র ১৩গ)।



চিত্র ১৩গ $-CO_2$ প্রস্তুত

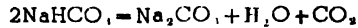


$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া গ্যাসটিকে শুষ্কাবস্থায় পারদের উপর সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(১) এই প্রস্তুতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা সমীচীন নয়, কেননা প্রথমতঃ খানিকটা বিক্রিয়া হওয়ার পরই উৎপন্ন অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফেট মার্বেলের উপর জমিয়া বিক্রিয়াটি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রয়োজনানুরূপ CO_2 পাওয়ার জন্য কিপ-যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহার মধ্য-গোলকে মার্বেল পাথরের টুকরা থাকে এবং উপরে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয়।

(২) সোডিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়ার ইহাই প্রশস্ত উপায়।



$$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

(৩) ক্ষার-ধাতুর কার্বনেট এবং বেরিয়াম কার্বনেট ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কার্বনেটই উত্তাপে বিযোজিত হইয়া যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। চুনাপাথরই এইজন্য বেশী ব্যবহৃত হয় :— $CaCO_3 = CaO + CO_2$

প্রকৃতিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$ নানা অবস্থায় পাওয়া যায়, যথা—মার্বেল পাথর, চুনাপাথর (লাইমস্টোন) বা খড়িমাটি (চক) ইত্যাদি। ইহাই প্রধানতঃ CO_2 উৎপাদনের প্রধান উপাদান এবং CO_2 শিল্প ইহার উপর নির্ভর করে।

(৪) উৎসেচকের সাহায্যে চিনির কোহলজাতীয় সন্ধানের ফলেও (alcoholic fermentation) কার্বন ডাই-অক্সাইডের উদ্ভব হইয়া থাকে :—



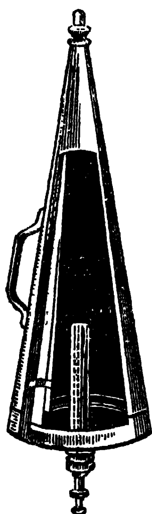
$$C_6H_{12}O_6 = 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

(গ্লুকোজ) (কোহল)

২৩৮। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্মঃ

(১) কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি মৃদু-ঘ্রাণ এবং একটু অম্ল-স্বাদ আছে। চাপ বৃদ্ধি করিয়া সহজেই এই গ্যাসটিকে তরল করা যায়। স্টীলের সিলিণ্ডারে অতিরিক্ত চাপে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড রাখা হয় এবং হিমায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সহসা বাষ্পীভূত করিতে গেলেই উহার খানিকটা জমিয়া কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড সাধারণ চাপে ও উষ্ণতায় রাখিলে উর্ধ্বপাতিত হইয়া সোজাসুজি গ্যাসে পরিণত হয়। কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড আজকাল হিমায়ক-রূপে প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। ইহাকে "শুকনো বরফ" (Dry ice) বলা হয়।

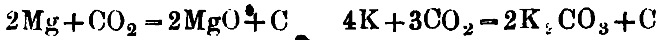
(২) কার্বন ডাই-অক্সাইড নিজে দাহ্য নয় এবং অপর কোন বস্তুর দহনেও সহায়ক নয়। এই জন্য ছোট ছোট অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণ করিতে প্রায়ই কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি কাচের বোতলে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে এবং বাকী স্থানটি সোডিয়াম কার্বনেটের গাঢ় দ্রবণে পূর্ণ থাকে। প্রয়োজনকালে বাহির হইতে একটি স্প্রিংয়ের সাহায্যে ভিতরের কাচের বোতলটি ভাঙিয়া ফেলা হয়। অ্যাসিড সোডার সংস্পর্শে আসিয়া তৎক্ষণাৎ প্রচুর CO_2 উৎপাদন করে। জল ও গ্যাসের মিশ্রণ বেগের সহিত যন্ত্রের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। আগুনের উপর উহা নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং এই ভাবে অগ্নিনির্বাপণ করা হয়। তেল বা পেট্রোলের আগুন নিভাইতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে ফটকিরি ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট থাকে এবং তাহা হইতে ফেনাযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়:



$$Al_2(SO_4)_3 + 6NaHCO_3 = 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4 + 6CO_2$$

(৩) কার্বন ডাই-অক্সাইড দহন সহায়ক না হইলেও জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা পটাসিয়াম এই গ্যাসে যথারীতি জ্বলিতে থাকে। উহার কারণ, পটাসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম দহন-কালে উষ্ণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিয়োজিত হইয়া অক্সিজেন

উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন অক্সিজেন সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম জ্বলিতে থাকে। দহনের ফলে CO_2 হইতে কালো কার্বন পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড যে কার্বনের যৌগ ইহাই তাহার প্রমাণ।

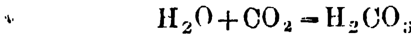


$$2Mg + CO_2 = 2MgO + C \qquad 4K + 3CO_2 = 2K_2CO_3 + C$$

কার্বন ডাই-অক্সাইডের কোন বিষক্রিয়া নাই, কিন্তু উহাতে জীবজন্তু থাকিলে অক্সিজেন অভাবে শ্বাসকার্য বন্ধ হইয়া মারা যায়।

(৪) সাধারণ অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে প্রায় সমায়তন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করিয়া উহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট বাড়ান যায়। অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিয়াই বাতান্বিত জল, সোডা, লেমনেড প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

(৫) কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণটি অম্ল-জাতীয়। উহা নীল লিটমাসকে ঈষৎ লাল করিয়া দেয়। ইহার কারণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড জলের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড নামক মৃদু অম্ল উৎপাদন করে—



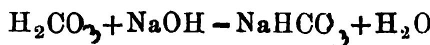
$$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$$

এবং এই জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডকে অনেক সময় কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসও বলা হয়।

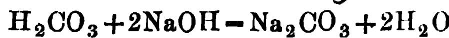
কেবল জলীয় দ্রবণেই কার্বনিক অ্যাসিড থাকে। জল হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ কার্বনিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জলীয় দ্রবণে অ্যাসিডের সমস্ত গুণই বিদ্যমান থাকে। কার্বনিক অ্যাসিড দ্বিক্ষারী অম্ল এবং উহা হইতে দুই প্রকার লবণের উৎপত্তি হয়—বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট।



$$H_2CO_3 = 2H^+ + CO_3^{--}$$



$$H_2CO_3 + NaOH = NaHCO_3 + H_2O$$



$$H_2CO_3 + 2NaOH = Na_2CO_3 + 2H_2O$$

কার্বনিক অ্যাসিড মৃদু অম্ল এবং অতি সহজে বিযোজিত হইয়া CO_2 গ্যাসে পরিণত হয় বলিয়া কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ যে কোন তীব্র অম্ল দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং CO_2 উৎপাদন করে।

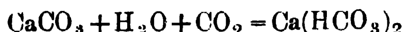
(৬) পূর্বেই বলা হইয়াছে, কার্বন ডাই-অক্সাইড অম্ল-জাতীয় অক্সাইড। বিভিন্ন ক্ষার-দ্রবণ উহাকে শোষণ করে এবং উহার সহিত ক্রিয়া করিয়া কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ চুনের জলের সহিত বিক্রিয়ার

ফলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্বচ্ছ চুনের জল ঘোলাটে হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সর্বদা কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা করা হয়।



$$Ca(OH)_2+CO_2=CaCO_3+H_2O$$

কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস যদি ক্রমাগত চুনের জলে পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হইয়া যায়। ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট জলে দ্রবণীয়, সুতরাং ঘোলাটে চুনের জল আবার স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। এই দ্রবণ ফুটাইলে আবার $CaCO_3$ পাওয়া যায়।

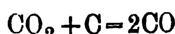


$$CaCO_3+H_2O+CO_2=Ca(HCO_3)_2$$



$$Ca(HCO_3)_2=CaCO_3+CO_2+H_2O$$

(৭) লোহিততপ্ত কার্বন, অথবা উত্তপ্ত জিঙ্ক, আয়রন-চূর্ণ প্রভৃতির দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়।



$$CO_2+C=2CO$$



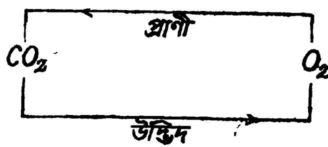
$$CO_2+Zn=ZnO+CO$$

উদ্ভিদ-জগৎ বায়ু হইতে CO_2 গ্রহণ করে। সূর্যালোকে ক্লোরোফিল নামক প্রভাবকের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হইয়া শর্করা-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন নির্গত হয়।



$$6CO_2+5H_2O=C_6H_{10}O_5+6O_2$$

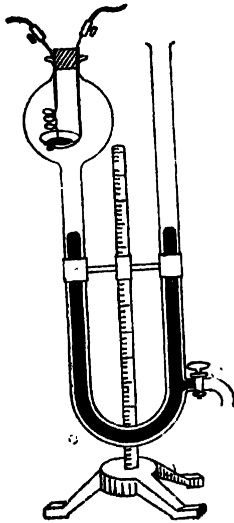
জীবজগৎ আবার শ্বাসকার্যের জন্য বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে CO_2 গ্যাস ফিরাইয়া দেয়। এই ভাবে বাতাসে CO_2 এবং অক্সিজেনের ভিতর একটা সমতা রক্ষা হয়।



২৩-৯। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার: সমস্ত উদ্ভিদ-জগতের বৃদ্ধি ও অস্তিত্বের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের একান্ত প্রয়োজন। হিমায়করূপে আজকাল প্রচুর পরিমাণ কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। অগ্নিনির্বাপণের কাজে এবং বাতান্বিত জল প্রস্তুত

কার্য্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন। সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করিতেও কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি ও সঙ্কেত ঃ সালফার ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি-নির্ণয়ে যেরূপ গ্যাসমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ যন্ত্রের সাহায্যেই কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতিও নির্ধারিত হয় (চিত্র ২৩ঘ)। অংশাঙ্কিত একটি U-নলের একটি প্রান্ত গোলকের আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। এই গোলকের কাচের ছিপির ভিতর দিয়া দুইটি শক্ত কপারের তার ভিতরে প্রবেশ করান থাকে। একটি তারের শেষে গোলকের মধ্যস্থলে একটি ছোট চামচ থাকে। একটি সরু প্লাটিনাম-তারের কুণ্ডলী দ্বারা এই চামচটি কপারের অপর তারটির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। চামচের ভিতর একটুখানি বিশুদ্ধ কার্বন-চূর্ণ লওয়া হয়। U-নলের অপর বাহুটির নীচের দিকে একটি স্টপকক থাকে। U-নলটি প্রথমে পারদে


চিত্র ২৩ঘ—CO_2-এর সংযুতি-নির্ণয়

ভরিয়া লওয়া হয়। অতঃপর পারদের উপরে, সম্পূর্ণ গোলকটি এবং U-নলের কিয়দংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। দুইটি বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া ভিতরে অক্সিজেনকে বাহিরের বায়ুচাপে রাখা হয়। অতঃপর কপারের তার দুইটির বাহিরের প্রান্তদ্বয় একটি ব্যাটারীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে সরু প্লাটিনাম তারের কুণ্ডলীটি লোহিততপ্ত হইয়া উঠে। এই তাপে চামচের অঙ্গার-চূর্ণ অক্সিজেন সহযোগে প্রজ্বলিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। বিক্রিয়া-শেষে যন্ত্রটিকে ব্যাটারী হইতে মুক্ত করা হয় এবং শীতল করিয়া উহাকে পূর্বতন উষ্ণতায় ফিরাইয়া আনা হয়। উভয় বাহুতে পারদ সমতল করিলে দেখা যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের ফলে গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। অথচ খানিকটা অক্সিজেন ব্যয়িত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইয়াছে, আয়তনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং ব্যয়িত অক্সিজেন এবং উৎপন্ন

CO_2 গ্যাসের আয়তন সমান। অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইডে সমায়তন পরিমাণ অক্সিজেন আছে।

সঙ্কেতঃ দেখা যাইতেছে,

x ঘনসেন্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে x ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন থাকে।

∴ ১ ঘন.....................................১..

অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পানুযায়ী, মনে কর প্রতি ঘনসেন্টিমিটার যে কোন গ্যাসের উক্ত অবস্থায় অণুসংখ্যা = n।

∴ n সংখ্যক কার্বন ডাই-অক্সাইড অণুতে n সংখ্যক অক্সিজেন অণু থাকে

∴ ১ টি . . . ১টি . ...

অতএব, ১টি . ... ২টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে,

∴ এই দ্বিযৌগিক পদার্থের সঙ্কেত ধরা যাইতে পারে, CxO_2।

তাহা হইলে উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, $x \times ১২ + ২ \times ১৬$।

কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ২২,

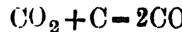
অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব, $২ \times ২২ = ৪৪$

∴ $x \times ১২ + ২ \times ১৬ = ৪৪$, অর্থাৎ $x = ১$।

সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত হইবে, CO_2।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন-সংযুক্তির বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

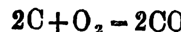
২৩-১০। কার্বন মনোক্সাইড, CO: সাধারণ অবস্থায় প্রকৃতিতে কার্বন মনোক্সাইড প্রায় দেখাই যায় না। আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত গ্যাসে খুব অল্প পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড থাকে। কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস, প্রডিউসার গ্যাস প্রভৃতি গ্যাসীয় জ্বালানীতে অবশ্য কার্বন মনোক্সাইড থাকেই।

প্রস্তুতি: (১) প্রায় ১০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত কার্বনের উপর দিয়া ধীরে ধীরে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করিলে উহা কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়:— 

$$CO_2 + C = 2CO$$

চুনাপাথর ও কার্বন একত্র উত্তপ্ত করিলেও কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া সম্ভব:— 

$$CaCO_3 + C = CaO + 2CO$$

(২) অনতিরিক্ত বাতাসে বা অক্সিজেনে কার্বন বা কয়লা পোড়াইলে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়:— 

$$2C + O_2 = 2CO$$

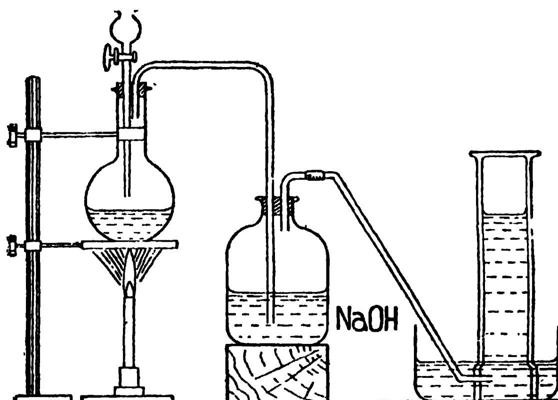
শুধু কার্বন নয়, অন্যান্য অনেক জৈবজাতীয় পদার্থও এরূপ অপ্রচুর বাতাসে পোড়াইলে কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া যায়। কয়লা পোড়ানোর সময় প্রায়ই উহার উপরে একটি ঈষৎ নীল শিখা দেখা যায়। উহা কার্বন মনোক্সাইডের প্রজ্বলন-জনিত।

(৩) জিঙ্ক অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড প্রভৃতি কোন কোন ধাতব অক্সাইড অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে উহারা বিজারিত হইয়া যায় এবং কার্বন মনোক্সাইড উপজাত হয় :—

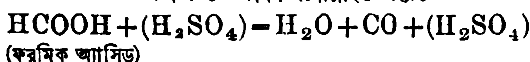


$$ZnO + C = Zn + CO \; ; \; Fe_2O_3 + 3C = 2Fe + 3CO$$

(৪) **ল্যাবরেটরী পদ্ধতি** : ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ উষ্ণ ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহায়তায় ফরমিক অ্যাসিড হইতে কার্বন মনোক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। একটি কূপীতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড লইয়া উহাকে প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপিত করা হয়। কূপীটির মুখে একটি কর্কের সাহায্যে একটি নির্গম-নল ও একটি বিন্দুপাতী-ফানেল জুড়িয়া দেওয়া হয়। বিন্দুপাতী-ফানেলটি হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফরমিক অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ গরম সালফিউরিক অ্যাসিডের উপর ফেলিলে ইহা বিযোজিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া



চিত্র ২৩৬—কার্বন মনোক্সাইড প্রস্তুতি

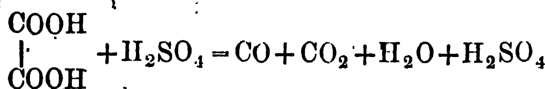


$$\underset{\text{(ফরমিক অ্যাসিড)}}{HCOOH} + (H_2SO_4) = H_2O + CO + (H_2SO_4)$$

বাহির হইয়া যায়। এই গ্যাসটিকে যথারীতি জলের উপর সঞ্চিত করা যাইতে পারে। অনেক সময় গ্যাসটির সহিত কিঞ্চিৎ SO_2 ও CO_2 মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহাকে কস্টিক পটাস বা সোডার দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া বিশুদ্ধ করা হয় (চিত্র ২৩৬)। অনার্দ্র বিশুদ্ধ গ্যাস প্রয়োজন হইলে উহাকে ফসফরাস পেন্টোক্সাইডপূর্ণ নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া শুষ্ক করিয়া পারদের উপর সঞ্চয় করা হয়।

বস্তুতঃ, এই বিক্রিয়াতে সালফিউরিক অ্যাসিডের কোন পরিবর্তন ঘটে না। উহা কেবলমাত্র নিরুদকের কাজ করে এবং ফরমিক অ্যাসিড হইতে জল বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত করে।

ফরমিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অক্সালিক অ্যাসিড হইতেও অনুরূপ উপায়ে কার্বন মনোক্সাইড প্রস্তুত করা যায়। বিচূর্ণ অক্সালিক অ্যাসিড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া একটি কূপীতে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উভয়েই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাস কস্টিক পটাস দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিলে কস্টিক পটাস কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া লয় এবং বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া যায়।



$$\begin{matrix} COOH \\ | \\ COOH \end{matrix} + H_2SO_4 = CO + CO_2 + H_2O + H_2SO_4$$

(অক্সালিক অ্যাসিড)

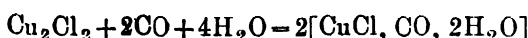
(৫) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড অতিরিক্ত পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলেও বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া যায়।



$$K_4FeC_6N_6 + 6H_2SO_4 + 6H_2O = 2K_2SO_4 + FeSO_4 + 3(NH_4)_2SO_4 + 6CO$$

২৩-১১। কার্বন মনোক্সাইডের ধর্ম ঃ

(১) কার্বন মনোক্সাইড বর্ণহীন, স্বাদহীন মৃদুগন্ধযুক্ত গ্যাস। কার্বন মনোক্সাইডের জলে দ্রবণীয়তা খুবই কম। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিংবা অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণে কার্বন মনোক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হয়। বাস্তবিক পক্ষে কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণটি কার্বন মনোক্সাইডের সহিত একটি যুত-যৌগিক সৃষ্টি করিয়া থাকে :—



$$Cu_2Cl_2 + 2CO + 4H_2O = 2[CuCl, CO, 2H_2O]$$

কার্বন মনোক্সাইড একটি বিষ। বাতাসের লক্ষভাগে একভাগ কার্বন মনোক্সাইড থাকিলেই উহার বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। যে বাতাসে শতকরা ·০৬ ভাগ কার্বন মনোক্সাইড আছে, তাহা কিছুক্ষণ প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলেই মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের সহিত মিশিয়া উহার হেমোগ্লোবিন নামীয় পদার্থটিকে কার্বোক্সি-হেমোগ্লোবিনে পরিণত করে। ইহার ফলে রক্তের অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় এবং অক্সিজেন অভাবে শ্বাসগ্রহণকারীর মৃত্যু ঘটে। অপ্রচুর বাতাসে কয়লা পোড়ানোর ফলে বা

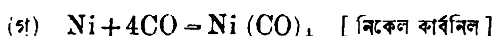
কেরোসিনের ল্যাম্প বহুক্ষণ জ্বালানোর ফলে আবদ্ধ ঘরে যে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহাতে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বিরল নহে।

(২) কার্বন মনোক্সাইড অপর বস্তুর দহন-সহায়ক নয়, কিন্তু উহা নিজেই দাহ্য। বাতাস বা অক্সিজেনে উহা একটি ঈষৎ নীল শিখাসহ জ্বলিতে থাকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। এই বিক্রিয়াটি তাপ-উদ্গারী। কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানীতে যে কার্বন মনোক্সাইড থাকে তাহা এই ভাবেই তাপ উৎপাদন করে : $2CO + O_2 = 2CO_2 + 136000$ cals.

(৩) কার্বন পরমাণু চতুর্যোজী, কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডে কার্বন দ্বিযোজী পরমাণুর ন্যায় ব্যবহার করে। সুতরাং এই যৌগটি অপরিপৃক্ত অবস্থায় আছে। এই কারণে উহা অন্যান্য পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া সহজেই যুক্ত-যৌগিকের সৃষ্টি করে। যথা :—


(ক) $CO + Cl_2 = COCl_2$ [সূর্যালোকে]


(খ) $CO + S = COS$ [উচ্চ উষ্ণতায়]


(গ) $Ni + 4CO = Ni(CO)_4$ [নিকেল কার্বনিল]


$Fe + 4CO = Fe(CO)_4$


$Fe + 5CO = Fe(CO)_5$ [আয়রন কার্বনিল]

(৪) প্রায় ২০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অতিরিক্ত চাপে কার্বন মনোক্সাইড কঠিন কস্টিক সোডার সহিত যুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ফরমেট পাওয়া যায় :—


$$CO + NaOH = HCOONa$$

কার্বন মনোক্সাইড সহজে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইতে পারে বলিয়া, উহা অতিরিক্ত উষ্ণতায় বিজারকের কাজ করে। বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড হইতে ধাতু-নিষ্কাশনে অথবা স্টীম হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদনে (বস প্রণালীতে) কার্বন-মনোক্সাইডের এইরূপ বিজারণ-ক্রিয়া দেখা যায় :—


$$PbO + CO = Pb + CO_2$$

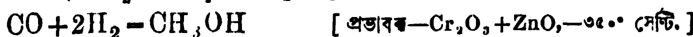

$$CuO + CO = Cu + CO_2$$


$$H_2O + CO = H_2 + CO_2$$

কিন্তু বিভিন্ন প্রভাবকের সাহায্যে কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হয়। যথা :—



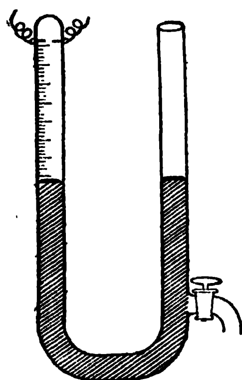
$2CO + 2H_2 = CH_4 + CO_2$ [প্রভাবক—Ni,—৩৮০° সেন্টি.]



$CO + 2H_2 = CH_3OH$ [প্রভাবক—$Cr_2O_3 + ZnO$,—৩৫০° সেন্টি.]

২৩-১২। কার্বন মনোক্সাইডের পরীক্ষা : কার্বন মনোক্সাইড নীল শিখা সহকারে জ্বলিয়া থাকে এবং উহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইডে দ্রবণীয়। এই দুইটি গুণের সাহায্যে এই গ্যাসটিকে সাধারণতঃ চেনা যায়। কিন্তু অন্য গ্যাসের সহিত সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে উহাকে নিম্নরূপে পরীক্ষা করা হয়। অল্প একটু রক্ত জলের সহিত মিশাইয়া লঘু করিয়া লইয়া উহাতে গ্যাসটি পরিচালিত করা হয় এবং এই রক্তের বর্ণালী চিত্র গ্রহণ করা হয়। বিশুদ্ধ রক্তের এবং কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত রক্তের পটি-বর্ণালী (Band spectrum) ভিন্ন রকমের। সুতরাং পটি-বর্ণালীটি পরীক্ষা করিলেই কার্বন মনোক্সাইডের অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে।

২৩-১৩। কার্বন মনোক্সাইডের সংযুতি ও সঙ্কেত : আয়তন-সংযুতি : একটি অংশাঙ্কিত U-আকৃতিবিশিষ্ট গ্যাসমান যন্ত্রের সাহায্যে ইহার আয়তন-সংযুতি নির্ধারণ করা হয়। এই গ্যাসমান যন্ত্রের একটি বাহুর মুখ বন্ধ থাকে এবং উহাতে দুইটি প্লাটিনাম তার লাগানো থাকে (চিত্র ২৩চ)। অপর বাহুর নীচের দিকে একটি স্টপকক থাকে। পারদের উপরে আবদ্ধ বাহুটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড সংগৃহীত করা হয়। তৎপর উহাতে প্রায় সমায়তন পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করা হয়। যে পরিমাণ অক্সিজেন দেওয়া হইল তাহার আয়তন অংশাঙ্কিত নল হইতেই জানা যাইতে পারে। অতঃপর গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর একটি ব্যাটারী হইতে প্লাটিনাম-তার দুইটির সাহায্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অতিরিক্ত অক্সিজেন এই গ্যাস-মিশ্রণটির আয়তনও নলটি হইতেই স্থির করা হয়। ইহার পর খানিকটা কস্টিক পটাস এই গ্যাস-মিশ্রণে ঢুকাইয়া দিয়া উহার সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডটুকু শোষণ করিয়া লওয়া হয়। শুধু অতিরিক্ত-অক্সিজেন গ্যাস-অবস্থায় থাকে এবং ইহার আয়তনও অংশাঙ্কিত নল হইতে জানা যায়। সমস্ত আয়তনই একই চাপে ও উষ্ণতায় আনিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।



চিত্র ২৩চ—বায়ুর আয়তন-সংযুতি

গণনা : মনে কর, কার্বন মনোক্সাইডের আয়তন = a ঘনসেণ্টিমিটার
অক্সিজেন-মিশ্রিত গ্যাসের আয়তন = b "
বিদ্যুৎস্ফুরণের পর গ্যাস মিশ্রণের (CO_2+O_2) আয়তন = c "
কস্টিক পটাস দ্বারা CO_2 শোষণের পর অতিরিক্ত অক্সিজেনের আয়তন = d "
অতএব, মিশ্রিত অক্সিজেনের আয়তন = (b—a) ঘনসেণ্টিমিটার
উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়তন = (c—d) "
কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনে ব্যয়িত অক্সিজেনের আয়তন = (b—a—d) "

অর্থাৎ a ঘনসেণ্টিমিটার কার্বন মনোক্সাইড (b—a—d) ঘনসেণ্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া (c—d) ঘনসেণ্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। সর্বদাই দেখা যায় এই আয়তন-অনুপাতটি নিম্নরূপ :—

কার্বন মনোক্সাইড : অক্সিজেন : কার্বন ডাই-অক্সাইড
২ : ১ : ২

অর্থাৎ, কার্বন মনোক্সাইড সমায়তন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইতে অর্ধায়তন পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডে উহার নিজের সমায়তন পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। অতএব কার্বন মনোক্সাইডেই উহার নিজের আয়তনের অর্ধ পরিমাণ অক্সিজেন আছে। ইহাই কার্বন মনোক্সাইডের আয়তন-সংযুতি। আমরা বলিতে পারি,

১ ঘনসেণ্টিমিটার কার্বন মনোক্সাইডে $\frac{1}{2}$ ঘনসেণ্টিমিটার অক্সিজেন আছে অথবা, অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পানুযায়ী,

কার্বন মনোক্সাইডের p সংখ্যক অণুতে $p/২$ সংখ্যক অক্সিজেন অণু আছে।

∴ কার্বন মনোক্সাইডের ১টি অণুতে ১টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।

সুতরাং কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্কেত ধরা যাইতে পারে, C_xO।

অর্থাৎ ইহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, $১২ \times x + ১৬$। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের ঘনত্ব = ১৪ অথবা আণবিক গুরুত্ব = ২৮

∴ $১২x + ১৬ = ২৮$; অর্থাৎ $x = ১$

∴ কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্কেত, CO।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
জৈব পদার্থ

২৪-১। জৈব-রসায়ন : চিনি, তৈল, মাখন, ঘৃত, ময়দা, স্পিরিট, আটা ইত্যাদির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধূপ, রঞ্জকদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির প্রচলনও বহুদিনের। এই সমস্ত বস্তুই উদ্ভিদ্ বা জীবজগৎ হইতে পাওয়া যাইত। সুতরাং তখনকার দিনে লোকে মনে করিত, এই সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্যে জীবদেহে বা উদ্ভিদদেহেই কেবল পাওয়া

সম্ভব। সুতরাং এ সকল বস্তুকে জৈব পদার্থ বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে চুন, লবণ, সোরা, হীরাকস, ফিটকারী ইহারা খনিজ দ্রব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাভয়সিয়র প্রমাণ করেন যে যাবতীয় জৈবপদার্থই কার্বন-ঘটিত যৌগ। কার্বনের সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত থাকে। সময় সময় নাইট্রোজেন, সালফার অথবা হ্যালোজেন ইত্যাদিও যুক্ত থাকিতে পারে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে উলার (Wohler) খনিজ-উদ্ভূত অ্যামোনিয়াম সায়ানেট হইতে ইউরিয়া (Urea) নামক জৈব পদার্থ প্রস্তুত করেন। ইহার ফলে, প্রাণ-শক্তির অভাবে জৈব পদার্থ সৃষ্টি হইতে পারে না, এই অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহার পর ল্যাবরেটরীতেই শত শত জৈব পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং জৈব পদার্থ বলিতে আমরা এখন কার্বন-ঘটিত পদার্থই বুঝি। কার্বন-যুক্ত যৌগের রাসায়নিক আলোচনাই জৈব-রসায়ন।

কার্বনের অক্সাইডদ্বয় এবং কার্বনেটগুলিকে সাধারণতঃ অজৈব রসায়নের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

মৌলসমাজে কার্বনের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। (১) কার্বনের যৌগিক পদার্থের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক: আর কোন মৌলের এত অধিকসংখ্যক যৌগ নাই। অন্যান্য শতাধিক মৌলের সমস্ত যৌগ ধরিলে লক্ষাধিকও হইবে না। (২) কার্বনের বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগের ভিতর সাদৃশ্য খুব বেশী। এই শ্রেণীগত সাদৃশ্যের জন্য উহাদের পরিচয় সহজলভ্য। যেমন, সমস্ত কোহলের ধর্ম একই রকম। (৩) প্রায়ই একই সঙ্কেত দ্বারা বহু বিভিন্ন জৈব পদার্থের প্রকাশ সম্ভব। উহাদের সংযুক্তি কেবল বিভিন্ন রকমের (Isomerism), যথা—১৩৫টি বিভিন্ন জৈব পদার্থের একই সঙ্কেত $C_{10}H_{13}O_3N$। (৪) প্রায়ই এই জৈব পদার্থের অণুগুলিতে বহুসংখ্যক পরমাণু থাকে। যেমন, স্টার্চের অণুর সঙ্কেত $C_{1200}H_{2000}O_{1000}$। কোন কোন জৈব পদার্থের আণবিক গুরুত্ব পাঁচ লক্ষেরও অধিক। এ রকম দৃষ্টান্ত অজৈব পদার্থের ভিতর পাওয়া যায় না।

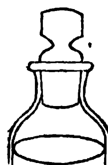
সাধারণ ব্যবহার্য অনেক পদার্থই, যেমন- তুলা, পশম, কাগজ, সিল্ক, পেট্রোল, সাবান, কুইনিন, পেনিসিলিন জাতীয় নানা ঔষধ, ভাইটামিন, রঞ্জক-দ্রব্য, শর্করা, স্নেহ, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য—ইত্যাদি সবই কার্বন-ঘটিত যৌগ।

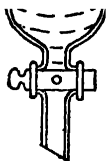
এই সকল কারণে কার্বনের যৌগগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় এবং রসায়নের এই শাখাটি জৈব-রসায়ন।

২৪-২। জৈব পদার্থের বিশুদ্ধীকরণ ঃ অনেক সময়েই একই শ্রেণীর যৌগগুলির রাসায়নিক ধর্ম একরূপ। উহাদের কোন একটির গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে উহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া প্রয়োজন।

আংশিকপাতন, উর্ধ্বপাতন, দ্রবণ, স্ফটিকীকরণ প্রভৃতির সাহায্যেই জৈব পদার্থকে বিশুদ্ধ করা হয়। সময় সময় দুই-একটি বিশেষ পন্থাও অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।

(ক) **"দ্রাবক-নিষ্কাশন" (Solvent extraction) ঃ** মিশ্র পদার্থের একাধিক উপাদানের একটি যদি কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তবে সেই দ্রাবকের সাহায্যে উহাকে উদ্ধার করিয়া বিশুদ্ধ করা যায়। ইথার, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি দ্রাবক হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। মনে কর, একটি মিশ্রণে অ্যালকোহল ও ক্লোরোফর্ম আছে। মিশ্রণটি একটি পৃথকীকরণ-ফানেলে (separating funnel) লইয়া খানিকটা জল মিশাইয়া ঝাঁকাইলে, অ্যালকোহল জলে দ্রব হইয়া উপরে থাকিবে এবং নীচের ক্লোরোফর্ম পৃথক হইয়া যাইবে (চিত্র ২৪ক)। স্টপককটি খুলিয়া নীচের দিক হইতে ক্লোরোফর্ম বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে রাখিয়া ক্লোরোফর্ম বিশুদ্ধ করা যায়। এইভাবে বিশুদ্ধ ক্লোরোফর্ম পাওয়া যাইবে। অ্যালকোহলের জলীয় দ্রবণ আংশিক পাতন করিলে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল পাওয়া যাইবে।

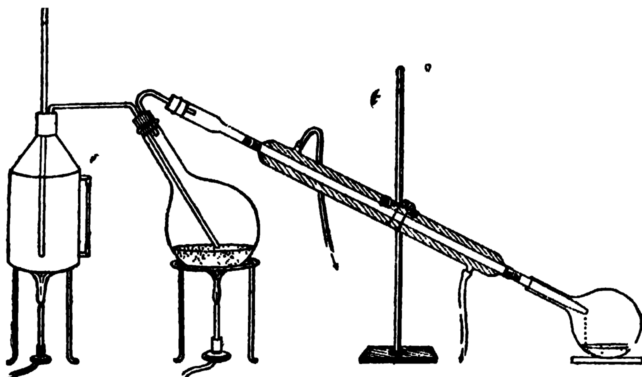




চিত্র ২৪ক

(খ) **"বাষ্প-পাতন" ঃ** উদ্বায়ী অথচ জলে অদ্রবণীয় পদার্থগুলিকে অনেক সময়েই বাষ্পের সহিত পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ করা যায়। পদার্থটি স্বল্প-পরিমাণ জল সহ একটি কূপীতে লওয়া হয়। অন্য একটি পাত্রে জল ফুটাইয়া উহার বাষ্প একটি নল দ্বারা ক্রমাগত পদার্থটির ভিতরে প্রবাহিত করা হয়। এই অবস্থায় জলীয় বাষ্পের সঙ্গে পদার্থটি ১০০° সেন্টি. উষ্ণতায় উদ্বায়িত হইয়া যায়। একটি শীতকের ভিতর দিয়া উহাকে পরিচালিত করা হয় এবং জল ও পদার্থ উভয়েই ঘনীভূত হইয়া গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ২৪খ)। জলে পদার্থটি । পাতিত তরল মিশ্রণটিকে অতঃপর পৃথকীকরণ-ফানেলে লইয়া

পদার্থটিকে আলাদা করা হয়। গোলাপের নির্যাস, ইউক্যালিপ্টাস তৈল প্রভৃতি এই ভাবে বিশুদ্ধ করা হয়।

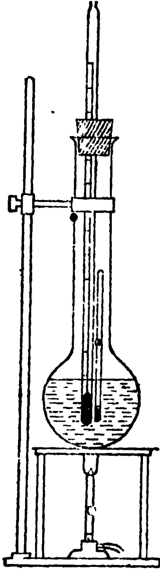


চিত্র ২৪খ—বাষ্প-পাতন

(গ) **জৈব পদার্থের বিশুদ্ধতার নির্ণায়ক :** প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক অথবা স্ফুটনাঙ্ক নির্দিষ্ট। কোন পদার্থ বিশুদ্ধ কিনা, উহা জানিবার জন্য, উহাদের গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। অধিকাংশ জৈব পদার্থের গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম—সাধারণতঃ ৩০০°Cএর নীচে। পদার্থটি বারবার কেলাসিত করিয়া যদি একই গলনাঙ্ক পাওয়া যায় তবে উহা বিশুদ্ধ বুঝিতে হইবে। সেইরূপ পদার্থটি তরল হইলে উহার স্ফুটনাঙ্ক স্থির করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ পাতনের পরেও যদি স্ফুটনাঙ্ক একই থাকে তবে তরল পদার্থটি বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিতে হইবে। সামান্য পরিমাণ মালিন্য থাকিলেও গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(ঘ) **গলনাঙ্ক নির্ধারণ :** কঠিন পদার্থটিকে বিচূর্ণ করিয়া শোষকাধারে রাখিয়া দেওয়া হয়। একমুখবন্ধ একটি অতি সরু নলে শুষ্ক পদার্থের অতি সামান্য একটুখানি লওয়া হয়। এই সরু নলটি একটি থার্মোমিটারের বাল্বের গায়ে গলাইয়া রাখা হয়। একটি শক্ত কাচের কুপীতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড লইয়া উহাতে থার্মোমিটারটি আংশিক ডুবাইয়া রাখা হয় (চিত্র ২৪গ)। অতঃপর কুপীটি ধীরে ধীরে গরম করা হয়। উহার উষ্ণতা গলনাঙ্কে পৌঁছিলে হঠাৎ সরু নলের পদার্থটি গলিয়া যায়। সেই সময় থার্মোমিটার হইতে উষ্ণতা জানিয়া লওয়া হয়। উহা পদার্থটির গলনাঙ্ক।

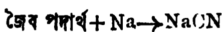
(ঙ) **স্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণঃ** একটি মোটা শক্ত কাচের টেস্টটিউবে তরল পদার্থটি লইয়া উহার মুখটি কর্ক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। কর্কের ভিতর দিয়া একটি থার্মোমিটার বসান হয়। থার্মোমিটারের বাল্‌বটি তরল-পদার্থে নিমজ্জিত থাকা চাই। ধীরে ধীরে এই টেস্টটিউবটি গরম করা হয়। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থটি ফুটিতে থাকিবে। থার্মোমিটার হইতে স্ফুটনাঙ্ক জানা যাইবে।



চিত্র ২৪গ —গলনাঙ্ক নির্ণয়

২৪-৩। জৈব পদার্থের বিভিন্ন মৌলের অস্তিত্ব নির্ধারণ : কার্বন ও হাইড্রোজেনঃ একটি টেস্টটিউবে জৈব পদার্থটি সমপরিমাণ কপার অক্সাইড সহ উত্তপ্ত করা হয়। জারণের ফলে জৈব পদার্থের কার্বন ও হাইড্রোজেন হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। জল টিউবের শীতল অংশে ঘনীভূত হয়। প্রয়োজন হইলে অনার্দ্র কপার-সালফেট দ্বারা উহা প্রমাণ করা যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড টেস্টটিউব হইতে একটি নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাসটিকে পরিস্রুত চুনের জলে প্রবাহিত করিলে উহা ঘোলাটে হইয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব এইরূপে জানা যায়।

নাইট্রোজেনঃ একটি ছোট পাতলা টেস্টটিউবে একটুখানি পদার্থ একটু ধাতব সোডিয়াম সহ খুব উত্তপ্ত করা হয়। সোডিয়াম গলিয়া গিয়া পদার্থটির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও সোডিয়াম সায়নাইড উৎপন্ন হয়। একটি পর্সেলীনের খলে খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া উত্তপ্ত টেস্টটিউবটি পদার্থ সহ ডুবাইয়া দেওয়া হয়। পদার্থটিকে ভাল করিয়া দণ্ডদ্বারা বিচূর্ণ করা হয় এবং পরে পরিস্রাবিত করিয়া একটি স্বচ্ছ দ্রবণ সংগ্রহ করা হয়। একটি টেস্টটিউবে এই দ্রবণ একটুখানি লইয়া সামান্য ফেরাসসালফেট দ্রবণ দিয়া ২।৩ মিনিট ফুটান হয়। তৎপর উহাতে HCl দিয়া আম্লিক দ্রবণে পরিণত করিয়া ফেরিক ক্লোরাইড মিশাইলে গাঢ় নীল রঙের অধঃক্ষেপ বা দ্রবণ পাওয়া যায়। উহাতেই নাইট্রোজেন উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কারণ :—



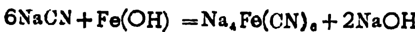
জৈব পদার্থ $+ Na \rightarrow NaCN$



$Na + H_2O \rightarrow NaOH$



$FeSO_4 + NaOH \rightarrow Fe(OH)_2.$



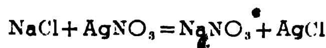
$6NaCN + Fe(OH) = Na_4Fe(CN)_6 + 2NaOH$



$3Na_4Fe(CN)_3 + 4FeCl_3 = Fe_4[Fe(CN_6]_3 + 12NaCl$

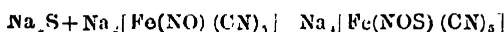
হ্যালোজেনঃ সোডিয়ামের সহিত গলাইয়া যে স্বচ্ছ দ্রবণটি পাওয়া গিয়াছে, হ্যালোজেন থাকিলে সেই দ্রবণটি পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। এই দ্রবণটি প্রথমতঃ নাইট্রিক অ্যাসিড

মিশাইয়া ফুটান হয়। উহার ফলে H_2S, HCN প্রভৃতি চলিয়া যায়। অতঃপর উহাতে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দিলে সাদা অথবা হলুদ অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। এই অধঃক্ষেপ AgCl, AgBr, AgI হইবে। অ্যামোনিয়াতে উহার দ্রাব্যতা পরীক্ষা করিয়া কোন্ হ্যালোজেন আছে জানা যাইতে পারে।



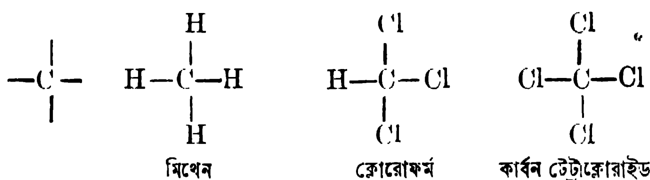
$$NaCl + AgNO_3 = NaNO_3 + AgCl$$

সালফারঃ পূর্বের মতই সোডিয়াম সহযোগে পদার্থটি গলাইয়া লইয়া উহার জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। পদার্থটিতে সালফার থাকিলে উহা হইতে Na_2S উৎপন্ন হইবে। এই দ্রবণের একটুখানি লইয়া এক ফোঁটা সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড দিলে বেগুনী রং ধারণ করিবে। তাহাতে সালফারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে।



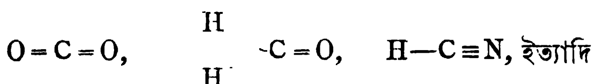
$$Na_2S + Na_2[Fe(NO)(CN)_5] \quad Na_4[Fe(NOS)(CN)_5]$$

২২-২। জৈব পদার্থের শ্রেণীবিভাগঃ কার্বন পরমাণুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা চার, অর্থাৎ একটি কার্বন পরমাণুর সহিত অপর চারিটি একযোজী পরমাণু মিলিত হইতে পারে। যেমন,



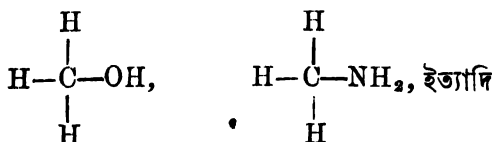
মিথেন ক্লোরোফর্ম কার্বন টেট্রাক্লোরাইড

যদি দ্বিযোজী বা ত্রিযোজী মৌলের পরমাণু কার্বনের সহিত যুক্ত হয় তবে কার্বনের একাধিক যোজ্যতা এই সংযোগে অংশগ্রহণ করিবে। যেমন,



$O=C=O$, $H_2C=O$, $H—C\equiv N$, ইত্যাদি

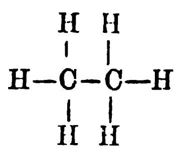
কার্বনের যোজ্যতাগুলি পরমাণুর পরিবর্তে কোনও যৌগমূলক দ্বারাও সম্পৃক্ত হইতে পারে।



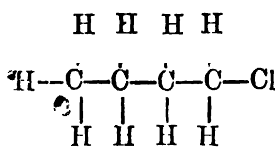
$H_3C—OH$, $H_3C—NH_2$, ইত্যাদি

কার্বন পরমাণুর আর একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা অন্যান্য পরমাণুতে প্রায় দেখাই যায় না। যৌগসৃষ্টির সময় একাধিক কার্বন পরমাণু পরস্পরের সহিত

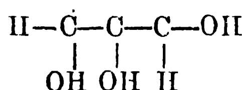
নিজেদের যোজকের সাহায্যে সংযুক্ত হইতে পারে। এই ভাবে যৌগিক পদার্থের একটি অণুতে বহুসংখ্যক কার্বন-পরমাণুর সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যথা—



ইথেন, C_2H_6

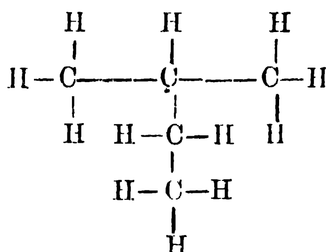


ক্লোরোবিউটেন, ($CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$)



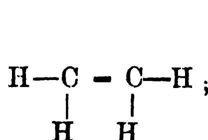
গ্লিসারিন ($CH_2OH—CHOH—CH_2OH$)

এইরূপ কার্বন-শৃঙ্খল বা সারিতে ৮০।৯০টি কার্বন-পরমাণুও থাকিতে পারে। আবার অনেক অণুতে কার্বন-সারিগুলির শাখাবিস্তারও সম্ভব। যথা—

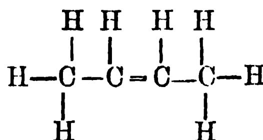


(আইসো পেন্টেন, C_5H_{10})

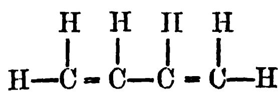
কার্বন-পরমাণুগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগকালে উহাদের একাধিক যোজকও অংশগ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ দুইটি বা তিনটি যোজকের সাহায্যেও দুইটি কার্বন-পরমাণু মিলিত হইতে পারে। যেমন :—



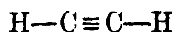
[ইথিলীন, C_2H_4]



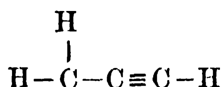
[বিউটিলীন, $CH_3CH=CHCH_3$]

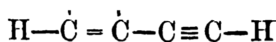


[বিউটাডীন, $CH_2=CH—CH=CH_2$]



[অ্যাসিটিলীন, $CH\equiv CH$]

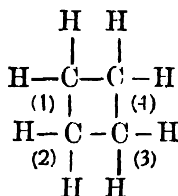




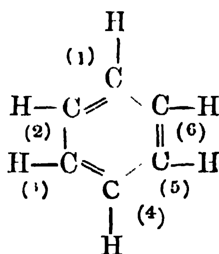
[অ্যালিলীন, CH_3—C≡CH] [ভিনাইল অ্যাসিটিলীন, CH_2=CH—C≡CH]

অতএব, এই সকল অণুতে দুইটি কার্বনের ভিতর দ্বিবন্ধ (double bond) বা ত্রিবন্ধ (triple bond) দ্বারা মিলন সংঘটিত হইয়াছে। একটি অণুতে একাধিক দ্বিবন্ধ বা ত্রিবন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু অণুর প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা সর্বদাই চার হইবে।

আমরা এ পর্যন্ত যে সকল অণু লইয়া আলোচনা করিয়াছি, উহাতে কার্বন পরমাণুগুলি যোজকের দ্বারা উহাদের পার্শ্ববর্তী পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কার্বন সারি (carbon chain) রচনা করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন কার্বন-পরমাণুর একটি যোজক সারিতে দূরবর্তী কোন পরমাণুর যোজকের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। ফলে, কার্বন-পরমাণুগুলি একটি বৃত্তাকার সারি সৃষ্টি করে। যেমন,

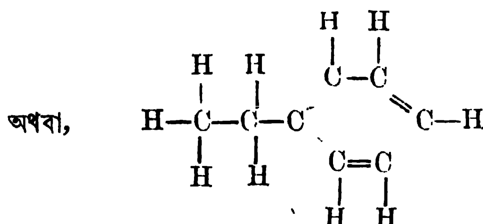


(টেট্রামিথিলিন)



(বেনজিন)

অথবা,



(ইথাইল বেনজিন)

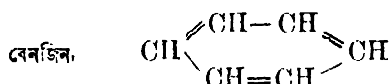
অতএব, কার্বন-যৌগগুলি দুই রকমের।

(১) **সারবন্দী কার্বন যৌগ (Open chain) :** যেমন—



প্রকৃতিজাত স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি সচরাচর এইরূপ সারবন্দী কার্বনের যৌগ। এইজন্য এই সকল যৌগকে অনেক সময় **"স্নেহজ জৈব পদার্থ" (aliphatic organic compounds)** বলা হয়।

(২) **বৃত্তাকার কার্বন যৌগ (Cyclic compounds) :** যেমন—



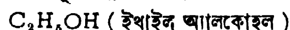
এইজাতীয় যৌগগুলির প্রায়ই বিশিষ্ট গন্ধ থাকার জন্য উহাদিগকে "গন্ধবহ জৈব পদার্থ" বলা হয় (aromatic organic compounds)।

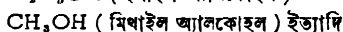
বৃত্তাকার এবং সারবন্দী যৌগগুলির অবস্থাগত এবং রাসায়নিক ধর্মের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এইজন্য উহাদের পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, কার্বন যৌগগুলির উপাদান বা মূলক অনুযায়ী উহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

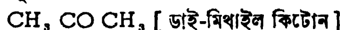
(১) কার্বন ও হাইড্রোজেনের দ্বিযৌগিক পদার্থগুলিকে হাইড্রোকার্বন বলা হয়। যেমন, C_2H_6 (ইথেন)

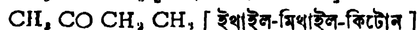
(২) অণুতে OH-মূলক থাকিলে উহাদের অ্যালকোহল বা কোহল বলা হয়। যেমন,



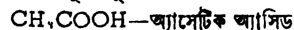


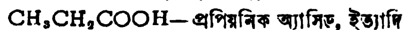
(৩) – CO-মূলক সমন্বিত যৌগকে কিটোন বলা হয়, যেমন,





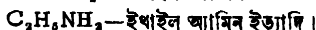
(৪) —COOH-মূলক যুক্ত যৌগগুলিকে জৈবাম্ল বা জৈব অ্যাসিড বলা হয়; যেমন,





(৫) —NH_2-মূলক সংযুক্ত যৌগসমূহকে বলে "অ্যামিন"। যথা,



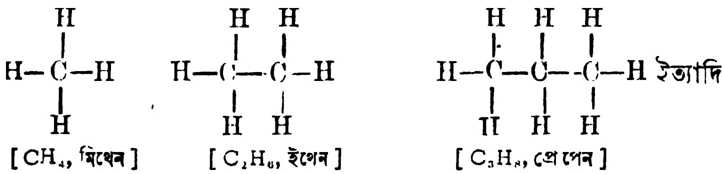


এইরূপ নানা রকম গোষ্ঠীতে উহাদের শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মোটামুটি ধর্মগুলি একই রকমের। সুতরাং এইরূপ শ্রেণীবিভাগে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা ইহাদের কতকগুলি সরল যৌগের আলোচনা করিব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

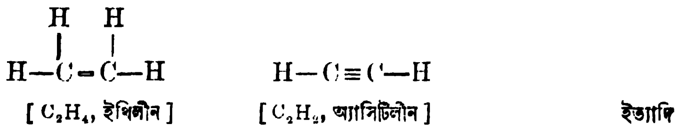
হাইড্রোকার্বন

২৫-১। হাইড্রোকার্বন ঃ কার্বন ও হাইড্রোজেনের দ্বিযৌগিক পদার্থগুলি হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন সাধারণতঃ দুইশ্রেণীর —(১) পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন (Saturated Hydrocarbons), (২) অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন (Unsaturated Hydrocarbons)। পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সমস্ত কার্বন পরমাণুগুলিই পরস্পরের সহিত একটি যোজকের সাহায্যে মিলিত থাকে এবং বাকী যোজ্যতাগুলির সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে, যথা :—



[CH_4, মিথেন] [C_2H_6, ইথেন] [C_3H_8, প্রোপেন] ইত্যাদি

কিন্তু অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অণুতে কোন দুইটি কার্বন পরমাণু দ্বিবন্ধ অথবা ত্রিবন্ধের দ্বারা মিলিত থাকে এবং অন্যান্য যোজকের সহিত হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। যথা :—



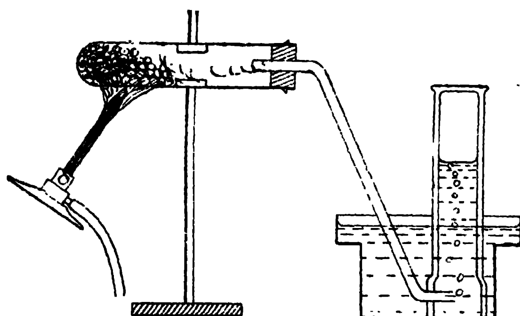
[C_2H_4, ইথিলীন] [C_2H_2, অ্যাসিটিলীন] ইত্যাদি

অপরিপৃক্ত যৌগগুলি অস্থায়ী ধরণের এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই পরিপৃক্ত যৌগে পরিণত হয়।

২৫-২। পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন ঃ মিথেন, CH_4 ঃ কার্বনের সমস্ত জৈবজাতীয় যৌগের ভিতর মিথেনকেই সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া ধরা হয়। উহার অণুতে একটিমাত্র কার্বন আছে। মিথেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ।

পেট্রোলিয়ামের খনি হইতে নির্গত গ্যাসকে 'ন্যাচারেল গ্যাস' '(Natural Gas)' বলে এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণ 'মিথেন' থাকে। কয়লার খনি হইতে নিষ্ক্রান্ত গ্যাসেও স্বল্প পরিমাণ 'মিথেন' দেখা যায়। পুকুর, ডোবা প্রভৃতি আবদ্ধ জলাভূমি হইতেও মিথেন গ্যাস বাহির হয়। পচা-পানা ও অন্যান্য জলজ-উদ্ভিদের বিয়োজনের ফলে এই গ্যাস সেখানে উৎপন্ন হয়। জলাভূমিতে এই গ্যাস উৎপন্ন হয় বলিয়া ইংরেজীতে উহাকে "মার্স গ্যাস" (Marsh gas) বলে। ইহার সহিত একটু ফসফিন মিশ্রিত থাকে বলিয়া বাতাসে উহা জ্বলিয়া ওঠে এবং প্রচণ্ড আগুনের সৃষ্টি করে। দূর হইতে উহাকেই আলেয়া বলিয়া মনে হয়। কয়লার খনিতে মাঝে মাঝে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহারও মূলে এই দাহ্যবস্তু মিথেন।

প্রস্তুতি ঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ (১) বিশুষ্ক সোডিয়াম অ্যাসিটেট উহার ওজনের তিনগুণ পরিমাণ সোডালাইমের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি কাচের শক্ত টেস্টটিউবে বা তামার কূপীতে উত্তপ্ত করিলেই মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।



চিত্র ২৫ক—মিথেন প্রস্তুতি

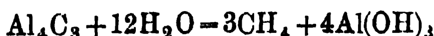
[উপযুক্ত পরিমাণ কস্টিকসোডা দ্রবণে কলিচুন ফুটাইয়া শুকাইয়া লইলেই সোডালাইম পাওয়া যায়।] উৎপন্ন মিথেন গ্যাস জলের অধোভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। ইহার সহিত কিছু হাইড্রোজেন ও ইথিলীন গ্যাস মিশ্রিত থাকে (চিত্র ২৫ক)।



$$CH_3COONa + NaOH = CH_4 + Na_2CO_3$$

[সোডিয়াম অ্যাসিটেট]

(২) সাধারণ উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইডের উপর জলের বিক্রিয়ার ফলেও মিথেন প্রস্তুত করা যাইতে পারে।*

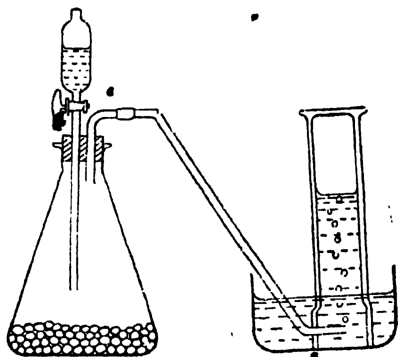


$$Al_4C_3 + 12H_2O = 3CH_4 + 4Al(OH)_3$$

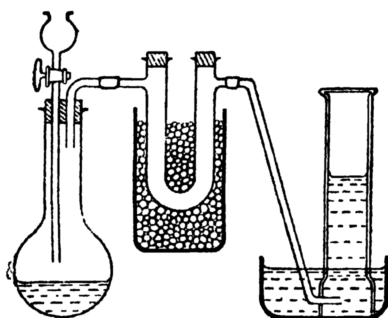
* একটি শঙ্কু-কূপীতে অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড লওয়া হয়। উহার মুখে একটি

কর্কের সাহায্যে একটি বিন্দুপাতী-ফানেল এবং একটি নির্গম-নল লাগান থাকে। ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ভিতরে দিলেই মিথেন গ্যাস নির্গত হয় (চিত্র ২৫খ)।

(৩) বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস পাইতে হইলে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা মিথাইল আয়োডাইডকে বিজারিত করিয়া লওয়া হয়। এই জায়মান হাইড্রোজেন তামা ও দস্তার যুগলের সাহায্যে তৈয়ারী করা হয়।



চিত্র ২৫খ—অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড হইতে মিথেন



চিত্র ২৫গ—মিথাইল আয়োডাইড হইতে মিথেন প্রস্তুতি

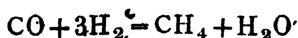
প্রথমে কপার সালফেট দ্রবণের সহিত দস্তা-রজ (zinc dust) মিশ্রিত করিলে দস্তার উপরে তামার একটি আবরণ পড়ে। এইভাবে দস্তা ও তামার যুগল প্রস্তুত হয়। উহাকে ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া একটি কূপীতে কোহলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা মিথাইল আয়োডাইডের কোহলীয় দ্রবণ কূপীর ভিতর ফেলা হয়। কোহল হইতে প্রথমে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং উহা মিথাইল আয়োডাইডকে বিজারিত করিয়া মিথেনে পরিণত করে :—



$$CH_3I + 2H = CH_4 + HI$$

মিথেনের সহিত উদ্বায়ী মিথাইল আয়োডাইডও খানিকটা মিশ্রিত থাকে। একটি শীতল U-নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া মিথাইল আয়োডাইড ঘনীভূত করিয়া পৃথক করা হয়। মিথেন যথারীতি জলের উপর সঞ্চিত করা হয় (চিত্র ২৫গ)।

(৪) কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ উত্তপ্ত বিজারিত-নিকেলের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে মিথেন পাওয়া যায়।



$$CO + 3H_2 = CH_4 + H_2O$$

২৫-৩। মিথেনের ধর্ম: মিথেন বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক হালকা এবং জলে খুব সামান্য দ্রবীভূত হয়। ইহা

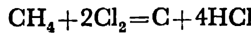
দহন-সহায়ক নয়, কিন্তু নিজে দাহ্য। ইহার সহিত অক্সিজেন বা বায়ু মিশ্রিত করিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। মিথেন জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়।



$$CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O$$

মিথেনের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন অ্যাসিড বা ক্ষারের দ্বারা ইহা মোটেই আক্রান্ত হয় না। কেবল ক্লোরিন ও ব্রোমিন ইহার সহিত বিক্রিয়া করিতে সমর্থ।

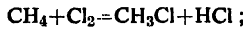
ক্লোরিন ও মিথেনের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দিলে মিথেন বিযোজিত হইয়া কার্বনে পরিণত হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



$$CH_4+2Cl_2=C+4HCl$$

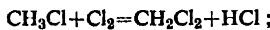
প্রখর সূর্যালোকে এই বিক্রিয়াটি আরও প্রচণ্ডতার সহিত সম্পন্ন হয়।

কিন্তু বিক্ষিপ্ত বা মৃদু আলোকে যদি মিথেন এবং ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণ রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মিথেনের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি একে একে ক্লোরিনদ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে থাকে। ইহার ফলে পর পর চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ক্লোরিন-যুক্ত যৌগ পাওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপনের সময় একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণুর সৃষ্টি হয়।



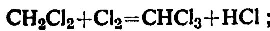
$$CH_4+Cl_2=CH_3Cl+HCl\,;$$

[মিথাইল ক্লোরাইড]



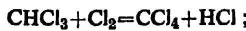
$$CH_3Cl+Cl_2=CH_2Cl_2+HCl\,;$$

[মিথিলীন ক্লোরাইড]



$$CH_2Cl_2+Cl_2=CHCl_3+HCl\,;$$

[ক্লোরোফর্ম]



$$CHCl_3+Cl_2=CCl_4+HCl\,;$$

[কার্বন টেট্রাক্লোরাইড]

এইরূপ বিক্রিয়াকে 'প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া' বলে এবং উৎপন্ন পদার্থগুলিকে প্রতিস্থাপিত-পদার্থ বলা হয়। ব্রোমিনও এইরূপ প্রতিস্থাপন করিতে সমর্থ, কিন্তু আয়োডিন পারে না।

কেবলমাত্র, মিথেন ইথেন নয়, সমস্ত পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন যেমন ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন C_3H_8, বিউটেন C_4H_{10}, ইত্যাদিও একই রকম ব্যবহার করে। এই সকল অপেক্ষাকৃত

নিষ্ক্রিয় পরিপৃক্ত মুক্ত-সারবন্দী হাইড্রোকার্বনগুলির অপর নাম প্যারাফিন। সাধারণ সাদা মোমও হাইড্রোকার্বন এবং এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

২৫-৪। পেট্রোলিয়াম—মাটির নীচে যে তৈল পাওয়া যায় উহাকে পেট্রোলিয়াম বলে। মাটি খনন করিয়া দীর্ঘ নল বসাইয়া পাম্প-সাহায্যে এই তৈল উত্তোলন করা হয়। পেট্রোলিয়ামে নানা রকম পদার্থ থাকে, তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক কার্বন সমন্বিত প্যারাফিনই বেশী। পেট্রোলিয়াম উপরে তোলার পর, উহার মাটি, বালু প্রভৃতি থিতাইয়া গেলে, উহাকে একটি ট্যাঙ্ক হইতে পাতিত করা হয়। পাতিত পদার্থগুলিকে বিভিন্ন উষ্ণতায় সংগ্রহ করিয়া পৃথক পৃথক পদার্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেরোসিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। কেরোসিনও কতকগুলি প্যারাফিনের মিশ্রণ। পাতনের ফলে প্রথমতঃ অত্যন্ত উদ্বায়ী কিছু গ্যাস সংগৃহীত হয়, তৎপর পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি বিভিন্ন উষ্ণতায় পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থগুলিকে আবার পৃথক পৃথক আংশিক-পাতন করিয়া বিভিন্ন অংশে পরিণত করা হয়। এই সকল পাতনের ফলে যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাদের তালিকা ও ব্যবহার এখানে উল্লিখিত হইল। পাতন-শেষে খানিকটা কালো পিচ অনেক সময়ে ট্যাঙ্কে পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম-জাত পদার্থ

পাতন-উষ্ণতা	অণুর কার্বন সংখ্যা	পাতিত পদার্থ	মোটামুটি শতকরা ভাগ	ব্যবহার
(১) ৩০°C	C_4—C_5	সাইমোজেন গ্যাস		হিমায়করূপে, জ্বালানীরূপে
(২) ৩০°—৬০°C	C_5—C_6	পেট্রোলিয়াম ইথার	১৭%	চর্বি ও তৈলের দ্রাবকরূপে
(৩) ৭০°—১২০°C	C_6—C_8	পেট্রোল, গ্যাসোলীন		মোটরের জ্বালানীরূপে
(৪) ১২০°—১৫০°C	C_8—C_9	বেন্‌জাইন	-	দ্রাবক, পশম পরিষ্কারক
(৫) ১৫০°—৩০০°C	C_{10}—C_{12}	কেরোসিন	৫৪%	জ্বালানী ও আলোক উৎপাদক রূপে
(৬) ৩০০°C এর ঊর্ধ্বে	—	পিচ্ছিল তৈল	১৮%	পিচ্ছিলকারক রূপে
(৭) কেরোসিন হইতে পৃথকীকৃত কঠিন পদার্থ গলনাঙ্ক ৫০°—৬০°	C_{24}—C_{28}	(১) মোম (২) ভেসেলীন	৫%	মোমবাতির জন্য ঔষধে ও যন্ত্রের মসৃণতায়

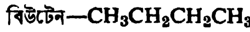
বিভিন্ন স্থানের পেট্রোলিয়ামের ভিতর এই পদার্থগুলির অনুপাত বিভিন্ন হয়। কোন কোন সময়ে পেট্রোলিয়াম হইতে বেনজিন বা ন্যাপথলিন জাতীয় বৃত্তাকার যৌগও পাওয়া যায়।

২৫-৫। সমগোত্রীয় যৌগ—ধারাবাহিকভাবে প্যারাফিনগুলির সঙ্কেত অনুধাবন করিলে দেখা যায় উহাদের ভিতর সর্বদাই একটি—CH_2-পরমাণুপুঞ্জের ব্যবধান আছে। যেমন :—


মিথেন—CH_4


ইথেন—CH_3CH_3

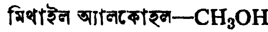

প্রোপেন—$CH_3CH_2CH_3$

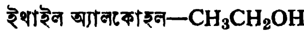

বিউটেন—$CH_3CH_2CH_2CH_3$

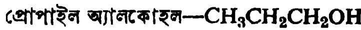

পেণ্টেন—$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

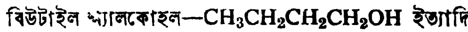

হেক্সেন—$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$. ইত্যাদি।

অন্যান্য গোষ্ঠীতেও এইরূপ—CH_2-এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অ্যালকোহলে :—


মিথাইল অ্যালকোহল—CH_3OH


ইথাইল অ্যালকোহল—CH_3CH_2OH


প্রোপাইল অ্যালকোহল—$CH_3CH_2CH_2OH$


বিউটাইল অ্যালকোহল—$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ ইত্যাদি

এইরূপ—CH_2-পার্থক্য বিশিষ্ট সমধর্মী যৌগগুলি এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ইহাদের সমগোত্রীয় বলা চলে (Homologous series)।

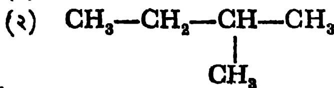
এক গোষ্ঠীর বিভিন্ন পদার্থগুলির মধ্যে সর্বদা একই পরমাণুর পার্থক্য ($-CH_2-$) থাকায় উহাদের জন্য একটি সাধারণ সঙ্কেত ব্যবহার করা যায়। যেমন, সমস্ত প্যারাফিনের সাধারণ সঙ্কেত C_nH_{2n+2}, (n যে কোন পূর্ণসংখ্যা হইতে পারে)।

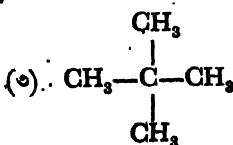
যথা $n=1$, CH_4 (মিথেন)

$n=2$, C_2H_6 (ইথেন) ইত্যাদি

২৫-৬। সমযোগী পদার্থ (Isomers) : C_5H_{12} কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা হাইড্রোকার্বন। এই একই সঙ্কেতের তিনটি হাইড্রোকার্বন আছে, যথা :—


(১) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$


(২) $CH_3—CH_2—CH(CH_3)—CH_3$


(৩) $CH_3—C(CH_3)_2—CH_3$

সঙ্কেত এক হইলেও ইহারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ এবং ইহাদের ধর্মও বিভিন্ন। অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন পদার্থকে একই সঙ্কেত সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এরকম এক সঙ্কেতযুক্ত বিভিন্ন পদার্থকে সমযৌগিক পদার্থ (Isomers) বলা যায়। বিভিন্ন পদার্থে পরমাণুর প্রতি-বিন্যাস অবশ্যই বিভিন্ন।

সমযৌগিক পদার্থগুলি যে একই গোষ্ঠীভুক্ত হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। যেমন ঃ—

(ক) C_3H_6O—

(১) CH_3COCH_3—অ্যাসিটোন।

(২) CH_3CH_2CHO—প্রপিয়ন-অ্যালডিহাইড

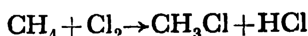
(খ) $C_4H_{10}O$—

(১) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ বিউটাইল অ্যালকোহল

(২) $CH_3CH_2—O—CH_2CH_3$ ইথার

এইরূপ C_6H_{14}-এর পাঁচটি, C_9H_{20}-এর ৩৫টি, $C_{10}O_3H_{13}N$-এর ১৩৫টি বিভিন্ন সমযোগী পদার্থ আছে।

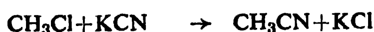
২৫-৭। অ্যালকিল মূলক ঃ আমরা দেখিয়াছি মিথেনের সহিত ক্লোরিনের বিক্রিয়ার ফলে উহার একটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইয়া মিথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



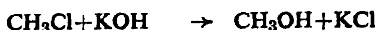
$$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$$

এই মিথাইল ক্লোরাইড নানারূপ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং উহার ক্লোরিন পরমাণুটি বিভিন্ন রকমে প্রতিস্থাপিত করা যায়।

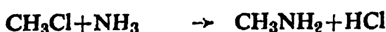
যেমন—



$$CH_3Cl + KCN \rightarrow CH_3CN + KCl$$



$$CH_3Cl + KOH \rightarrow CH_3OH + KCl$$



$$CH_3Cl + NH_3 \rightarrow CH_3NH_2 + HCl$$



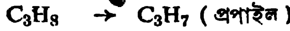
$$CH_3Cl + AgNO_2 \rightarrow CH_3NO_2 + HCl$$ ইত্যাদি

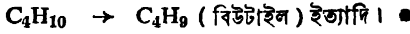
এই সকল বিক্রিয়াতে CH_3-পরমাণুপুঞ্জের কোনই পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ CH_3-পরমাণুপুঞ্জ NH_4, SO_4, NO_3 প্রভৃতি মূলকের ন্যায় ব্যবহার করে। সেইজন্য CH_3-কে "মিথাইল মূলক" বলা হয়। অনুরূপভাবে C_2H_5-পরমাণুপুঞ্জও [ইথেনের একটি হাইড্রোজেন বিয়োগে পাওয়া যায়] একটি মূলক। ইহাকে বলে "ইথাইল মূলক" যে কোন পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন হইতে একটি

হাইড্রোজেন সরাইয়া লইলে যে মূলক পাওয়া যাইবে, তাহার নাম "অ্যালকিল মূলক"।

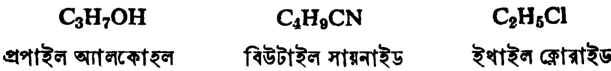

$CH_4 \rightarrow CH_3$ (মিথাইল)


$C_2H_6 \rightarrow C_2H_5$ (ইথাইল)


$C_3H_8 \rightarrow C_3H_7$ (প্রপাইল)


$C_4H_{10} \rightarrow C_4H_9$ (বিউটাইল) ইত্যাদি।

যৌগপদার্থের নামকরণের সময় অনেক সময় এই "অ্যালকিল মূলকের" সাহায্য লওয়া হয়। যেমন,

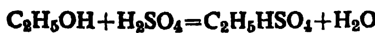


C_3H_7OH	C_4H_9CN	C_2H_5Cl
প্রপাইল অ্যালকোহল	বিউটাইল সায়নাইড	ইথাইল ক্লোরাইড

২৫-৮। অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন। ইথিলীন, C_2H_4: ইথিলীন একটি অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন—কোল গ্যাসে শতকরা ৫-১০ ভাগ ইথিলীন থাকে।

প্রস্তুতি: ইথাইল অ্যালকোহল (অর্থাৎ, কোহল, C_2H_5OH) হইতে জল নিষ্কাশিত করিয়া ইথিলীন প্রস্তুত করা হয়। নিরুদক হিসাবে সাধারণতঃ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা ফসফরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়।

একটি কাচের কূপীতে একভাগ কোহলের সহিত উহার চার-পাঁচ গুণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। কূপীর মুখে একটি কর্কের সাহায্যে একটি বিন্দুপাতী-ফানেল ও নির্গম-নল এবং থার্মোমিটার জুড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর কূপীটিকে একটি বালিখোলাতে ১৬০°—১৭০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপিত করা হয়। এই উত্তাপে মিশ্রণটি ফুটিতে থাকে এবং সেই সময় অতিরিক্ত ফেনা বন্ধ করার জন্য কূপীর ভিতরে খানিকটা অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অথবা কয়েকটি কাচের টুকরা দেওয়া হয়। এই উত্তাপে H_2SO_4 দ্বারা কোহল বিশ্লেষিত হইয়া ইথিলীনে পরিণত হয় এবং ইথিলীন গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। বস্তুতঃ কোহল প্রথমে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেটে পরিণত হয় এবং পরে উহা বিযোজিত হইয়া ইথিলীন উৎপন্ন হয়।

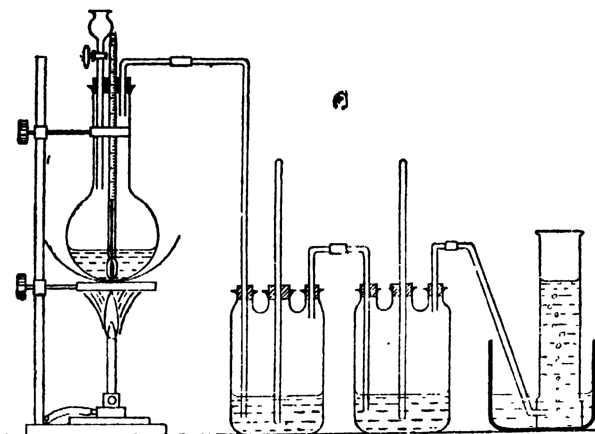

$$C_2H_5OH + H_2SO_4 = C_2H_5HSO_4 + H_2O$$


$$C_2H_5HSO_4 = C_2H_4 + H_2SO_4$$


অর্থাৎ,
$$C_2H_5OH = C_2H_4 + H_2O$$

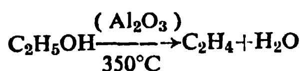
উৎপন্ন ইথিলীনের সহিত কিছু CO_2 এবং SO_2 মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উহাকে কষ্টিক পটাসের দ্রবণের ভিতর দিয়া প্রথমে পরিচালিত করিলে ঐ সমস্ত দূর হয় এবং পরে উহাকে

জলের অধোভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয় (চিত্র ২৫ ঘ)। সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ সঠিক রাখা প্রয়োজন নচেৎ ইথিলীনের পরিবর্তে ইথার উৎপন্ন হইবে।



চিত্র ২৫ঘ—ইথিলীন প্রস্তুতি

প্রায় ৩৫০° সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত অ্যালুমিনা (Al_2O_3) প্রভাবকের উপর দিয়া কোহল-বাষ্প প্রবাহিত করিলেও ইথিলীন পাওয়া যায়।



$$C_2H_5OH \xrightarrow[350°C]{(Al_2O_3)} C_2H_4 + H_2O$$

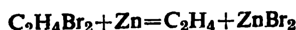
(১) ইথাইল আয়োডাইডের কোহলীয় দ্রবণের সহিত তপ্ত গাঢ় কস্টিক পটাস দ্রবণের বিক্রিয়ার দ্বারাও ইথিলীন পাওয়া যায়।



$$C_2H_5I + KOH = C_2H_4 + KI + H_2O$$

[ইথাইল আয়োডাইড]

(৩) ইথিলীন-ডাই-ব্রোমাইডের কোহলীয় দ্রবণ দস্তা-রজসহ (Zn-dust) তাপিত করিলে ইথিলীন উৎপন্ন হয় :—



$$C_2H_4Br_2 + Zn = C_2H_4 + ZnBr_2$$

[ইথিলীন-ডাই-ব্রোমাইড]

২৫-৯। ইথিলীনের ধর্ম : ইথিলীন একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি ঈষৎ-মিষ্ট গন্ধ আছে। জলে ইহার দ্রাব্যতা খুবই কম এবং ইহা প্রায় বাতাসের সমান ভারী। ইথিলীন দহন-সহায়ক নয় বটে, কিন্তু উহা নিজে দাহ্য। বাতাসে ইহা উজ্জ্বল-শিখাসহ জ্বলিতে থাকে।

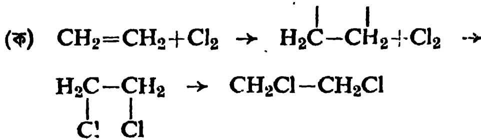


$$C_2H_4 + 3O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$$

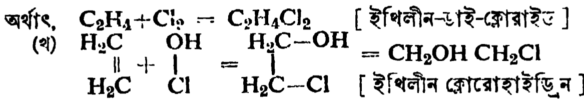
প্রজ্বলনের ফলে উহা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। কোল-গ্যাসে ইথিলীন আছে বলিয়াই, উহা আলোক-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ইথিলীন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দিলে বিস্ফোরণ হয়।

ইথিলীন অণুতে কার্বন-পরমাণু দুইটির ভিতর একটি দ্বিবন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ অণুটি অপরিপৃক্ত। এই জন্য ইথিলীনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক।

(১) ইথিলীন সোজাসুজি বহু পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুত-যৌগিক উৎপাদন করে। হ্যালোজেন, হ্যালোজেন অ্যাসিড, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড প্রভৃতির সহিত উহা খুব সহজে সংযুক্ত হয়। এই সকল বিক্রিয়ার সময় কার্বন-পরমাণুদ্বয়ের মধ্যস্থিত দ্বিবন্ধটি খুলিয়া যায় এবং দুইটি মুক্ত যোজকের সাহায্যে সংযোগ সাধিত হয়। যথা :—

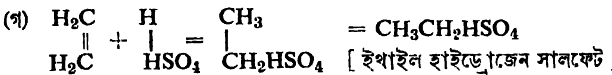


(ক) $CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow H_2C-CH_2+Cl_2 \rightarrow H_2C(Cl)-CH_2(Cl) \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl$

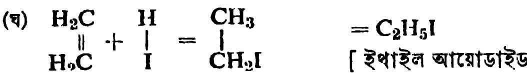


অর্থাৎ, $C_2H_4+Cl_2 = C_2H_4Cl_2$ [ইথিলীন-ডাই-ক্লোরাইড]

(খ) $H_2C{=}CH_2 + HO{-}Cl = H_2C(OH){-}H_2C(Cl) = CH_2OH\ CH_2Cl$ [ইথিলীন ক্লোরোহাইড্রিন]

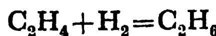


(গ) $H_2C{=}CH_2 + H{-}HSO_4 = CH_3{-}CH_2HSO_4 = CH_3CH_2HSO_4$ [ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট]



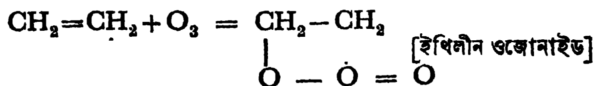
(ঘ) $H_2C{=}CH_2 + H{-}I = CH_3{-}CH_2I = C_2H_5I$ [ইথাইল আয়োডাইড]

(২) বিচূর্ণ নিকেলের প্রভাবে ১৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা ইথিলীন বিজারিত হইয়া ইথেনে পরিণত হয়।



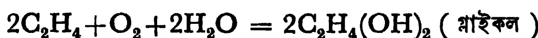
$$C_2H_4+H_2=C_2H_6$$

(৩) ওজোনের সহিত মিলিত হইয়া ইথিলীন একটি অস্থায়ী যৌগিকের সৃষ্টি করে। উহাকে ইথিলীন ওজোনাইড বলে :—



$CH_2=CH_2+O_3 = CH_2-CH_2$ (with $O-O=O$ bridge) [ইথিলীন ওজোনাইড]

(৪) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের জারণের ফলে ইথিলীন গ্লাইকল নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয় :—

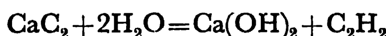


$$2C_2H_4+O_2+2H_2O = 2C_2H_4(OH)_2 \text{ (গ্লাইকল)}$$

ইথিলীনের ব্যবহার : চিকিৎসকেরা চেতনানাশক (anaesthetic) রূপে ইথিলীন ব্যবহার করেন। কাঁচা ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর জন্য ইথিলীন ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য "মাস্টার্ড গ্যাস" (mustard gas) ইথিলীন হইতেই তৈয়ারী করা হয়। ইথিলীন হইতে অ্যালকোহল তৈয়ারী করা হয়।

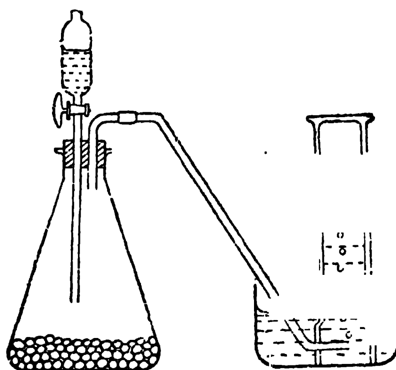
২৫-১০। অ্যাসিটিলীন, C_2H_2 : কোলগ্যাসে অতি সামান্য পরিমাণ (০·০৬%) অ্যাসিটিলীন আছে। ইহা ছাড়া, প্রকৃতিতে অ্যাসিটিলীন আর বড় দেখা যায় না।

প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : সাধারণ উষ্ণতায় জলের সহিত ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিটিলীন গ্যাস উৎপন্ন হয়।



$$CaC_2+2H_2O=Ca(OH)_2+C_2H_2$$

(১) একটি শঙ্কু-কূপীতে প্রথমে খানিকটা বালু লইয়া উহার উপরে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ছোট ছোট টুকরা রাখিয়া দেওয়া হয়। কূপীটির মুখ কর্ক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই কর্কের সঙ্গে একটি নির্গম-নল ও জলপূর্ণ একটি বিন্দুপাতী-ফানেল লাগান থাকে (চিত্র ২৫ ঙ)। ফানেল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল কূপীর মধ্যে ফেলিলে কার্বাইড জলের সংস্পর্শে আসিয়া অ্যাসিটিলীন গ্যাস উৎপন্ন করে। নির্গম-নল দিয়া বাহির হইলে উহাকে জলের উপর গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়।

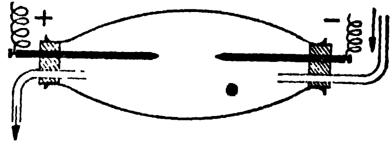


চিত্র ২৫ ঙ—অ্যাসিটিলীন প্রস্তুতি

এই অ্যাসিটিলীনের সহিত স্বল্পপরিমাণ ফসফিন, আরসাইন, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। ফসফিন প্রভৃতির জন্য এই গ্যাসের একটি দুর্গন্ধও থাকে।

অনেক সময় অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর দিয়া উৎপন্ন গ্যাসটি পরিচালিত করিয়া এই সকল অপদ্রব্য দূর করা হয় এবং বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলীন সংগ্রহ করা হয়।

(২) কার্বন ও হাইড্রোজেন এই মৌল দুইটির সংশ্লেষণ দ্বারাও অ্যাসিটিলীন পাওয়া যায়। একটি শক্ত কাচের গ্লোবে দুইটি গ্যাস-কার্বনের তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাচের গ্লোবের ভিতর দিয়া একটি বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন প্রবাহ পরিচালিত করা হয় (চিত্র ২৫ চ)। এই অবস্থায় তড়িৎ-দ্বারের কার্বনের সহিত হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া অ্যাসিটিলীন তৈয়ারী হয়। $2C+H_2=C_2H_2$



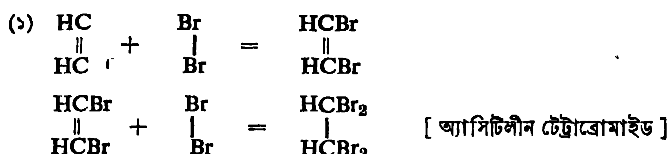
চিত্র ২৫চ—অ্যাসিটিলীনের সংশ্লেষণ

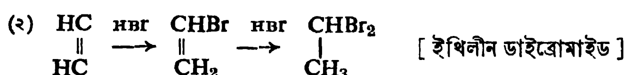
২৫-১১। অ্যাসিটিলীনের ধর্ম: অ্যাসিটিলীন একটি বর্ণহীন গ্যাস। বিশুদ্ধ অবস্থায় উহার একটি মিষ্ট-ঘ্রাণ আছে। ০° উষ্ণতায় ও সাধারণ চাপে জলে উহার সমায়তন পরিমাণ অ্যাসিটিলীন দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অ্যাসিটোন দ্রাবকে অ্যাসিটিলীন অত্যন্ত দ্রবণীয়। অ্যাসিটিলীনকে সহজেই তরলিত করা যায় বটে, কিন্তু তরল অ্যাসিটিলীন বিস্ফোরক। এজন্য অ্যাসিটিলীন স্থানান্তরে পাঠানোর সময় সর্বদাই অতিরিক্ত চাপে অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করিয়া লওয়া হয়। অ্যাসিটিলীন অপরের দহন-সহায়ক নয়। যদি একটি সরু নলের মাথায় বাতাসের ভিতর অ্যাসিটিলীন জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা উজ্জ্বল আলো সহকারে জ্বলিতে থাকে এবং প্রচুর তাপ বিকিরণ করে। বাতাসের পরিবর্তে যদি এইভাবে অক্সিজেন গ্যাসের ভিতর অ্যাসিটিলীন জ্বলিতে দেওয়া হয় তবে যে অক্সি-অ্যাসিটিলীন শিখা পাওয়া যায় তাহার উষ্ণতা প্রায় ৩৫০০° সেন্টিগ্রেড। এই কারণে, বিভিন্ন ধাতু গলানোর জন্য, বা দুইটি ধাতু জোড়া দিতে এই অক্সি-অ্যাসিটিলীন-শিখা ব্যবহৃত হয়।

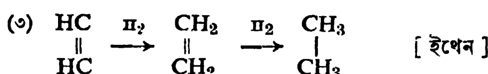
অ্যাসিটিলীন ও বাতাসের মিশ্রণ কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে আসিলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। $2C_2H_2+5O_2=4CO_2+2H_2O$

(i) ইথিলীনের মত অ্যাসিটিলীনও একটি অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন। ইহার অণুতে কার্বন পরমাণু দুইটির ভিতর একটি ত্রিবন্ধ আছে, সেইজন্য অ্যাসিটিলীন যৌগটি অস্থায়ী ধরণের এবং বিশেষ সক্রিয়। বহুরকম পদার্থের

সহিত উহা যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বস্তুর সহিত সংযুক্ত হওয়ার সময় ইহার ত্রিবন্ধ পরিবর্তিত হইয়া উহাদের চারিটি যোজক মুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমে দুইটি এবং পরে আরও দুইটি যোজক এইভাবে রাসায়নিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে। যথা :—





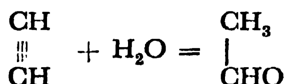


এই বিজারণ-ক্রিয়াতে বিচূর্ণ নিকেল প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ii) অ্যাসিটিলীন ও ক্লোরিনের বিক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রচণ্ডতার সহিত সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ, অ্যাসিটিলীন জারিত হইয়া কার্বন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় :— $C_2H_2+Cl_2=2C+2HCl$

কিন্তু "কাইজেলগুড়" (Keiselguhr) চূর্ণের উপস্থিতিতে ক্লোরিন গ্যাস ধীরে ধীরে অ্যাসিটিলীনের সহিত যুক্ত হইয়া টেট্রাক্লোরো-অ্যাসিটিলীন উৎপন্ন করে :— $C_2H_2+2Cl_2=C_2H_2Cl_4$

(iii) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (২০%) এবং মারকিউরিক সালফেট দ্রবণের ভিতর দিয়া অ্যাসিটিলীন পরিচালিত করিলে উহা জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া অ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয় :—



$$CH\equiv CH + H_2O = CH_3-CHO$$

(iv) অ্যামোনিয়া-যুক্ত সিলভার বা কপারের লবণের দ্রবণের ভিতর অ্যাসিটিলীন গ্যাস পরিচালিত করিলে যথাক্রমে উহাদের ভিতর হইতে সিলভার ও কপার অ্যাসিটিলাইড অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।



$$2AgNO_3 + C_2H_2 + 2NH_4OH = Ag_2C_2 + 2H_2O + 2NH_4NO_3$$

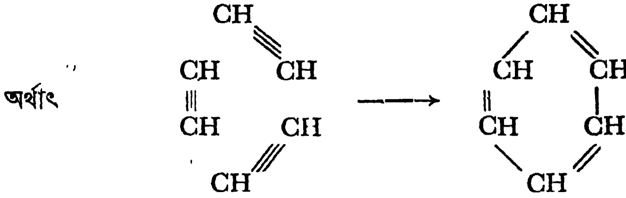


$$Cu_2Cl_2+C_2H_2+2NH_4OH=Cu_2C_2+2H_2O+2NH_4Cl$$

এই বিক্রিয়ার সাহায্যেই সাধারণতঃ অ্যাসিটিলীন পরীক্ষা করা হয় এবং উহার অস্তিত্ব জানা যায়। ইথিলীন বা মিথেন এইরূপ বিক্রিয়া করে না।

(v) একটি তপ্ত নলের ভিতর দিয়া অ্যাসিটিলীন গ্যাস প্রবাহিত করিলে বেনজিন পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনে বস্তুতঃ তিনটি অ্যাসিটিলীন অণু একত্র যুক্ত হইয়া একটি বেনজিন অণুতে পরিণত হয় :—$3C_2H_2 = C_6H_6$

অর্থাৎ



কোনও পদার্থের এইরূপ একাধিক অণু একত্র সংযুক্ত হইয়া যখন অপর একটি পদার্থে পরিণত হয়, তখন উহাকে বহু-যৌগিক বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিক্রিয়া "বহু-সংযোগ-ক্রিয়া" (Polymerisation) নামে পরিচিত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই বহু-সংযোগের ফলে নূতন অণুটির আণবিক গুরুত্ব পূর্বেকার অণুর গুরুত্বের কোন সরল গুণিতক হইবে, কিন্তু উহাদের উপাদান মৌলসমূহের ওজনের অনুপাত একই থাকিবে।

অ্যাসিটিলীনের ব্যবহার : অ্যাসিটিলীনের অনেক রকম ব্যবহার আছে। (ক) অ্যাসিটিলীন বিভিন্ন জৈব-যৌগিক প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। যথা—অ্যাসিট্যালডিহাইড (CH_3CHO), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH), হেক্সাক্লোরো ইথেন (C_2Cl_6), জৈবদ্রাবক ওয়েস্ট্রন (westron, $C_2H_2Cl_4$) ইত্যাদি। (খ) আলোক উৎপাদনেও অ্যাসিটিলীন ব্যবহার করা হয়। (গ) অক্সি-অ্যাসিটিলীন শিখা উৎপাদনে প্রচুর অ্যাসিটিলীন প্রয়োজন। (ঘ) কৃত্রিম রবার প্রস্তুতিতেও অ্যাসিটিলীনের প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি।

তুলনা : আমরা মিথেন, ইথিলীন ও অ্যাসিটিলীন—এই তিনটি হাইড্রোকার্বনের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু হাইড্রোকার্বন হইলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্যে মিথেন পরিপৃক্ত যৌগ, কিন্তু অপর দুইটি অপরিপৃক্ত। সুতরাং মিথেন নিষ্ক্রিয়, কিন্তু অ্যাসিটিলীন ও ইথিলীন খুব সক্রিয়।

(১) ব্রোমিন মিথেনের সহিত ক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে মাত্র, কিন্তু ব্রোমিন ইথিলীন ও অ্যাসিটিলীনের সহিত যুক্ত হইয়া যুত-যৌগিক উৎপাদন করে।

(২) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত মিথেনের কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু ইথিলীন ও অ্যাসিটিলীন উহার সহিত সংযুক্ত হয়।

(৩) গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা মিথেন আক্রান্ত হয় না, কিন্তু ইথিলীন ও অ্যাসিটিলীন উহার সহিত যুক্ত হয়।

(৪) অ্যামোনিয়া-যুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের সহিত মিথেন ও ইথিলীনের কোন বিক্রিয়া হয় না, কিন্তু অ্যাসিটিলীন উহা হইতে লাল অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।

(৫) ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণ অ্যাসিটিলীন ও ইথিলীন দ্বারা বিরঞ্জিত হয়, কিন্তু মিথেনের সেই ক্ষমতা নাই।

জ্বালানি গ্যাস

বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে, যানবাহন পরিচালনে এবং গৃহের সাধারণ কাজে প্রচুর তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়। সৌরকিরণ হইতে বা বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে অবশ্য তাপ-শক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুপ্রকারের দাহ্যবস্তু পোড়াইয়া তাপ-উৎপাদন করা হয়। এই দাহ্যবস্তুগুলি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হইতে পারে। সাধারণ উনানে, ধাতু-নিষ্কাশনের চুল্লীতে, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতিতে কঠিন ইন্ধন কয়লা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি তরল জ্বালানিসমূহ মোটরের ইঞ্জিন, স্টোভ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। গ্যাসীয় ইন্ধনের প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু উহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। অনেক রকম রাসায়নিক শিল্প ছাড়াও গৃহস্থের কাজে গ্যাসীয় ইন্ধনের প্রয়োগ আজকাল দেখা যাইতেছে। বিশেষ কয়েকটি গ্যাস জ্বালানি-রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা :—

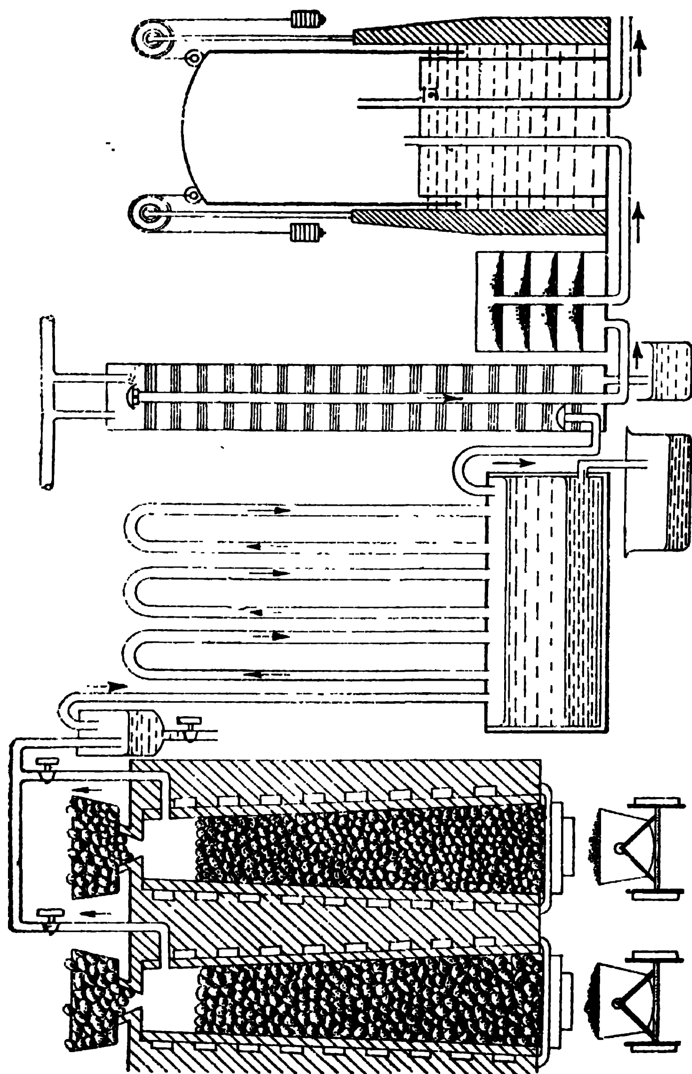
(১) কোল গ্যাস, (২) প্রডিউসার গ্যাস, (৩) ওয়াটার গ্যাস (৪) সেমি-ওয়াটার গ্যাস, (৫) অয়েল গ্যাস।

২৫-১২। কোল গ্যাস (Coal gas) : খনি হইতে যে "কাঁচা কয়লা" পাওয়া যায় তাহাতে মৌলিক কার্বনের অংশই অবশ্য বেশী, কিন্তু উহার সহিত অনেক জৈবপদার্থও মিশ্রিত থাকে। বাতাসের অবর্তমানে কাঁচা কয়লার অন্তর্ধূমপাতন করিলে এই সকল জৈবপদার্থ বিয়োজিত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় পাতিত হয়। এই উদ্বায়ী পদার্থ হইতেই কোল গ্যাস পাওয়া যায়।

অগ্নিসহ মৃত্তিকার বড় বড় বকযন্ত্রে বা অগ্নিসহ-ইষ্টকের চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠে কয়লার অন্তর্ধূমপাতন সম্পাদিত হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্ঘ্যে ১২′-১৫′ ফুট, উচ্চতায় ৮′-১০′ ফুট এবং ২′ ফুট প্রস্থ হয়। এই রকম একত্রে প্রায় ২০-২৫টি প্রকোষ্ঠ থাকে। উহাদিগকে চারিদিক হইতে জ্বালানি-গ্যাস সাহায্যেই উত্তপ্ত

করার ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কয়লার টুকরাতে ভর্তি করিয়া লওয়া হয় এবং উহার চারিদিক মাটির প্রলেপ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। এই প্রণালীতে যে কোলগ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহারই কিয়দংশ বাতাসের সহিত পোড়াইয়া এই প্রকোষ্ঠগুলিকে উত্তপ্ত করা হয়। প্রায় ১০০০° ডিগ্রী উষ্ণতায় সচরাচর অন্তর্ধূমপাতন সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ হইতে উদ্বায়ী পদার্থসমূহ উপরের একটি নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। অনুদ্বায়ী কোক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকে। কার্বনের কিছু অংশ ঊর্ধ্বপাতিত হইয়া প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে সঞ্চিত হয়। ইহাই গ্যাস-কার্বন।

অন্তর্ধূমপাতনের ফলে কয়লা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাতে বাষ্পীভূত অবস্থায় যথেষ্ট আলকাতরা থাকে এবং আরও অনেক প্রকার গ্যাস থাকে; যথা, CH_4, C_2H_4, CS_2, H_2S, HCN, CO, NH_3 প্রভৃতি। উদ্বায়ী গ্যাসসমূহ নিষ্ক্রান্ত হইয়াই প্রথমে একটি আংশিক জলপূর্ণ সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে এবং জলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় (চিত্র ২৫ ছ)। অতঃপর গ্যাস পর পর কতকগুলি শীতক-নলের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়। এই শীতক-নলগুলি একটি ট্যাঙ্কের সহিত যুক্ত থাকে। ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ আলকাতরাটুকু এবং জলীয় বাষ্প তরল হইয়া ট্যাঙ্কে সঞ্চিত হয়। কোন কোন গ্যাস জলে দ্রবীভূতও হইয়া যায়। ট্যাঙ্কের তরল পদার্থ দুইটি স্তরে পৃথক হইয়া পড়ে। নীচের অংশে আলকাতরা জমিয়া থাকে এবং উহার উপরিভাগে একটি জলীয় অংশ পাওয়া যায়। এই জলীয় অংশে অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত থাকে এবং ইহা "অ্যামোনিয়াক্যাল লিকর" (ammoniacal liquor) নামে পরিচিত। ইহার পর একটি কোক বা পাথরের প্লেটে পরিপূর্ণ উচ্চ-স্তম্ভে গ্যাসটিকে যথাসম্ভব জলে ধৌত করা হয়। ইহার পরেও গ্যাসের ভিতর কিছু সালফার-ঘটিত যৌগ থাকে। জ্বালানি-গ্যাসে কোন সালফার যৌগ থাকা অবাঞ্ছিত। সুতরাং উহাকে দূর করার জন্য গ্যাসটিকে আর একটি ছোট স্তম্ভের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। এই স্তম্ভটিতে কয়েকটি তাকের উপর ফেরিক হাইড্রক্সাইড রাখা হয়। ফেরিক হাইড্রক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড শোষণ করিয়া লয়। এইরূপে শোধিত হওয়ার পর যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকেই কোল-গ্যাস বলা হয় এবং উহাকে বড় বড় গ্যাস-ট্যাঙ্কে সঞ্চিত করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী



চিত্র ২৫ছ—কোল-গ্যাস প্রস্তুতি

বিভিন্ন জায়গায় পরিচালিত করা হয়। যে পরিমাণ ওজন কয়লার অন্তর্ধূমপাতন করা হয় তাহার প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ কোল গ্যাস পাওয়া যায়।

ফেরিক হাইড্রক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বারা ফেরিক সালফাইডে পরিণত হয়। তখন উহাকে স্পেণ্ট-অক্সাইড (Spent Oxide) বলে :—



$$2Fe(OH)_3+3H_2S=Fe_2S_3+6H_2O$$

স্পেণ্ট-অক্সাইড বাতাসে রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে আবার ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় এবং সালফার পাওয়া যায়।



$$2Fe_2S_3+3O_2+6H_2O=4Fe(OH)_3+6S$$

এই ফেরিক হাইক্সড্রাইড পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে ফেরিক হাইড্রক্সাইডের পরিবর্তে কলিচুন (Slaked lime) ব্যবহৃত হয় :



$$Ca(OH)_2+2H_2S=Ca(SH)_2+2H_2O$$

বর্তমানে কোন কোন ফ্যাক্টরীতে কোল-গ্যাসকে সোডা এবং সোডিয়াম থায়ো-আর্সেনেটের দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া উহার H_2S, HCN প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

কোল-গ্যাসে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গ্যাসসমূহ থাকে :

মিথেন ৩০-৩৫% ; হাইড্রোজেন, ৪৫-৫০% ; ইথিলীন, ৪% ; কার্বন মনোক্সাইড, ৫-১০% ; নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি, ৫-৮%

কোল-গ্যাস সাধারণতঃ তাপ উৎপাদনের জন্যই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইথিলীন প্রভৃতি থাকার জন্য সময় সময় ভাস্বর জালির সাহায্যে উহা আলোক-উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

কয়লার অন্তর্ধূমপাতনের ফলে কোক, গ্যাসকার্বন, আলকাতরা, অ্যামোনিয়াক্যাল লিকর এবং কোল-গ্যাস—প্রধানতঃ এ পাঁচটি পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটিই খুব মূল্যবান এবং নানা রকম রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজনীয়।

জৈব-জাতীয় না হইলেও, অন্যান্য জ্বালানি গ্যাস সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা সমীচীন হইবে।

২৫-১৩। "প্রডিউসার গ্যাস" (Producer Gas) : প্রডিউসার গ্যাস নামক জ্বালানি প্রধানতঃ কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ। শ্বেততপ্ত কোকের উপর দিয়া নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ বায়ু পরিচালিত করিলে যে গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যায় উহাই প্রডিউসার গ্যাস। একটি বিশেষ রকমের চুল্লীতে (চিত্র ২৫ জ) উত্তপ্ত কয়লা লইয়া উহার নীচের দিক হইতে বায়ু প্রবেশ করান হয়। উপরের একপাশের নির্গম-নল দিয়া প্রডিউসার গ্যাস বাহির হইয়া যায়। এমন

পরিমাণে বায়ু দেওয়া হয় যাহাতে কার্বন পুড়িয়া কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। যদি কোন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহা হইলেও উহা উত্তপ্ত কোকের সংস্পর্শে বিজারিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। নাইট্রোজেন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।



$$2C+O_2=2CO+54 \text{ Cals.}$$



$$C+O_2=CO_2+94 \text{ Cals.}$$



$$CO_2+C=2CO-40 \text{ Cals.}$$

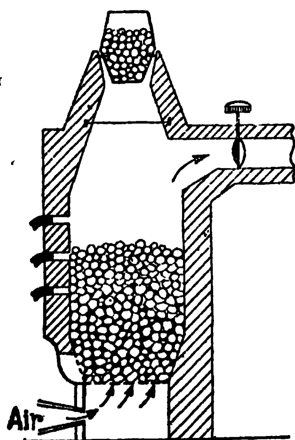
প্রডিউসার গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানগুলির মোটামুটি আয়তন-অনুপাত :—

নাইট্রোজেন—৬২%, কার্বন মনোক্সাইড—৩০%, হাইড্রোজেন—৪%, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি—৪%।

জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রডিউসার গ্যাসের CO এবং H_2 বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়িয়া যায় এবং যথেষ্ট তাপ উদ্গিরণ করে :—



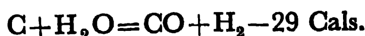
$$2CO+O_2=2CO_2+136 \text{ Cals.}$$



চিত্র ২৫জ—প্রডিউসার গ্যাস উৎপাদন

অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় প্রডিউসার গ্যাসের তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা খুব বেশী নয়। কিন্তু সহজে প্রস্তুত করা যায় বলিয়া ধাতুনিষ্কাশন প্রক্রিয়াতে ও গ্যাস-ইঞ্জিনে প্রায়শঃই ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রডিউসার গ্যাস যেখানে ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন কালে সেখানেই উৎপাদন করিয়া লওয়া হয় এবং উত্তপ্ত গ্যাসই ব্যবহার করা হয়।

২৫-১৪। ওয়াটার-গ্যাস (Water gas) : লোহিত-তপ্ত কোকের উপর দিয়া স্টীম পরিচালনা করিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। ইহাকেই ওয়াটার-গ্যাস বলে।



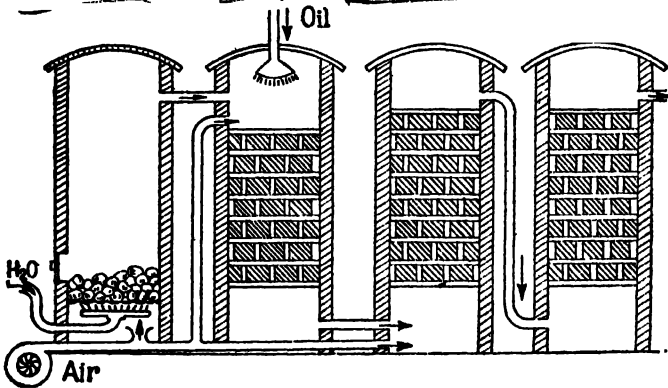
$$C+H_2O=CO+H_2-29 \text{ Cals.}$$

ইহারা উভয়েই দাহ্যবস্তু, সুতরাং ওয়াটার-গ্যাস জ্বালানি হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। মোটামুটি ওয়াটার-গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের আয়তন-অনুপাত :—

হাইড্রোজেন—৫২%, কার্বন মনোক্সাইড—৪০%, নাইট্রোজেন—২%, কার্বন ডাই-অক্সাইড—৪%, মিথেন—১% ইত্যাদি।

ওয়াটার-গ্যাস প্রস্তুত-কালে যে বিক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় উহা তাপগ্রাহী। ফলে কিছুক্ষণ বিক্রিয়াটি হওয়ার পরই কোকের উষ্ণতা অনেক কমিয়া যায় এবং আর কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় না। সুতরাং কিছুক্ষণ স্টীম পরিচালিত করিয়া ওয়াটার-গ্যাস তৈয়ারী করা হইলে পর অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ কোকের উপর দিয়া বায়ু পরিচালনা করা হয়। ইহাতে প্রডিউসার গ্যাস হয় এবং আবার কোক তপ্ত হইয়া উঠে। পুনরায় স্টীম পরিচালনা করা হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে স্টীম ও বায়ুর প্রবাহ দ্বারা যে জ্বালানি পাওয়া যায় তাহা বস্তুতঃ ওয়াটার-গ্যাস ও প্রডিউসার-গ্যাসের মিশ্রণ—ইহাকে সেমি-ওয়াটার-গ্যাস বলে। কোন কোন সময় বায়ু ও স্টীম প্রয়োজনীয় অনুপাতে একত্র পরিচালিত করিয়াও সেমি-ওয়াটার-গ্যাস উৎপন্ন করা হয়।

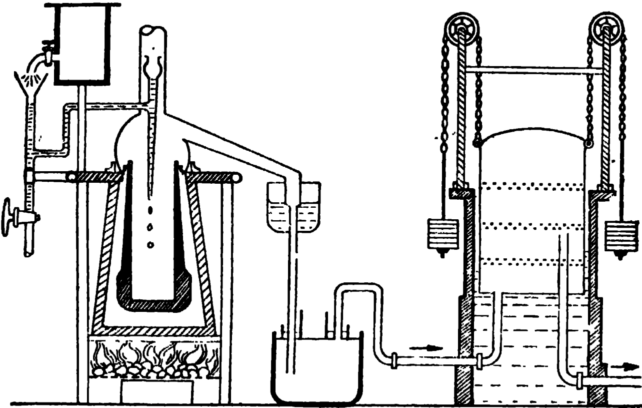
ওয়াটার-গ্যাস যখন জ্বালান হয় তখন উহা হইতে কোন উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায় না। আলোক-উৎপাদক রূপে ব্যবহার করার জন্য ওয়াটার-গ্যাসের সহিত আজকাল খনিজতৈল-বাষ্প মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। উত্তাপে খনিজতৈল-বাষ্প বিযোজিত হইয়া লঘু হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়। এখন এই হাইড্রোকার্বন-যুক্ত ওয়াটার-গ্যাস ভাস্বর থোরিয়াম জালির উপর জ্বালাইলে



চিত্র ২৫ ঝ—কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাস

উজ্জ্বল আলোক উৎপাদন করে। হাইড্রোকার্বন-মিশ্রিত ওয়াটার-গ্যাসকে কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাস বলে (চিত্র ২৫ঝ)।

২৫-১৫। অয়েল-গ্যাস (Oil Gas): পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ-তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া লোহিত-তপ্ত কোন লৌহ-পাত্রে ফেলিলে উহা



চিত্র ২৫ এ—অয়েল-গ্যাস প্রস্তুতি

তৎক্ষণাৎ বিয়োজিত হইয়া বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন গ্যাসে পরিণত হয়। সাধারণ ল্যাবরেটরীতে এই অয়েল-গ্যাস অনেক সময় বুনসেন দীপ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ২৫এ চিত্রে অয়েল-গ্যাস প্রস্তুতির একটি মোটামুটি ব্যবস্থা দেখান হইল।

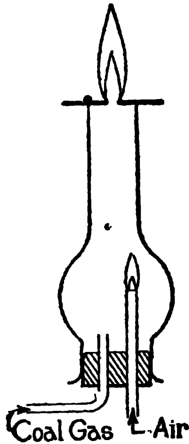
বলা বাহুল্য, বিভিন্ন গ্যাসীয় ইন্ধনের তাপ-উৎপাদনী শক্তি এক নহে। ইহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জ্বালানি-গ্যাসের উপাদান ও তাহাদের অনুপাত বিভিন্ন। উহাদের মোটামুটি তাপনমূল্য নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রতি ঘন ফুটে, প্রডিউসার গ্যাস—	১৪২	ব্রিটিশ	তাপীয়	একক (B. T. U)
ওয়াটার গ্যাস—	৩০০	,,	,,	,,
কোল-গ্যাস—	৫৬৬	,,	,,	,,

এক পাউণ্ড জল এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপিত করিতে যে তাপের প্রয়োজন ইহাকে ব্রিটিশ তাপীয় একক বলে।

২৫-১৬। দহন ও শিখা: যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় তাপ ও আলোক উভয়েরই সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে দহন-ক্রিয়া বলে। কার্বন মনোক্সাইড, মোম, কেরোসিন প্রভৃতি পুড়িবার সময় দেখা যায় তাপ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আলোকও উৎপাদিত হয়। সুতরাং, এগুলিকে দহন-ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্সিজেনের সহিত সংযোগের ফলে বা জারণের ফলে আলোক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই জন্য আলোক উৎপাদন না হইলেও কোন কোন সময় অক্সিজেনের সাহায্যে জারণক্রিয়াকেই দহন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যেমন,

শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্যের জারণকে প্রায়ই মৃদু-দহন বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়াতে আলো বিকিরণ হয় তাহাদিগকেই শুধু দহন-ক্রিয়া বলা যায়। যেমন, শ্বেত ফসফরাস ও আয়োডিন মিশ্রিত করিলেই উহারা জ্বলিয়া উঠে এবং ফসফরাস আয়োডাইডে পরিণত হয়। ইহা দহনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যদিও তাহাতে অক্সিজেনের সংস্রব নাই।



চিত্র ২৫ট—বাতাসের দহন

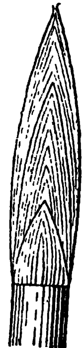
অতএব, যে কোন দহন-ক্রিয়াতে দুইটি বিক্রিয়ক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ, উহাদের যেটি আপাতদৃষ্টিতে জ্বলিয়া আলোক উৎপাদন করে তাহাকে দাহ্য-বস্তু বলা হয়। অপর যে পদার্থের আবেষ্টনীতে বা আবহাওয়ায় দহন-ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় তাহাকে দহন-সহায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন কোল-গ্যাস ও হাইড্রোজেন যখন বাতাসে বা অক্সিজেনে জ্বলিয়া থাকে, তখন কোল-গ্যাস ও হাইড্রোজেনকে দাহ্য পদার্থ মনে করা হয় এবং বাতাস অথবা অক্সিজেনকে দহন-সহায়ক বলা হয়।

দুইটি গ্যাসীয় পদার্থ যখন দহন-ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে তখন যে স্থানটুকু হইতে উহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আলোক-উৎপাদন হয় তাহাকেই শিখা বলে। মোমবাতির শিখা বলিতে, মোমের বাষ্প যে স্থানটুকুর ভিতর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া আলো বিকিরণ করিয়া থাকে, তাহাই মোমের শিখা।

কোল-গ্যাস, হাইড্রোকার্বন, মোম প্রভৃতির শিখা মোটামুটি চারিটি অংশে বিভক্ত করা চলে।

(১) শিখাটির প্রায় মধ্যস্থলের অভ্যন্তরভাগে একটি ঈষৎ-কৃষ্ণ মণ্ডলী থাকে। এখানে অপরিবর্তিত গ্যাস অথবা অল্পাধিক বিয়োজিত হাইড্রোকার্বন বাষ্প থাকে। এই অংশে একটি দেশলাইয়ের কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলেও উহা প্রজ্বলিত হইবে না।

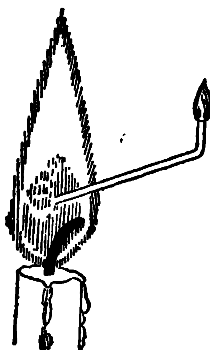
একটি সরু কাচের নলের একটি মুখ এই অংশে রাখিয়া বাহিরের অপর মুখটিতে আগুন ধরাইয়া দিলে উহা জ্বলিতে থাকিবে। অর্থাৎ এই স্থানের অপরিবর্তিত গ্যাস সরু নল দিয়া আসিয়া বাতাসে প্রজ্বলিত হইতে থাকে (চিত্র ২৫ট)।


চিত্র ২৫ঠ—অ্যামোনিয়া-শিখা

(২) শিখার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া যে উজ্জ্বল আলোক-যুক্ত হলুদ অংশ দেখা যায় সেখানে হাইড্রোকার্বনের আংশিক দহন হয় এবং খুব সূক্ষ্ম কার্বন কণার জন্য ঐরূপ উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়। একটি পর্সেলীনের বেসিন এই অংশে ধরিলে সহজেই উহার গায়ে কালো কার্বন জমিয়া যায়।

(৩) সমস্ত শিখাটির চতুর্দিকে ঈষৎ নীলাভ একটি আবরণ দেখা যায়। এখানে দহন সম্পূর্ণ হইয়া দাহ্যবস্তু জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

(৪) শিখার গোড়ার দিকে খুব ছোট একটু গাঢ় নীল অংশ থাকে, এখানেও অবশ্য দহন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।


চিত্র ২৫ড

বুনসেন দীপে যখন কোল-গ্যাস পোড়ান হয়, তখন দীপের ভিতরেই উহার সহিত বায়ু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই শিখান্ত দীপের মুখে একটি ছোট নীল অংশ থাকে—উহাতে অপরিণত কোল-গ্যাস থাকে। তাহার উপরের ঈষৎ নীলাভ অংশে কোল-গ্যাসের আংশিক দহন হয় এবং বাহিরের প্রায় বর্ণহীন বড় অংশে এই দহন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বুনসেন দীপের মধ্যে যদি বায়ু দেওয়া না হয় তাহা হইলে দহন সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য একটি ভুসা কয়লার ধোঁয়াযুক্ত হলদে আলোকশিখা পাওয়া যায়।

২৫-১৭। হ্যালোজেন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকার্বন : পূর্বেই দেখিয়াছি, হাইড্রোকার্বনের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বিভিন্ন হ্যালোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিয়া শত শত নূতন যৌগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন :—

CH_3I—মিথাইল আয়োডাইড	CCl_4—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
C_2H_5Br—ইথাইল ব্রোমাইড	$CHCl_3$—ক্লোরোফর্ম
$C_2H_4Cl_2$—ডাইক্লোরো ইথেন	$C_2H_4Br_2$—ইথিলীন ডাইব্রোমাইড
$C_2H_2Cl_4$—টেট্রাক্লোরো ইথেন	CHI_3—আয়োডোফর্ম
C_2Cl_6—হেক্সাক্লোরো ইথেন	ইত্যাদি

সচরাচর অ্যালকোহলের উপর ফসফরাস হ্যালাইডের ক্রিয়ার সাহায্যেই অ্যালকিল হ্যালাইড উৎপাদন করা হয়। যেমন,

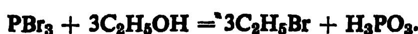


$$PCl_5+C_2H_5OH=C_2H_5Cl+HCl+POCl_3$$

PCl_5 যে কোন পদার্থের OH মূলককে Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। অন্যান্য ফসফরাস হ্যালাইডও অনুরূপ বিক্রিয়া করে—



$$PI_3 + 3C_2H_5OH = 3C_2H_5I + H_3PO_3.$$



$$PBr_3 + 3C_2H_5OH = 3C_2H_5Br + H_3PO_3.$$

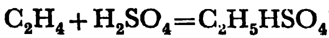


$$PBr_3 + 3CH_3OH = 3CH_3Br + H_3PO_3.$$

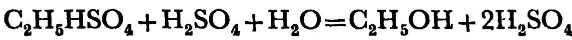
বিভিন্ন অ্যালকিল হ্যালাইডের রাসায়নিক ধর্ম একই রকমের। নানা রকম

২৬-৫। ইথাইল অ্যালকোহল, C_2H_5OH : কোহল গোষ্ঠীতে ইথাইল অ্যালকোহলের গুরুত্বই সর্বাধিক। বৎসরে লক্ষ লক্ষ মণ ইথাইল অ্যালকোহল প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ইহা প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

(১) ইথিলীন গ্যাসকে ৮০°-১০০°C উষ্ণতায় গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে শোষণ করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট হয়। পরে উহাকে ৫০% সালফিউরিক অ্যাসিড সহ ফুটাইলে ইথাইল অ্যালকোহল হয়। পাতিত করিয়া উহা সংগ্রহ করা হয়।

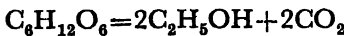


$$C_2H_4 + H_2SO_4 = C_2H_5HSO_4$$



$$C_2H_5HSO_4 + H_2SO_4 + H_2O = C_2H_5OH + 2H_2SO_4$$

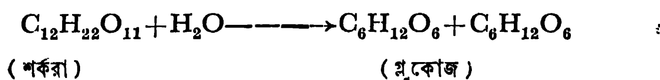
(২) **চিনির কোহল-সন্ধান দ্বারা :** ঈস্ট নামক খুব ছোট একপ্রকার উদ্ভিদ আছে। ইহারা বংশবৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ অন্যান্য পদার্থের ধ্বংসের উপর নির্ভর করে। যদি খানিকটা ঈস্ট গ্লুকোজের জলীয় দ্রবণে সাধারণ অবস্থায় মিশাইয়া রাখা যায়, তবে খানিকক্ষণ পরে উহার উপরে ফেনা সঞ্চিত হইবে এবং মনে হইবে যে উহা ফুটিতেছে যদিও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না। বস্তুতঃ গ্লুকোজ বিযোজিত হইয়া ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। CO_2 গ্যাস নির্গমনের ফলেই উহাকে ফুটন্ত বলিয়া মনে হয়।



$$C_6H_{12}O_6 = 2C_2H_5OH + 2CO_2$$
(গ্লুকোজ)

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য ঈস্টের অভ্যন্তরস্থ একটি নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল পদার্থই দায়ী। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "জাইমেস" (Zymase)। যদিও জীবন্ত কোষে ইহার উদ্ভব, কিন্তু জাইমেস একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ মাত্র। ইহার নিজের কোন প্রাণশক্তি নাই। প্রভাবক হিসাবে ইহারা উপস্থিত হইয়া গ্লুকোজের বিযোজন ঘটায়, ইহাদের নিজেদের কোন রূপান্তর হয় না। জাইমেস সাহায্যে এই প্রক্রিয়াকে "কোহল সন্ধান" (alcoholic fermentation) বলা হয়। ঈস্টের কোষগুলিকে শুকাইয়া লইয়া উহা হইতে "জাইমেস" নিষ্কাষিত করা যায়। সেই "জাইমেস" দ্বারাও গ্লুকোজের সন্ধান করা সম্ভব। অতএব, সন্ধান-প্রক্রিয়াতে জীবনীশক্তির প্রয়োজন নাই।

নানা রকম জীবকোষে এইরূপ বিভিন্ন রকমের জটিল পদার্থ পাওয়া গিয়াছে ইহারা প্রভাবকরূপেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে। এই পদার্থগুলিকে বলে এনজাইম বা উৎসেচক। বিভিন্ন বিক্রিয়াতে বিভিন্ন এনজাইম প্রয়োজন হয় এবং একই জীবকোষে একাধিক প্রকারের এনজাইম থাকিতে পারে। এনজাইমগুলি সচরাচর সাধারণ উষ্ণতায় কার্যকরী হইয়া থাকে। আমাদের জিভের লালাতে "টাইলিন" (ptylin) নামক একটি এনজাইম আছে। উহা ভাতের স্টার্চকে মল্‌টোজ নামক চিনিতে পরিণত করে, যাহাতে উহা সহজপাচ্য হইতে পারে। ঈস্ট কোষে আর একটি এনজাইম আছে—ইনভারটেজ (Invertase)। উহা শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করিয়া দেয়। ফলে, আখের চিনির লঘু দ্রবণে ঈস্ট দিলে প্রথমে চিনি হইতে গ্লুকোজ হইবে এবং পরে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হইবে। দুইটিই সন্ধান-প্রক্রিয়া এবং উৎসেচক সাহায্যে সম্পন্ন হইবে।

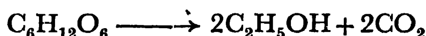


ইনভারটেজ

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

(শর্করা) (গ্লুকোজ)

জাইমেস



$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

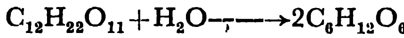
আলু, চাউল, ভুট্টা প্রভৃতি সহজলভ্য ও সস্তা স্টার্চ জাতীয় পদার্থ হইতে বর্তমানে সন্ধান-পদ্ধতিতে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত হয়। আলুগুলিকে পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া অতিরিক্ত চাপে স্টীমের সহিত সিদ্ধ করিয়া পিষ্ট করিলে কোষ হইতে স্টার্চ বাহির হইয়া পড়ে। ইহার সহিত মল্ট (Malt) অথবা মিউকার (Mucor) মিশ্রিত করা হয়।

থানিকটা বালি সামান্য জলের সহিত মিশাইয়া খোলা রাখিয়া দিলে উহা ফাঁপিয়া ওঠে এবং পচন সুরু হয়। ইহাকে মল্ট বলে। মিউকার একজাতীয় ছত্রাক। মল্ট এবং মিউকার উভয়ের ভিতরেই "ডায়াস্টেস" (Diastase) নামক উৎসেচক আছে।

জল মিশ্রিত স্টার্চের সহিত মল্ট বা মিউকার মিশাইয়া দিলে ৫০°C উষ্ণতায় ডায়াস্টেস দ্বারা স্টার্চ সন্ধিত হইয়া মল্‌টোজে পরিণত হয়। অল্পক্ষণেই এই বিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। $2(C_6H_{10}O_5)_x + xH_2O = (C_{12}H_{22}O_{11})_x$

তৎপর ঠাণ্ডা করিয়া ঈস্ট মেশানো হয়। ঈস্টের মধ্যে "মালটেজ"

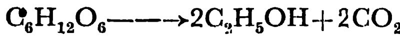
(Maltase) নামক এনজাইম দ্বারা মলটোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়। ইহাও আর্দ্র বিশ্লেষণ।



$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{মালটেজ}} 2C_6H_{12}O_6$$

মলটোজ গ্লুকোজ

এই গ্লুকোজ সঙ্গে সঙ্গেই জাইমেস দ্বারা ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়।



$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেস}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

এই অ্যালকোহলে জল মিশ্রিত থাকে। পুনঃপুনঃ আংশিক পাতন করিয়া উহাকে শতকরা ৯৫·৬% করা হয়। ইহা বাজারে Rectified spirit নামে বিক্রয় হয়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল পাইতে হইলে প্রথমতঃ চুন এবং পরে ক্যালসিয়াম ধাতুর সান্নিধ্যে পাতিত করিয়া লইতে হয়।

ধর্ম ও ব্যবহার ঃ ইথাইল অ্যালকোহল একটি বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ। স্ফুটনাঙ্ক, ৭৮·৫°C। ইহার একটি মিষ্ট গন্ধ আছে। জলের সহিত ইহা যে কোন পরিমাণে সমসত্ব হইয়া মিশিতে পারে।

ইথাইল অ্যালকোহলের রাসায়নিক ধর্ম অন্যান্য অ্যালকোহলের মতই। উহার রাসায়নিক ধর্মাবলী ৫৭ পৃষ্ঠাতে আলোচিত হইয়াছে।

নানা প্রয়োজনে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় ; যেমন :—

(ক) ইথার, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ক্লোরোফর্ম, আয়োডোফর্ম প্রভৃতি জৈব-জাতীয় পদার্থ প্রস্তুতিতে, (খ) কোন কোন সাবান এবং বলকারী ঔষধ প্রস্তুতিতে, (গ) মোটরের জ্বালানী হিসাবে (পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত), (ঘ) রঞ্জন শিল্প ও রেয়ন-শিল্পে, (ঙ) বীজবারক হিসাবে, (চ) পানীয় মদ্যরূপে—বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি, (ছ) মেথিলেটেড স্পিরিটে। বার্নিশের কাজে প্রচুর মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহৃত হয়। উহা বস্তুতঃ ইথাইল কোহল। ইথাইল কোহলের সহিত খানিকটা পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড জাত স্পিরিট, কিছু পিরিডিন ও ন্যাপথা মিশাইয়া উহাকে বিষাক্ত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে লোকে পান করিতে না পারে।

২৬-৬। মিথাইল ও ইথাইল অ্যালকোহলের পার্থক্য ঃ

(১) আয়োডিন ও কস্টিকসোডা সাহায্যে ইথাইল কোহল আয়োডোফর্ম উৎপন্ন করে। মিথাইল কোহলের কোন পরিবর্তন হয় না।

(২) অ্যাসিড ও ডাইক্রোমেট দ্বারা জারিত করিলে মিথাইল কোহল ফরম্যালডিহাইড এবং ইথাইল কোহল অ্যাসিট্যালডিহাইড দেয়। বিশিষ্ট গন্ধ দ্বারা উহাদের চিহ্নিত করা যায়।

(৩) স্যালিসিলিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে মিথাইল অ্যালকোহল হইতে মিথাইল স্যালিসিলেট পাওয়া যায়। উহার বিশিষ্ট গন্ধ আছে। ইথাইল স্যালিসিলেটের গন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২৬-৭। গ্লিসারিন, (গ্লিসারল) : $CH_2OH\text{-}CHOH\text{-}CH_2OH$: এই ট্রাই-হাইড্রিক কোহলটিও সমধিক পরিচিত। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ তৈল বা চর্বির ইহা একটি উপাদান। গ্লিসারিন এবং কোন অ্যাসিডের সংযোগে বিভিন্ন তৈলজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য উহাদিগকে গ্লিসারাইড বলে।

$$\begin{array}{lcll} CH_2OH & & HOOC-R & CH_2-OOCR \\ | & & & | \\ CHOH & + & HOOC-R & CH-OOCR \quad +3H_2O \\ | & & & | \\ CH_2OH & & HOOC-R & CH_2-OOCR \\ \text{গ্লিসারিন} & & \text{অ্যাসিড} & \text{গ্লিসারাইড (তৈল)} \end{array}$$

এইজন্যই তৈল বা চর্বি জাতীয় যৌগকে কস্টিক সোডার সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষিত করিলে গ্লিসারিন পাওয়া যায়।

$$\text{তৈল} + NaOH = \text{গ্লিসারিন} + \text{অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ (সাবান)}$$

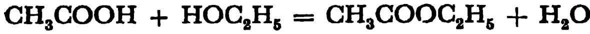
নারিকেল তৈলকে কস্টিক সোডার সহিত উত্তপ্ত করিলে সাবান এবং গ্লিসারিন তৈয়ারী হয়। সাবানটি সরাইয়া লইলে, যে তরল পদার্থ পড়িয়া থাকে উহাতে গ্লিসারিন থাকে। অনুপ্রেষ পাতনের সাহায্যে উহার জল দূরীভূত করিয়া গ্লিসারিন পাওয়া যায়।

গ্লিসারিন বর্ণহীন, গন্ধহীন, মিষ্টস্বাদযুক্ত, ভারী, তরল পদার্থ। স্ফুটনাঙ্ক, ২৯০°C। গ্লিসারিনে অ্যালকোহলের সমস্ত গুণই বিদ্যমান, যেমন

$$CH_2OH-CHOH-CH_2OH \begin{cases} \xrightarrow{PCl_5} CH_2Cl-CHCl-CH_2Cl. \\ \xrightarrow{P_2O_5} CH_2=CH-CHO \\ \xrightarrow{O} CH_2OH-CHOH-COOH \end{cases}$$

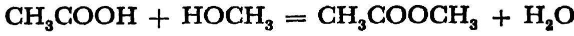
ইত্যাদি

ব্যবহার : নাইট্রো-গ্লিসারিন নামক বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে প্রচুর গ্লিসারিন প্রয়োজন। উহা হইতে ডিনামাইট তৈয়ারী করা হয়। ঔষধেও গ্লিসারিন ব্যবহার হয়। নানারকম প্রসাধন দ্রব্যেও গ্লিসারিন প্রয়োগ করা হয়।



$$CH_3COOH + HOC_2H_5 = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

ইথাইল কোহল ইথাইল অ্যাসিটেট

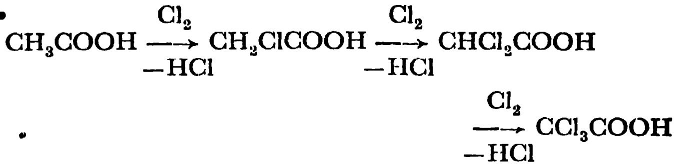


$$CH_3COOH + HOCH_3 = CH_3COOCH_3 + H_2O$$

মিথাইল কোহল মিথাইল অ্যাসিটেট

সব অ্যাসিডই অনুরূপ ব্যবহার করে।

(৩) ফুটন্ত অ্যাসেটিক অ্যাসিডে Cl_2 গ্যাস পরিচালিত করিলে অ্যালকিল মূলকের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় :—



$$CH_3COOH \xrightarrow[-HCl]{Cl_2} CH_2ClCOOH \xrightarrow[-HCl]{Cl_2} CHCl_2COOH \xrightarrow[-HCl]{Cl_2} CCl_3COOH$$

উৎপন্ন পদার্থগুলিকে ক্লোরো-অ্যাসেটিক অ্যাসিড বলা হয়।

ব্যবহার : ঔষধ প্রস্তুতি, রাগবন্ধন, খাদ্য প্রস্তুতি ও রবার শিল্পে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিটেট লবণগুলির প্রচুর ব্যবহার আছে। ঔষধ, রঞ্জন দ্রব্য, বীজবারক, কৃত্রিম সিল্ক, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নানারকম অ্যাসিটেট ব্যবহৃত হয়।

পরীক্ষা : (১) প্রশম ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ প্রশম অ্যাসিটেট দ্রবণের সহিত মিশাইলে উহা লাল হইয়া যায়।

(২) ইথাইল কোহল এবং গাঢ় H_2SO_4 এর সহিত উত্তপ্ত করিলে অ্যাসেটিক অ্যাসিড হইতে মিষ্টগন্ধ এস্টার ইথাইল অ্যাসিটেট পাওয়া যায়।

(৩) অ্যাসেটিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াযুক্ত $AgNO_3$ দ্রবণকে বিজারিত করে না। (ফরমিক অ্যাসিড উহা করিতে পারে।)

(৪) শুষ্ক সোডিয়াম অ্যাসিটেট স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিয়াস অক্সাইড সহ উত্তপ্ত করিলে দুর্গন্ধ যুক্ত ক্যাকোডিল অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসের ভয়ানক বিষক্রিয়া আছে। (ফরমিক অ্যাসিডের এই বিক্রিয়া হয় না।)



$$AS_2O_3+4CH_3COONa=AS_2O(CH_3)_4+2Na_2CO_3+2CO_2$$

জৈব-অ্যাসিড-জাত পদার্থসমূহ : বিভিন্ন বিকারকের ক্রিয়ার ফলে জৈব-অ্যাসিড হইতে নানারকম পদার্থ পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) কতকগুলি পদার্থ অ্যাসিডের COOH মূলকের অংশ হইতে উদ্ভূত এবং উহার H অথবা OH এর প্রতিস্থাপনে পাওয়া যায়। যেমন,



$CH_3COOH \rightarrow CH_3COCl, CH_3CONH_2, (CH_3CO)_2O$ ইত্যাদি

(২) আবার কতকগুলি পদার্থ অ্যাসিডের অ্যালকিল মূলকের H প্রতিস্থাপন দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন :—


$CH_3COOH \rightarrow CH_2ClCOOH, CCl_3COOH, CH_2OHCOOH,$
$CH_2CNCOOH$ ইত্যাদি

অন্যান্য সাধারণে ব্যবহৃত অ্যাসিড।

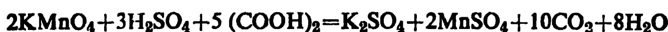
(১) অক্সালিক অ্যাসিড, COOH—COOH ঃ।

অনেক উদ্ভিদের কোষে অক্সালিক অ্যাসিডের লবণ, বিশেষতঃ পটাসিয়াম হাইড্রোজেন অক্সালেট অথবা ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাওয়া যায়।

ল্যাবরেটরীতে সচরাচর শর্করা এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড একত্র উত্তপ্ত করিয়া অক্সালিক প্রস্তুত করা হয়। শর্করা (Canesugar) নাইট্রিক অ্যাসিডে জারিত হইয়া যায়।

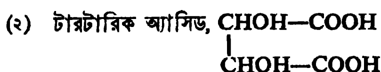
$C_{12}H_{22}O_{11}+9O_2=6COOH-COOH+5H_2O$ দ্রবণটি ঘনীভূত করিয়া ঠাণ্ডা করিলেই অক্সালিক অ্যাসিডের স্ফটিক অধঃক্ষিপ্ত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আম্লিক দ্রবণ অক্সালিক অ্যাসিডে বিজারিত হইয়া বর্ণহীন হইয়া পড়ে।


$$2KMnO_4+3H_2SO_4+5\,(COOH)_2=K_2SO_4+2MnSO_4+10CO_2+8H_2O$$

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ হইতে অক্সালিক অ্যাসিড শ্বেত অধঃক্ষেপ দেয় এবং উহা অ্যাসেটিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়। এই শ্বেত অধঃক্ষেপ এবং পটাস পারম্যাঙ্গানেটের বিরঞ্জন—এই দুইটি পরীক্ষার সাহায্যে অক্সালিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়।

রঞ্জনশিল্পে, কালি প্রস্তুতিতে, বিরঞ্জক হিসাবে এবং ছাপার কাজে অক্সালিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।


(২) টারটারিক অ্যাসিড, CHOH—COOH
|
CHOH—COOH

তেঁতুল এবং আঙুর জাতীয় অনেক ফলে টারটারিক অ্যাসিড বা উহার লবণ থাকে। পচনশীল দ্রাক্ষারসের হাইড্রোজেন পটাসিয়াম টারটারেট (বা আর্গল) হইতে ইহা তৈয়ারী হয়। এই অ্যাসিডের অণুতে দুইটি OH মূলক এবং দুইটি COOH মূলক আছে, সুতরাং ডাই-হাই-ড্রক্সি—ডাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। টারটারিক অ্যাসিড জলে দ্রবণীয় সাদা স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়।

শীতল পানীয়ে এবং কোন কোন মদ্যজাতীয় পানীয়ে টারটারিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। ঔষধে, রঞ্জন শিল্পে, বেকিং পাউডারে, ফেলিং দ্রবণে টারটারিক অ্যাসিডের নানা রকমের লবণ প্রয়োজন হয়।


(৩) সাইট্রিক অ্যাসিড, $CH_2COOH-C(OH)COOH-CH_2COOH$ ঃ

তিনটি কার্বক্সিল মূলক থাকার জন্য ইহা ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তো বটেই, উপরন্তু OH মূলকও বর্তমান। সুতরাং ইহা একটি হাইড্রক্সি-জৈব-অ্যাসিড।

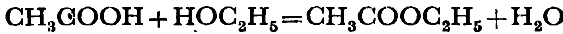
লেবু জাতীয় ফলের রসে প্রচুর সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে এবং লেবুর রস হইতেই উহা প্রস্তুত হয়। চুনের সহিত লেবুর রস ফুটাইলে, উহা হইতে ক্যালসিয়াম সাইট্রেট লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহাতে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



$$(C_6H_5O_7)_2Ca_3 + 3H_2SO_4 = 3CaSO_4 + 2C_6H_8O_7$$

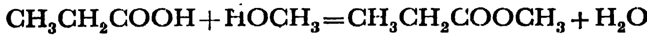
রঞ্জন শিল্পে রাগবন্ধক হিসাবে এবং কোন কোন পানীয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।

২৮·৩। এস্টার, $RCOOR_1$: অ্যাসিড এবং কোহলের বিক্রিয়ার ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে এস্টার বলা হয়। অ্যাসিডের $-COOH$ মূলকের হাইড্রোজেনটি অ্যালকিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলেই এস্টার পাওয়া যাইবে।



$$CH_3COOH + HOC_2H_5 = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

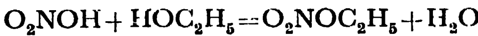
ইথাইল অ্যাসিটেট



$$CH_3CH_2COOH + HOCH_3 = CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O$$

মিথাইল প্রপিয়নেট

অজৈব অ্যাসিডের সহিতও কোহল বিক্রিয়া করে এবং এস্টার পাওয়া যায়।



$$O_2NOH + HOC_2H_5 = O_2NOC_2H_5 + H_2O$$

নাইট্রিক অ্যাসিড ইথাইল নাইট্রেট

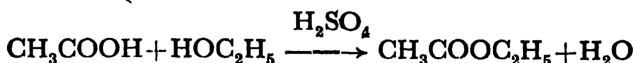
এই সকল বিক্রিয়াতে সর্বদাই জল উপজাত হয়। সুতরাং এই সকল বিক্রিয়ার সময় নিরুদক ব্যবহার করা প্রয়োজন। গাঢ় H_2SO_4, অনার্দ্র $ZnCl_2$, HCl গ্যাস প্রভৃতি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিয়া এস্টার তৈয়ারী করা হয়।

জৈব-এস্টার যৌগে $-C{<}^{O-}_{O}$ এই মূলকটি দুইটি অ্যালকিল মূলকের সহিত যুক্ত থাকিবে। যে কোহল এবং অ্যাসিড হইতে এস্টার উৎপন্ন হয় তাহাদের নামানুযায়ী এস্টারের নামকরণ হয়। কোহলের নাম প্রথমে এবং অ্যাসিডের নাম পরে থাকে—ইথাইল অ্যাসিটেট।

এস্টারের প্রতীক হিসাবে ইথাইল অ্যাসিটেটের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

ইথাইল অ্যাসিটেট, $CH_3COOC_2H_5$: ইথাইল অ্যালকোহল এবং গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সমপরিমাণ মিশ্রণ গাঢ় H_2SO_4 সহ একটি

পাতন-কূপীতে উত্তপ্ত করিয়া ইথাইল অ্যাসিটেট তৈয়ারী হয়। পাতনের সাহায্যে উহাকে পৃথক করিয়া পরে শোধিত করা হয়।

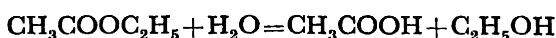


$$CH_3COOH + HOC_2H_5 \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

ধর্ম : ইথাইল অ্যাসিটেট একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ (স্ফুটনাঙ্ক, ৭৭·৫°C)। উহার একটি মিষ্ট গন্ধ আছে। অধিকাংশ এস্টারই সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন এস্টার ঔষধরূপেও প্রয়োগ করা হয়।

ইথাইল বিউটিরেট এস্টারের আনারসের মত গন্ধ আছে, আইসো এমাইল আইসো ভেলেরেট এস্টারে আপেলের গন্ধ। এসেন্স হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। অনেক এস্টার যেমন, সেলুলোজ অ্যাসিটেট্, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট্ প্রভৃতি প্লাস্টিক প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়।

জলের সহিত ফুটাইলে (বিশেষতঃ ক্ষার অথবা লঘু অ্যাসিডের প্রভাবে) এস্টার আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া যায়।



$$CH_3COOC_2H_5 + H_2O = CH_3COOH + C_2H_5OH$$

ইহা অ্যামোনিয়া গ্যাসের সহিত অ্যাসিট্যামাইড এবং PCl_5এর সহিত অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড দেয় :—



$$CH_3COOC_2H_5 + NH_3 = CH_3CONH_2 + C_2H_5OH$$



$$CH_3COOC_2H_5 + PCl_5 = CH_3COCl + C_2H_5Cl + POCl_3$$

২৮-৪। তৈল, চর্বি এবং মোম : আমরা যে সকল তৈল বা মোমজাতীয় পদার্থ দেখি, তাহারা প্রধানতঃ চার রকমের।

(১) **খনিজ তৈল (Mineral oils)**—পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি এই জাতীয় তৈল। উহারা প্রধানতঃ হাইড্রোকার্বন যৌগ।

(২) **উদ্ভিজ্জ বা জান্তব তৈল বা চর্বি (Oils and fats)**—নারিকেল তেল, মাছের তেল, মাংসের চর্বি, প্রভৃতি এই জাতীয়। উদ্ভিদ ও জন্তু হইতে এই সমস্ত পাওয়া যায়। এগুলি সবই গ্লিসারাইড যৌগ অর্থাৎ গ্লিসারিন এবং গুরুভার জৈব অ্যাসিড সংযোগে উৎপন্ন। অতএব এগুলিও এস্টার। যে সকল গ্লিসারাইড সাধারণ উষ্ণতায় কঠিনাকার তাহাদের চর্বি বলা হয়, তরল হইলে তেল বলা হয়।

(৩) **উদ্বায়ী তৈল (Essential oils)**—ফুলের সুবাসে এবং কোন কোন ফলে সুগন্ধি তৈল-জাতীয় পদার্থ থাকে। খুব উদ্বায়ী বলিয়া উহাদের "উদ্বায়ী তৈল" বলে। গোলাপের নির্যাস, চন্দন তেল ইত্যাদি এই জাতীয়। ইহাদের ভিতর প্রায়ই নানারকম বৃত্তাকার-যৌগ থাকে।

(৪) **মোম (Waxes)**—ইহা সাধারণ অবস্থায় কঠিনাকার পদার্থ। জুতা পালিশে, গ্রামোফোন রেকর্ডে যে মোমজাতীয় বস্তু ব্যবহৃত হয় তাহার নাম কার্নোবা মোম (carnauba

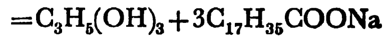
wax)। মৌচাকের মোমও এই জাতীয়। ইহারা সকলেই এস্টার, কিন্তু এই সকল এস্টার গ্লিসারিন হইতে উদ্ভূত নয়, সুতরাং ইহারা গ্লিসারাইড নয়। মৌচাকের মোমে আছে মিরিসিল পামিটেট, $C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$।

উদ্ভিজ্জ তৈল এবং জান্তব চর্বিগুলি প্রশম পদার্থ। ইহারা বেনজিন, অ্যাসিটোন, ইথার প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এই সকল পদার্থকে ক্ষারকের সহিত ফুটাইলে সহজেই আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া যায়।

তৈল + NaOH = গ্লিসারিন + সোডিয়াম লবণ
(সাবান)



$$C_3H_5(COOC_{17}H_{35})_3 + 3NaOH$$
(গ্লিসারাইড)



$$= C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COONa$$
(গ্লিসারিন) (সোডিয়াম স্টিয়ারেট সাবান)

তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত এই ভাবেই হয়। তৈলের আর্দ্র বিশ্লেষণে যে জৈব লবণ পাওয়া যায় তাহাই সাবান।

গ্লিসারাইড তৈলের ভিতর অপরিপৃক্ত জৈব-অ্যাসিড থাকিলে তৈলটি তরল এবং অনেক সময় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়। নিকেল প্রভাবকের সান্নিধ্যে উহাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালিত করিলে, অ্যাসিড অংশ পরিপৃক্ত হইয়া যায় এবং তৈলটি ধীরে ধীরে বর্ণহীন সাদা ও কঠিনাকার হইয়া ওঠে। এই ভাবেই অনেক তৈলকে চর্বিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বনস্পতি ঘি এইরূপে উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **"তৈলের হাইড্রোজেনেসন"**।

HCN-এর হাইড্রোজেনটি বিভিন্ন অ্যালকিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলে নানারকম অ্যালকিল সায়নাইড পাওয়া যাইবে। পটাসিয়াম সায়নাইডের সহিত অ্যালকিল আয়োডাইডের বিক্রিয়ার ফলে এই সকল যৌগ পাওয়া সম্ভব।

মিথাইল আয়োডাইড এবং পটাসিয়াম সায়নাইড হইতে মিথাইল সায়নাইড প্রস্তুত হয়।

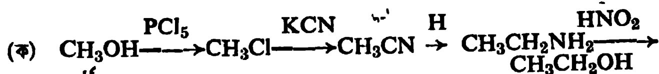


$$CH_3I + KCN = CH_3CN + KI$$

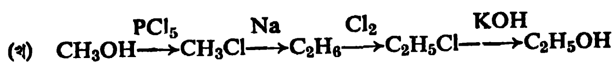
২৮-৫। সারবন্দী যৌগে কার্বন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা মোটামুটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধান বিক্রিয়াগুলির আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক সমসংস্থ বা সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর ভিতরেই বিভিন্নসংখ্যক কার্বন-পরমাণু-যুক্ত পদার্থ রহিয়াছে। যেমন, CH_3OH, CH_3CH_2OH,

$CH_3CH_2CH_2OH$। কিভাবে কার্বন-সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া একটি যৌগকে অপর একটি যৌগে পরিণত করা সম্ভব কয়েকটি উদাহরণ সাহায্যে তাহা সম্যক বুঝা যাইবে।

উদাহরণ ১। মিথাইল কোহল হইতে ইথাইল কোহল ঃ

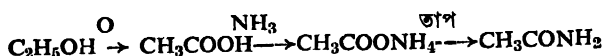


(ক) $CH_3OH \xrightarrow{PCl_5} CH_3Cl \xrightarrow{KCN} CH_3CN \xrightarrow{H} CH_3CH_2NH_2 \xrightarrow{HNO_2} CH_3CH_2OH$

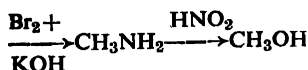


(খ) $CH_3OH \xrightarrow{PCl_5} CH_3Cl \xrightarrow{Na} C_2H_6 \xrightarrow{Cl_2} C_2H_5Cl \xrightarrow{KOH} C_2H_5OH$

উদাহরণ ২। ইথাইল কোহল হইতে মিথাইল কোহল ঃ

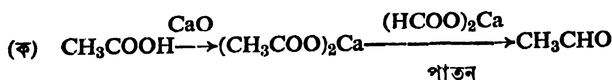


$C_2H_5OH \xrightarrow{O} CH_3COOH \xrightarrow{NH_3} CH_3COONH_4 \xrightarrow{\text{তাপ}} CH_3CONH_2$

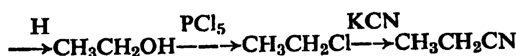


$\xrightarrow[KOH]{Br_2+} CH_3NH_2 \xrightarrow{HNO_2} CH_3OH$

উদাহরণ ৩। অ্যাসেটিক অ্যাসিড হইতে প্রপিয়নিক অ্যাসিড ঃ



(ক) $CH_3COOH \xrightarrow{CaO} (CH_3COO)_2Ca \xrightarrow[\text{পাতন}]{(HCOO)_2Ca} CH_3CHO$

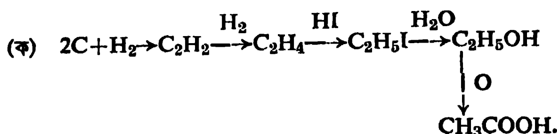


$\xrightarrow{H} CH_3CH_2OH \xrightarrow{PCl_5} CH_3CH_2Cl \xrightarrow{KCN} CH_3CH_2CN$

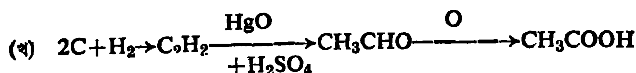


$\xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2COOH$

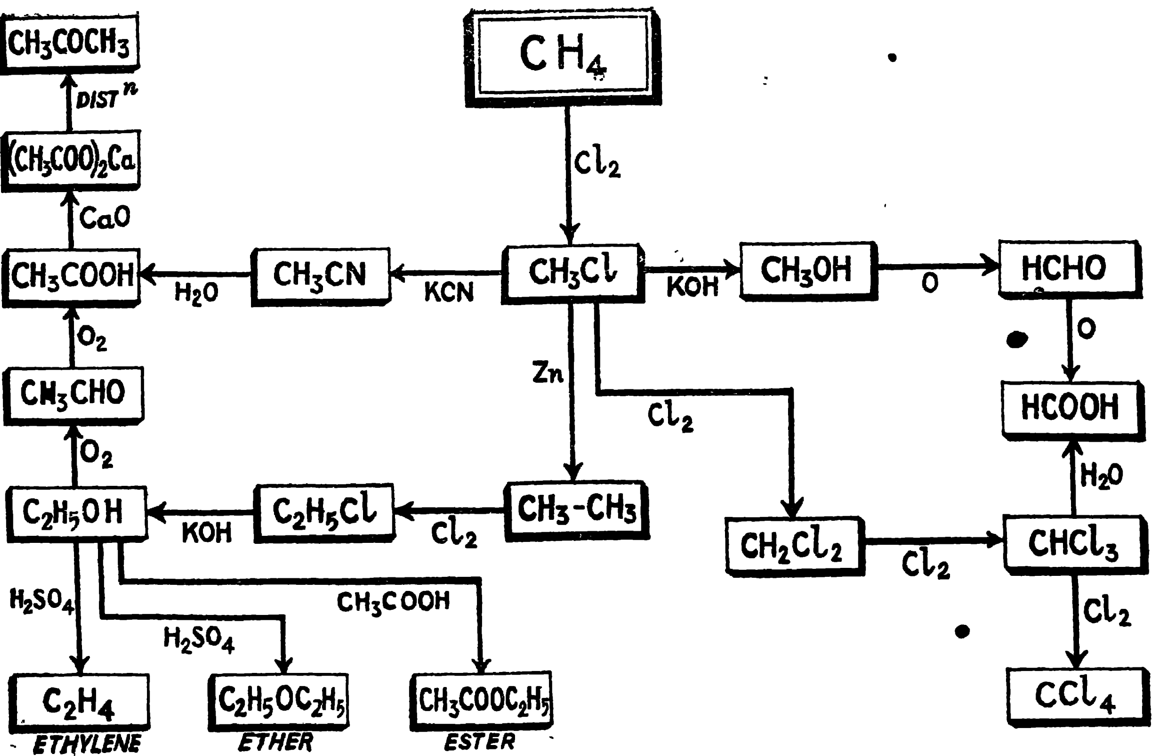
উদাহরণ ৪। কার্বন ও হাইড্রোজেন মৌল হইতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ঃ



(ক) $2C+H_2 \rightarrow C_2H_2 \xrightarrow{H_2} C_2H_4 \xrightarrow{HI} C_2H_5I \xrightarrow{H_2O} C_2H_5OH \xrightarrow{O} CH_3COOH.$



(খ) $2C+H_2 \rightarrow C_2H_2 \xrightarrow[+H_2SO_4]{HgO} CH_3CHO \xrightarrow{O} CH_3COOH$



মিথেন হইতে উদ্ভূত কয়েকটি যৌগ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

শর্করা। কার্বোহাইড্রেট।

২৯-১। আমাদের খাদ্য প্রধানতঃ তিন রকমের—প্রোটিন, স্নেহ বা ফ্যাট, এবং কার্বোহাইড্রেট। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন; ঘি, তেল প্রভৃতি স্নেহ; এবং চিনি, চাউল, গম, যব প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট। এই সকল খাদ্যবস্তু ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের কার্বোহাইড্রেট আছে। যেমন—তূলা, কাগজ প্রভৃতিও কার্বোহাইড্রেট।

কার্বোহাইড্রেট যৌগমাত্রেরই সাধারণ সঙ্কেত $C_x(H_2O)_y$। সুতরাং সমস্ত কার্বোহাইড্রেট কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সমন্বিত যৌগ এবং উহাদের ভিতরে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সর্বদাই (২ : ১) অর্থাৎ জলে যে অনুপাতে থাকে সেই অনুপাতে আছে। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জৈব যৌগে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের এই অনুপাত থাকিলেই উহা কার্বোহাইড্রেট হইবে না। যেমন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, $C_2H_4O_2$, কার্বোহাইড্রেট নহে।

কার্বোহাইড্রেট-সমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) শর্করা—যথা, আখের চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি।

(২) স্টার্চ বা শ্বেতসার—চাউল, গম, আলু, বার্লি প্রভৃতি।

(৩) সেলুলোজ—তূলা, পাট, কাগজ, ঘাস, বাঁশ ও কাঠের প্রধান অংশ ইত্যাদি।

স্টার্চ বা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থগুলির অণুগুলি খুবই বড় এবং বেশ জটিল। খুব সাধারণ স্টার্চেরও আণবিক গুরুত্ব ৩০০০০-৪০০০০ হইয়া থাকে। সভ্যতার ইতিহাসে সেলুলোজের দান অসামান্য। তূলা, পাট আমাদের বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিয়াছে, ঘাস, বাঁশ হইতে কাগজ না হইলে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হইত না। আবার সেলুলোজ হইতেই নানা প্লাস্টিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃত্রিম রেশমও সেলুলোজ হইতে প্রস্তুত হয়। শিল্প ও ব্যবসায়ে সেলুলোজ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুই একটি শর্করার বিষয় আলোচনা করিব।

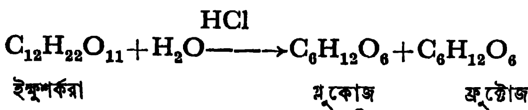
২৯-২। শর্করা : বিভিন্ন উদ্ভিদে এবং প্রাণিদেহে নানা রকমের শর্করা বা চিনি পাওয়া যায়। শর্করা মাত্রেই মিষ্টস্বাদযুক্ত, জলে দ্রবণীয় এবং স্ফটিকাকার পদার্থ। এই হিসাবে সেলুলোজ বা স্টার্চ হইতে তাহারা স্বতন্ত্র। চিনি আবার দুই রকমের : (১) মনো-স্যাকারাইড (monosaccharides)—ইহাদের অণুতে ৯টির অধিক কার্বন-পরমাণু থাকে না। যেমন, গ্লুকোজ $C_6H_{12}O_6$; ফ্রুক্টোজ, $C_6H_{12}O_6$; জাইলোজ, $C_5H_{10}O_6$, ইত্যাদি। (২) ডাই-স্যাকারাইড (disaccharides) : ইহাদের অণুতে ১২ বা ১৮টি কার্বন-পরমাণু সচরাচর দেখা যায়। আখের চিনি, $C_{12}H_{22}O_{11}$; রাফিনোজ, $C_{18}H_{32}O_{16}$ ইত্যাদি।

সমস্ত স্যাকারাইডই কোহল জাতীয় এবং উহাদের অণুতে বহুসংখ্যক OH-মূলক থাকে। মনোস্যাকারাইডে কোহল মূলক ছাড়াও অ্যালডিহাইড বা কিটোনের মূলক থাকিবে। ডাই-স্যাকারাইড-গুলি একাধিক মনোস্যাকারাইডের সংযোগে উদ্ভুত।

২৯-৩। গ্লুকোজ (Glucose) $C_6H_{12}C_6$: মনোস্যাকারাইড শর্করার মধ্যে গ্লুকোজই সর্বপ্রধান। চাকের এবং ফুলের মধুতে, নানারকম ফলে, আঙুরে গ্লুকোজ থাকে। এইজন্য গ্লুকোজের অপর নাম দ্রাক্ষাশর্করা। জীবকোষেও গ্লুকোজ পাওয়া যায়। জীবদেহে স্টার্চ এবং সেলুলোজের বিশ্লেষণেই প্রধানতঃ গ্লুকোজের উৎপত্তি হয়।

ডাই-স্যাকারাইড এবং স্টার্চ অথবা সেলুলোজ সবই গ্লুকোজ-উদ্ভুত যৌগ। বস্তুতঃ এই সমস্ত পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করিয়াই গ্লুকোজ তৈয়ারী করা হয়।

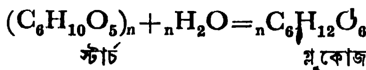
ইক্ষুশর্করা ডাই-স্যাকারাইড ($C_{12}H_{22}O_{11}$), ইহার গাঢ় দ্রবণ গাঢ় HCl দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষণ করা হয় (৫০°C)। ইক্ষুশর্করা একটি জলের অণুর সহযোগে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হইয়া যায়। আংশিক কেলাসন সাহায্যে এই উৎপন্ন দ্রব্য দুইটি পৃথক করিয়া লওয়া হয়।



$$\underset{\text{ইক্ষুশর্করা}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{HCl} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

চাউল অথবা আলুর স্টার্চ বিশ্লেষিত করিয়া প্রচুর গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। খোসা ছাড়াইয়া আলু বা চাউলের শ্বেতসার পিষিয়া লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া হয়। অতিরিক্ত চাপে ০·৫% লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড সহ ফুটাইলে

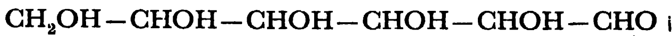
উহার আর্দ্র-বিশ্লেষণ দুই ঘণ্টাতেই সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর সোডা দ্বারা উহার অম্লত্ব প্রশমিত করিয়া প্রাণিজ অঙ্গার সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। দ্রবণটি ঘনীভূত করিয়া শীতল করিলে কঠিন স্ফটিকাকারে গ্লুকোজ পাওয়া যায়।



$$(C_6H_{10}O_5)_n + {}_nH_2O = {}_nC_6H_{12}O_6$$

স্টার্চ গ্লুকোজ

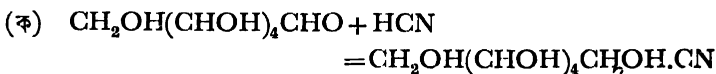
গ্লুকোজের মোটামুটি সংযুতি সঙ্কেত—



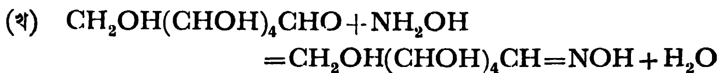
$$CH_2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO$$ ।

সুতরাং ইহাতে অ্যালডিহাইড এবং অ্যালকোহল উভয়েরই ধর্ম পরিলক্ষিত হয়।

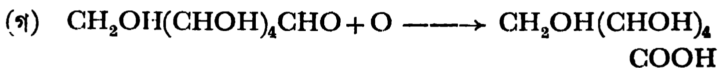
(১) অ্যালডিহাইড হিসাবে গ্লুকোজ বিজারণ-গুণ সম্পন্ন। ফেলিং দ্রবণ, অ্যামোনিয়া-যুক্ত $AgNO_3$ দ্রবণ ইত্যাদি গ্লুকোজ দ্বারা সহজেই বিজারিত হইয়া থাকে। অ্যালডিহাইডের অন্যান্য বিক্রিয়াও ইহাতে দেখা যায়:—



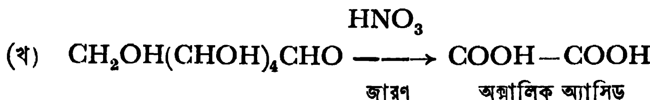
(ক) $CH_2OH(CHOH)_4CHO + HCN$
$= CH_2OH(CHOH)_4CHOH.CN$



(খ) $CH_2OH(CHOH)_4CHO + NH_2OH$
$= CH_2OH(CHOH)_4CH{=}NOH + H_2O$



(গ) $CH_2OH(CHOH)_4CHO + O \longrightarrow CH_2OH(CHOH)_4COOH$



(ঘ) $CH_2OH(CHOH)_4CHO \xrightarrow{HNO_3} COOH-COOH$

জারণ অক্সালিক অ্যাসিড

২৯-৪। ফ্রুক্টোজ (Fructose), $C_6H_{12}O_6$: ইহা গ্লুকোজের সমযোগী সুতরাং সঙ্কেত একই, তবে সংযুতি স্বতন্ত্র। ফলের ভিতরেই ফ্রুক্টোজ বেশী পাওয়া যায়। চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণে গ্লুকোজের সহিত ফ্রুক্টোজও পাওয়া যায়। এই ভাবেই উহা তৈয়ারী হয়।

ফ্রুক্টোজ কিটোন জাতীয় শর্করা। উহাতে কোহলের মূলক ছাড়া একটি কিটোন মূলক (CO) আছে। উহার সঙ্কেত $CH_2OH - CHOH - CHOH - CHOH - CO - CH_2OH$। সুতরাং উহাতে কিটোনের ধর্ম বর্তমান। কোহলের মত ব্যবহারও আছে।

২৯-৫। ইক্ষু-শর্করা (Cane sugar), $C_{12}H_{22}O_{11}$: যে চিনি আমরা সর্বদা ব্যবহার করি, উহা আখের চিনি বা ইক্ষুশর্করা। ইহা ডাই-স্যাকারাইড। বীটের চিনিও একই পদার্থ। অনেক তালজাতীয় ফলে এবং আনারসেও এই শর্করা আছে। আখে ১২-১৯% ভাগ চিনি থাকে।

আখ হইতে এই চিনি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। ছোট ছোট টুকরা কাটিয়া কাটিয়া যন্ত্রের চাপে আখের রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। রসটি প্রথমে একবার ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে চুন মিশাইয়া প্রায় ১০০°C উষ্ণতা পর্যন্ত তাপিত করা হয়। প্রয়োজন হইলে তারপর কিছু SO_2 গ্যাস উহাতে পরিচালিত করা হয়। চুন এবং SO_2 এর প্রক্রিয়ার ফলে রসে যে সমস্ত অ্যাসিড বা অপ্রয়োজনীয় মালিন্য থাকে তাহা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থিতাইয়া পড়ে। এই সকল প্রক্রিয়ার সময় রসের দ্রবণটি যথাসম্ভব প্রশম অবস্থায় রাখা হয়। ইহার পর, রসটি পাম্পের সাহায্যে বড় বড় ট্যাঙ্কে লইয়া যাওয়া হয়। অমুপ্রেষ পাতনের সাহায্যে উহার জল অনেকটা উদ্বায়িত করিয়া লইলে রসটি খুব গাঢ় হইয়া পড়ে। তৎপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করিলে রস হইতে চিনির স্ফটিক নিষ্ক্রান্ত হইবে। চোষক পাম্পের সাহায্যে শেষদ্রব গুড় সরাইয়া চিনি পৃথক করা হয়।

ইক্ষুশর্করা বর্ণহীন স্ফটিকাকার মিষ্ট পদার্থ। জলে দ্রবণীয় কিন্তু কোহলে দ্রবীভূত হয় না। প্রায় ২০০°C উষ্ণতায় উহার জল খানিকটা উদ্বায়িত হইয়া গেলে আঠাল চিনি বা ক্যারামেল পাওয়া যায়। নানারকম লজেন্স, মিছরি জাতীয় পদার্থ উহা হইতে প্রস্তুত হয়।

ইক্ষুশর্করার কোন বিজারণ গুণ নাই। লঘু অ্যাসিড বা ক্ষার দ্রবণের সাহায্যে ইহাকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করিলে ইহা গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়। ইনভারটেস (Invertase) উৎসেচকের সন্ধানের ফলেও চিনির এই আর্দ্রবিশ্লেষণ হয়। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের আক্রমণে চিনি অক্সালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। খাদ্য হিসাবে এবং বহুরকম খাদ্যপ্রস্তুতিতে চিনির প্রচুর ব্যবহার আছে।

শর্করাগুলি মিষ্টপদার্থ বটে তবে সমস্ত চিনির মিষ্টত্ব সমান নহে। পারস্পরিক মিষ্টত্বের অনুপাত নিম্নরূপ :—

চিনি		মিষ্টত্ব
ইক্ষুশর্করা	—	১০০
গ্লুকোজ	—	৭৪
ফ্রুক্টোজ	—	১৭০
ল্যাক্টোজ (দুগ্ধজাত)	—	১৬

খাদ্য ও রসায়ন : কয়লা বা পেট্রোল ব্যতিরেকে যেমন ইঞ্জিন বা মোটর চলে না, তেমনই মানবদেহে উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ না করিলে উহা চলিতে পারে না। দেহের ভিতরে অস্থি, মাংস, পেশী ও নানা প্রত্যঙ্গে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ। এই কোষগুলির ভিতরের প্রোটোপ্লাজমে সতত নানারকম পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। ইহাই প্রাণশক্তির পরিচয়। আমরা চিন্তা করি, কথা বলি, পরিশ্রম করি, কাজ করি,—এই সব প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের দেহের ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্তনের ফলে যে শক্তি উৎসারিত হয়, তাহাই আমাদের সকল কাজ করিতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, যদি খাদ্যের অভাব ঘটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলি পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনে লয় পাইয়া যায়। খাদ্য সরবরাহ করিলে, পাকস্থলীতে উহা জীর্ণ হইয়া রক্তের সাহায্যে সমস্ত কোষে কোষে নানা পদার্থরূপে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল পদার্থেরই পরে রাসায়নিক বিকার ঘটে। ইহাদের প্রায় সমস্ত বিক্রিয়াগুলিই তাপ-উদ্গারী। যদি দেহের ভিতর খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, তবে শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে না। কোষগুলি ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া গিয়া লয় পাইবে। আমাদের কোন কাজ করার বা চিন্তা করার শক্তি-সামর্থ্য থাকিবে না এবং দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপ রাখাও সম্ভব হইবে না। ফলে প্রাণশক্তি লোপ পাইবে—মৃত্যু অনিবার্য হইবে।

খাদ্যের প্রয়োজন প্রধানতঃ তিনটি কারণে :

(১) শক্তি উৎপাদন করিয়া দেহের কর্মক্ষমতা ও সাধারণ ব্যবস্থা অটুট রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা :

(২) দেহের উন্নতি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ;

(৩) অনিবার্য কারণে যে সকল কোষ লয় পাইবে সেগুলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া দেহের সমতা রক্ষা করা।

পূর্বেই বলিয়াছি, খাদ্য হিসাবে আমরা প্রধানতঃ তিন রকমের জৈব-পদার্থ গ্রহণ করি :

(ক) কার্বোহাইড্রেট—(চিনি, চাউল, আলু প্রভৃতি)

(খ) স্নেহ-জাতীয়—(ঘি, তেল, মাখন প্রভৃতি)

(গ) প্রোটিন-জাতীয়—(মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি)।

দেহের আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু ও সঙ্গত পরিচালনার জন্য এই তিন

রকমের খাদ্যই প্রয়োজন এবং সচরাচর নির্দিষ্ট অনুপাতেই থাকা উচিত। কেবলমাত্র একরকমের খাদ্য (যথা—প্রোটিন) দিলেই চলিবে না। এই সকল জৈব-পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনে শক্তি-উৎপাদন ত হয়ই, উপরন্তু ইহাদের সাহায্যে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সকল পদার্থের পরিবর্তনে সাহায্য করার জন্য বিকারক হিসাবে আরও দুইটি পদার্থ নিরন্তর সরবরাহ করা আবশ্যক—ইহারা হইতেছে জল এবং অক্সিজেন। জল ও অক্সিজেন ব্যতীত দেহের ভিতরের বিক্রিয়া সম্ভব নয়। পদার্থগুলির পরিবর্তনে বহু উৎসেচক এবং প্রভাবকের সাহায্য অপরিহার্য। উৎসেচকগুলি অবশ্য দেহের ভিতরেই আছে। যে সকল খাদ্যবস্তু আমরা গ্রহণ করি, দেহের অভ্যন্তরে সেগুলির বিভিন্ন রকমের পরিণতি সম্ভব। দেহের পুষ্টির জন্য সচরাচর যে রকম বিক্রিয়া বা পরিণতি প্রয়োজন তৎপরিবর্তে অন্যরকমের বিক্রিয়া সংঘটিত হইয়া দেহের ক্ষতিও করিতে পারে। অথবা বিক্রিয়াগুলির যে রকম গতিবেগ থাকা উচিত তাহার পরিবর্তে অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত ধীরে সেই বিক্রিয়াগুলি হইয়া দেহের পুষ্টির অভাব বা রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। যাহাতে খাদ্যবস্তুর সাহায্যে দেহের পুষ্টি ও সমতা সাধারণভাবে রক্ষা হয় এবং দেহের নানা প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটে, সেজন্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে আরও দুইরকমের পদার্থ থাকা একান্তই আবশ্যক। এই পদার্থগুলি হইতেছে কিছু খনিজ লবণ এবং ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এই পদার্থগুলি আমাদের খুব সামান্যই প্রয়োজন কিন্তু অপরিহার্য। প্রকৃতিজাত যে সকল খাদ্য আমরা গ্রহণ করি উহার সঙ্গেই এই সকল দ্রব্য দেহে প্রবেশ করে। যদি খাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য ইহাদের অভাব ঘটে তবে পৃথকভাবে এই সকল দ্রব্য দেহে সরবরাহ করা প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে খাদ্য হিসাবে আমাদের গ্রহণ করা উচিত :—

(ক) জৈবজাতীয় পদার্থ—কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন

(খ) খনিজ লবণ—ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ইত্যাদির লবণ

(গ) ভাইটামিন—‘এ’, ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি’, ইত্যাদি

(ঘ) অক্সিজেন ও জল—বিকারক হিসাবে।

খনিজ লবণ : সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, কপার ঘটিত লবণ সামান্য পরিমাণে আমাদের প্রয়োজন। ফস্‌ফরাস্‌ ও সালফার যৌগও

দেহের পুষ্টিতে আবশ্যক। ম্যাঙ্গানিজ, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, আয়োডিনও থাকা উচিত। সাধারণ খাদ্যে যে সকল উৎস হইতে এগুলি পাওয়া যায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল :

খনিজ-দ্রব্য উৎস

১। সোডিয়াম—সাধারণ আমিষ পদার্থ, মাংস ইত্যাদি

২। পটাসিয়াম—শাক-সব্জী ও কোন কোন আমিষ পদার্থ

৩। কপার—সিমজাতীয় ফল, লিভার, কিড্‌নী ইত্যাদি

৪। লৌহ—সিমজাতীয় ফল, শাকপাতা, ডিমের কুসুম, লিভার

৫। ক্যালসিয়াম—দুধ, পনীর, গম, ডিম ইত্যাদি

৬। ম্যাগনেসিয়াম—সবুজ শাকপাতা, কোকো, চাউল

ভাইটামিন : দেহের আভ্যন্তরীণ বিক্রিয়াগুলিকে সংহত করিয়া নির্দিষ্টরূপে ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিচালনার জন্য ভাইটামিনের প্রয়োজন। এই পদার্থগুলি খুবই সামান্য পরিমাণে দেহের প্রয়োজন। কিন্তু ইহাদের অবর্তমানে দেহের ভিতর নানারূপ অপক্রিয়া দেখা দেয় এবং ফলে ভাইটামিন-অভাবজনিত রোগের আবির্ভাব হয়। যেমন, খাদ্যবস্তুতে ভাইটামিন "বি" না থাকিলে বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়, ভাইটামিন "সি" না থাকিলে দুরন্ত স্কার্ভি রোগ হয়। ভাইটামিনগুলি জৈবজাতীয় পদার্থ এবং প্রায়ই খুব জটিল পদার্থ। কোন কোন ভাইটামিন, যেমন ভাইটামিন "বি" অথবা "সি" জলেই দ্রবণীয়, আবার ভাইটামিন "এ", "ডি"······ইহারা স্নেহদ্রব্য। এপর্যন্ত "এ", "বি", "সি", "ডি" প্রভৃতি এক ডজনেরও অধিক ভাইটামিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, আবার ইহার মধ্যে কোন কোন ভাইটামিন একাধিক ভাইটামিনের মিশ্রণ—যেমন "বি" ভাইটামিনের ভিতর পাঁচটি বিভিন্ন ভাইটামিন বর্তমান। দেহের প্রয়োজনে প্রত্যেক ভাইটামিনের নির্দিষ্ট কার্যকারিতা আছে। প্রধান ভাইটামিনগুলি আমরা নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তু হইতে সাধারণতঃ গ্রহণ করি।

ভাইটামিন খাদ্যবস্তু

"এ"—লিভার, দুধ, ডিম এবং সবুজ শাকপাতা

"বি"—গম, আছাঁটা চাউল, ঈস্ট, ডাল ইত্যাদি

"সি"—লেবু, কমলাজাতীয় ফল, টোমাটো, কফি, সাধারণ কাঁচা সব্জী

"ডি"—মাছের লিভারের তেল, ডিম, মাখন ইত্যাদি।

খাদ্যপদার্থের পরিবর্তনগুলি কিন্তু দেহের ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। একটি উদাহরণ হইতে সহজেই উহা উপলব্ধি করা যাইবে। আমরা যখন ভাত খাই, উহাতে কার্বোহাইড্রেট—স্টার্চ থাকে। প্রথমে উহা মুখের ভিতরে লালার সংস্পর্শে আসে। লালার ভিতরে "টাইলিন" (Ptylin) নামে একটি উৎসেচক আছে। চর্বণের সময় এই টাইলিন দ্বারা উহা জীর্ণ হইতে থাকে এবং পাকস্থলীতে যাওয়ার সময় উহা আস্তে আস্তে গ্লুকোজে পরিণত হইতে থাকে। খাদ্য গেলে পাকস্থলীতে পাচক রস উৎপন্ন হয়। ইহাতে খানিকটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপসিন, রেনিন প্রভৃতি উৎসেচক থাকে। ইহাদের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু জীর্ণ হইতে থাকে। কার্বোহাইড্রেট এখানে সম্পূর্ণরূপে গ্লুকোজে পরিণত হয়। আংশিক জীর্ণ খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে পাকস্থলী হইতে গ্রহণীর ভিতর দিয়া নীচের দিকে যাওয়ার সময় লিভার হইতে নিঃসারিত পিত্ত দ্বারা এবং অগ্ন্যাশয়ের রস দ্বারা সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া থাকে। অতঃপর গ্লুকোজ এবং অন্যান্য যে সকল দ্রব্য দেহের জন্য প্রয়োজন, ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ছোট ছোট রক্তনালীর সাহায্যে সেগুলি শোষিত হইয়া বিভিন্ন কোষে পরিচালিত হয়। অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি মল-নালীর দিকে চলিয়া যায়। কোষের ভিতর যে গ্লুকোজ উপস্থিত হয়, রক্তের সহিত মিশ্রিত অক্সিজেন দ্বারা জারিত হইয়া উহা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে থাকে।

ত্রিংশ অধ্যায়

বৃত্তাকার জৈবপদার্থ

বহুকাল হইতেই নানারকম সুগন্ধযুক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। পরীক্ষায় ইহাদের অধিকাংশই দেখা যায় বৃত্তাকার কঠিন-যৌগ। সমস্ত বৃত্তাকার কার্বন-যৌগই বেনজিন (C_6H_6) হাইড্রোকার্বন হইতে উদ্ভূত মনে করা হয়। তাই, এখন সমস্ত বেনজিন-উদ্ভূত অথবা বৃত্তাকার যৌগকেই

"গন্ধবহ (aromatic) যৌগ" বলা হয়—তাহাদের গন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক।

রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য থাকার জন্য বৃত্তাকার কার্বন-যৌগ সারবন্দী কার্বন-যৌগ হইতে পৃথক আলোচনা করা হয়, যদিও এক শ্রেণীর যৌগ হইতে অপর শ্রেণীর যৌগ উৎপাদন সম্ভব। অ্যাসিটিলীন হইতে বেনজিন পাওয়া যায়, আবার বেনজিন হইতে ম্যালেইক অ্যাসিড পাওয়া সম্ভব।

জৈব যৌগের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই বৃত্তাকার যৌগ। আলকাতরা হইতেই তিনশতাধিক প্রধান বৃত্তাকার যৌগ পাওয়া যায় এবং এইগুলি হইতে বহু সহস্র যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ল্যাবরেটরীতেও সংখ্যাতীত যৌগ প্রস্তুত হইয়াছে। অসংখ্য রঞ্জকদ্রব্য, বহু প্লাস্টিক, নানারকমের গন্ধদ্রব্য ও ঔষধ বৃত্তাকার যৌগ। জার্মান রসায়নবিদ বায়ারের কৃত্রিম নীল উৎপাদন ভারতবর্ষকে কুখ্যাত নীলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই নীলও বৃত্তাকার যৌগ।

৩০-১। আলকাতরার পাতন: পূর্বেই বলা হইয়াছে, কয়লার অন্তর্ধূমপাতনের ফলে নানারকম মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আলকাতরা অন্যতম। একদা বহু উপেক্ষিত আলকাতরা হইতে বর্তমানে নানারকম ঔষধ, রঞ্জক, সুগন্ধি, বিস্ফোরক, বীজবারক ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

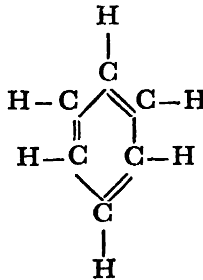
আলকাতরাতে সূক্ষ্ম কার্বনের কণা ছাড়াও নানারকম অম্ল, ক্ষারক ও প্রশম জটিল পদার্থ মিশ্রিত থাকে। লোহার বড় ট্যাঙ্কে আলকাতরাকে উত্তপ্ত করিয়া উহার নানাবিধ উপাদান উদ্বায়িত করা হয়। বিভিন্ন উষ্ণতায় উদ্বায়ী বাষ্পগুলি পৃথক সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি চার রকম তৈল সংগ্রহ করা হয়। এই ভাবে প্রায় ৪০০°C উষ্ণতা পর্যন্ত উহাকে উত্তপ্ত করিলে প্রায় ৪০% ভাগ পাতিত হইয়া যায় এবং যে কালো পদার্থ ট্যাঙ্কে পড়িয়া থাকে উহা পিচ (Pitch)। বিভিন্ন উষ্ণতায় সংগৃহীত পদার্থগুলি :—

	উষ্ণতা °C	আনুমানিক শতকরা ভাগ	প্রধান উপাদান
(i) লাইট অয়েল	— ১৭০° —	৮% —	বেনজিন
(ii) কার্বলিক অয়েল	— ২৩০° —	১০% —	ফিনোল, ন্যাপথালিন

	উষ্ণতা °C		আনুমানিক শতকরা ভাগ		প্রধান উপাদান
(iii) ক্রিয়োজোট অয়েল —	২৭০°	—	১০%	—	ক্রেসোল
(iv) অ্যানথ্রাসিন অয়েল —	৩৬০°	—	২০%	—	অ্যানথ্রাসিন

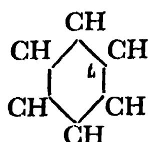
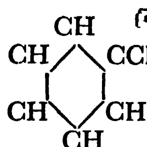
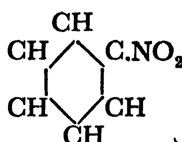
ইহাদের প্রত্যেক অংশকে লইয়া পুনঃ পুনঃ আংশিক পাতন দ্বারা শোধিত করিয়া বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করা হয়; লাইট অয়েল লইয়া উহাকে আবার পাতিত করা হয়। প্রথম ৭০°C পর্যন্ত বাষ্পগুলিকে আলাদা সংগ্রহ করা হয়। ৭০°Cএর অধিক উষ্ণতায় পাতিত পদার্থে প্রায় ৭০% বেনজিন থাকে। H_2SO_4 এবং NaOH দ্রবণ দ্বারা শোধিত এবং পরিষ্কৃত করিয়া আবার আংশিক পাতন করিলে বেনজিন পাওয়া যায়। এই বেনজিন বৃত্তাকার যৌগসমূহের আদি-পদার্থ।

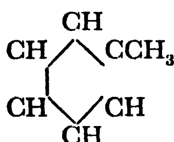
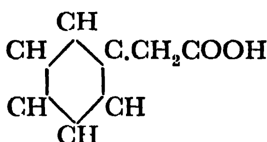
৩০-২। বেনজিন, C_6H_6 : বেনজিন বৃত্তাকার হাইড্রোকার্বন যৌগ। উহার অণুতে ছয়টি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সহিত যুক্ত হওয়ার ফলে একটি ষড়ভুজ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি কার্বনের সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুও যুক্ত আছে। কার্বন পরমাণুদের ভিতরে তিনটি দ্বিবন্ধ এবং তিনটি সাধারণ যোজক বর্তমান।

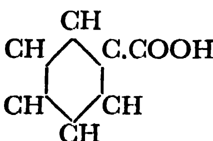
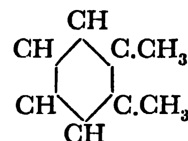
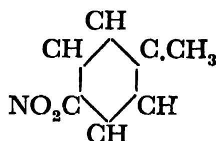


অতএব প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর যোজ্যতাই চার প্রতিপন্ন হইবে। বেনজিনের এই সংযুতি-সঙ্কেত কেকুলে (Kekule) প্রথম প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে এই সঙ্কেতই এখন সর্বজনগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অনেক সময় কেবল একটি ষড়ভুজ মাত্র অঙ্কন করিয়া ⬡ বেনজিনকে প্রকাশ করা হয়।

বেনজিনের ভিতর দ্বিবন্ধ থাকিলেও উহা খুব স্থায়ী যৌগ, এই ষড়ভুজ বৃত্তকে ভাঙিয়া ফেলা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। সংলগ্ন হাইড্রোজেন্ পরমাণুগুলিকে বিভিন্ন মূলক দ্বারা অবস্থাবিশেষে প্রতিস্থাপন করিয়া নানারকম যৌগিকপদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। যেমন:—

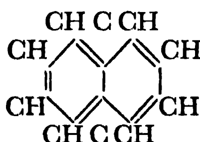
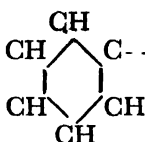
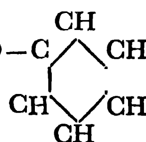




ইত্যাদি।

আবার অনেক যৌগিকপদার্থের একটি অণুতে একাধিক বেনজিন বৃত্তের সমাবেশ হইতে পারে। যেমন:—

ন্যাপথালিন $C_{10}H_8$ বেনজিল $C_{14}H_{10}O_2$.

ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন বিক্রিয়াতে বেনজিনের বৃত্তটি অপরিবর্তিত অবস্থায় বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। সংলগ্ন হাইড্রোজেনের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু কার্বন-বৃত্ত অটুট থাকে।

প্রস্তুতি: আলকাতরার পাতন হইতেই সমস্ত বেনজিন প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন উপায়ে ল্যাবরেটরীতেও বেনজিন তৈয়ারী করা যায় বটে, তাত্ত্বিক কৌতূহল ছাড়া উহাদের আর কোন গুরুত্ব নাই।

(ক) উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া অ্যাসিটিলীন পরিচালিত করিলে, বেনজিন পাওয়া যায় :— $3C_2H_2 = C_6H_6$

(খ) সোডিয়াম বেনজয়েট এবং সোডালাইম পাতিত করিলেও বেনজিন পাওয়া সম্ভব :—$C_6H_5COONa + NaOH = C_6H_6 + Na_2CO_3$

ধর্ম : জলের চেয়ে হাল্‌কা, কিন্তু জলের মতই বর্ণহীন তরল পদার্থ বেনজিন (স্ফুটনাঙ্ক, ৮০°C)। জলের সঙ্গে বেনজিন মিশেও না। ইহার একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে। কোহল এবং ইথারের সঙ্গে বেনজিন মিশিয়া থাকে।

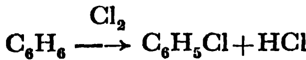
বেনজিনের হ্যালোজেন এবং অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়াগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) সূর্যালোকে ক্লোরিন বা ব্রোমিনের সহিত বিক্রিয়াতে বেনজিন হইতে যুত-যৌগিক উৎপন্ন হয়।

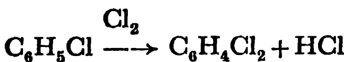


$C_6H_6 + 3Cl_2 = C_6H_6Cl_6$ [বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড]

(২) লৌহ অথবা আয়োডিন প্রভাবক থাকিলে, ক্লোরিন ও ব্রোমিন আস্তে আস্তে বেনজিনের হাইড্রোজেনগুলি প্রতিস্থাপিত করে—



$$C_6H_6 \xrightarrow{Cl_2} C_6H_5Cl + HCl$$



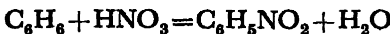
$$C_6H_5Cl \xrightarrow{Cl_2} C_6H_4Cl_2 + HCl$$

এইভাবে সমস্ত হাইড্রোজেনগুলিই প্রতিস্থাপিত হইতে পারে।



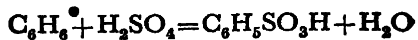
$$C_6H_6 + 6Cl_2 = C_6Cl_6 + 6HCl$$

(৩) গাঢ় H_2SO_4 এর সান্নিধ্যে, বেনজিন গাঢ় HNO_3 দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নাইট্রোবেনজিনে পরিণত হয়।



$$C_6H_6 + HNO_3 = C_6H_5NO_2 + H_2O$$

(৪) সালফিউরিক অ্যাসিড সহ বেনজিন উত্তপ্ত করিলে বেনজিন-সালফনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।



$$C_6H_6 + H_2SO_4 = C_6H_5SO_3H + H_2O$$

(৫) শ্বেততপ্ত নলের ভিতর দিয়া বেনজিন বাষ্প পরিচালিত করিলে ডাইফিনাইল পাওয়া যায় :—



$$2C_6H_6 = C_6H_5 - C_6H_5 + H_2$$

(৬) ২০০°C উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও বেনজিন বাষ্পের মিশ্রণ বিচূর্ণ নিকেল প্রভাবকের উপর দিয়া পরিচালিত করিলে হেক্সাহাইড্রো-বেনজিন উৎপন্ন হয় :—



$$C_6H_6 + 3H_2 = C_6H_{12}$$

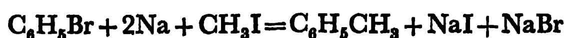
ব্যবহার : তেল ও চর্বির দ্রাবক হিসাবে বেনজিন সর্বদা ব্যবহৃত হয়। পশম ও রেশমের বস্ত্রাদি পরিষ্করণের জন্য বেনজিন ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় জ্বালানি হিসাবে ইহাকে প্রয়োগ করা হয়। কার্বলিক অ্যাসিড, নাইট্রোবেনজিন প্রভৃতি প্রস্তুতিতে বেনজিন প্রয়োজন।

বেনজিনের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিয়া নানারকম যৌগ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ক্লোরো-বেনজিন (C_6H_5Cl) অথবা নাইট্রোবেনজিনের ($C_6H_5NO_2$) মাধ্যমেই ঐ সকল পদার্থ পাওয়া যায়। নানা রকমের রঙ, বীজবারক, ঔষধ প্রভৃতি বেনজিন-উদ্ভূত যৌগ। যেমন, প্যারাহাইড্রক্সি অ্যাজোবেনজিন ⬡ N=N ⬡ OH একটি রঙ; অ্যান্টিফেব্রিন, ⬡ $NHCOCH_3$ জ্বরবিনাশক ঔষধ, কার্বলিক অ্যাসিড, ⬡ OH, বীজবারক। সাধারণের প্রয়োজনীয় বেনজিন-উদ্ভূত কয়েকটি সরল এবং সহজ যৌগের আলোচনা করা হইতেছে।

৩০-৩। টলুইন ($C_6H_5—CH_3$) : ইহাও একটি হাইড্রোকার্বন। ইহাতে বেনজিনের একটি হাইড্রোজেন মিথাইল মূলক (CH_3) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে মিথাইল বেনজিন বলা যায়। বেনজিন হইতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সরাইয়া লইলে যে একযোজী মূলক থাকিবে তাহাকে বলা হয়, ফিনাইল মূলক (C_6H_5)। C_6H_5Br ফিনাইল ব্রোমাইড বা ব্রোমো-বেনজিন, $C_6H_5CH_2COOH$, ফিনাইল অ্যাসেটিক অ্যাসিড।

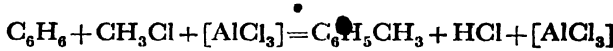
লাইট অয়েলের আংশিক পাতনের ফলে বেনজিন ছাড়া টলুইনও পাওয়া যায়। আরও দুইটি উপায়ে টলুইন প্রস্তুত করা যায় :

(১) **ফিটিগ পদ্ধতি : (Fittig's method)**—ইথিরীয় দ্রবণে মিথাইল আয়োডাইড এবং ব্রোমোবেনজিনের মিশ্রণে ধাতব সোডিয়াম দিলে, টলুইন পাওয়া যায়। আংশিক পাতন দ্বারা উহা হইতে টলুইন উদ্ধার করা হয় :—



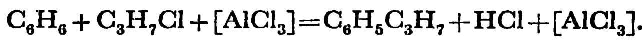
$$C_6H_5Br + 2Na + CH_3I = C_6H_5CH_3 + NaI + NaBr$$

(২) **ফ্রিডেল-ক্রাফ্‌ট পদ্ধতি ঃ (Friedel-Craft's method)**—অনার্দ্র $AlCl_3$ এর প্রভাবে, মিথাইল হ্যালাইড এবং বেনজিনের বিক্রিয়াতে টলুইন পাওয়া যায় ঃ—



$$C_6H_6+CH_3Cl+[AlCl_3]=C_6H_5CH_3+HCl+[AlCl_3]$$

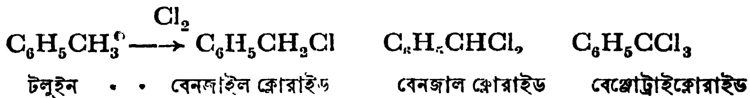
যে কোন অ্যালকিল বেনজিন এই উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব :—



$$C_6H_6+C_3H_7Cl+[AlCl_3]=C_6H_5C_3H_7+HCl+[AlCl_3].$$

ধর্ম ঃ সমগোত্রীয় বেনজিনের মতই টলুইন বর্ণহীন হালকা তরল পদার্থ (স্ফুটনাঙ্ক, ১১০°C), জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কোহল, ইথার প্রভৃতির সহিত সমসত্ত্ব মিশ্রণ করে। টলুইনের রাসায়নিক বিক্রিয়াও বেনজিনের মতই।

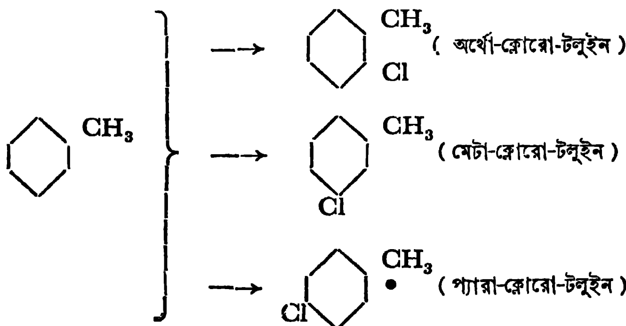
(১) ফুটন্ত টলুইনে Cl_2-গ্যাস পরিচালিত করিলে, ক্লোরিন মিথাইল মূলকের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে, বৃত্তের হাইড্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া করে না। ধীরে ধীরে CH_3 এর সমস্ত হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইতে পারে।



$$C_6H_5CH_3 \xrightarrow{Cl_2} C_6H_5CH_2Cl \quad C_6H_5CHCl_2 \quad C_6H_5CCl_3$$

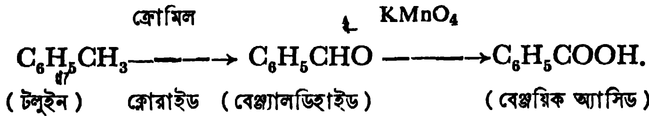
টলুইন বেনজাইল ক্লোরাইড বেনজাল ক্লোরাইড বেঞ্জোট্রাইক্লোরাইড

(২) আয়োডিন, ফসফরাস প্রভৃতির প্রভাবে সাধারণ অবস্থায় Cl_2-গ্যাস বেনজিনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং বেনজিন বৃত্তের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে। CH_3-এর মূলকের কোন রূপান্তর হয় না। এইভাবে তিনরকম ক্লোরো-টলুইন পাওয়া সম্ভব।



যে সমস্ত Cl-পরমাণু বেনজিনের বৃত্তের সহিত যুক্ত, উহাদিগকে সোজাসুজি OH, CN প্রভৃতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়।

(৩) বেনজিনকে জারিত করা সুকঠিন, কিন্তু টলুইনকে জারিত করিলে উহার CH_3-শাখাটি প্রথমে $-CHO$ এবং পরে $-COOH$ মূলকে পরিণত হইয়া যায়। এইভাবে বেনজয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায়।



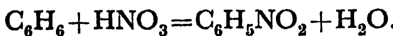
$$C_6H_5CH_3 \xrightarrow{\text{ক্রোমিল ক্লোরাইড}} C_6H_5CHO \xrightarrow{KMnO_4} C_6H_5COOH.$$

(টলুইন) (বেঞ্জ্যালডিহাইড) (বেঞ্জয়িক অ্যাসিড)

বেনজিনের মত টলুইনও HNO_3 এবং H_2SO_4 অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হইলে নাইট্রোটলুইন ও টলুইন-সালফনিক অ্যাসিড দেয়।

ব্যবহার ঃ টলুইনও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নানারকম ঔষধ প্রস্তুতিতে টলুইনকে আদি পদার্থ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। T.N.T. নামক বিস্ফোরক 'ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন' টলুইন হইতেই তৈয়ারী হয়।

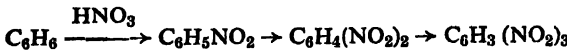
৩০-৪। নাইট্রোবেনজিন, $C_6H_5NO_2$। প্রস্তুতি ঃ সমপরিমাণ গাঢ় HNO_3 এবং গাঢ় H_2SO_4 মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া হয়। অল্প অল্প পরিমাণে অ্যাসিড-মিশ্রণটি বেনজিনের সহিত মিশান হয়। অতঃপর কূপীটি গরম জলে (৬০-৭০°C) ঘণ্টাখানেক বসাইয়া রাখা হয়।



$$C_6H_6 + HNO_3 = C_6H_5NO_2 + H_2O.$$

এই বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড জল শোষণ করিয়া লইয়া বিক্রিয়াটি সহজে সংঘটিত করে।

অধিকতর উষ্ণতায় ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করিলে ডাই-নাইট্রোবেনজিন এবং ট্রাই-নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যাইবে,



$$C_6H_6 \xrightarrow{HNO_3} C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_4(NO_2)_2 \rightarrow C_6H_3(NO_2)_3$$

ধর্ম ঃ নাইট্রোবেনজিন ঈষৎ হলুদ তরল পদার্থ। স্ফুটনাঙ্ক, ২০৯°C। ইহা জলে অদ্রাব্য এবং জল অপেক্ষা ভারী। ইহার একটি তীব্র বিশিষ্ট গন্ধ আছে। নাইট্রোবেনজিন বেশ স্থায়ী যৌগ ; অ্যাসিড, ক্ষার বা জারক দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কিন্তু বিভিন্ন বিজারকের দ্বারা নানারকম পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে :—

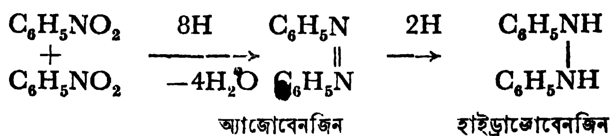
(১) আম্লিক দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা (Zn+HCl) উহা অ্যানিলীনে পরিণত হয় :—



$$C_6H_5NO_2 + 6H = C_6H_5NH_2 + 2H_2O$$

অ্যানিলীন

(২) ক্ষারকীয় দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা (Zn+NaOH) অ্যাজো-বেনজিন বা হাইড্রাজোবেনজিন পাওয়া যায় :—

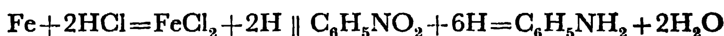


$$\begin{matrix} C_6H_5NO_2 \\ + \\ C_6H_5NO_2 \end{matrix} \xrightarrow[-4H_2O]{8H} \begin{matrix} C_6H_5N \\ \| \\ C_6H_5N \end{matrix} \xrightarrow{2H} \begin{matrix} C_6H_5NH \\ | \\ C_6H_5NH \end{matrix}$$

অ্যাজোবেনজিন হাইড্রাজোবেনজিন

৩০-৫। অ্যানিলীন, $C_6H_5NH_2$: নাইট্রোবেনজিনের বিজারণে এই যৌগটি পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ জিঙ্ক অথবা লৌহ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা নাইট্রোবেনজিনকে বিজারিত করিয়া অ্যানিলীন প্রস্তুত করা হয় :—

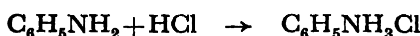


$$Fe+2HCl=FeCl_2+2H \parallel C_6H_5NO_2+6H=C_6H_5NH_2+2H_2O$$

উৎপন্ন অ্যানিলীন তেলের মত ভাসিতে থাকে। স্টীম-সহযোগে উহাকে পাতিত করিয়া পৃথক্ করা হয়।

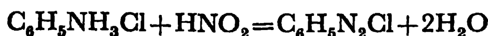
ধর্ম : অ্যানিলীন তেলের মত পিচ্ছিল বর্ণহীন তরল পদার্থ। স্ফুটনাঙ্ক, ১৮৩°C। ইহার একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে ইহা আস্তে আস্তে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। ইহা জলে অদ্রাব্য এবং জল হইতে ভারী। কোহল, ইথার ও বেনজিনে ইহা দ্রবণীয়।

(১) ক্ষারকত্বের জন্য অ্যানিলীন বিভিন্ন অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হইয়া লবণ উৎপাদন করে।



$$C_6H_5NH_2+HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$$

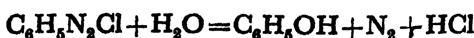
(২) শীতল অবস্থায় নাইট্রাস অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অ্যানিলীন-লবণ ডায়াজোনিয়াম যৌগ উৎপাদন করে।



$$C_6H_5NH_3Cl+HNO_2=C_6H_5N_2Cl+2H_2O$$

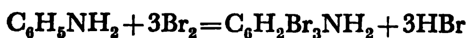
[বেনজিন-ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড]

অধিকতর উষ্ণতায় ডায়াজোনিয়াম যৌগিকগুলি ভাঙিয়া যায় এবং নাইট্রোজেন গ্যাস বাহির হওয়ার ফলে উহারা ফিনোলে পরিণত হয়।



$$C_6H_5N_2Cl+H_2O=C_6H_5OH+N_2+HCl$$

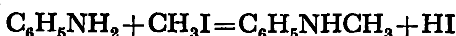
(৩) ক্লোরিন বা ব্রোমিনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অ্যানিলীন হইতে হ্যালোজেন প্রতিস্থাপিত যৌগ পাওয়া যায় :—



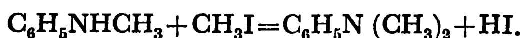
$$C_6H_5NH_2+3Br_2=C_6H_2Br_3NH_2+3HBr$$

(ট্রাইব্রোমো অ্যানিলীন)

(৪) মিথাইল আয়োডাইডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে NH_2-মূলকের হাইড্রোজেন অ্যালকিল মূলকদ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় :—



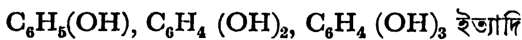
$$C_6H_5NH_2+CH_3I=C_6H_5NHCH_3+HI$$



$$C_6H_5NHCH_3+CH_3I=C_6H_5N\,(CH_3)_2+HI.$$

অ্যানিলীন হইতে নানাপ্রকার রঞ্জনদ্রব্য এবং ঔষধ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য বহু রকমের জৈব-যৌগ তৈয়ারী করার জন্যও ইহা প্রয়োজন হয়।

৩০-৬। ফিনোল (Phenol), C_6H_5OH : বেনজিনের হাইড্রোজেন OH মূলকদ্বারা প্রতিস্থাপিত যৌগগুলিকে ফিনোল বলা হয়। অর্থাৎ ফিনোলগুলি হাইড্রক্সি-বেনজিন। যথা :—



$C_6H_5(OH)$, $C_6H_4\,(OH)_2$, $C_6H_4\,(OH)_3$ ইত্যাদি

ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সরলতম ফিনোল C_6H_5OH। ইহার অপর নাম **কার্বলিক অ্যাসিড**। OH থাকার জন্য বাহ্যতঃ কোহলের মত দেখাইলেও ধর্মের দিক দিয়া কোহলের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। OH মূলকটি বেনজিন বৃত্তের সহিত সরাসরি যুক্ত থাকার জন্যই এই স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে C_6H_5-CH_2OH, বেনজাইল কোহলে OH মূলকটি বৃত্তের সহিত যুক্ত নয়। ইহার ধর্ম সাধারণ কোহলের মতই।

প্রস্তুতি : (১) আলকাতরার পাতনের সময় একটি অংশ প্রায় ২৩০°C উষ্ণতায় সংগৃহীত হয়। ইহাতে কার্বলিক অ্যাসিড এবং ন্যাপথালীন ইত্যাদি থাকে। ঠাণ্ডা করিলে ন্যাপথালীন কেলাসিত হইয়া প্রথমেই পৃথক হইয়া যায়। উহাকে ছাঁকিয়া, শেষদ্রব তরল পদার্থকে NaOH সহ গরম করা হয়। ফিনোলগুলি সোডিয়াম ফেনেট অবস্থায় দ্রব হইয়া যায়। অন্যান্য অপদ্রব্য হইতে পৃথক করিয়া H_2SO_4 দ্বারা ফেনেট হইতে ফিনোল পুনরায় প্রস্তুত করা হয়। আংশিক পাতন দ্বারা উহাকে শোধিত করিয়া লওয়া হয়।

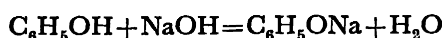
ধর্ম : ফিনোল বর্ণহীন স্ফটিকাকারে থাকে। গলনাঙ্ক, ৪২°C। সাধারণ উষ্ণতায় জলে বেশী দ্রবণীয় নয়, কিন্তু কোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়। ইহার

একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। গন্ধের সাহায্যেই ইহাকে চেনা যায়। ফিনোল একটি তীব্র বিষ এবং বীজবারক।

(১) সমস্ত ফিনোলই অম্লজাতীয় যৌগ, উহার OH মূলকের হাইড্রোজেনটি আয়নিত হয় এবং উহা লবণ উৎপাদনে সক্ষম :—



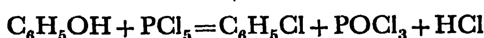
$$C_6H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5O^- + H^+$$



$$C_6H_5OH + NaOH = C_6H_5ONa + H_2O$$

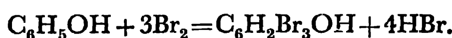
কোহল কখনও এরূপ ব্যবহার করে না।

(২) PCl_5 ফিনোলের OH মূলকের সহিত স্বাভাবিক বিক্রিয়া করিয়া থাকে—



$$C_6H_5OH + PCl_5 = C_6H_5Cl + POCl_3 + HCl$$

(৩) সাধারণ অবস্থায় ব্রোমিনের সহিত ফিনোল বিক্রিয়া করে এবং ট্রাইব্রোমো-ফিনোল পাওয়া যায় :—



$$C_6H_5OH + 3Br_2 = C_6H_2Br_3OH + 4HBr.$$

(৪) H_2SO_4 এবং HNO_3 বেনজিনের মতই ফিনোলকে আক্রমণ করে এবং ফিনোল-সালফনিক অ্যাসিড ও নাইট্রোফিনোল পাওয়া যায় :—



$$C_6H_5OH + H_2SO_4 = C_6H_4(OH)SO_3H + H_2O$$

(ফিনোল-সালফনিক অ্যাসিড)



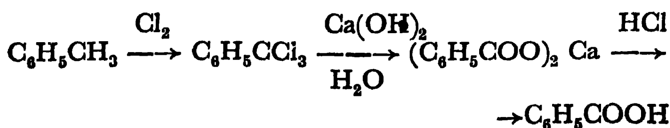
$$C_6H_5OH + HNO_3 = C_6H_4(OH)\,NO_2 + H_2O$$

(নাইট্রোফিনোল)

ব্যবহার : অধিকাংশ ফিনোলের ব্যবহার হয় প্লাস্টিক শিল্পে। ফিনোল হইতে নানারকম প্লাস্টিক প্রস্তুত হয়। পিকরিক অ্যাসিড নামক বিস্ফোরকও ফিনোল হইতে প্রস্তুত হয়। বীজবারক হিসাবে কোন কোন সাবানে ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ঔষধ ও রং প্রস্তুতিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

৩০-৭। বেনজয়িক অ্যাসিড, C_6H_5COOH : বেনজয়িক অ্যাসিড নানারকমে পাওয়া যাইতে পারে।

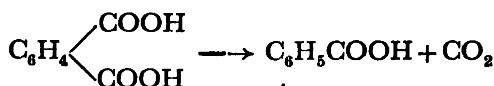
(১) টলুইনের সহিত ক্লোরিনের বিক্রিয়াতে যে ট্রাই-ক্লোরো-টলুইন হয় উহাকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করিলে বেনজয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায়।



$$C_6H_5CH_3 \xrightarrow{Cl_2} C_6H_5CCl_3 \xrightarrow[H_2O]{Ca(OH)_2} (C_6H_5COO)_2\,Ca \xrightarrow{HCl}$$

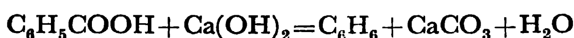
$$\rightarrow C_6H_5COOH$$

(২) থলিক অ্যাসিড (Phthalic acid) উত্তপ্ত করিলেও বেনজয়িক অ্যাসিড পাওয়া সম্ভব :—



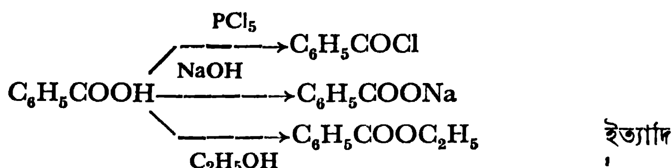
$$C_6H_4\begin{cases}COOH\\COOH\end{cases} \longrightarrow C_6H_5COOH + CO_2$$

বেনজয়িক অ্যাসিড সাদা চকচকে স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। গলনাঙ্ক, ১২১°C। গরমজল, ইথার এবং কোহলে ইহার যথেষ্ট দ্রাব্যতা আছে। চুনের সহিত উত্তপ্ত করিলে উহা বেনজিনে পরিণত হয়।



$$C_6H_5COOH + Ca(OH)_2 = C_6H_6 + CaCO_3 + H_2O$$

উহাতে—COOH মূলক থাকার জন্য অম্লত্ব ত আছেই এবং জৈব-অ্যাসিডের অন্যান্য গুণও বর্তমান।



$$C_6H_5COOH \begin{cases}\xrightarrow{PCl_5} C_6H_5COCl\\ \xrightarrow{NaOH} C_6H_5COONa\\ \xrightarrow[C_2H_5OH]{} C_6H_5COOC_2H_5\end{cases}$$ ইত্যাদি

বেনজয়িক অ্যাসিড ও উহার লবণ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

জৈব রসায়নের ব্যবহার : রসায়নের ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বেই অনেকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে আরও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

রঞ্জন : অ্যানিলীন, ফিনোল প্রভৃতি হইতে বহু রকমের রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বস্ত্র, রেশম প্রভৃতি রঞ্জনে ইহারা ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রব্য বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রঞ্জক সোজাসুজি বস্ত্র রঞ্জিত করে। আবার কখনও রাগবন্ধকের (mordant) এর সাহায্যে বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়। প্রথমে পরিষ্কৃত বস্ত্রটি অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেটের দ্রবণে সিক্ত করিয়া পরে রঞ্জন-দ্রব্য দেওয়া হয়। ফলে, রঞ্জক একটি অদ্রাব্য যৌগে পরিণত হইয়া বস্ত্রের উপর স্থায়ী হয়।

রং ও বার্নিশ : তিসির তেল (Linseed oil) তাপিত করিলে বহু যৌগিকতার ফলে ঘনতর হয়। এই সকল বিশুষ্ক তিসির তেল (drying oil) বাতাসে রাখিয়া দিলে উহারা সহজেই জারিত হইয়া কঠিন হয়। ফলে কোন বস্তুর উপর উহাদ্বারা প্রলেপ দিলে, উহা হইতে একটি পাতলা কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়। সচরাচর গালা (shellac) তিসির তেলে দ্রবীভূত করিয়া ঐ দ্রবণের

প্রলেপ কাঠের উপর দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা হইতে বার্নিশ হয়। স্পিরিটের ভিতর গালা দ্রবীভূত করিয়া 'স্পিরিট বার্নিশ' হয়। স্পিরিট উবিয়া গেলে গালার প্রলেপ থাকে।

তিসির তেলের ভিতরে যদি কোন অজৈব রং (pigment) সূক্ষ্ম বিচূর্ণ অবস্থায় প্রলম্বিত করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেই সাধারণ রং-বার্নিশ (paint) তৈয়ারী হয়। সঙ্গে একটু তার্পিন তেল দিতে হয় ZnO, (সাদা) Pb_3O_4 (লাল) প্রভৃতি ধাতব অক্সাইড রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিক ঃ ফিনোল ও ফরম্যালডিহাইডের বিক্রিয়াতে সেলুলয়েড জাতীয় কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাদের বলা হয় প্লাস্টিক। Bakelite একটি বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক। প্লাস্টিকগুলি অদ্রাব্য এবং বিদ্যুৎ ও তাপ-পরিবাহিতা ইহাদের কম। এইজন্য আজকাল বহুরকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্লাস্টিক হইতে প্রস্তুত হয়। বর্তমানে প্লাস্টিক একটি বড় শিল্পে পরিণত হইয়াছে ফিনোল ছাড়াও অন্যান্য অনেক জৈব-যৌগ (যেমন, স্টাইরিন) হইতে বহু প্লাস্টিক এখন তৈয়ারী করা হয়।

প্রসাধন দ্রব্য ঃ স্নো, ক্রীম, সুগন্ধি প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যও জৈবজাতীয় যৌগ। গ্লিসারিন ও নানারকমের অ্যালকিল অ্যাসিডের সাহায্যে এগুলি প্রস্তুত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

একত্রিংশ অধ্যায়

ধাতুসমূহ

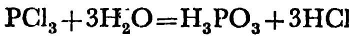
মৌলসমূহ ধাতু ও অ-ধাতু—এই দুই শ্রেণীর। এ পর্যন্ত যে সকল মৌলিক পদার্থের আলোচনা করা হইয়াছে, উহারা সকলেই অ-ধাতু। ধাতু ও অ-ধাতু এই দুই শ্রেণীর মৌলের ধর্মের খানিকটা বিভিন্নতা আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, ধাতুগুলি সাধারণতঃ তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী, দ্যুতিসম্পন্ন ও আলোকপ্রতিফলনক্ষম; পারদ ব্যতীত অন্যান্য সব ধাতুই সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় থাকে। ধাতুর ঘাতসহতা এবং প্রসার্যতাও অধিক হইয়া থাকে। অ-ধাতুসমূহের ভিতর এসকল লক্ষণ সচরাচর দেখা যায় না।

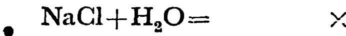
অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে ঐ সকল ধর্মের ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নহে। যেমন, গ্র্যাফাইট অ-ধাতু কিন্তু বিদ্যুৎ-পরিবাহী; হীরক অ-ধাতু কিন্তু আলোক-প্রতিফলনক্ষম; আয়োডিন অ-ধাতু হইলেও দ্যুতিসম্পন্ন; সোডিয়াম ধাতু হইলেও অত্যন্ত হাল্‌কা, উহার ঘনত্ব জলের চেয়েও কম; এবং অনেক অ-ধাতুও সাধারণ উষ্ণতায় কঠিনাকারে থাকে। অতএব উক্ত ধর্মগুলির দ্বারা কোন মৌলের সঠিক শ্রেণী-নির্ণয় সর্বদা সম্ভব নাও হইতে পারে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অনেক যৌগিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে পারে। দ্রবীভূত অবস্থায় এই সকল যৌগিক পদার্থ বিযোজিত হইয়া আয়নে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি এইরূপে পরা ও অপরা বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়নে পরিণত হয়। সর্বদাই দেখা গিয়াছে ধাতব আয়নগুলি পরাবিদ্যুৎযুক্ত এবং অ-ধাতব পরমাণুগুলি আয়নিত অবস্থায় অপরাবিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়াই ধাতু ও অ-ধাতুর শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। যে সকল মৌলের পরমাণু হইতে পরাবিদ্যুৎযুক্ত আয়নের উৎপত্তি হয় উহারা ধাতু, পক্ষান্তরে যে সব মৌলের পরমাণু অপরাবিদ্যুৎযুক্ত আয়নের উৎপত্তি করে উহারা অ-ধাতু। হাইড্রোজেনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অন্যান্য ধর্মবিচারে হাইড্রোজেন অ-ধাতু হইলেও উহার আয়ন পরাবিদ্যুৎসম্পন্ন।

এইজন্য হাইড্রোজেন ও ধাতব মৌলসমূহকে পরাবিদ্যুৎবাহী মৌল, এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অ-ধাতব মৌলকে অপরাবিদ্যুৎবাহী মৌল হিসাবে গণ্য করা হয়।

রাসায়নিক ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিলেও ধাতু ও অ-ধাতুর ভিতর খানিকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ধাতব অক্সাইডসমূহ ক্ষারজাতীয়, কিন্তু অ-ধাতব অক্সাইডগুলি সাধারণতঃ অম্লজাতীয়। অধিকাংশ ধাতুই খনিজ অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অ-ধাতব মৌলসমূহের সহিত অ্যাসিডের সক্রিয়তা যথেষ্ট কম। ধাতুগুলি হাইড্রোজেনের সহিত খুব কমই সংযুক্ত হয়, এবং হইলেও ঐ সকল হাইড্রাইড অস্থায়ী ধরণের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অ-ধাতব হাইড্রাইডগুলি বিশিষ্ট স্থায়ী যৌগিক পদার্থ হইয়া থাকে। অ-ধাতব ক্লোরাইডগুলি অনেক ক্ষেত্রে জলের দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া যায়, কিন্তু ধাতব ক্লোরাইডের অত সহজে আর্দ্রবিশ্লেষণ হয় না।


$$PCl_3+3H_2O=H_3PO_3+3HCl$$


$$NaCl+H_2O= \quad \times$$

তাড়িত রাসায়নিক বৈভব:

কোন একটি ধাতুকে যদি জলের সংস্পর্শে রাখা যায় তবে ধাতুর পরমাণুগুলি আয়নিত হইয়া দ্রবণে যাইতে চেষ্টা করে। জিঙ্ক হইতে জিঙ্কের আয়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জলের পরিবর্তে যদি ধাতুটিকে উহার নিজেরই আয়ন বর্তমান এরূপ কোন দ্রবণের সংস্পর্শে রাখা যায় তবে দুইটি বিপরীত বিক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থাৎ জিঙ্ক ধাতু যদি জিঙ্ক সালফেট দ্রবণের সংস্পর্শে আসে তবে একদিকে যেমন জিঙ্কধাতুর পরমাণুগুলি আয়নিত হওয়ার সম্ভাবনা অপরদিকে দ্রবণ হইতে জিঙ্ক আয়নগুলি আবার পরমাণুতে পরিণত হইয়া ধাতুর উপর জমিতে চেষ্টা করে।


$$Zn \rightleftarrows Zn^{++}+2e$$

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দ্রবণের জিঙ্ক আয়নের পরমাণুরূপে পরিন্যস্ত হওয়ার ক্ষমতা অপেক্ষা জিঙ্ক পরমাণুর আয়নিত হওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী, সুতরাং কিছু জিঙ্ক আয়নিত হইয়া পড়ে। সব ধাতুর এই ক্ষমতা একরূপ নহে। কপার ধাতু যদি কপার-সালফেট দ্রবণের সংস্পর্শে আসে তবে কপারের আয়নিত হওয়ার পরিবর্তে কপার আয়নের পরমাণু পরিন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রত্যেকটি ধাতুকে যদি তাহার নিজ নিজ আয়নের তুল্য দ্রবণের সংস্পর্শে রাখি, তবে বিভিন্ন ধাতুর এই আয়নিত হওয়ার ক্ষমতার একটা তুলনা সম্ভব হইতে পারে। [এক লিটার দ্রবণে এক গ্রাম আয়ন দ্রবীভূত থাকিলে, উহাকে তুল্য-দ্রবণ বলা হয়।] এখন, জিঙ্ক ধাতু যদি জিঙ্ক-সালফেটের তুল্য দ্রবণে রাখি, তবে আয়নিত হওয়ার অধিকতর ক্ষমতার জন্য উহা হইতে

কিঞ্চিৎ জিঙ্ক-আয়ন সৃষ্টি হইয়া দ্রবীভূত হইবে। ইহার ফলে, জিঙ্ক ধাতুটির উপরে অপরা-বিদ্যুৎভার বাড়িবে এবং এই অপরা-বিদ্যুৎ আর পরাবিদ্যুৎবাহী জিঙ্ক আয়নকে ছাড়িয়া যাইতে দিবে না। জিঙ্ক ধাতুটির উপর অপরা-বিদ্যুৎ থাকিবে এবং দ্রবণে থাকিবে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরা-বিদ্যুৎ। জিঙ্ক ও দ্রবণের ভিতর এইরূপে একটি তাড়িত বৈভবের সৃষ্টি হইবে। ইহাকে সচরাচর তাড়িত-রাসায়নিক বৈভব বলে।

এইরূপ, কপার যদি কপার লবণের দ্রবণের সংস্পর্শে আসে, তবে অধিকতর ক্ষমতার জন্য দ্রবণ হইতে কপার আয়ন ধাতুর উপর সামান্য জমিলেই, কপার ধাতুর উপর পরা-বিদ্যুৎভার সঞ্চারিত হইবে। এই পরাবিদ্যুৎ সমধর্মী কপার আয়নকে আর পরিন্যস্ত হইতে দিবে না। এখানেও তাড়িত-বৈভবের সৃষ্টি হইবে। কপার ধাতু পরাবিদ্যুৎবাহী এবং দ্রবণটি অপরাবিদ্যুৎবাহী হইবে। মাত্রিক দিক হইতে এই সকল বৈভব তুলনা করার জন্য হাইড্রোজেনকে মাপকাঠি লওয়া হইয়াছে। হাইড্রোজেন যদি H+ আয়নের তুল্য দ্রবণের সংস্পর্শে আসে তবে যে তাড়িত-বৈভবের সৃষ্টি হয় তাহাকে শূন্যমাত্রা ধরা হয়। এই মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন ধাতুর তাড়িত রাসায়নিক-বৈভব নিম্নরূপ :

তাড়িত রাসায়নিক-বৈভব শ্রেণী

ধাতু	বৈভব	ধাতু	বৈভব
K	−২·৯২	Ni	−০·২২
Na	−২·৭১	Sn	−০·১৪
Ba	−২·১৫	Pb	−০·১৩
Ca	−১·৮৭	H	০·০০
Mg	−১·৫৫	Cu	+০·৩৪৪
Al	−১·৬৭	Hg	+০·৭৯
Zn	−০·৭৫৮	Pt	+০·৮৬
Fe	−০·৪৪১	Ag	+·৭৯৯
Co	−০·২৯	Au	+১·৫

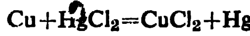
এই শ্রেণীতে যার স্থান যত উপরে, সেই ধাতুর আয়নিত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী। বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক ধর্মবিচারে এই বৈভব-শ্রেণীটির গুরুত্ব সমধিক। এই শ্রেণীতে বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী ধাতুর রাসায়নিক সক্রিয়তা নির্ধারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইল :—

(১) প্রতিস্থাপন ক্রিয়া : যদি একটুকরা লৌহ কপার-সালফেটের লবণের দ্রবণে রাখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই উহার উপর দ্রবণ হইতে কপার ধাতু জমিতে আরম্ভ হইবে এবং লৌহ দ্রবীভূত হইবে।



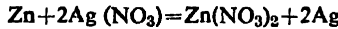
$$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$$

কিন্তু যদি কপার ধাতুর পাত ফেরাস-সালফেট দ্রবণে রাখি, কোনই পরিবর্তন হইবে না। আবার কপার ধাতুটিকে যদি মারকারি ক্লোরাইড দ্রবণে রাখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ উহার উপরে ধাতব মারকারি জমিতে সুরু হইবে। কিন্তু মারকারি কপার লবণের দ্রবণে রাখিলে কিছুই হইবে না।



$$Cu + HgCl_2 = CuCl_2 + Hg$$

অর্থাৎ বৈভব শ্রেণীতে যে ধাতুর স্থান উপরে সেইটি তাহার নিম্নস্থিত ধাতুকে উহার লবণ হইতে প্রতিস্থাপিত করিতে পারিবে। সেইজন্য কপার, সিলভার প্রভৃতি ধাতু সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক প্রভৃতিকে উহাদের লবণের দ্রবণ হইতে প্রতিস্থাপিত করিতে পারে না। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, সোডিয়াম, কপার প্রভৃতি ধাতু সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণ হইতে অতি সহজে সিলভারকে প্রতিস্থাপিত করিবে।



$$Zn + 2Ag\,(NO_3) = Zn(NO_3)_2 + 2Ag$$

(২) **অ্যাসিড ও জলের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন :** বৈভব শ্রেণীতে দেখা যায় কতকগুলি ধাতুর (যেমন, Cu, Hg, Ag) স্থান হাইড্রোজেনের নীচে। অতএব, পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী উপরস্থ ধাতুগুলির জল বা অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করা সহজ। কিন্তু কপার, সিলভার প্রভৃতি নিম্নস্থ ধাতুগুলি জল হইতে বা অ্যাসিড হইতে সহজে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিবে না। সেইজন্য জিঙ্ক বা আয়রন সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে সঙ্গে সঙ্গেই হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। কপার পারে না।

টিন, লেড, ব্যতীত হাইড্রোজেনের উপরস্থ সমস্ত ধাতুই জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। যে ধাতু যত বেশী পরাবিদ্যুৎবাহী অর্থাৎ উপরে স্থান পাইয়াছে, সেইটি তত সহজে জল হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিবে। সোডিয়াম জলের সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন গ্যাস হয়, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম আয়রন প্রভৃতি উচ্চতর উষ্ণতায় স্টীম হইতে হাইড্রোজেন দেয়।

(৩) **অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া :** যে ধাতু যত বেশী পরাবিদ্যুৎবাহী তাহার অক্সিজেনের প্রতি সক্রিয়তা তত বেশী। অর্থাৎ বৈভব শ্রেণীর অবস্থান অনুযায়ী এই সক্রিয়তা নির্ধারিত হইবে। পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি অক্সিজেন গ্যাসের সংস্পর্শে আসা মাত্র উহাদের দহন হয়। ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম উত্তপ্ত করিলে অক্সাইডে পরিণত হয়। আবার প্লাটিনাম, সিলভার প্রভৃতিকে অক্সাইডে পরিণত করা কষ্টসাধ্য। ফলে অধিকতর পরা-ধর্মী ধাতুগুলির অক্সাইডসমূহ খুব স্থায়ী এবং তাহাদের বিযোজন করা দুষ্কর। যথা, সোডিয়াম অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতিকে কার্বন দ্বারাও বিজারিত করিয়া ধাতু নিষ্কাশন করা যায় না, তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার হয়। পক্ষান্তরে, মারকারি, গোল্ড প্রভৃতির অক্সাইড সহজেই এমনকি সামান্য তাপ প্রয়োগেই বিযোজিত হইয়া থাকে।

ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়াতেও ধাতুগুলির একইরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩১-১। প্রকৃতিতে ধাতুর অবস্থান—কোন কোন ধাতু প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই পাওয়া যায় ; যেমন সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থরূপে থাকে। এই সকল যৌগিক পদার্থ নানা রকমের হইতে পারে। ইহাদের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) অক্সাইড—অ্যালুমিনিয়ম [বক্সাইট, Al_2O_3 $2H_2O$]
আয়রন [হেমাটাইট, Fe_2O_3] ইত্যাদি।

(২) কার্বনেট—ক্যালসিয়াম [চুনাপাথর, লাইমস্টোন, $CaCO_3$]
ম্যাগনেসিয়াম [ম্যাগনেসাইট, $MgCO_3$]

(৩) সালফাইড—মারকারি (পারদ) [সিনাবার, HgS]
লেড (সীসক) [গেলেনা, PbS]

(৪) সালফেট—ক্যালসিয়াম [জিপসাম, $CaSO_4$, $2H_2O$]

(৫) নাইট্রেট—সোডিয়াম [$NaNO_3$]

(৬) হালাইড—ক্যালসিয়াম [ফ্লুয়োস্পার, CaF_2]

(৭) সিলিকেট—ম্যাগনেসিয়াম [মাইকা, অভ্র, $KHMg_2Al_2(SiO_4)_3$]

(৮) ফসফেট—ক্যালসিয়াম [ফসফরাইট, $Ca_3(PO_4)_2$]

এই সকল স্বভাবজাত ধাতব যৌগপদার্থ প্রায়ই পাথর বা শিলারূপে কঠিন অবস্থায় থাকে। কখনো মাটির নীচে বা কখনো ভূপৃষ্ঠে ইহাদিগকে দেখা যায়। সচরাচর এই স্বভাবজাত অজৈব বস্তুগুলিকে আমরা খনিজ বলি। প্রকৃতিজাত পাথর বা শিলাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। উহাদের রাসায়নিক উপাদানগুলি সুনিয়ত। যেমন, বক্সাইট পাথরে সর্বদাই সোদক অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থাকে Al_2O_3, $2H_2O$। খনিজ বস্তুতে একাধিক যৌগ থাকাও সম্ভব। যেমন, কার্নালাইট KCl, $MgCl_2$, $6H_2O$; ক্রায়োলাইট, $3NaF$, AlF_3 ; ইত্যাদি।

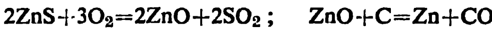
খনিজ পাথরের ভিতর আসল বস্তুটির সহিত অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, মাটি, বালু প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। খনিজের এই সকল মালিন্য বা অপদ্রব্যকে 'খনিজ-মল' (Gangue) বলা যাইতে পারে। খনিজ-মলের প্রকার ও পরিমাণ অবশ্য খনিজ পাথরের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন কোন সময় খনিজের ভিতর আসল বস্তু অপেক্ষা খনিজ-মলই অনেক বেশী থাকে।

যে সকল খনিজ হইতে কোন ধাতু নিষ্কাশন করা হয় সেই সকল খনিজ বস্তুকে সেই ধাতুর আকরিক (Ore) বলা হয়। অনেক সময় অবশ্য আকরিক

হইতে ধাতু-নিষ্কাশন বিশেষ সহজসাধ্য নয়। ব্যাপক অর্থে ধাতু বা ধাতুর কোন যৌগ মিশ্রিত সমস্ত স্বভাবজাত বস্তুকেই ঐ ধাতুর আকরিক বলিয়া ধরা হয়। সমুদ্র-লবণ সোডিয়ামের আকরিক, হেমাটাইট লৌহ-আকরিক, বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক ইত্যাদি।

৩১-২। ধাতু-নিষ্কাশন—স্বভাবজাত আকরিক হইতে ধাতুটি যে উপায়ে প্রস্তুত করা হয় তাহাকে ধাতু-নিষ্কাশন-প্রণালী বলে। ধাতু-নিষ্কাশন কার্যটি প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে সম্পন্ন করা হয়।

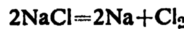
১। কোন কোন ক্ষেত্রে আকরিকসমূহকে তাপশক্তির সাহায্যে উচ্চ উষ্ণতায় বিযোজিত বা বিজারিত করিয়া ধাতুতে পরিণত করা হয়। তাপপ্রয়োগই এই সকল ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। লোহা, তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি এই উপায়ে উহাদের আকরিক হইতে প্রস্তুত করা হয়। উহাদের আকরিকগুলিকে প্রথমতঃ বাতাসে অত্যন্ত তাপিত করিয়া ধাতব অক্সাইডে পরিণত করা হয় এবং তৎপর সেই অক্সাইডকে বিজারিত করা হয়। সাধারণতঃ বিজারণ কার্যে কোক-কার্বন ব্যবহৃত হয়। যথা—



$$2ZnS + 3O_2 = 2ZnO + 2SO_2 ; \quad ZnO + C = Zn + CO$$

[জিঙ্ক-ব্লেণ্ড]

২। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাপ-প্রয়োগ দ্বারা আকরিকের বিয়োজন বা রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাহায্যে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। যথা, বিগলিত সোডিয়াম-ক্লোরাইড হইতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা সোডিয়াম প্রস্তুত করা হয়।



$$2NaCl = 2Na + Cl_2$$

অধিকতর পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন (Electropositive) ধাতুর অক্সিজেনের প্রতি আকর্ষণ সমধিক। ঐ সকল অক্সাইডকে কার্বন দ্বারা বিজারণ করা কষ্টসাধ্য, এইজন্য অধিকতর পরাবিদ্যুৎসম্পন্ন ধাতুসমূহ উহাদের যৌগ হইতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা উৎপাদন করা হয়।

৩১-৩। ধাতু-নিষ্কাশনের বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ :

গাঢ়ীকরণ (Concentration)—সমস্ত আকরিকেই অল্পবিস্তর খনিজ-মল থাকে। উহা হইতে ধাতু-নিষ্কাশন করার পূর্বে যথাসম্ভব খনিজ-মল দূরীভূত করিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে আকরিকের ভিতর প্রয়োজনীয় যৌগিক-পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে আকরিকের গাঢ়ীকরণ বলা হয়। বিভিন্ন আকরিকের গাঢ়ীকরণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। কখনো কখনো উহাকে বিচূর্ণ করিয়া ধৌত করিলেই খনিজ-মল অনেকাংশে দূরীকৃত হয়। আবার কখনো তেল ও জলের মিশ্রণে বিচূর্ণ আকরিক দিয়া উহার ভিতর বায়ু পরিচালনা করিলে খনিজ-মল পৃথক হইয়া যায়। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বিত হয়।

ইহা ছাড়া, তাপ-প্রয়োগে যে সমস্ত ধাতু-নিষ্কাশন কার্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়। যথা:—

(১) ভস্মীকরণ (Calcination)—অনেক আকরিকই প্রথমে বিশেষ রূপে তাপিত করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে আকরিকে উদ্বায়ী পদার্থ যদি কিছু থাকে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। ফলে খনিজটি অপেক্ষাকৃত ফাঁপা ও সচ্ছিদ্র হয় এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে ভস্মীকরণ বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় অবশ্য খনিজটিকে গলানো হয় না।

(২) তাপ-জারণ (Roasting)—অনেক সময়েই আকরিকটিকে বাতাসে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহাকে ধাতব অক্সাইডে পরিণত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়। অবশ্য এই প্রক্রিয়াতে আকরিকটিকে গলিতে দেওয়া হয় না। এইরূপ বাতাসে তাপিত করিয়া জারিত করাকে আকরিকের তাপ-জারণ বলা হয়।

(৩) বিগলন (Smelting)—অতিরিক্ত উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রায়ই চুল্লীর ভিতর বিগলিত অবস্থায় ধাতুটি উৎপন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু বিগলিত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে বিগলন-প্রণালী (Smelting Process) বলে। তড়িৎ-বিশ্লেষণেও অনেক সময় ধাতুটি বিগলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাকে বিগলন বলা হয় না।

বিগলিত ধাতু হইতে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে সহজে গলিয়া পৃথক হইয়া যায় সেই-জন্য কতকগুলি বস্তু প্রায়ই চুল্লীতে আকরিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই পদার্থগুলি আকরিকের অন্তর্ভুক্ত অপদ্রব্যগুলির সহিত সংযুক্ত হয় এবং উহাকে গলাইয়া পৃথক করিয়া ফেলে। এই পদার্থগুলিকে **বিগালক (Flux)** বলে। বিগালক ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের সংযোগে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাকে **ধাতু-মল (Slag)** বলা হয়। যেমন কোন আকরিকের ধাতু-নিষ্কাশনের সময় বালু (SiO_2) থাকিলে উহাতে বিগালক হিসাবে কিছু চুন মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। কারণ SiO_2 সহজে গলে না বা পৃথক করা যায় না, কিন্তু চুন সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়া ক্যালসিয়াম সিলিকেটে পরিণত হয়। উহা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় গলিয়া ধাতু-মল হিসাবে পৃথক হইয়া যায়।

ক্ষার-ধাতু: সর্বাধিক পরাবিদ্যুৎগুণসম্পন্ন লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম—এই পাঁচটি ধাতুকে ক্ষারধাতু বলা হয়। এই ধাতু কয়টি সোজাসুজি জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার উৎপন্ন করে; সেই জন্যই এই নামকরণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, কস্টিক সোডা, কস্টিক পটাস প্রভৃতি তীক্ষ্ণক্ষার বিযোজিত করিয়াই এই ধাতুগুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই ধাতু কয়টির নিজেদের ভিতরেও অনেক সাদৃশ্য আছে। এই পাঁচটির মধ্যে সোডিয়ামের পরিমাণই পৃথিবীতে বেশী।

সোডিয়াম

চিহ্ন, Na পারমাণবিক গুরুত্ব, ২৩ ক্রমাঙ্ক ১১

৩১-৪। অত্যধিক সক্রিয়তার জন্য মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে সোডিয়াম পাওয়া যায় না। উহার যে সকল যৌগ পাওয়া যায় তাহাদের প্রধান কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(১) সোডিয়াম ক্লোরাইড, (খাদ্যলবণ), NaCl ; সমুদ্রের জলে এবং লবণের খনি হইতে।

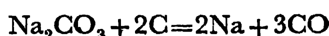
(২) সোডিয়াম নাইট্রেট, (চিলি-শোরা), $NaNO_3$, চিলির সমুদ্র-উপকূলে।

(৩) সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3। মাটি ও বালুকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা থাকে। মিশরে ইহাকে ট্রোনা (Trona) ও ভারতে ইহাকে সাজিমাটি বলে।

(৪) সোডিয়াম পাইরোবোরেট, (বোরাক্স বা সোহাগা), $Na_2B_4O_7$। তিব্বত, হিমালয় অঞ্চল ও সিংহলে পাওয়া যায়।

(৫) সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট বা সোডা-ফেল্ডস্পার, $NaAlSi_3O_8$। ইহা এক প্রকার খনিজ পাথর, বহু পাহাড়েই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

৩১-৫। **সোডিয়াম প্রস্তুতি**—পরাবিদ্যুৎবাহী মৌলসমূহের ভিতর সোডিয়াম অন্যতম, সুতরাং অক্সিজেন বা অন্যান্য অ-ধাতুর প্রতি উহার আসক্তিও সমধিক। এই কারণে উহার অক্সাইড বা অন্য কোন লবণকে উত্তপ্ত করিয়া কার্বন প্রভৃতি বিজারক সাহায্যে বিশ্লেষিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তবে অসম্ভব নহে।



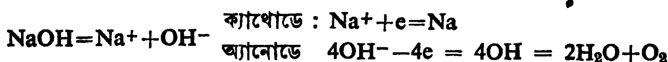
$$Na_2CO_3+2C=2Na+3CO$$

কাছ্‌নারের (Castner) প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে কস্টিকসোডার তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা সোডিয়াম প্রস্তুত করা হয়। অধুনা কোন কোন দেশে খাদ্যলবণের (NaCl) তড়িৎ-বিশ্লেষণ সাহায্যেও ধাতুটি উৎপাদন করা হইতেছে।

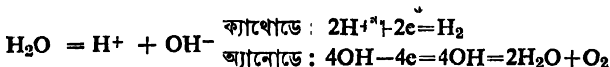
৩১-৬। **কাছ্‌নার পদ্ধতি (Castner Process)**—দুইটি তড়িৎদ্বারের সাহায্যে গলিত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিলে উহা বিশ্লেষিত হইয়া ক্যাথোডে সোডিয়াম ও হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। $2NaOH=2Na+H_2+O_2$

গলিত কস্টিকসোডা বিদ্যুৎ-পরিবাহী এবং উহাতে Na^+ আয়ন এবং OH^- আয়ন থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ দিলে, এই আয়নগুলি তড়িৎ-দ্বারে গিয়া উহাদের

আধান হইতে মুক্তি লাভ করে এবং নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণটি সংঘটিত হইয়া থাকে :—

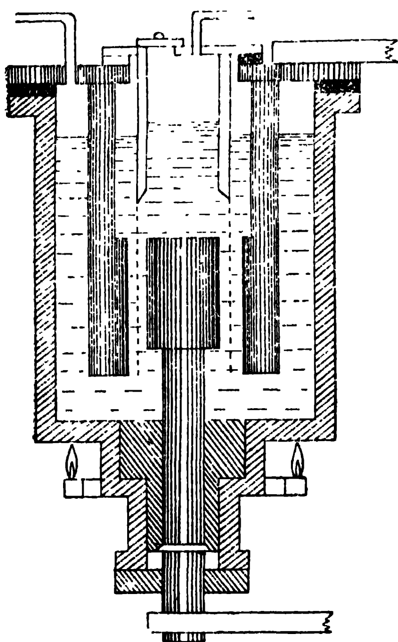


$NaOH = Na^+ + OH^-$ ক্যাথোডে : $Na^+ + e = Na$
অ্যানোডে $4OH^- - 4e = 4OH = 2H_2O + O_2$



$H_2O = H^+ + OH^-$ ক্যাথোডে : $2H^+ + 2e = H_2$
অ্যানোডে : $4OH - 4e = 4OH = 2H_2O + O_2$

অর্থাৎ ক্যাথোডে সোডিয়াম ও অ্যানোডে OH যৌগমূলক উৎপন্ন হয়। কিন্তু OH মূলকের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, সুতরাং উহা জল ও অক্সিজেনে পরিণত হইয়া যায়। অ্যানোডে উৎপন্ন জল অতঃপর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন ক্যাথোড এবং অক্সিজেন অ্যানোড হইতে পাওয়া যায়।



চিত্র ৩১ক—সোডিয়াম প্রস্তুতি (কাষ্‌নার পদ্ধতি)

গলিত কস্টিকসোডার পরিবর্তে কস্টিকসোডার জলীয় দ্রবণ হইতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা সোডিয়াম পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ক্যাথোডে সোডিয়াম উৎপন্ন হওয়ামাত্র জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে উহা পুনরায় কস্টিকসোডাতে পরিণত হইয়া যাইবে।

ঢালাই লোহার তৈয়ারী ছোট ছোট গোলাকার ট্যাঙ্কে কস্টিক সোডার তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্পাদিত হয়। কস্টিকসোডা গলিত অবস্থায় রাখার জন্য ট্যাঙ্কের নীচে গ্যাস-দীপ জ্বালিয়া উহাকে তাপিত করা হয়। ট্যাঙ্কটির নীচের অংশটি একটি প্রশস্ত নলের আকারে প্রসারিত। এই নলের ভিতর একটি লোহার ক্যাথোড প্রায় ট্যাঙ্কের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে (চিত্র ৩১ক)। ক্যাথোডের উপরের অংশ-টুকু অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত থাকে। গলিত কস্টিকসোডা নীচের নলের ভিতরে গিয়া

শীতল হইয়া জমিয়া যাওয়ার ফলে ক্যাথোডটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রাখার কোন অসুবিধা হয় না। ক্যাথোডটিকে বেষ্টন করিয়া উহার কিছুদূরে একটি নিকেলের দৃঢ় পাত উপর হইতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহা অ্যানোডের কাজ করে। ট্যাঙ্কের অন্যান্য অংশ হইতে অ্যানোড ও ক্যাথোড অবশ্যই অন্তরিত (insulated) অবস্থায় থাকে। ক্যাথোডের অব্যবহিত উপরে একটি গোলাকার লৌহপাত্র থাকে। উহার নীচের দিকটা খোলা, এবং উপরের দিকে গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য একটি নির্গমদ্বার আছে। এই পাত্রটির নিম্নপ্রান্ত হইতে একটি লোহার তারজালি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তারজালিটি অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে অবস্থিত থাকে। উৎপন্ন সোডিয়াম যাহাতে অ্যানোডের দিকে বিস্তৃত না হয়, সেইজন্য এই তারজালিটির প্রয়োজন। ইহা সোডিয়ামের বিস্তৃতিতে বাধা দেয়। সম্পূর্ণ ক্যাথোডটি এবং অ্যানোডেরও অধিকাংশ গলিত কস্টিকসোডাতে নিমজ্জিত থাকে। অতঃপর ক্যাথোড ও অ্যানোডটি যথারীতি ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া গলিত কস্টিকসোডার ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়।

সোডিয়াম গলিত অবস্থায় লোহার ক্যাথোডে উৎপন্ন হয় এবং কস্টিকসোডা হইতে হাল্‌কা বলিয়া উপরের লোহার পাত্রে ভাসিয়া ওঠে। সোডিয়ামের সঙ্গে হাইড্রোজেনও উৎপন্ন হয় এবং উহা সোডিয়ামের ভিতর দিয়া বুদ্‌বুদের আকারে উঠিতে থাকে এবং পাত্রটির উপরে নির্গমদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইজন্য উৎপন্ন সোডিয়াম সর্বদাই হাইড্রোজেন গ্যাসে আবৃত থাকে। বাহিরের বাতাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার উহার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যথেষ্ট পরিমাণ সোডিয়াম সঞ্চিত হইলে, ঝাঁঝরা চামচের সাহায্যে উহা তুলিয়া লইয়া কেরোসিনের ভিতরে রাখা হয়। অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং একটি নির্গম-নলের ভিতর দিয়া উহা বাহির হইয়া যায়।

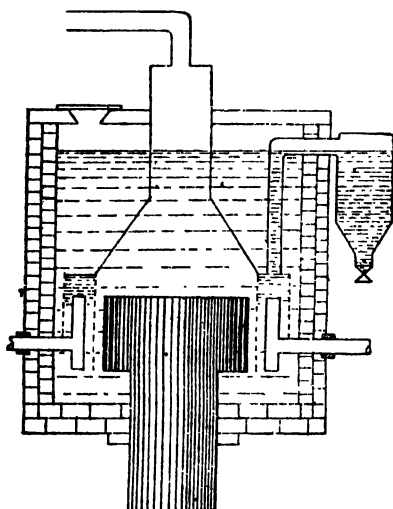
কাষ্‌নার পদ্ধতিতে সহজেই সোডিয়াম পাওয়া যায় এবং বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই এই পদ্ধতিটির সমাদর হইয়াছে। কিন্তু ইহার কতকগুলি অসুবিধাও আছে, ইহাতে যে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যয় হয় তাহার মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ সোডিয়াম প্রস্তুতিতে প্রয়োজন, অপরাংশ জল-বিশ্লেষণের জন্য অপব্যয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কস্টিকসোডা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। উহা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; সুতরাং কাঁচামালের মূল্য অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে বহুকাল যাবৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎবিশ্লেষণ দ্বারা সোডিয়াম প্রস্তুতির প্রচেষ্টা চলিতেছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড

প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করে নাই।

(১) সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক ৮১৫° সেন্টি। সুতরাং উহাকে গলান বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য। (২) অধিক উষ্ণতায় গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং বিক্রিয়াজাত সোডিয়াম এবং ক্লোরিন—ইহারা সকলেই পাত্র এবং ক্যাথোড ইত্যাদি আক্রমণ করে। (৩) উৎপন্ন সোডিয়ামের অধিকাংশ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত মিশিয়া কলয়েডে পরিণত হয়। সেই সোডিয়াম উদ্ধার করা দুরূহ। (৪) সোডিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক ৮৮৩° সেন্টি। এই জন্য ৮০০° সেন্টিগ্রেডে উহার যথেষ্ট উদ্বায়িতা পরিলক্ষিত হয়, এবং এই উষ্ণতায় অনেকটা সোডিয়াম বাষ্পীভূত হইয়া যায়।

অধুনা সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে সোডিয়াম প্রস্তুত করার একটি বিশেষ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

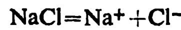
৩১-৭। ডাউনস্ পদ্ধতি (Downs' Process) :—সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত উহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রণটিকে একটি লোহার ট্যাঙ্কে প্রথমে তাপ-প্রয়োগে গলান হয়, পরে অবশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যেই উহাকে গলিত অবস্থায় রাখা যায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত মিশ্রিত থাকার ফলে উহা ৬০০°-৬২০° সেন্টিগ্রেডেই বিগলিত হইয়া যায়। এইভাবে প্রায় ২০০° ডিগ্রী উষ্ণতা কমিয়া যাওয়াতে শুধু সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষণের অসুবিধা বহুলাংশে দূরীকৃত হয়। এই জন্যই, সোডিয়াম প্রস্তুতি হইয়াছে।



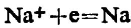
চিত্র ৩১খ—সোডিয়াম প্রস্তুতি (ডাউনস্ পদ্ধতি)

ট্যাঙ্কের নীচ হইতে একটি প্রশস্ত গ্র্যাফাইট কার্বন অ্যানোড হিসাবে ভিতরে প্রবেশ করান থাকে। অ্যানোডটি বেষ্টন করিয়া উহা হইতে কিছু দূরে একটি

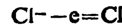
বৃত্তাকার শক্ত লোহার পাত ক্যাথোড হিসাবে রাখা হয়। সমস্ত ক্যাথোডের উপর অংশটুকু একটি ঢাকনার সাহায্যে আবৃত থাকে। ক্যাথোডের উপর এই ঢাকনার ভিতরে উৎপন্ন সোডিয়াম সঞ্চিত হয় (চিত্র ৩১ খ)। অ্যানোডের ঠিক উপরে পর্সেলীন বা অগ্নিসহ মৃত্তিকায় তৈয়ারী একটি বড় গম্বুজাকৃতি ঢাকনা থাকে। ইহার ভিতরে বিশ্লেষণজাত ক্লোরিন সঞ্চিত হয় এবং উপরের একটি নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে একটি সরু তারজালি রাখা হয়; যাহাতে ক্যাথোডের নিকট হইতে সোডিয়াম সহজে অ্যানোডের দিকে না আসিতে পারে। তড়িৎ-দ্বার দুইটি যথারীতি একটি ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া গলিত লবণের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। উপযুক্ত রূপ বিদ্যুৎ-চাপ রাখিলে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিলে, কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইবে।



$$NaCl = Na^+ + Cl^-$$



$$Na^+ + e = Na$$
[ক্যাথোডে]



$$Cl^- - e = Cl$$
$$Cl + Cl = Cl_2$$ [অ্যানোডে]



অর্থাৎ $2NaCl = 2Na + Cl_2$

গলিত সোডিয়াম ধাতু ক্যাথোডের উপরের ঢাকনার নীচে সঞ্চিত হয়। যথেষ্ট পরিমাণ সোডিয়াম জড় হইলে সেখান হইতে একটি সাইফন নলের সাহায্যে উহা বাহিরের একটি কেরোসিন-পূর্ণ পাত্রে চলিয়া যায়। অ্যানোডে যে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়, উহা পর্সেলীনের ঢাকনার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে।

৩১-৮। সোডিয়ামের ধর্মঃ—(১) সোডিয়াম অত্যন্ত নরম, রূপার মত উজ্জ্বল সাদা ধাতু। উহাকে একটি ছুরির দ্বারাই কাটা যায়। উহার ঘনত্ব ০·৮৩৪, গলনাঙ্ক ৯৮° সেন্টি. এবং স্ফুটনাঙ্ক ৮৮৩° সেন্টি.। ইহার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যথেষ্ট।

(২) সোডিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির সহিত ক্রিয়া করে। সেইজন্যই সাধারণতঃ সোডিয়ামের উজ্জ্বল সাদা রঙটি দেখা যায় না। সোডিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি দ্বারা উহার বহির্ভাগ আবৃত থাকে। $4Na + O_2 = 2Na_2O$

(৩) জলের সংস্পর্শে সোডিয়াম আসিলেই উহা তৎক্ষণাৎ কস্টিকসোডাতে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$

সুতরাং সোডিয়ামকে জল ও বায়ু হইতে পৃথক রাখা প্রয়োজন। এই কারণেই উহাকে কেরোসিনের ভিতর রাখা হয়।

(৪) উত্তপ্ত সোডিয়াম অক্সিজেন গ্যাসে উজ্জ্বল সোনালী আলো সহকারে জ্বলে এবং সোডিয়াম অক্সাইড ও পার-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে।



$$4Na+O_2=2Na_2O \qquad 2Na+O_2=Na_2O_2$$

(৫) ক্লোরিনের সংস্পর্শে আসিলেও সোডিয়াম প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। $2Na+Cl_2=2NaCl$

অন্যান্য হ্যালোজেন এবং অনেক অ-ধাতুর সহিতও সোডিয়াম সোজাসুজি যুক্ত হয়।

(৬) হাইড্রোজেন গ্যাসে সোডিয়াম উত্তপ্ত করিলে সোডিয়াম হাইড্রাইড পাওয়া যায়। $2Na+H_2=2NaH$

(৭) উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত সোডিয়াম কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতিকে বিযোজিত করিয়া দেয়।



$$4Na+3CO_2=2Na_2CO_3+C \qquad 2NO+4Na=2Na_2O+N_2$$

সোডিয়ামের ব্যবহার ঃ—সোডিয়াম পার-অক্সাইড, সোডিয়াম সায়নাইড প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সোডিয়াম ধাতুর প্রয়োজন হয়। কোন কোন কৃত্রিম রবার উৎপাদনেও সোডিয়াম দরকার। জৈবজাতীয় যৌগ-পদার্থের বিশ্লেষণে সোডিয়াম ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম একত্র মিশ্রিত করিলে যে ধাতুসংকর পাওয়া যায় উহা অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণতাতেও তরল থাকে বলিয়া থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয়। সোডিয়ামের পারদসংকর (amalgam) জল বা কোহলের সহিত মিশ্রিত করিলে জায়মান হাইড্রোজেন পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং বিজারক হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয়।

৩১-৯। ধাতুসংকর (Alloys)—অনেক সময় একাধিক ধাতু বিগলিত অবস্থায় মিশ্রিত করিয়া শীতল করিলে একটি সমসত্ত্ব কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। ধাতুর এইরূপ মিশ্রণকে ধাতুসংকর বলে। যথা ঃ—তামা এবং টিন গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা করিলে কাঁসা পাওয়া যায়। সেইরূপ তামা ও দস্তার মিশ্রণে পিতল প্রস্তুত হয়। কাঁসা, পিতল—এইসব ধাতুসংকর। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য নানারকম ধাতুসংকর প্রস্তুত করা হয়। কারণ ধাতুসংকরের রঙ ও অন্যান্য অনেক ধর্ম উহাদের উপাদানগুলির ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। যেমন, কাঠিন্য, প্রসার্যতা, নমনীয়তা প্রভৃতি বৃদ্ধি করার জন্য লোহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি অনেক রকম ধাতু মিশ্রিত করা হয়। অবশ্য সব সময়েই যে কোন দুইটি গলিত

ধাতু মিশাইলে ধাতুসংকর পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। যেমন, গলিত সীসার সহিত গলিত দস্তা মিশাইলেও ঠাণ্ডা করার সঙ্গে সঙ্গে উহারা পৃথক পৃথক ঘনীভূত হয়। খুবই স্বল্প পরিমাণ দস্তা সীসাতে দ্রবীভূত থাকে।

পারদের ভিতর প্লাটিনাম জাতীয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধাতুই প্রায় দ্রবীভূত হইয়া থাকে। পারদের সহিত অন্য ধাতুর সংকরকে সচরাচর পারদসংকর বলা হয়। ইংরেজীতে ইহাদের নামই অ্যামালগাম।

সোডিয়ামের যৌগসমূহ

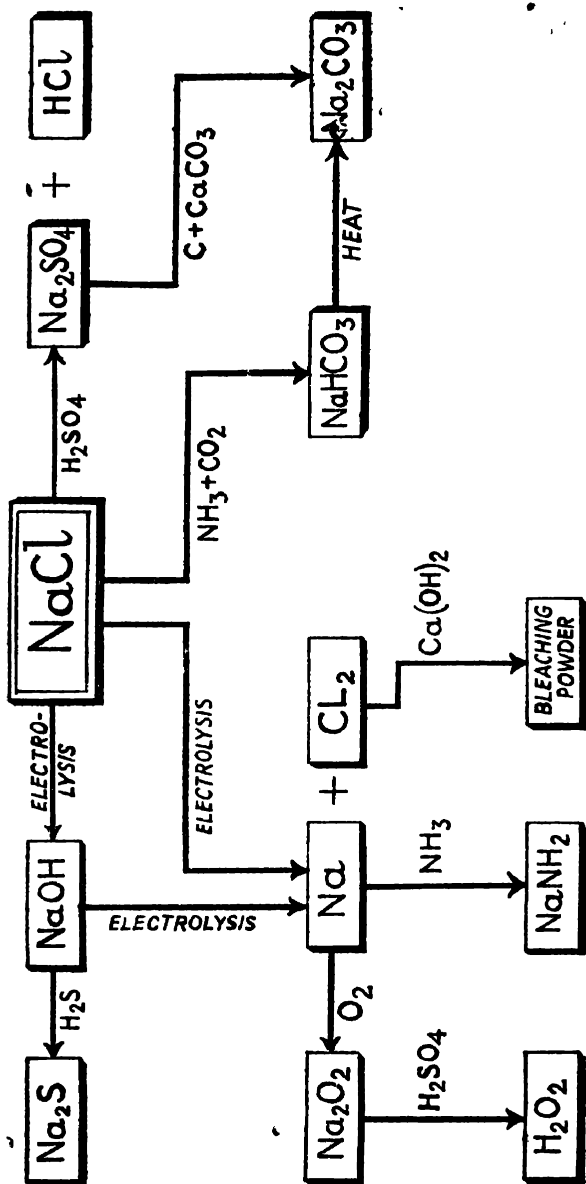
সোডিয়ামের নানা রকম যৌগের ভিতর সোডিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রক্সাইড, কার্বনেট ও সালফেট বিশেষ ব্যবহৃত। উহাদের বিষয় শুধু এখানে আলোচনা করা হইবে।

৩১-১০। সোডিয়াম ক্লোরাইড, খাদ্যলবণ, NaCl—প্রকৃতিতে প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সমুদ্রজলে গড়ে শতকরা প্রায় ২·৮ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। ইহা ছাড়া লবণের খনিতেও প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ খাদ্যলবণই সমুদ্রজল হইতে তৈয়ারী করা হয়। খেওড়া ও কলাবাগের লবণখনি হইতেও লবণ সংগৃহীত হয়। রাজপুতানার সম্বর হ্রদের লবণও ব্যবহৃত হয়।

নানা কারণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের চাহিদা খুব বেশী। খাদ্যলবণ হিসাবেই উহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সোডিয়াম, কস্টিকসোডা, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড অবশ্য প্রয়োজনীয়। মাটির বাসনের উপর চিক্কণলেপ দিতেও সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়।

খাদ্যলবণ প্রস্তুতি—ভারতবর্ষ, চীন, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রধানতঃ সমুদ্রজল হইতেই খাদ্যলবণ উৎপাদন করা হয়। অগভীর কিন্তু খুব প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে সমুদ্রজল রাখিয়া দেওয়া হয়। সূর্যকিরণের তাপে উহার জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইতে থাকে এবং দ্রবণটি যখন যথেষ্ট গাঢ় হয় তখন উহা হইতে সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হয়। ইহা সংগ্রহ করিয়া খাদ্যলবণরূপে ব্যবহৃত



খাদ্য-লবণ-জাত নানাবিধ যৌগ

হয়। খাদ্যলবণ সংগ্রহ করার পর যে শেষদ্রব পড়িয়া থাকে তাহাকে "বিটার্ণ" (Bittern) বলে এবং উহা হইতে ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব।

শীতপ্রধান, বিশেষতঃ হিমমণ্ডলের নিকটস্থ, দেশে সূর্যকিরণের প্রাচুর্য ও তীব্রতা কম। এইজন্য এই সকল দেশে আজকাল সমুদ্রজলকে শীতলীকৃত করিয়া উহাকে আংশিকভাবে কঠিন বরফে পরিণত করা হয় এবং এই বরফ পৃথক করিয়া লইয়া সমুদ্রজল গাঢ় করা হয়। এই ভাবে সম্পৃক্ত হইলে সমুদ্রজল হইতে খাদ্যলবণ কেলাসিত হয়।

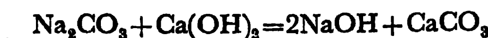
যে সমস্ত খনিতে মাটির নীচে খাদ্যলবণ আছে, সেখানে পাম্পের সাহায্যে নীচে জল লইয়া গিয়া উহাকে দ্রবীভূত করিয়া উপরে আনা হয় এবং সেই দ্রবণ হইতে খাদ্যলবণ কেলাসিত করিয়া লওয়া হয়।

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুতি—বিশুদ্ধ অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইড পাইতে হইলে সাধারণ খাদ্যলবণের গাঢ় জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পরিচালিত করা হয়। ইহাতে বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ফটিক কেলাসিত হইয়া আসে।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ধর্ম ও ব্যবহার—বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। সাধারণ খাদ্যলবণ বাতাসে রাখিয়া দিলে উহা বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়। কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড বস্তুতঃ উদ্‌গ্রাহী নয়। খাদ্যলবণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত কিছু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড থাকে, সেইজন্যই উহা জল আকর্ষণ করিয়া গলিতে থাকে।

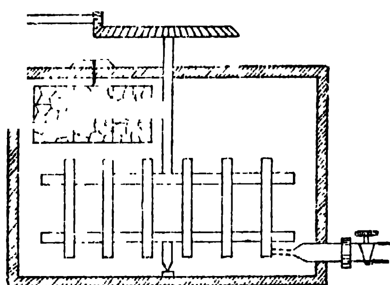
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, কস্টিকসোডা, NaOH : ইহার প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি আছে।

৩১-১১। ক্ষারীকরণ পদ্ধতি (Causticising Process)—অতিরিক্ত পরিমাণ চুনের সহিত সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বনেট গরম করিলে কস্টিকসোডা পাওয়া যায়। সোডা একটি মৃদু ক্ষার, কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অত্যন্ত বিদাহী তীক্ষ্ণ ক্ষার। মৃদু ক্ষার এইরূপ তীক্ষ্ণ ক্ষারে পরিণত হয় বলিয়া এই পদ্ধতিটিকে "ক্ষারীকরণ" বলা হয়।



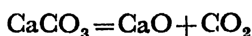
$$Na_2CO_3+Ca(OH)_2=2NaOH+CaCO_3$$

একটি লোহার চতুষ্কোণ ট্যাঙ্কে সোডার লঘুদ্রবণ (২০%) লওয়া হয়। একটি তারজালির বাক্সে কলিচুন ভরিয়া, বাক্সটি সোডার দ্রবণে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। চুন জলের সহিত মিশিয়া ফুটিতে থাকে। যন্ত্র-চালিত আলোড়ক সাহায্যে ফুটান চুন (Slaked lime) সোডার দ্রবণের সহিত উত্তমরূপে মিশান হয়। বিক্রিয়াটি সহজে নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনানুরূপ স্টীম ট্যাঙ্কের ভিতর পরিচালিত করা হয়, যাহাতে দ্রবণের উষ্ণতা মোটামুটি ৮০°-৯০° সেন্টি. থাকে [চিত্র ৩১ গ]। বিক্রিয়াশেষে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট থিতাইয়া যায় এবং উপর হইতে কস্টিকসোডার লঘু দ্রবণ আস্রাবণ করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর অনুপ্রেষপাতন সাহায্যে উহার জলীয় অংশ যথাসম্ভব বাষ্পীভূত করিয়া দেওয়া হয়।



চিত্র ৩১গ—ক্ষারীকরণ পদ্ধতিতে কস্টিকসোডা

দ্রবণে যখন কস্টিকসোডার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হয় তখন উহাকে উন্মুক্ত লোহার কড়াইতে উত্তপ্ত করিয়া বিশুষ্ক করা হয় এবং গলিত কস্টিক সোডাকে যষ্টির আকারে ঢালাই করা হয়। উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়, উহাকে চুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন পাওয়া যায়। এই চুন পুনরায় ক্ষারীকরণে ব্যবহৃত হয়।

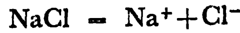


$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

এই পদ্ধতিতে যে কস্টিকসোডা পাওয়া যায়, ইহা খুব বিশুদ্ধ নহে। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে কস্টিকসোডা প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচামাল হিসাবে মোটামুটি বিশুদ্ধ সোডার প্রয়োজন। উহা প্রকৃতিতে খুব বেশী পাওয়া সম্ভব নয়, প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় ; সুতরাং কাঁচামালের মূল্য অধিক। এই সকল কারণে বর্তমানে সহজলভ্য সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা কস্টিকসোডা উৎপাদন করার পদ্ধতিই প্রচলিত।

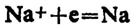
৩১-১২। তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Electrolytic Process)—সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণে ক্যাথোডে সোডিয়াম উৎপন্ন হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উহা জলের সহিত ক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন ও কস্টিক-সোডার্তে পরিণত হয়। অ্যানোডে অবশ্য ক্লোরিন উৎসারিত হয়।

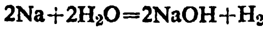


$$NaCl = Na^{+} + Cl^{-}$$

ক্যাথোডে :—



$$Na^{+} + e = Na$$



$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

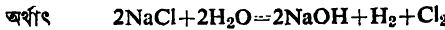
অ্যানোডে :—



$$Cl^{-} - e = Cl$$



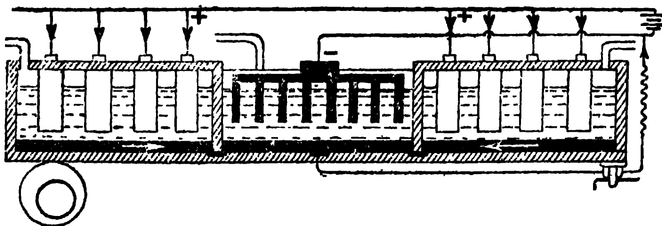
$$Cl + Cl = Cl_2$$



অর্থাৎ $$2NaCl + 2H_2O = 2NaOH + H_2 + Cl_2$$

তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির ইহাই মূলকথা। কিন্তু সাধারণতঃ এই বিশ্লেষণটি করিতে গেলে উৎপন্ন ক্লোরিন কস্টিকসোডার সহিত খানিকটা বিক্রিয়া করে এবং উহার কতকাংশ হাইপোক্লোরাইট বা ক্লোরেট লবণে পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে কস্টিকসোডার অপচয় ঘটে এবং বিশুদ্ধ ক্ষার পাওয়া যায় না। যাহাতে উৎপন্ন ক্লোরিন কস্টিকসোডার সংস্পর্শে না আসিতে পারে সেইজন্য পৃথক প্রকোষ্ঠে উহাদের উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা হয়। কস্টিকসোডা উৎপাদনে সাধারণতঃ দুই প্রকারের বৈদ্যুতিক সেল (cell) ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—(১) পারদ সেল : (২) মধ্যাবরক (Diaphragm) সেল। নানা রকমের পারদ সেল ও মধ্যাবরক সেলের প্রচলন আছে, তন্মধ্যে দুই একটির বিষয় এখানে বিবৃত করা হইল।

৩১-১৩। পারদ সেলঃ কাছ্‌নার-কেল্‌নার পদ্ধতি (Castner-Kellner cells)—এই পদ্ধতিতে শ্লেটের তৈয়ারী প্রশস্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগভীর ট্যাঙ্কে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। ট্যাঙ্কের



চিত্র ৩১ঘ—কাছ্‌নার-কেল্‌নার সেল

আয়তন মোটামুটি ৬′ × ৪′ এবং উচ্চতা ৬″ ইঞ্চি। ট্যাঙ্কের মেঝেটি প্রায় ⅛″ ইঞ্চি পুরু পারদ দ্বারা আবৃত থাকে। প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ক দুইটি শ্লেটের প্রাচীর দ্বারা তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে। এই প্রাচীর দুইটি কিন্তু মেঝে পর্যন্ত পৌঁছায় না, মেঝে

হইতে প্রায় $\frac{1}{16}$" ইঞ্চি উপরে পারদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। ফলে অনায়াসেই পারদ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল করিতে পারে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠ দুইটিতে পারদের উপরে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ অথবা লবণোদক (Brine) লওয়া হয়। মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠে জল থাকে। কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড বাহিরের প্রকোষ্ঠের লবণোদকে নিমজ্জিত রাখিয়া অ্যানোড রূপে ব্যবহার করা হয়। ক্যাথোড হিসাবে কয়েকটি লৌহশলাক মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠের জলে উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত ট্যাঙ্কটি অবশ্যই আবৃত রাখা হয় এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই উপরের দিকে গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য নির্গম-নল থাকে। ট্যাঙ্কের নীচে এক প্রান্তে একটি অসমকেন্দ্রী চাকা লাগান থাকে। উহার সাহায্যে এই প্রান্তটি ধীরে ধীরে উঁচু ও নীচু করা যায়। ইহাতে এক প্রকোষ্ঠের পারদ অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল করিতে পারে, কিন্তু জল বা লবণোদক উহাদের প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে পারে না (চিত্র ৩১ ঘ)।

গ্র্যাফাইট অ্যানোড ও লোহার ক্যাথোড যথারীতি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দিলে দ্রবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। ব্যাটারী হইতে গ্র্যাফাইট তড়িৎ-দ্বার সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। লবণোদকের ভিতর দিয়া উহা মেঝের পারদে উপনীত হয়। পারদ বাহিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মধ্যপ্রকোষ্ঠের জলে সঞ্চারিত হয় এবং পরিশেষে লোহার ক্যাথোডের সাহায্যে ব্যাটারীতে ফিরিয়া যায়। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠই একটি বৈদ্যুতিক সেলের কাজ করে। বাহিরের প্রকোষ্ঠগুলিতে গ্র্যাফাইট অ্যানোড ও পারদ ক্যাথোড এবং মধ্যপ্রকোষ্ঠে পারদই অ্যানোড ও লোহা ক্যাথোড। বিদ্যুৎ-পরিচালনার ফলে বহিঃপ্রকোষ্ঠের লবণ বিশ্লেষিত হইয়া গ্র্যাফাইটে ক্লোরিন ও পারদে সোডিয়াম উৎপন্ন হয়। ক্লোরিন নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। উৎপন্ন সোডিয়াম পারদের সহিত মিশিয়া পারদ-সংকরের সৃষ্টি করে। নীচের চাকাটি ঘোরানোর ফলে সমস্ত ট্যাঙ্কটি একবার উঁচু ও একবার নীচু হইয়া দুলিতে থাকে। ফলে পারদ-সংকর বাহিরের প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যপ্রকোষ্ঠে চলিয়া আসে। এখানে জলের সংস্পর্শে আসিয়া সোডিয়াম কস্টিকসোডা ও হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। হাইড্রোজেন লোহার ক্যাথোডে নির্গত হয় ও উপরের নল দিয়া বাহিরে যাইতে পারে। যখন বিক্রিয়ার ফলে মধ্যপ্রকোষ্ঠের জল প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কস্টিকসোডা দ্রবণে পরিণত হয়, তখন উহাকে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লওয়া

হয়। মধ্যপ্রকোষ্ঠ হইতে কস্টিকসোডার লঘুদ্রবণটি বাহির করিয়া লইয়া লোহার কড়াইতে গাঢ় করিয়া শুকাইয়া কঠিন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে পরিণত করা হয়।

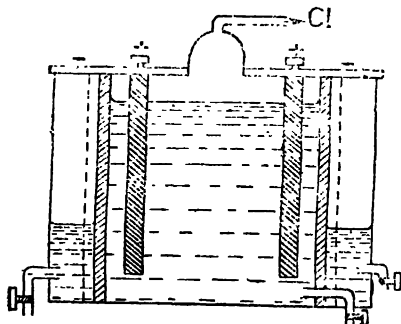
সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ সচরাচর মধ্যপ্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয় না। মধ্যপ্রকোষ্ঠের পারদ এইজন্য একটি রোধ-কুণ্ডলীর (Resistance coil) ভিতর দিয়া ব্যাটারীর অপরা প্রান্তের সহিত যুক্ত করা থাকে। ফলে, বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর বিদ্যুৎ-প্রবাহটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং উহার অধিকাংশ জলের ভিতর দিয়া যায় কিন্তু অপরাংশ রোধ-কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া ব্যাটারীতে ফিরিয়া আসে। এই সতর্কতা না লইলে খানিকটা পারদ মধ্যপ্রকোষ্ঠে আয়নিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অপচয় প্রতিরোধ করা অবশ্য প্রয়োজন, কারণ পারদ যথেষ্ট দামী।

৩১-১৪। মধ্যাবরক সেলঃ ভোর্স সেল (Vorce cell)—সব মধ্যাবরক সেলেই ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে একটি সচ্ছিদ্র পর্দা বা আচ্ছাদন থাকে এবং ফলতঃ সেলটি ক্যাথোড ও অ্যানোড এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবরকটি এমনভাবে তৈয়ারী যে উহার ভিতর দিয়া দ্রবণ অনায়াসেই চলাচল করিতে পারে এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহও অতিক্রম করিতে পারে।

ভোর্স সেলে ঢালাই লোহার তৈয়ারী একটি গোলাকার ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। উহার ব্যাস প্রায় ২৬" ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৪০" ইঞ্চি। ২" ইঞ্চি পুরু এবং ৩৬" ইঞ্চি লম্বা ২৪টি গ্র্যাফাইটের দণ্ড এই সেলে অ্যানোডরূপে ব্যবহৃত হয়। এই দণ্ডগুলি বৃত্তাকারে একটি তামার রিং-এ আটকান থাকে এবং ট্যাঙ্কের ঢাকনির সহিত উহার মধ্যস্থলে স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। মধ্যস্থিত এই অ্যানোড-শ্রেণীর অনতিদূরে এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া একটি লোহার পাত ক্যাথোডরূপে রাখা হয়। এই ক্যাথোডে অনেক বড় বড় ছিদ্র থাকে যাহাতে লবণের দ্রবণ উহা অতিক্রম করিতে পারে। ক্যাথোডের ঠিক অভ্যন্তরে এবং উহার গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় সিমেণ্ট ও অ্যাসবেসটোসের তৈয়ারী একটি আবরক থাকে [চিত্র ৩১ ঙ]। ক্যাথোড ও অ্যানোডকে অবশ্যই ট্যাঙ্ক হইতে 'অন্তরিত' করিয়া রাখা হয়। আবরকের ভিতরের দিকে অ্যানোড থাকে, উহাই অ্যানোড-প্রকোষ্ঠ, এবং উহার বাহিরে ক্যাথোড ও ট্যাঙ্কের প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশই ক্যাথোড-প্রকোষ্ঠ। দুইটি প্রকোষ্ঠেই উপরের দিকে গ্যাস নির্গমের পথ থাকে। অ্যানোড-প্রকোষ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণরূপে লবণোদকে ভরিয়া লওয়া হয়। এই দ্রবণ ধীরে ধীরে আবরক ও ক্যাথোড অতিক্রম করিয়া বাহিরের প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত

হইতে থাকে। অ্যানোড-প্রকোষ্ঠে সর্বদাই লবণোদক ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দেওয়া হইতে থাকে যাহাতে প্রকোষ্ঠের দ্রবণের পরিমাণ সর্বদাই একরকম থাকে।

ক্যাথোড ও অ্যানোড ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দিলে সেলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হয়। ইহাতে অপরাবিদ্যুৎধর্মী ক্লোরিন গ্র্যাফাইট অ্যানোডে উৎপন্ন হয় এবং উপরের নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। পরাবিদ্যুৎধর্মী সোডিয়াম আয়ন বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। উহা আবরক অতিক্রম করিয়া গিয়া ক্যাথোডে আধানমুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সোডিয়াম জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কস্টিকসোডা ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। সর্বদাই লবণের দ্রবণ অ্যানোড হইতে ক্যাথোড প্রকোষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হয়, সেই জন্য উৎপন্ন কস্টিকসোডার দ্রবণ আর অ্যানোড-প্রকোষ্ঠে যাওয়ার সুযোগ পায় না। লবণের দ্রবণের সহিত কস্টিকসোডা মিশ্রিত হইয়া ক্যাথোড-প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এই দ্রবণে কস্টিকসোডার পরিমাণ শতকরা ১১-১২ ভাগ হইলে, দ্রবণটি ট্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর এই মিশ্র দ্রবণকে শূন্যচাপে গাঢ় করা হয়। ফলে, সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হইয়া যায়। তৎপর সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাঁকিয়া সরাইয়া লওয়া হয় এবং দ্রবণটিকে লোহার কড়াইতে বিশুদ্ধ করা হয়। এইরূপে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রস্তুত হয়।



চিত্র ৩১৬—ভোর্স সেল

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ধর্ম—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি সাদা উদগ্রাহী কঠিন পদার্থ। ইহার ঘনত্ব ২·১৩, গলনাঙ্ক ৩১৮°। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, কোহলেও ইহার যথেষ্ট দ্রাব্যতা আছে। ইহা একটি তীক্ষ্ণ ক্ষার এবং শরীরের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে উহা দাহ এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে।


(১) $NaOH = Na^+ + OH^-$


(২) $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$


$2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$

জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, প্রভৃতি ধাতু কস্টিকসোডার গাঢ় দ্রবণ হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করে :—



$$Zn+2NaOH=H_2+Na_2ZnO_2$$



$$2Al+2NaOH+2H_2O=3H_2+2NaAlO_2$$

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ব্যবহার—নানারকম শিল্পে কস্টিকসোডার প্রয়োজন হয় :—(১) সাবান প্রস্তুতি, (২) কাগজ প্রস্তুতি, (৩) সোডিয়াম ধাতু উৎপাদন, (৪) কৃত্রিম সিল্ক উৎপাদন, (৫) পেট্রোলিয়াম পরিষ্করণ প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিকারক হিসাবেও ল্যাবরেটরীতে ইহার প্রয়োজন হয়।

৩১-১৫। সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3। সমুদ্রে যে সকল উদ্ভিদ পাওয়া যায়, সেগুলি পোড়াইলে উহার ভস্মে সোডিয়াম কার্বনেট থাকে। প্রাচীনকালে এইভাবেই সোডিয়াম কার্বনেট তৈয়ারী করা হইত। বর্তমানে সোডিয়াম কার্বনেট তিনটি উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

(ক) লেব্লাঙ্ক প্রণালী (Leblanc's method)।

(খ) সলভে বা অ্যামোনিয়া-সোডা প্রণালী (Ammonia-Soda method)।

(গ) বৈদ্যুতিক প্রণালী (Electrolytic method)।

মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকার শুষ্ক হ্রদগুলিতে অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণ ট্রোনা (Trona), বা Na_2CO_3, $NaHCO_3$, $2H_2O$ পাওয়া যায়। উত্তপ্ত করিলে নিরুদিত হইয়া উহা সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়।

(ক) **লেব্লাঙ্ক প্রণালী**—এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ খাদ্যলবণকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া উহাকে সোডিয়াম সালফেটে পরিণত করা হয়। তৎপর সোডিয়াম সালফেট কোক ও চুনাপাথরের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে সোডিয়াম সালফেট কোক দ্বারা বিজারিত হইয়া যায় এবং সোডিয়াম সালফাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম সালফাইড চুনাপাথরের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়।



$$2NaCl+H_2SO_4=Na_2SO_4+2HCl$$



$$Na_2SO_4+4C=Na_2S+4CO$$



$$Na_2S+CaCO_3=Na_2CO_3+CaS$$

অতএব, এই প্রণালীতে কাঁচামাল হিসাবে খাদ্যলবণ (NaCl), কোক, এবং চুনাপাথর (Limestone, $CaCO_3$) প্রয়োজন হয়। এই পদার্থসমূহ সহজলভ্য এবং সস্তা।

প্রণালীর বিবরণ—একটি সংবৃত চুল্লীতে খাদ্যলবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিড তাপিত করিয়া প্রথমে সোডিয়াম সালফেট তৈয়ারী করা হয় (পৃ ২৮৪)। গলিত অবস্থায় উহা বাহির করিয়া আনা হয়। জমিয়া গেলে কঠিন পিষ্টকাকার ধারণ করে বলিয়া উহাকে সল্ট-কেক (Salt-cake) বলে।

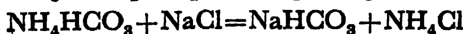
অতঃপর সোডিয়াম সালফেট উহার সমপরিমাণ ওজনের বিচূর্ণ চুনাপাথর ও অর্ধপরিমাণ ওজনের বিচূর্ণ কোকের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণচুল্লীতে প্রায় ১০০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। কয়লা পোড়াইয়া প্রডিউসার গ্যাস উৎপন্ন করা হয় এবং বাতাসের সহিত উহাকে চুল্লীর ভিতর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ঘূর্ণচুল্লীটি তাপিত হয়। প্রথমে সোডিয়াম সালফেট বিজারিত হইয়া সোডিয়াম সালফাইডে পরিণত হয় এবং পরে উহার সহিত চুনাপাথরের বিপরিবর্ত ক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়।

বিক্রিয়াশেষে চুল্লী হইতে গলিত অবস্থায় সমস্ত পদার্থ বাহিরে আনা হয়। উহাতে সোডিয়াম কার্বনেট ছাড়া, CaS, CaO, $CaCO_3$, কোক ইত্যাদি অবশ্যই মিশ্রিত থাকে এবং উহার বর্ণও ধূসর বা কালো হয়। এইজন্য ইহাকে সাধারণতঃ কৃষ্ণভস্ম (Black Ash) বলা হয়। ইহাতে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ সোডিয়াম কার্বনেট থাকে। এই মিশ্রণটিকে চূর্ণ করিয়া জলে ফুটাইলে, সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং অন্যান্য দ্রব্য ছাঁকিয়া পৃথক করা হয়। এই দ্রবণ ঘনীভূত করিয়া শীতল করিলে $Na_2CO_3, 10H_2O$ স্ফটিক কেলাসিত হয়।

(খ) **অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি বা সল্‌ভে প্রণালী**—এই প্রণালীতেও সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্যলবণ হইতেই সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করা হয়। গাঢ় লবণোদক প্রথমে অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা সম্পৃক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই অ্যামোনিয়াযুক্ত লবণোদকে পরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিচালিত করিলে, অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয়। তৎপর অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড পরস্পরের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। সোডিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তপ্ত করিয়া উহাকে বিযোজিত করিলে সোডিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়।



$$NH_3+CO_2+H_2O=NH_4HCO_3$$



$$NH_4HCO_3+NaCl=NaHCO_3+NH_4Cl$$



$$2NaHCO_3=Na_2CO_3+H_2O+CO_2$$

উপজাত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে চুনের সাহায্যে অ্যামোনিয়া উদ্ধার করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের ভিতর অ্যামোনিয়াই সর্বাপেক্ষা দামী। সুতরাং, সম্পূর্ণ অ্যামোনিয়া আবার ফিরিয়া পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।



$$2NH_4Cl + CaO = 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$$

চুনাপাথর পোড়াইয়া প্রয়োজনীয় CO_2 প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়।

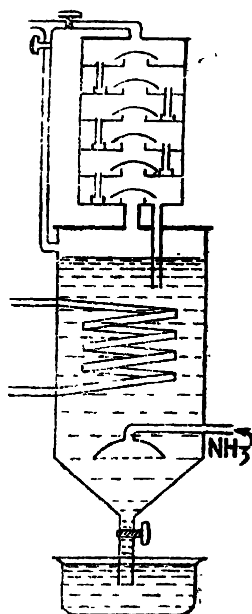


$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

অতএব, এই পদ্ধতিতে কাঁচামাল হিসাবে প্রয়োজন :—(১) লবণোদক (Brine) (২) চুনাপাথর (Limestone) (৩) অ্যামোনিয়া (Ammonia)।

সমস্ত প্রণালীটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে।

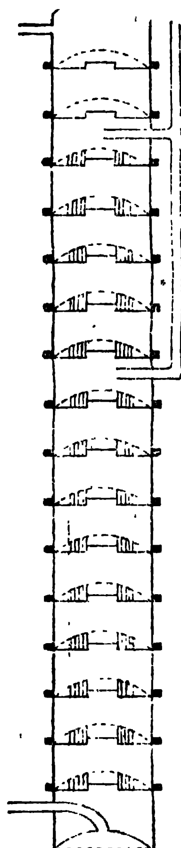
(১) **লবণোদকের অ্যামোনিয়া-সম্পৃক্তি**—একটি লোহার ট্যাঙ্কের ভিতর লবণোদক অ্যামোনিয়া দ্বারা সম্পৃক্ত করা হয়। উপরস্থ একটি চৌবাচ্চা হইতে ধীরে ধীরে সর্বদাই এই ট্যাঙ্কে গাঢ় লবণোদক প্রবাহিত করা হয় এবং একটি নলের সাহায্যে লবণোদকের ভিতর ট্যাঙ্কের নীচের দিকে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবেশ করান হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাস উপরের দিকে বুদ্বুদের আকারে উঠিবার সময় লবণোদকে দ্রবীভূত হইতে থাকে। এইরূপে লবণোদক অ্যামোনিয়াতে সম্পৃক্ত হয়।



চিত্র ৩১চ—লবণোদকের অ্যামোনিয়া-সম্পৃক্তি

অ্যামোনিয়া দ্রবণ-কালে তাপ-উদ্ভব হয়, সেইজন্য লবণোদকের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। অথচ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে অ্যামোনিয়ার দ্রাব্যতা কমিয়া যায়, সেইজন্য একটি কুণ্ডলাকৃতি নল এই ট্যাঙ্কে রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করিয়া উষ্ণতা ৪০°-৬০° ডিগ্রীর ভিতর রাখা হয়। অ্যামোনিয়া-সম্পৃক্ত লবণোদক অতঃপর নীচে একটি প্রকাণ্ড হৌজে আসিয়া জমা হয় (চিত্র ৩১ চ)।

(২) **অ্যামোনিয়া-সম্পৃক্ত লবণোদকের অঙ্গারাম্লীকরণ (Carbonation)**—পাম্পের সাহায্যে পূর্বোক্ত হৌজ হইতে অ্যামোনিয়া-যুক্ত লবণোদক একটি সু-উচ্চ স্তম্ভের উপরে লইয়া যাওয়া হয় এবং স্তম্ভের ভিতর আস্তে আস্তে নীচের দিকে প্রবাহিত করা হয়। এই স্তম্ভটিকে সল্‌ভে-স্তম্ভ বলা হয়। ইহার ভিতর অনেকগুলি লোহার প্লেট আড়াআড়ি সংলগ্ন থাকে এবং প্লেটগুলির মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের ঈষৎ উপরে একটি ব্যাঙের ছাতার মত গোলাকার ছোট ঢাকনি থাকে। ঢাকনিটি এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে ছিদ্রপথে গ্যাস বা তরল পদার্থের চলাচল সম্ভব হয়। উপর হইতে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া-যুক্ত লবণোদক পর পর এই ঢাকনিগুলির উপর পড়ে এবং উহা বাহিয়া ছিদ্রপথ দিয়া পরবর্তী প্রকোষ্ঠে আসিতে থাকে। এইভাবে লবণোদক নীচের দিকে নামিতে থাকে, এবং নীচ হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উপরের দিকে পরিচালিত করা হয়। বিপরীতমুখী CO_2 গ্যাস ও অ্যামোনিয়া-যুক্ত লবণোদক নিবিড় সংস্পর্শে আসে (চিত্র ৩১ ছ)। ইহাতে প্রথমে অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন হয় এবং উহা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপাদন করে। সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের দ্রবণীয়তা অপেক্ষাকৃত কম এবং লবণোদকে উহার দ্রাব্যতা খুবই কম। সুতরাং সোডিয়াম বাই-কার্বনেট খুব ছোট ছোট স্ফটিকের আকারে কেলাসিত হইয়া লবণোদকে প্রলম্বিত (suspended) অবস্থায় থাকে। এইভাবে লবণোদকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড বাই-কার্বনেটে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটি চুনের ভাটিতে চুনাপাথর পোড়াইয়া তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। স্তম্ভের ভিতরে সাধারণতঃ উষ্ণতা ৩৫°-৫৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ভিতর রাখাই সমীচীন। সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট সহ স্তম্ভের সমস্ত লবণোদক নীচের একটি নির্গম-পথে বাহিরে আসে।



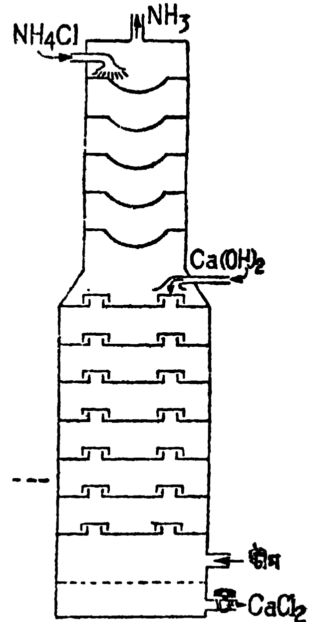
চিত্র ৩১ছ—অ্যামোনিয়া যুক্ত লবণোদকের অঙ্গারাম্লীকরণ

সোডিয়াম বাই-কার্বনেট অতঃপর ফেল্ট কাপড়ের উপর ছাঁকিয়া পৃথক করা হয়। অতঃপর এই সোডিয়াম বাই-কার্বনেট একত্র সংগৃহীত করিয়া একটি ঘূর্ণ-চুল্লীতে ১৮০° সেন্টি. উষ্ণতায় তাপিত করা হয়। ফলে উহা বিযোজিত এবং নিরুদিত হইয়া সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয় এবং কিছু CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডও সল্‌ভে-স্তম্ভে ব্যবহৃত হয়। ঘূর্ণচুল্লী হইতে যে সাদা শুষ্ক বিচূর্ণ পদার্থ পাওয়া যায় উহাই অনার্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট।

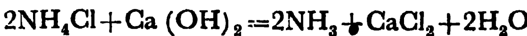


$$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$$

(৩) **অ্যামোনিয়ার পুনরুদ্ধার** :—সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ছাঁকিয়া পৃথক করায় যে পরিস্রুৎ পাওয়া যায়, উহাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও সমস্তটুকু উপজাত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থাকে। এই পরিস্রুৎ হইতে সমস্ত অ্যামোনিয়া উদ্ধার করিয়া আবার ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে অ্যামোনিয়া উদ্ধার আর একটি বিশেষ রকমের উচ্চ স্তম্ভে সম্পাদিত হয় (চিত্র ৩১জ)। ইহার উপর হইতে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত পরিস্রুৎটি নীচের দিকে পরিচালিত করা হয়। স্তম্ভটির নীচের দিক হইতে স্টীম প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রায় মধ্যস্থলে একটি নলের সাহায্যে জলের সহিত কলিচুন মিশ্রিত করিয়া প্রবেশ করান হয়। স্টীমের উত্তাপে কলিচুন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে সম্পূর্ণ অ্যামোনিয়া নিষ্কাশিত করে এবং উহা উপরের দিকে উঠিয়া নির্গম-নল দ্বারা বাহির হইয়া আসে।



চিত্র ৩১জ—
অ্যামোনিয়ার পুনরুদ্ধার

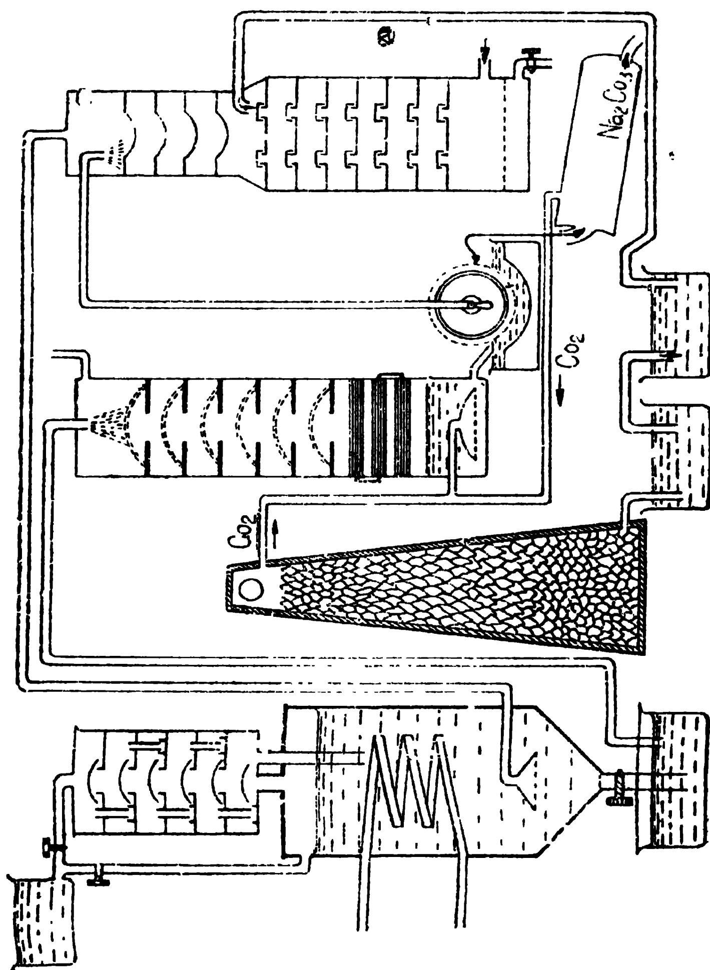


$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$



$$NH_4HCO_3 = NH_3 + CO_2 + H_2O$$

উৎপন্ন অ্যামোনিয়া পুনরায় লবণোদক সম্পৃক্তীকরণে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩১ক—সলভে প্রণালী

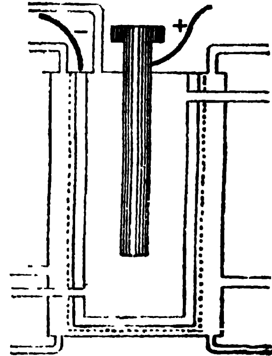
সল্‌ভে প্রণালীর সুবিধা—গত শতাব্দীতে লেব্লাঙ্ক পদ্ধতিতেই সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হইত, কিন্তু সল্‌ভে প্রণালীর প্রবর্তনে লেব্লাঙ্কের পদ্ধতির প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সর্বত্রই সল্‌ভে প্রণালীতে সোডা তৈয়ারী হয়। সল্‌ভে প্রণালীর বিশেষ সুবিধা এই যে (১) উহার কাঁচামাল সস্তা ও সহজলভ্য, (২) এই পদ্ধতিতে বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং জ্বালানির ব্যয় খুব কম, (৩) এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোডা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং এই পদ্ধতির উৎপাদন-ক্ষমতা বা কার্যকারিতাও অধিকতর। প্রণালীটির অবশ্য দুইটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পূর্ণ ক্লোরিনটুকুই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং উহার কোন উপযুক্ত চাহিদা নাই। দ্বিতীয়তঃ, অ্যামোনিয়া-সম্পৃক্ত লবণোদক যথেষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষারগুণসম্পন্ন। উহার পরিচালন ইত্যাদি বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

লেব্লাঙ্ক প্রণালীর প্রধান সুবিধা এই যে উহাতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং ক্যালসিয়াম সালফাইড হইতে প্রয়োজন হইলে সালফার উদ্ধার করা যায়। কিন্তু প্রণালীটি ব্যয়বহুল এবং উৎপন্ন সোডিয়াম কার্বনেট তত বিশুদ্ধ নয়।

সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত না হইলেও লেব্লাঙ্ক পদ্ধতিতে এখনও যথেষ্ট সোডিয়াম সালফেট তৈয়ারী করা হয়।

(গ) তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (হারগ্রিভস-বার্ড পদ্ধতি) [Hergreaves-Bird-Process]

—একটি মধ্যাবরক সেলে লবণোদক তড়িৎ-বিশ্লেষিত করিয়া কস্টিকসোডা উৎপন্ন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে উহাকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করা হয়। ইহাই এই পদ্ধতির মূল কথা। হারগ্রিভস-বার্ড সেলে এই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। সেলটির প্রাচীরের ভিতরের দিকটি সিমেন্ট-লিপ্ত থাকে। সিমেন্ট-অ্যাসবেসটোসের তৈয়ারী দুইটি আবরক-প্রাচীরের (Diaphragm wall) সাহায্যে সেলটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে (চিত্র ৩১ এ)। এই মধ্যাবরক প্রাচীর দুইটির বাহিরের দিকে দুইটি তামার তারজালি সংলগ্ন থাকে। মধ্য-প্রকোষ্ঠটিতে লবণোদক রাখা হয় এবং উহাতে একটি গ্যাস-কার্বনের অ্যানোড নিমজ্জিত থাকে। তারজালি দুইটি ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত সেলটির একটি ঢাকনি আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের উপরের দিকে গ্যাস-নির্গমপথ আছে। বিশ্লেষণ করার সময় তারজালি দুইটি একটু জলে সিক্ত করিয়া লওয়া হয়, এবং অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সোডিয়াম



চিত্র ৩১ এ—হারগ্রিভস-বার্ড সেল

ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইয়া অ্যানোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম আয়নগুলি সিমেণ্টের মধ্যাবরকের ভিতর দিয়া আসিয়া তারজালিতে আধানমুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। বাহিরের প্রকোষ্ঠে দুইটি নলের সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও স্টীম প্রবেশ করান হইতে থাকে। সোডিয়াম স্টীমের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কস্টিকসোডা উত্তপ্ত করে এবং পরে উহা CO_2 দ্বারা সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। সঞ্জাত হাইড্রোজেন উপরের নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। নীচের একটি নির্গমপথ দিয়া সোডিয়াম-কার্বনেটের দ্রবণ বাহির করিয়া লইয়া উহা হইতে সোডা-স্ফটিক কেলাসিত করা হয়।



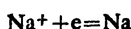
$$NaCl = Na^+ + Cl^-$$



অ্যানোডে

$$Cl - e = Cl$$

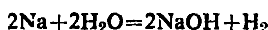
$$Cl + Cl = Cl_2$$



ক্যাথোডে

$$Na^+ + e = Na$$

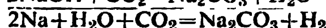




$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$



$$2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$$



$$2Na + H_2O + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2$$

সোডিয়াম কার্বনেটের ধর্ম। দ্রবণ হইতে কেলাসিত করিতে যে সাদা সোডিয়াম-কার্বনেট স্ফটিক পাওয়া যায়, উহাতে প্রত্যেক অণুর সহিত ১০টি জলের অণু সংযুক্ত থাকে—$Na_2CO_3, 10H_2O$। ইহাই বাজারে "কাপড়-কাচা সোডা" নামে পরিচিত। বাতাসে রাখিয়া দিলে এই সোদক স্ফটিক হইতে জল বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং উদ্ত্যাগী স্ফটিক হইতে একটি নূতন সোডার উদ্ভব হয়। উহাতে সোডার প্রতি অণুতে একটি মাত্র জলের অণু থাকে।

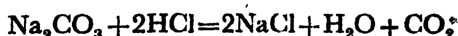


$$Na_2CO_3, 10H_2O = Na_2CO_3, H_2O + 9H_2O$$

অধিকতর উত্তাপে জল সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া অনার্দ্র সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। ইহাকে সোডা-ভস্ম (Soda Ash) বলা হয়।

অতিরিক্ত তাপে সোডিয়াম কার্বনেট গলিয়া যায় বটে কিন্তু বিযোজিত হয় না। ইহার জলীয় দ্রবণ মৃদু ক্ষারগুণসম্পন্ন। তীব্র ক্ষার এবং মৃদু অম্ল হইতে উৎপন্ন হওয়াতে লবণ হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে ক্ষারকত্ব পরিলক্ষিত হয়। জলীয় দ্রবণে খানিকটা লবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া তীব্রক্ষার উৎপাদন করিয়া থাকে :— $Na_2CO_3 + 2H_2O \rightleftharpoons 2NaOH + H_2CO_3$

অন্যান্য কার্বনেটের মত সোডাও অ্যাসিডের সংস্পর্শে CO_2 উৎপাদন করে।



$$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2O + CO_2$$

ব্যবহার :—কাচ, সাবান ও কস্টিকসোডা প্রস্তুতিতে প্রচুর সোডিয়াম কার্বনেট প্রয়োজন হয়। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পেও সোডিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র এবং অন্যান্য

দ্রব্য পরিষ্করণে, ল্যাবরেটরীর বিক্রিয়ক হিসাবে, এবং আরও নানা প্রয়োজনে সোডিয়াম কার্বনেটের যথেষ্ট চাহিদা। সোডিয়াম বাই-কার্বনেটেরও চাহিদা আছে। ঔষধ হিসাবে এবং CO_2 প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। রুটি বা বিস্কুট তৈয়ারীতে যে বেকিং পাউডার (baking powder) লাগে, উহাতে পটাসিয়াম-হাইড্রোজেন টারটারেট ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট থাকে। জলের সংস্পর্শে এই মিশ্রণ হইতে CO_2 উৎপন্ন হয় ও রুটি ফাঁপিয়া ওঠে।

৩১-১৬। সোডিয়াম সালফেট, Na_2SO_4—লেব্লাঙ্ক পদ্ধতিতেই সোডিয়াম সালফেট প্রস্তুত করার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সংবৃতচুল্লী হইতে যে "সল্ট-কেক" পাওয়া যায় উহাকে বড় বড় কাঠের ট্যাঙ্কে গরম জলে স্টীমের সাহায্যে দ্রবীভূত করা হয়। অতিরিক্ত অপরিবর্তিত যে সালফিউরিক অ্যাসিড উহাতে থাকে তাহা কলিচুন সাহায্যে প্রশমিত করা হয়। পরে এই দ্রবণটি ছাঁকিয়া সীসাবৃত কাঠের ট্যাঙ্কে শীতল করা হয়। তখন ইহা হইতে সোদক সোডিয়াম সালফেট, $Na_2SO_4, 10H_2O$ কেলাসিত হয়। ইহাকে 'গ্লবার লবণ' (Glauber's salt) বলা হয়।

সোডিয়াম সালফেট কাগজ ও কাচশিল্পে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়। সোডিয়াম সালফাইড তৈয়ারী করার জন্যও সোডিয়াম সালফেট দরকার। ঔষধ হিসাবে সোডিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয়।

৩১-১৭। কাচ (Glass)**:** সিলিকার (বালুর) সহিত অন্যান্য সিলিকেট একত্র মিশাইয়া গালাইলে অত্যন্ত সান্দ্র একটি তরল পদার্থ পাওয়া যায়। উহাই অতিশীতলীকরণের ফলে জমাট বাঁধিয়া কাচে পরিণত হয়। উহার কাঠিন্য বাহ্যিক। বস্তুতঃ কাচ অতিশীতলীকৃত একটি সান্দ্র তরল পদার্থ। সিলিকেটগুলির একটি সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেট হইতে হইবে। অপরটি লেড বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট। মোটামুটি ভাবে কাচের উপাদানসমূহ নিম্নরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—$X_2SiO_3, YSiO_3, 4SiO_2$

অথবা $X_2O, YO, 6SiO_2$ [X=K বা Na ; Y=Ca বা Pb]

কাচের কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্যই উহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। উহা স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে। অগ্নিসহ বলিয়া পরীক্ষাগারে উহা সদা ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তার জন্য সহজে গলাইয়া বিভিন্ন আকৃতিতে ঢালাই করা চলে। অ্যাসিড বা অন্যান্য রাসায়নিক বস্তুদ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া বহুরকমের পাত্র বা বোতল কাচের সাহায্যে করা হয়।

কাচ-শিল্প : কাচের ব্যবহার এত বহুল রকমের হওয়ায় প্রত্যেক দেশেই কাচশিল্পের প্রসার ও উন্নতির দিকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। কাচের বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য কয়েকটি কাঁচামালের প্রয়োজন। যথা :—

(১) সাধারণ বালুকা, কোয়ার্টজ, ফ্লিন্ট প্রভৃতি—সিলিকার জন্য।

(২) চুন, চুনাপাথর, খড়িমাটি ইত্যাদি—ক্যালসিয়ামের জন্য।

(৩) পটাসিয়াম কার্বনেট—পটাসিয়ামের জন্য।

(৪) সোডিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম সালফেট—সোডিয়ামের জন্য।

(৫) লিথার্জ (PbO)—লেডের জন্য।

ইহা ছাড়া, সহজে এই কাঁচামাল গলাইবার জন্য পুরাতন ভাঙা কাচ-চূর্ণ প্রয়োজন হয়। ইহাকে কিউলেট (Cullet) বলে। কাঁচামালসমূহের সহিত সদাই অপদ্রব্য কিছু থাকে, বিশেষতঃ লোহের যোগ থাকে। ফলে কাচের রং ঈষৎ সবুজ হয়। এই আপত্তিকর রং দূর করার জন্য বিরঞ্জক হিসাবে KNO_3, MnO_2 প্রভৃতি দেওয়া হয়।

কাচ-প্রস্তুতির উপাদানগুলি প্রথমতঃ যথাসম্ভব পরিষ্কৃত করিয়া বিচূর্ণ করা হয়। ইহার পর প্রয়োজন অনুপাতে উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করা হয়। অগ্নিসহ ইষ্টকের তৈয়ারী আবৃত চুল্লীতে এই মিশ্রণটি গলাইয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সমস্ত মিশ্রণটুকু একত্র না গলাইয়া অল্প অল্প করিয়া বিচূর্ণ মিশ্রণ পুরাতন কাচচূর্ণের (কিউলেট) সহিত চুল্লীতে দেওয়া হয়। কাচচূর্ণ বিগলনে সাহায্য করে। উহা গলিয়া গেলে পুনরায় আরও মিশ্রণ চুল্লীতে দেওয়া হয়। ইহাতে সমস্ত মিশ্রণটি সমভাবে গলে এবং উহার ভিতর গ্যাসের বুদ্বুদ থাকে না। সমস্ত মিশ্রণটি যখন উত্তমরূপে তরলিত হইয়া যায়, তখন উহার রং দূর করার জন্য অল্প MnO_2 বিরঞ্জক হিসাবে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বর্ণের কাচ প্রয়োজন হইলে সিলিকা ও সিলিকেটের সহিত স্বল্প পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ধাতব অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া লওয়া হয়। যেমন, Cr_2O_3 সাহায্যে সবুজ, CoO সাহায্যে নীল কাচ পাওয়া যায়। টিন্-অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম ফসফেট সাহায্যে অনচ্ছ সাদা কাচ প্রস্তুত হয়। সোনালী-লাল (Ruby-red) কাচের জন্য স্বর্ণরেণুও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গলিত কাচ অল্প অল্প করিয়া লইয়া ছাঁচে ঢালাই করা হয় অথবা নলের ভিতরে লইয়া ফুঁ দিয়া বিভিন্ন আকৃতিতে গড়া হয়। কাচের পাত্রগুলি হঠাৎ শীতল না করিয়া আস্তে আস্তে শীতল

করিলে অনেক শক্ত ও ভাল হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা করিলে উহার বহির্ভাগ তাড়াতাড়ি শক্ত হইয়া জমিয়া যায়। ফলে অভ্যন্তরের কাচের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। এইরূপ কাচ একটু চাপে অথবা উষ্ণতার ব্যতিক্রমে ভাঙিয়া যায়। গলিত কাচের উষ্ণতা ধীরে ধীরে কমাইয়া ঠাণ্ডা করিলে উহার ভিতরে কোন চাপ বা টান থাকে না। এই প্রণালীটিকে 'কাচের কোমলায়ন' বলা হয়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম।

ম্যাগনেসিয়াম

চিহ্ন, Mg। পারমাণবিক গুরুত্ব, ২৪·৩১। ক্রমাঙ্ক ১২।

মৌলাবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম না পাওয়া গেলেও উহার নানা রকমের যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। স্টাসফার্টের লবণস্তূপে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ম্যাগনেসিয়ামই খনিজ পাথরে থাকে। নিম্নলিখিত যৌগগুলিই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য :—

(১) কার্বনেট, যথা :—(ক) ম্যাগনেসাইট (Magnesite), $MgCO_3$
(খ) ডলোমাইট (Dolomite), $MgCO_3$, $CaCO_3$

(২) ক্লোরাইড, যেমন :—কার্নালাইট (Carnallite), $MgCl_2$, KCl, $6H_2O$

(৩) সালফেট, যেমন :—(ক) কাইসেরাইট (Kieserite), $MgSO_4$, H_2O
(খ) ক্যানাইট (Kaenite), KCl, $MgSO_4$, $3H_2O$

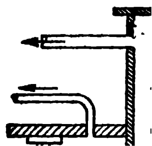
(৪) সিলিকেট, যথা :—(ক) অলিভাইন (Olivine), Mg_2 (Fe) SiO_4
(খ) টাল্ক (Talc), Mg_3H_2 $(SiO_3)_4$
(গ) অ্যাসবেসটোস (Asbestos), $Mg_3Ca(SiO_3)_4$

উদ্ভিদের সবুজ অংশে যে ক্লোরোফিল থাকে উহাও ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ।

৩২-১। ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতি—(১) সাধারণতঃ অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বা কার্নালাইটকে গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষিত করিয়া ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত করার রীতিই প্রচলিত।

স্টীলের তৈয়ারী ছোট ছোট চতুষ্কোণ ট্যাঙ্কে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। ট্যাঙ্কের ভিতর অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লইয়া

বিদ্যুৎ-প্রবাহ সাহায্যে উহাকে উত্তপ্ত করা হয় এবং প্রায় ৮০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গলাইয়া রাখা হয় (উহার গলনাঙ্ক, ৭৫০° সেন্টি)। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2, 6H_2O$) সোদক স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। কিন্তু গলানোর পূর্বে বিশেষ প্রণালীতে উহাকে অনার্দ্র করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে কার্নালাইটও ব্যবহার করা যায়।





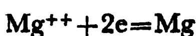
ট্যাঙ্কটির মধ্যস্থলে উপর হইতে একটি গ্র্যাফাইটের দণ্ড ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহা অ্যানোডের কাজ করে। গ্র্যাফাইট দণ্ডটিকে ঘিরিয়া একটি প্রশস্ত পর্সেলীনের নল রাখা হয়। অ্যানোড ও উহার কঞ্চুক পর্সেলীনের নলটি গলিত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডে আংশিক নিমজ্জিত থাকে। লোহার ট্যাঙ্কটিকে সোজাসুজি ব্যাটারীর অপর প্রান্তে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, সুতরাং উহাই ক্যাথোড। তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনের ফলে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইয়া যায়। অ্যানোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হয় এবং পর্সেলীনের নলের ভিতর দিয়া উঠিয়া একটি নির্গম-পথে বাহির হইয়া যায়। ট্যাঙ্কের ভিতর ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন হয় এবং অধিক উষ্ণতা হেতু গলিত অবস্থায় থাকে। তরল ম্যাগনেসিয়াম গলিত কার্নালাইট বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া ভাসিয়া ওঠে।

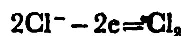
চিত্র ৩২ক—ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতি

সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কটি অবশ্য একটি ঢাকনিদ্বারা আবৃত থাকে এবং সর্বদা ট্যাঙ্কের ভিতরের তরল পদার্থের উপরে কোল-গ্যাস প্রবাহিত করা হয়, যাহাতে ভিতরে কোন বাতাস না থাকে। তাহা না হইলে, তরল ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠিবে এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হইয়া যাইবে (চিত্র ৩২ক)।



$$MgCl_2 = Mg^{++} + 2Cl^-$$





$$Mg^{++} + 2e = Mg \qquad 2Cl^- - 2e = Cl_2$$

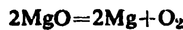
যথেষ্ট পরিমাণ তরল ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চিত হইলে উহাকে বাহির করিয়া ঢালাই করিয়া লওয়া হয়।

(২) উচ্চ উষ্ণতায় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডকে কার্বন দ্বারা বিজারিত করিয়াও কোন কোন দেশে ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতির প্রচলন হইতেছে। প্রকৃতিলব্ধ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট পোড়াইয়া প্রথমে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈয়ারী করা হয়। $MgCO_3 = MgO + CO_2$

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সহিত বিচূর্ণ কোক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। কোন তেল বা পিচের সহিত মিশাইয়া এই মিশ্রণটিকে ছোট ছোট ইষ্টকাকারে পরিণত করা হয়। একটি তড়িৎ-চুল্লীতে রাখিয়া ঐ ইষ্টকসমূহ প্রায় ২০০০° সেন্টিগ্রেডে তাপিত করা হয়। ইহার ফলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বিজারিত হইয়া যায়। $MgO + C = Mg + CO$

উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম ও কার্বন মনোক্সাইড বাষ্পাকারে তড়িৎ-চুল্লী হইতে বাহির হইয়া আসে (ম্যাগনেসিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক, ১১০০°)। শীতল পাত্রে ঘনীভূত করিয়া কঠিন ম্যাগনেসিয়াম সংগ্রহ করা হয়।

(৩) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডকে গলিত বেরিয়াম ফ্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইডে দ্রবীভূত করিয়া (৮৫০°C) তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলেও ক্যাথোডে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু পাওয়া যায়।


$$2MgO = 2Mg + O_2$$

ম্যাগনেসিয়ামের ধর্ম—ম্যাগনেসিয়াম ধাতু উজ্জ্বল সাদা রংয়ের। উহা অপেক্ষাকৃত নরম, উহার ঘনত্ব ১·৭৪, গলনাঙ্ক ৬৫১° সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক ১১০০° সেন্টিগ্রেড। উহার প্রসার্যতা ও ঘাতসহতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

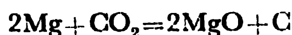
বাতাস বা অক্সিজেনের সান্নিধ্যে ম্যাগনেসিয়ামকে তাপিত করিলে উহা উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলিয়া ওঠে এবং জারিত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়:—$2Mg + O_2 = 2MgO$

হ্যালোজেনের সহিতও ম্যাগনেসিয়াম সোজাসুজি যুক্ত হয় এবং এই বিক্রিয়ার সময় তাপ ও আলো বিকিরণ হয়:—$Mg + Cl_2 = MgCl_2$

অধিকতর উষ্ণতায় ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডে পরিণত হয়—$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$

শ্বেততপ্ত ম্যাগনেসিয়াম স্টীম, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড

প্রভৃতিকে বিযোজিত করিয়া দেয় এবং বস্তুতঃ এই সকল ক্ষেত্রে উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম বিজারকের কাজ করে :—



$$2Mg + CO_2 = 2MgO + C$$



$$2Mg + 2NO = 2MgO + N_2 \qquad Mg + H_2O = MgO + H_2$$

ম্যাগনেসিয়াম নানারকম অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও H_2 উৎপাদন করে; কিন্তু ক্ষারক দ্রবণের সহিত কোন বিক্রিয়া করে না।

ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার ঃ—(১) ইলেকট্রন (Electron, Mg+Zn), ম্যাগনেলিয়াম (Mg+Al), প্রভৃতি ধাতুসঙ্কর ম্যাগনেসিয়াম হইতে প্রস্তুত হয়। (২) সাঙ্কেতিক আলোক এবং ফটোগ্রাফীর আলোক উৎপাদনে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হয়। (৩) বাজী প্রস্তুতিতে এবং কোন কোন অগ্ন্যুৎপাদক বোমা তৈয়ারী করিতে ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ প্রয়োজন হয়।

ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ

৩২-২। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, MgO : উত্তাপের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বিযোজিত করিয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সর্বদা প্রস্তুত করা হয়। $MgCO_3 = MgO + CO_2$

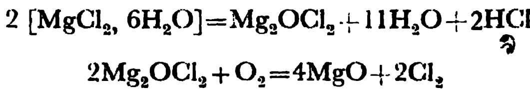
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সাদা বিচূর্ণ অবস্থায় থাকে। জলে ইহার দ্রাব্যতা খুব কম। অক্সাইডটি ক্ষারকীয় এবং অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া জল ও লবণ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত উষ্ণতা ছাড়া ইহা গলে না বলিয়া অগ্নিসহ ইষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ-চুল্লীর অভ্যন্তরে আবরক হিসাবে ইহা ব্যবহার হয়। ঔষধ হিসাবেও কিছু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রয়োজন হয়।

৩২-৩। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, $MgCl_2$: ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত করা হয়। বিক্রিয়াশেষে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের যে দ্রবণ পাওয়া যায় উহা গাঢ় করিয়া শীতল করিলে ছয়টি জলের অণু সহ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের সোদক স্ফটিক কেলাসিত হয়, $MgCl_2, 6H_2O$।



$$MgCO_3 + 2HCl = MgCl_2 + CO_2 + H_2O$$

সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডকে ধীরে ধীরে তাপিত করিলে উহার জল আংশিক উদ্বায়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনার্দ্র হয় না। অতিরিক্ত উত্তাপে সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সি-ক্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায় এবং পরে বাতাসের সাহায্যে অক্সাইডে পরিণত হয়।



$$2\,[MgCl_2,\ 6H_2O] = Mg_2OCl_2 + 11H_2O + 2HCl$$

$$2Mg_2OCl_2 + O_2 = 4MgO + 2Cl_2$$

অতএব সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড উত্তপ্ত করিয়া অনার্দ্র লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সহিত ক্লোরিন গ্যাসের ক্রিয়ার ফলে অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যাইতে পারে :—$Mg + Cl_2 = MgCl_2$

অপর একটি পদ্ধতিতেও অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত করা যায়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের সহিত প্রথমে আণবিক অনুপাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। মিশ্র দ্রবণটি গাঢ়তর করিলে উহা হইতে $NH_4Cl,\ MgCl_2,\ 6H_2O$—এই দ্বিধাতুক লবণটি (Double Salt) কেলাসিত হয়। এই দ্বিধাতুক লবণ উত্তপ্ত করিলে প্রথমে উহার জল সম্পূর্ণ উড়িয়া যায় এবং তৎপর উহা হইতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডও উদ্বায়িত হইয়া যায়, কেবল অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড অবশেষ থাকে।

সোরেল সিমেন্ট (Sorel Cement) নামক বিশেষ রকমের সিমেন্ট প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কাচ, পর্সেলীন প্রভৃতি জোড়া দিতে, দন্ত চিকিৎসাতে এই সিমেন্ট প্রয়োজন হয়। কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত সূতা প্রস্তুত করিতে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়।

৩২-৪। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, $MgSO_4$: ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পাওয়া যায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জলীয় দ্রবণে থাকে। কেলাসিত করিলে ৭টি জলের অণু সহ উহা স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়, $MgSO_4,\ 7H_2O$। সাধারণতঃ এই সোদক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটকে **'এপসাম লবণ' (Epsom Salt)** বলা হয়।

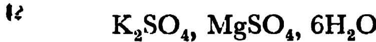
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ফটিক রূপে থাকে। উহা জলে খুব দ্রবণীয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ১৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহার ৬টি

জলের অণু উড়িয়া যায় এবং ২০০° সেন্টিগ্রেডে উহা সম্পূর্ণ অনার্দ্র হইয়া পড়ে।



$$MgSO_4 . 7H_2O \xrightarrow{150^\circ C} MgSO_4 . H_2O \xrightarrow{200^\circ C} MgSO_4$$

ক্ষার ধাতুর সালফেটের সহিত ইহা দ্বিধাতুক লবণ উৎপন্ন করে; যথা,



$$K_2SO_4, MgSO_4, 6H_2O$$

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। তুলা এবং সূতার ব্যবসায়ে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে।

মৃৎক্ষার-ধাতু—ক্যালসিয়াম

চিহ্ন, Ca পারমাণবিক গুরুত্ব, ৪০·০৮ ক্রমাঙ্ক, ২০

প্রকৃতিতে ক্যালসিয়াম মৌলাবস্থায় থাকে না, কিন্তু উহার নানাপ্রকার যৌগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল যৌগের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$—ইহা বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, যথা :—চুনাপাথর (Lime-Stone), খড়িমাটি, মার্বেল পাথর, ক্যালসাইট (Calcite), ক্যাল্ক-স্পার (Calcspar), ইত্যাদি। ডিমের খোসা এবং জলজন্তুর বহিরাবরণেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে।

(২) ডলোমাইট (Dolomite), $CaCO_3, MgCO_3$।

(৩) ক্যালসিয়াম সালফেট, $CaSO_4$। ইহা প্রধানতঃ দুই রকমের—

(ক) জিপসাম (Gypsum), $CaSO_4 . 2H_2O$।

(খ) অ্যানহাইড্রাইট (Anhydrite), $CaSO_4$।

(৪) ক্যালসিয়াম ফসফেট, $Ca_3(PO_4)_2$। যথা :—

(ক) অ্যাপেটাইট (Apatite), $CaF_2, 3Ca_3(PO_4)_2$।

(খ) ফসফরাইট (Phosphorite), $Ca_3(PO_4)_2$।

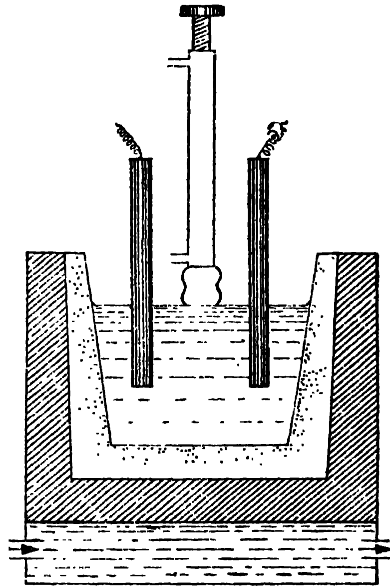
(গ) জীবজন্তুর হাড়েও, $Ca_3(PO_4)_2$ থাকে।

(৫) ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ফ্লুয়োরস্পার, CaF_2।

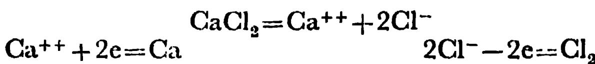
(৬) ক্যালসিয়াম সিলিকেট, $CaSiO_3$। অনেক পাথরেই ইহা মিশ্রিত থাকে।

৩২-৫। ক্যালসিয়াম প্রস্তুতি—ক্যালসিয়াম অক্সাইড অত্যন্ত সহজলভ বটে, কিন্তু উহাকে উচ্চ উষ্ণতায়ও কার্বন দ্বারা বিজারিত করা যায় না। সেইজন্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা ক্যালসিয়াম ধাতু প্রস্তুত করা হয়।

গ্র্যাফাইট নির্মিত পাত্রে বিগলিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের (৬৬০°-৭০০° সেণ্টিগ্রেড) ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া হয়। দুইটি গ্র্যাফাইট দণ্ড অ্যানোড রূপে এবং একটি লোহার দণ্ড ক্যাথোড রূপে গলিত $CaCl_2$এ আংশিক নিমজ্জিত রাখা হয় (চিত্র৩২ খ) ক্যাথোডটি ভিতরে ফাঁপা এবং ইহার মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ পরিচালিত করিয়া উহাকে সর্বদা শীতল রাখা হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে উহা বিযোজিত হইয়া ক্যাথোডে ক্যালসিয়াম ও অ্যানোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। ক্যালসিয়াম ক্যাথোডে সঞ্চিত হইতে থাকিলে, ধীরে ধীরে ক্যাথোডটি উপরের দিকে উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উৎপন্ন ক্যালসিয়াম একটি যষ্টির আকারে পাওয়া যায়।



চিত্র ৩২খ—ক্যালসিয়াম প্রস্তুতি

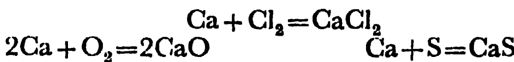


$$CaCl_2 = Ca^{++} + 2Cl^-$$

$$Ca^{++} + 2e = Ca \qquad 2Cl^- - 2e = Cl_2$$

[ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সামান্য ক্যালসিয়াম ফ্লুরাইড মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।]

ক্যালসিয়ামের ধর্ম—ক্যালসিয়াম ধাতু রূপার মতই উজ্জ্বল সাদা রংয়ের কিন্তু যথেষ্ট নরম। সাধারণ ধাতু হইতে ক্যালসিয়ামের সক্রিয়তা অনেক বেশী। অক্সিজেন, হ্যালোজেন, সালফার প্রভৃতির সহিত উহা সহজেই যুক্ত হয়।



$$Ca + Cl_2 = CaCl_2$$

$$2Ca + O_2 = 2CaO \qquad Ca + S = CaS$$

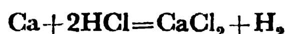
উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সহিতও ক্যালসিয়াম সোজাসুজি যুক্ত হইয়া দ্বিযৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে :—



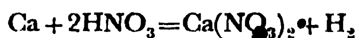
$$Ca + H_2 = CaH_2 \qquad 3Ca + N_2 = Ca_3N_2$$

জলের সহিত ক্যালসিয়াম ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন উৎপাদন করে :— $Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

বিভিন্ন অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করিয়া থাকে :—



$$Ca + 2HCl = CaCl_2 + H_2$$

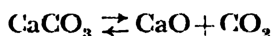


$$Ca + 2HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2$$

ক্যালসিয়ামের তেমন বহুল ব্যবহার নাই। কখন কখন কোন কোন ধাতু-নিষ্কাশনের পর ঢালাই করার সময় ক্যালসিয়াম বিজারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল্‌কো (Ulco), ফ্রেয়ারী (Frary) প্রভৃতি ধাতুসংকরের ক্যালসিয়াম একটি উপাদান।

ক্যালসিয়ামের যৌগসমূহ

৩২-৬। ক্যালসিয়াম অক্সাইড, চুন CaO : উত্তাপ-প্রয়োগে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুনাপাথর) বিযোজিত করিয়া সর্বদা চুন প্রস্তুত করা হয়।

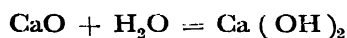


$$CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2$$

বিক্রিয়াটি উভমুখী। সুতরাং সম্পূর্ণ চুনাপাথরকে চুনে পরিণত করিতে হইলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন। এইজন্য ইষ্টক-নির্মিত বড় বড় চুনের ভাটিতে (Lime-kiln) এই বিযোজন সম্পাদিত হয়। এই চুনের ভাটি বা চুন-চুল্লীগুলি দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ গম্বুজের মত। চুল্লীর নীচে বায়ু-প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে; নীচের অংশে কয়লা জ্বালাইয়া চুল্লীতে তাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় পার্শ্ববর্তী একটি চুল্লীতে কয়লা জ্বালাইয়া উত্তপ্ত প্রডিউসার গ্যাস ইত্যাদি ভাটির ভিতর পরিচালিত করা সুবিধাজনক (চিত্র ৩২ গ)। ছোট ছোট কাঁকরের আকারে চুনাপাথর উপর হইতে এই চুল্লীতে প্রবেশ করিতে থাকে। চুল্লীর অভ্যন্তরের উষ্ণতা প্রায় ১০০০° সেন্টিগ্রেড হইলে, চুনাপাথর বিযোজিত হইয়া চুনে পরিণত হয়। উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উত্তপ্ত গ্যাস-প্রবাহে উপরের দিকে উঠিয়া একটি নির্গম-পথে বাহির হইয়া যায়। ভাটির নীচে সাদা চুন আসিয়া জমা হয় এবং উহাকে একটি নির্গম-দ্বার দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। চুন টিনের ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

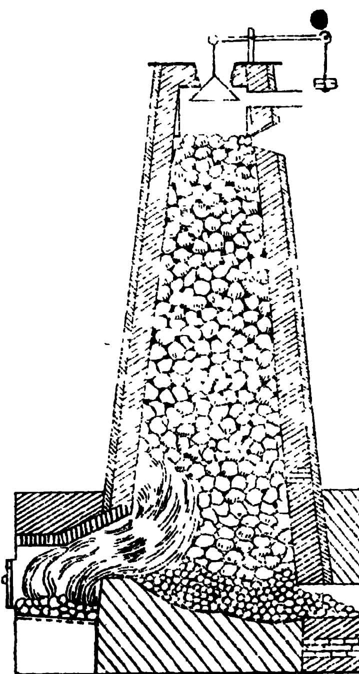
চুনের ধর্ম ঃ—চুন একটি সাদা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। ইহাকে তাপিত করিলে সহজে গলে না, বরং অতিরিক্ত উষ্ণতায়, অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা ইত্যাদিতে,—উহা ভাস্বর হইয়া উঠে এবং আলো বিকিরণ করে। বিদ্যুৎ-চুল্লীতে প্রায় ২৭৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহাকে গলান সম্ভব।

জলের প্রতি চুনের আসক্তি খুব বেশী। বায়ু হইতে জল শোষণ করিয়া উহা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়।



$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$

জলে চুনের দ্রাব্যতা খুব বেশী নয়। উহার জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ $Ca(OH)_2$-এর দ্রবণ তীব্রক্ষার-গুণাত্মক। চুন অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে এবং লবণ ও জল উৎপাদন করে। $CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$



চিত্র ৩২গ—চুনের ভাটি

৩২-৭। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, কলিচুন, $Ca(OH_2)$ ঃ— চুনের সহিত অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে, চুন উহা তৎক্ষণাৎ সশব্দে শোষণ করিয়া লয়। দ্রবীভূত না হইয়াও এইভাবে চুন যথেষ্ট জল শুষিয়া লইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সময় যথেষ্ট তাপ-উদ্গীরণ হয়, চুন আয়তনে অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে বিচূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ জলের সহিত চুনের রাসায়নিক যোগাযোগ ঘটে। $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$

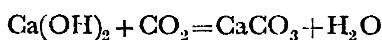
এই বিচূর্ণ কঠিন ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে "কলিচুন" (Slaked-lime) বলা হয়।

কলিচুন একটি তীব্রক্ষার বটে, কিন্তু জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং

কলিচুন যদি অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া রাখা হয়, তবে চুন নীচে থিতাইয়া যায় এবং তাহার উপরে একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ পাওয়া যায়। এই স্বচ্ছ দ্রবণটিকে সাধারণতঃ "চুনের জল" (Lime-water) বলা হয়।

কলিচুন যদি সামান্য পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে উহা জলে ভাসমান বা প্রলম্বিত অবস্থায় থাকিয়া দুধের মত সাদা একটি মিশ্রণের সৃষ্টি করে, উহাকে "চুন-গোলা" (Milk of lime) বলে।

কলিচুন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং উহার দ্বারা ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হইয়া যায়।



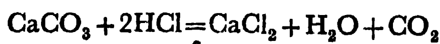
$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$$

চুন ও কলিচুনের ব্যবহার—চুন নানারকম কাজে লাগে। তন্মধ্যে অধিকাংশ চুন ব্যয় হয় কলিচুন প্রস্তুতিতে। নিরুদক রূপে এবং ধাতু-নিষ্কাশনে বিগালক রূপে চুন ব্যবহৃত হয়। "লাইম লাইট"—ভাস্বর আলো সৃষ্টিতে চুন প্রয়োজন হয়।

ইট বা পাথরের গাঁথনির মশলাতে যথেষ্ট কলিচুন ব্যবহৃত হয়। চুনকামের জন্যও কলিচুন প্রয়োজন। সিমেন্ট, কাচ, কংক্রীট, বিরঞ্জক, কস্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রভৃতির প্রস্তুতিতে কলিচুন অপরিহার্য। বীজবারক হিসাবে এবং জমির সার হিসাবেও কলিচুন ব্যবহৃত হয়।

গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের সহিত চুন মিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ করিলে যে মিশ্র-পদার্থটি পাওয়া যায় তাহাকে সোডা-লাইম (Soda-lime) বলা হয়; রাসায়নিক বিশ্লেষণে উহা ব্যবহৃত হয়।

৩২-৮। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, $CaCl_2$: বিচূর্ণ চক, চুনাপাথর বা মার্বেল পাথরের উপর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার শেষে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণটি অপরিবর্তিত মার্বেল এবং অন্যান্য অদ্রাব্য বস্তু হইতে ছাঁকিয়া লইয়া গাঢ় করা হয়। অতঃপর ঠাণ্ডা হইলে এই গাঢ় দ্রবণ হইতে $CaCl_2,6H_2O$ কেলাসিত হয়।



$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সোদক স্ফটিকগুলি স্বচ্ছ বর্ণহীন অবস্থায় থাকে। উহারা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। উত্তাপে এই সোদক স্ফটিকগুলি হইতে ক্রমশঃ

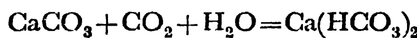
জল বাহির হইয়া যায় এবং অত্যধিক উষ্ণতায় উহারা সম্পূর্ণ অনার্দ্র অনিয়তাকার $CaCl_2$-এ পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অত্যন্ত উদ্‌গ্রাহী এবং বাতাসে রাখিয়া দিলে উহা জল শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইজন্য শোষকাধারে নিরুদক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোহল ও অ্যামোনিয়ার সহিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুত-যৌগিক উৎপাদন করে:— $CaCl_2, 4C_2H_5OH$ এবং $CaCl_2, 8NH_3$। অতএব কোহল বা অ্যামোনিয়া গ্যাসের নিরুদন-কার্যে ইহা ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

৩২-৮ক। ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$। প্রকৃতিতে এত ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে যে উহা প্রস্তুত করার প্রশ্ন উঠে না। চুনাপাথর, চক, মার্বেল প্রভৃতি অস্বচ্ছ স্ফটিকাকার ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

অনেক সময় পর্বতের গুহা বা কন্দরের ভিতরে ছাদ হইতে অতি সুদৃশ্য স্বচ্ছ স্ফটিকাকার পাথর ঝুলিতে দেখা যায়। ইহাদের Stalactites বলা হয়। আবার কখনও গুহার মেঝে হইতে কোণের আকারে স্ফটিকগুচ্ছ উঠিতে দেখা যায়। ইহাদের নাম Stalagmites। ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট জলে থাকে। সেই জল উবিয়া গেলে উহা হইতে $CaCO_3$ থিতাইয়া এই সকল সুদৃশ্য স্ফটিকের ঝারের সৃষ্টি হয়।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে অদ্রাব্য, কিন্তু CO_2 সম্পৃক্ত জলে দ্রব হয় এবং ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয়।



$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$$

উত্তাপে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিযোজিত হইয়া চুন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। $CaCO_3$-এর নানা রকম ব্যবহার আছে। চুন ও CO_2 প্রস্তুতি তন্মধ্যে প্রধান। প্রাসাদ নির্মাণে, ভাস্কর্য শিল্পে ও নানা রকম বাসনপত্র প্রস্তুতিতে উহা ব্যবহৃত হয়। সিমেণ্ট, কাচ, লৌহ, সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতিতে চুনাপাথর একান্ত প্রয়োজনীয়। সাদা রং হিসাবে ও দন্তমঞ্জনে চক ব্যবহার হয়।

৩২-৯। ক্যালসিয়াম সালফেট, $CaSO_4$: প্রকৃতিতে জিপসাম, $CaSO_4, 2H_2O$ এবং অ্যানহাইড্রাইট, $CaSO_4$—এই দুইরকম ক্যালসিয়াম সালফেট দেখা যায়। ল্যাবরেটরীতে চুন বা চকের উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে ক্যালসিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা হয়।



$$CaCO_3 + H_2SO_4 = CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

জিপসাম সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, উহা জলে অনতিদ্রবণীয়। উহাকে প্রায় ২০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত করিলে উহার সমস্ত জল বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং অনার্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট পড়িয়া থাকে।

প্যারিস-প্লাস্টার—যদি জিপসামকে ১১০°-১২০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত করা হয় তবে উহার জল আংশিক দূরীভূত হয় এবং $(CaSO_4)_2, H_2O$ এইরূপ পদার্থে পরিণত হয়।



$$2[CaSO_4, 2H_2O]=(CaSO_4)_2, H_2O+3H_2O$$

ইহাকে প্যারিস-প্লাস্টার বলে। ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহা সাধারণ উষ্ণতায় সহজেই জল আকর্ষণ বা শোষণ করিয়া কঠিন সিমেণ্টের মত অনমনীয় সাদা জিপসামে পরিণত হইয়া যায়। এই জন্য ঢালাইয়ের কাজে, ভাস্কর্যে, যন্ত্র-চিকিৎসকের ব্যাণ্ডেজে এবং সিমেণ্ট হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। জিপসাম নিরুদিত করার সময় যেন উহা কোন বিজারক গ্যাসের সংস্পর্শে না আসে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ক্যালসিয়াম সালফেট বিজারিত হইয়া ক্যালসিয়াম সালফাইডে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

প্যারিস-প্লাস্টার প্রস্তুত করা ছাড়াও অন্যান্য কাজে জিপসাম ব্যবহৃত হয়। জমিতে সার হিসাবে, কাগজ শিল্পের পরিপূরক (Filler) রূপে, সাধারণ চক পেন্সিল হিসাবে যথেষ্ট জিপসাম ব্যবহার করা হয়।

সিমেণ্ট : পরিশুত কাদামাটি (Clay) এবং লাইমস্টোন ($CaCO_3$) একত্র মিশ্রিত করিয়া দীর্ঘসময় চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে উহা কঠিন কাঁকরে পরিণত হয়। অতিরিক্ত উষ্ণতায় উহাকে পোড়াইয়া বিচূর্ণ করিলে সিমেণ্ট পাওয়া যায়। সিমেণ্ট জলের সংস্পর্শে আসিলেই জল শোষণ করে এবং পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। এই গুণের জন্য ঘরবাড়ী, নল, পুল, রাস্তা প্রভৃতি বহু প্রকার নির্মাণ কার্যে সিমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। সিমেণ্ট প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের মিশ্রণ। যথা :—Ca_3SiO_5, Ca_2SiO_4, $Ca_3Al_2O_6$, $Ca_5Al_6O_{14}$, ইত্যাদি।

অ্যালুমিনিয়াম

চিহ্ন, Al। পারমাণবিক গুরুত্ব, ২৬.৯৭। ক্রমাঙ্ক, ১৩।

অ্যালুমিনিয়াম মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে না সত্য, কিন্তু উহার বহুরকমের যৌগ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, সমস্ত ধাতুর ভিতর অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণই ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক। উহার অধিকাংশই সিলিকেট

হিসাবে মাটিতে বা মাটিপাথরে থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি বিশেষ খনিজের নাম এখানে উল্লিখিত হইল :—

(১) অক্সাইড : (ক) বক্সাইট (Bauxite), Al_2O_3. $2H_2O$

(খ) জিবসাইট (Gibbsite), Al_2O_3, $3H_2O$

(২) ফ্লোরাইড : ক্রায়োলাইট (Cryolite), Na_3AlF_6

(৩) সালফেট : অ্যালুনাইট (Alunite), $Al_2(SO_4)_3$, K_2SO_4, $4Al(OH)_3$

(৪) সিলিকেট : (ক) ফেল্ডস্পার (Feldspar), $KAlSi_3O_8$

(খ) ক্যাওলিন (Kaolin), $H_4Al_2Si_2O_9$ ইত্যাদি।

বর্তমানে অবশ্য প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুত করা হয় এবং নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহার উৎপাদনপ্রণালী খুব বেশীদিনের পুরাতন নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়ামই সিলিকেট অবস্থায় থাকে এবং অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট হইতে ধাতুটি উৎপাদন করা খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য। অ্যালুমিনিয়ামের আর একটি প্রশস্ত আকরিক বক্সাইট, উহাতে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থাকে। কিন্তু অধিক উষ্ণতাতেও কার্বন দ্বারা উহাকে সহজে বিজারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে উহা ভাস্বর হইয়া উঠে, গলে না এবং উহা বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। এইজন্য সোজাসুজি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণও সম্ভব হয় না। এই সকল অসুবিধার জন্য বহুদিন পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম ধাতু মোটেই সহজলভ্য ছিল না।

১৮৮৬ সালে হল (Hall) এবং হেরোঁ (Heroult) উভয়েই দেখিতে পান যে বক্সাইট গলে না এবং বিদ্যুৎ-পরিবাহীও নয়, কিন্তু বক্সাইট গলিত ক্রায়োলাইটে দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবণের যথেষ্ট বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা আছে। গলিত ক্রায়োলাইটে বক্সাইট দ্রবীভূত করিয়া যদি উহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া যায় তাহা হইলে বক্সাইট বিযোজিত হইয়া যায় এবং ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

৩২-১০। অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতি : বর্তমানে সমস্ত অ্যালুমিনিয়ামই বক্সাইট হইতে তড়িৎবিশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। বক্সাইটের ভিতর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সাধারণতঃ ৫০-৬০% ভাগ মাত্র থাকে। ইহার সহিত প্রধানতঃ আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3) ও সিলিকা (SiO_2) মিশ্রিত থাকে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ করার পূর্বে বক্সাইট হইতে বিশুদ্ধতর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা (Al_2O_3) তৈয়ারী করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনাকে

অতঃপর গলিত ক্রায়োলাইটে দ্রবীভূত করিয়া তড়িৎ-বিশ্লেষিত করা হয়। প্রয়োজন-বোধে উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়ামের পুনরায় তড়িৎ-বিশোধন [Electro-refining] করা হয় :—

অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন-পদ্ধতিটি এইভাবে তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পাদিত হয় :—

(১) বক্সাইট হইতে শুদ্ধতর অ্যালুমিনা প্রস্তুতি,

(২) অ্যালুমিনার তড়িৎ-বিশ্লেষণ, এবং

(৩) উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়ামের তড়িৎ-বিশোধন।

এই প্রক্রিয়াগুলির জন্য অ্যালুমিনিযাম-উৎপাদন-শিল্পে নিম্নলিখিত উপাদান-সমূহ প্রয়োজন হয় :—

(১) বক্সাইট (Al_2O_3, $2H_2O$), (২) কস্টিক সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট, (৩) ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6), (৪) ফ্লুয়োস্পার (CaF_2), (৫) কোক (কার্বন)।

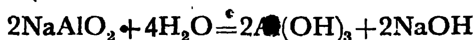
(১) **বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা প্রস্তুতি**—আজকাল সাধারণতঃ যে সকল বক্সাইটে সিলিকার পরিমাণ কম তাহাই ব্যবহৃত হয়। বিচূর্ণ অবস্থায় বক্সাইটকে একটি অটোক্লেভে (autoclave) প্রায় ছয় অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপ এবং ১৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের সহিত উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কস্টিক সোডার সহিত বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম অ্যালুমিনেটে পরিণত হয় এবং দ্রবীভূত হইয়া যায়। খানিকটা সিলিকাও সোডিয়াম সিলিকেট রূপে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু আয়রন অক্সাইডের কোন পরিবর্তন হয় না।


$$2NaOH + Al_2O_3 = 2NaAlO_2 + H_2O$$


$$2NaOH + SiO_2 = Na_2SiO_3 + H_2O$$

সোডিয়াম অ্যালুমিনেট ইত্যাদির দ্রবণটিতে কিছু জল মিশাইয়া উহাকে লঘু করিয়া, অদ্রবণীয় Fe_2O_3 হইতে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। অতঃপর দ্রবণটিতে অল্প-পরিমাণ সদ্য-প্রস্তুত β-অ্যালুমিনা [$Al(OH)_3$] দেওয়া হয় এবং সমস্ত দ্রবণটি দ্রুত আলোড়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং সমস্ত অ্যালুমিনিয়ামটুকু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড

রূপে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অধঃক্ষেপটি ছাঁকিয়া লইয়া বিশুদ্ধ করা হয় এবং পরে অতিরিক্ত উত্তাপে দহন করা হয় (ignited)। জল বিদূরিত হইয়া উহা শুদ্ধতর অ্যালুমিনাতে পরিণত হয়।

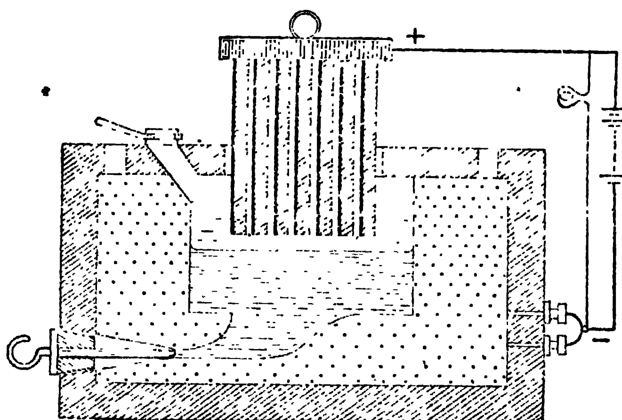


$$2NaAlO_2 + 4H_2O = 2Al(OH)_3 + 2NaOH$$



$$2Al(OH)_3 = Al_2O_3 + 3H_2O$$

(২) **তড়িৎ-বিশ্লেষণ**—অতঃপর ইস্পাতের তৈয়ারী ছোট ছোট লোহার ট্যাঙ্কে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনার তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরে উহার দেওয়াল ও মেঝে প্রায় ১' ফুট পুরু গ্র্যাফাইট কার্বন দ্বারা আবৃত থাকে। এই গ্র্যাফাইটই তড়িৎ-বিশ্লেষণের ক্যাথোডের কাজ করে। আর এক সারি গ্র্যাফাইট দণ্ড উপর হইতে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহারা অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্কের ভিতরে বিচূর্ণ ক্রায়োলাইট লইয়া বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের

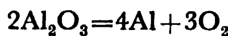


চিত্র ৩২ঘ—অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতি

সাহায্যে উহাকে গলান হয় এবং তৎপর গলিত ক্রায়োলাইটের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ যাইতে থাকে। এইভাবে উহাকে তরলিত অবস্থায় প্রায় ৯০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। অতঃপর গলিত ক্রায়োলাইটে অ্যালুমিনা-চূর্ণ দেওয়া হয়। উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহার সহিত অল্প পরিমাণে ফ্লুয়োস্পারও দেওয়া হয়। ফ্লুয়োস্পার দিলে মিশ্রণটির সান্দ্রতা কমিয়া তরলতা বৃদ্ধি পায়। মিশ্রণটিতে উপাদানগুলির অনুপাত—ক্রায়োলাইট : অ্যালুমিনা : ফ্লুয়োস্পার=৮০ : ২০ : ৭। অ্যানোড ও ক্যাথোড যথারীতি ব্যাটারীর সহিত

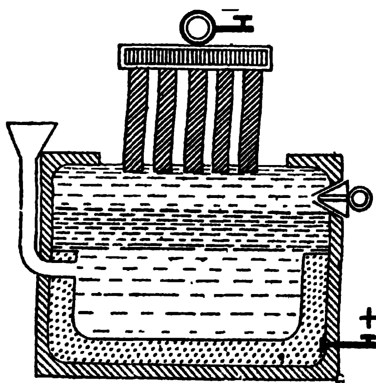
জুড়িয়া দিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হয় এবং ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম সঞ্চিত হয়। তরল অবস্থায় উহা গলিত ক্রায়োলাইটের নীচে জমিতে থাকে এবং প্রয়োজনমত নীচের দিকের একটি নির্গম-নল সাহায্যে বাহির করিয়া লওয়া হয়। বিশ্লেষণের ফলে অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং সেল হইতে বাহির হইয়া যায়। অধিক উষ্ণতার জন্য এই অক্সিজেন অ্যানোডের গ্র্যাফাইটকেও আক্রমণ করে। অ্যানোডের অপচয় নিবারণের জন্য গলিত ক্রায়োলাইটের উপর বিচূর্ণ কোক ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে অ্যানোডের পরিবর্তে অক্সিজেনে 'কোকচূর্ণ'ই জ্বলে। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ক্রমশঃ অ্যালুমিনার পরিমাণ কমিয়া আসিতে থাকে এবং গলিত মিশ্রণটির বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাও কমিয়া যায়। ব্যাটারীর সহিত এই সেল যুক্ত করার সময় খানিকটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ একটি বালবের' ভিতর দিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যখন ক্রায়োলাইট-মিশ্রণের বিদ্যুৎবাহিতা কমিয়া যায় তখন অধিকতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বালবের ভিতর দিয়া গিয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। ইহা ট্যাঙ্কের ভিতরের বিক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে। তখন আরও অ্যালুমিনা-চূর্ণ দেওয়া হয় এবং তড়িৎ-বিশ্লেষণটি অবিরাম চলিতে থাকে (চিত্র ৩২ঘ)।

বিশ্লেষণের ফলে ফ্লুয়োস্পার বা ক্রায়োলাইটের কোন রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু অ্যালুমিনা বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়।



$$2Al_2O_3 = 4Al + 3O_2$$

(৩) অ্যালুমিনিয়ামের তড়িৎ-বিশোধন [হুপ-পদ্ধতি, **Hoope's Process**]—বক্সাইটের তড়িৎ-বিশ্লেষণে যে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়, উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। এইজন্য উহাকে বিশোধিত করা হয়। উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়াম গলিত অবস্থাতেই আর একটি সেলে লইয়া যাওয়া হয়। এই সেলে NaF, BaF_2 এবং AlF_3-এর একটি মিশ্রণ গলিত অবস্থায় থাকে। উহার উপরে কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড ক্যাথোড হিসাবে রাখা হয় এবং

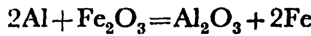


চিত্র ৩২ঙ—হুপ-পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম বিশোধন

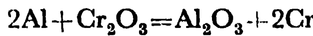
নীচে অবিশুদ্ধ গলিত অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডের কাজ করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিলে অ্যানোড হইতে অ্যালুমিনিয়াম আয়নিত হইয়া দ্রবীভূত হইতে থাকে এবং সম-পরিমাণ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণ হইতে ক্যাথোডে উৎপন্ন হয়। ক্যাথোড হইতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করা হয়।

৩২-১১। অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম—(ক) অ্যালুমিনিয়ামের রং সাদা কিন্তু উহার একটি ঈষৎ-নীলাভ দ্যুতি আছে। ধাতুটি অত্যন্ত হাল্‌কা, ইহার ঘনত্ব মাত্র ২·৭। অ্যালুমিনিয়াম ৬৫৮° সেন্টিগ্রেডে গলে। অ্যালুমিনিয়ামের ঘাতসহতা, প্রসার্যতা ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) শুষ্ক বাতাসে ধাতুটির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর্দ্র বাতাসে রাখিয়া দিলে অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটি খুব পাতলা অক্সাইডের আবরণ পড়ে। সাধারণ অবস্থায় বাতাস ও অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত না হইলেও, অধিকতর উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেন দ্বারা খুব সহজেই জারিত হয়। এমন কি, উত্তপ্ত অবস্থায় অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিজেন-আসক্তি এত বেশী যে উহা অন্যান্য ধাতব অক্সাইডকেও বিজারিত করিয়া দেয়। যথা :—



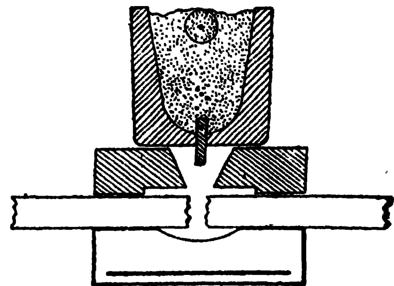
$$2Al + Fe_2O_3 = Al_2O_3 + 2Fe$$



$$2Al + Cr_2O_3 = Al_2O_3 + 2Cr$$

এইভাবে ধাতব অক্সাইডকে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণের সহিত উত্তপ্ত করিয়া কোন কোন ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। এই প্রণালীকে থারমাইট পদ্ধতি [Thermite Process] বলে।

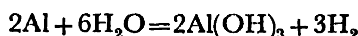
(গ) **থারমাইট পদ্ধতি**—অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় তৈয়ারী একটি খর্পরে ধাতব অক্সাইড (Fe_2O_3) ও অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণের মিশ্রণ লওয়া হয়। মিশ্রণের উপরে মধ্যস্থলে একটুখানি $KClO_3$, BaO_2 (জারক দ্রব্য) ও ম্যাগনেসিয়াম রাখিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ম্যাগনেসিয়াম জ্বলিয়া মিশ্রণটিকে অত্যন্ত তাপিত করিয়া দেয়। ফলে উত্তপ্ত অ্যালুমিনিয়াম বিস্ফোরণ সহকারে অক্সাইডকে বিজারিত করিয়া ধাতুতে পরিণত করে।



চিত্র ৩২চ—থারমাইট পদ্ধতি

যথেষ্ট উষ্ণতা থাকার জন্য উৎপন্ন ধাতু (লৌহ) গলিত অবস্থায় খর্পরের নীচে জড় হয় এবং একটি ছিদ্রপথে বাহির হইতে থাকে। কোন ভাঙা যন্ত্র বা রেল প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াই উহাকে গলিত ধাতু দ্বারা এইভাবে মেরামত করা সম্ভব (চিত্র ৩২চ)।]

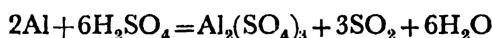
(ঘ) অ্যালুমিনিয়াম সাধারণ অবস্থায় জলের সহিত কোন ক্রিয়া করে না। কিন্তু পারদ-সহযোগে জলে দিলে উহা একটি বৈদ্যুতিক সেলে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় সহজেই জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে :—



$$2Al + 6H_2O = 2Al(OH)_3 + 3H_2$$

(ঙ) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত অ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়া করে ও হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্তু লঘু নাইট্রিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উহার কোন বিক্রিয়া ঘটে না। $2Al + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2$

(চ) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত অ্যালুমিনিয়াম উত্তপ্ত করিলে, উহা হইতে সালফার-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় :—



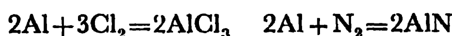
$$2Al + 6H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$$

(ছ) গাঢ় কস্টিক সোডা বা পটাস দ্রবণের সহিত অ্যালুমিনিয়াম তাপিত করিলে হাইড্রোজেন এবং অ্যালুমিনেট লবণ পাওয়া যায়।



$$2Al + 2NaOH + 2H_2O = 2NaAlO_2 + 3H_2$$

(জ) হ্যালোজেন দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম সোজাসুজি আক্রান্ত হয় এবং নাইট্রোজেন গ্যাসে অ্যালুমিনিয়াম উত্তপ্ত করিলে উহার নাইট্রাইড পাওয়া যায়।



$$2Al + 3Cl_2 = 2AlCl_3 \quad 2Al + N_2 = 2AlN$$

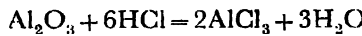
অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার—বর্তমান যুগে নানারকম প্রয়োজনে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। উহার কয়েকটি ব্যবহার এখানে উল্লেখ করা হইল :—

(১) এরোপ্লেন ইত্যাদি প্রস্তুতিতে, (২) বৈদ্যুতিক "ক্যাবল" (Cable) হিসাবে, ৩) পুল, সিঁড়ি প্রভৃতির নির্মাণকার্যে, (৪) বাসনপত্র, চেয়ার, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে, ৫) রঙ হিসাবে (অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ ও তিসির তৈল), (৬) থারমাইট বোমা, অ্যামোন্যাল (Ammonal, $Al + NH_4NO_3$) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ; ইত্যাদি। সামান্য Mg, Mn এবং Cu মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়ামের ধাতুসঙ্করকে "ডিউরালুমিন' (Duralumin) বলে। এরোপ্লেন প্রস্তুতিতে ইহা বহুল ব্যবহৃত।

৩২-১২। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা, Al_2O_3 : প্রকৃতিতে বিভিন্ন খনিজরূপে (বক্সাইট, জিবসাইট, প্রভৃতি) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডও স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ফটিকাকারে পৃথিবীতে পাওয়া যায়, উহাদিগকে 'কোরাণ্ডাম' [Corundum] বলে। চুণী, পান্না, পোখরাজ, নীলা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরসমূহও বস্তুতঃ কোরাণ্ডাম, কেবল স্বল্প পরিমাণে উহাতে বিভিন্ন অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে বলিয়া উহাদের বিভিন্ন রঙ হইয়া থাকে। 'এমারি' (Emery) নামে অস্বচ্ছ এবং অত্যন্ত শক্ত অ্যালুমিনাও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

সর্বত্রই বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তুতি-প্রণালীটি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের রঙ সাদা। উহা জলে অদ্রবণীয় উভধর্মী অক্সাইড। অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড লবণ ও জল উৎপাদন করে, আবার কস্টিকসোডা বা পটাসের সহিত গলাইলেও উহা অ্যালুমিনেট লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

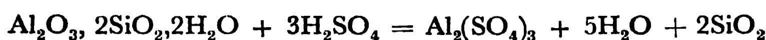

$$Al_2O_3 + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2O$$


$$Al_2O_3 + 2NaOH = 2NaAlO_2 + H_2O$$

অ্যালুমিনা অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতিতেই সর্বাধিক প্রয়োজন। তাহা ছাড়া অ্যালাম (ফটকিরি) ও অন্যান্য অ্যালুমিনিয়ামের লবণ প্রস্তুতিতে ইহা প্রয়োজন। "এমারি" অত্যন্ত শক্ত বলিয়া পালিশের কাজে লাগে। চুণী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথর অলঙ্কার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনার সহিত অন্যান্য অক্সাইড স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বৈদ্যুতিক শিখাতে গলাইয়া আজকাল কৃত্রিম জহরৎ প্রস্তুত করা হয়।

৩২-১৩। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, $Al_2(SO_4)_3$: বক্সাইটের উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা হয়। উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। দ্রবণটি ছাঁকিয়া লইয়া গাঢ় করিলে উহা হইতে $Al_2(SO_4)_3$, $18H_2O$ কেলাসিত হয়।
$Al_2O_3 + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$

ক্যাওলিন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত দীর্ঘকাল ফুটাইলে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট পাওয়া যায় :—

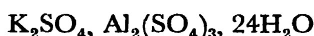


$$Al_2O_3, 2SiO_2, 2H_2O + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 5H_2O + 2SiO_2$$

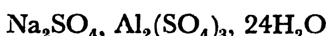
অ্যালুমিনিয়াম সালফেট জলে দ্রবণীয়। উহা নানারকম সালফেটের সহিত যুক্ত হইয়া দ্বিধাতুক লবণ উৎপাদন করিতে পারে।

জল পরিষ্করণে এবং রঞ্জনশিল্পে রাগবন্ধক (mordant) রূপে ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

৩২-১৪। অ্যালাম বা ফটকিরি (Alums) : অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের সহিত একযোজী ধাতুর সালফেট-সমূহ একত্র হইয়া দ্বিধাতুক লবণ উৎপন্ন করে এবং এই সকল যুগ্ম-সালফেট লবণগুলি সর্বদা ২৪টি জলের অণু সহ স্ফটিকাকারে কেলাসিত হয় ; যথা :—



$$K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$$



$$Na_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$$



$$(NH_4)_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$$ ইত্যাদি

অর্থাৎ, এই সকল দ্বিধাতুক সালফেট স্ফটিকের সঙ্কেত $R_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$ দেওয়া যাইতে পারে। 'R' এখানে যে কোন একযোজী ধাতুর অণু বা 'NH_4' যৌগমূলক হইতে পারে। এই সমস্ত দ্বিধাতুক লবণের সঙ্কেতই শুধু একরকম নয়, উহারা আবার সর্বদাই ২৪টি জলের অণু সহ কেলাসিত হয় এবং এই দ্বিধাতুক লবণ-সমূহ সমাকৃতি-সম্পন্ন (isomorphous)। এমন কি, যদি $Al_2(SO_4)_3$,-এর পরিবর্তে অন্য কোন ত্রিযোজী ধাতুর সালফেট একযোজী ধাতুর সালফেট সহ যুগ্ম-লবণ উৎপাদন করে, উহাও ২৪টি জলের অণু সহ পূর্বোক্ত লবণের সমাকৃতি-সম্পন্ন স্ফটিকাকারে কেলাসিত হয়। যথা :—



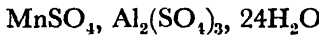
$$K_2SO_4, Cr_2(SO_4)_3, 24H_2O$$



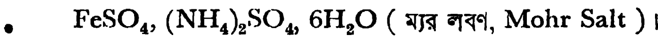
$$(NH_4)_2SO_4, Fe_2(SO_4)_3, 24H_2O$$ ইত্যাদি।

এইরূপ একযোজী এবং ত্রিযোজী দুইটি ধাতুর সালফেট মিলিয়া যখন ২৪টি জলের অণু সহ দ্বিধাতুক লবণ হিসাবে কেলাসিত হয়, উহাকে অ্যালাম বা ফটকিরি বলা হয়। সাধারণ ফটকিরি বলিতে পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট বুঝায়, $K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দ্বিযোজী বা অন্য কোন যোজ্যতাসম্পন্ন ধাতুর সালফেটের সহিত যদি কোন দ্বিধাতুক লবণ উৎপন্ন হয়, তবে উহারা ফটকিরির সহিত সমাকৃতি-সম্পন্ন হয় না এবং উহাদের আসল ফটকিরি বলিয়া ধরা হয় না। উহাদের স্ফটিকে ২৪টি জলের অণু থাকিতেও পারে, নাও পারে; যথা :—



$MnSO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$



$FeSO_4, (NH_4)_2SO_4, 6H_2O$ (ম্যর লবণ, Mohr Salt)।

পটাস-অ্যালাম (সাধারণ ফটকিরি), পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, $K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$:

অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের দ্রবণে প্রয়োজনানুসারে পটাসিয়াম সালফেট মিশ্রিত করিয়া লইয়া মিশ্রণটি গাঢ় করা হয়। শীতলাবস্থায় উহা হইতে দ্বিধাতুক সালফেট লবণ কেলাসিত হয়। এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রকৃতিজাত বক্সাইট বা অ্যালুনাইট খনিজ হইতে প্রথমে তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়।

রঞ্জনশিল্প, চামড়া প্রস্তুতি, জল পরিষ্করণ ও ঔষধে ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

নদী বা পুষ্করিণীর জল হইতে প্রলম্বিত বালু-মাটি প্রভৃতি সহজে থিতাইয়া লওয়ার জন্য ফটকিরি ব্যবহার করা হয়।

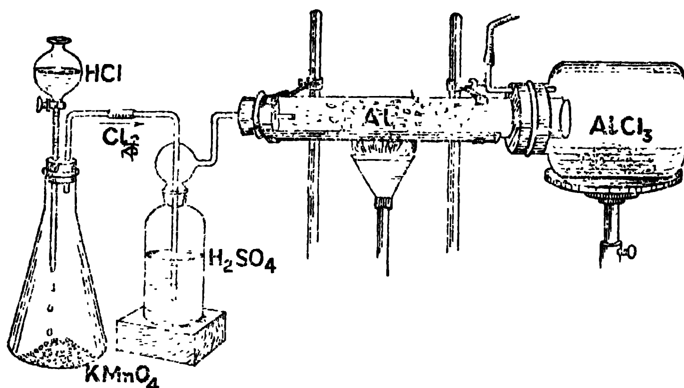
রঞ্জনশিল্পে সব রঙ সূতার উপর স্থায়ী হয় না—রঙের স্থায়িত্ব প্রদান করিতে হইলে বস্ত্র বা সূতাকে প্রথমে অ্যালাম বা অন্য কোন অ্যালুমিনিয়াম লবণের দ্রবণে সিক্ত করিয়া লওয়া হয়। তারপর উহাতে সোডার লঘু দ্রবণ বা স্টীম দিলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড সূতার অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। অতঃপর বস্ত্র বা সূতা রঙের ভিতর দিলে রঙটি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের সহিত যুক্ত হইয়া পাকা রঙে পরিণত হয়। এই প্রণালীকে সচরাচর "মর্ডান্টিং" (mordanting) বা রাগবন্ধন বলা হয়।

৩২-১৫। **অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, $AlCl_3$:** একটি কাচের নলে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু তাপিত করিয়া উহার উপর দিয়া শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস বা ক্লোরিন-বাষ্প পরিচালিত করিলেই অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড উদ্বায়িত হইয়া যায় এবং উহাকে একটি শীতল গ্রাহকে সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়।



$$2Al + 3Cl_2 = 2AlCl_3 : 2Al + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2$$

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডেও অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনা দ্রবীভূত হইয়া অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এই দ্রবণটি গাঢ় করিয়া শীতল করিলে,



চিত্র ৩২ছ—$AlCl_3$ প্রস্তুতি

$AlCl_3, 6H_2O$ স্ফটিক কেলাসিত হয়। সোদক স্ফটিক তাপিত করিয়া অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় না, উহা আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া যায়।



$$2[AlCl_3, 6H_2O]=Al_2O_3+6HCl+9H_2O$$

অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সাদা, অত্যন্ত উদ্‌গ্রাহী, স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে ইহা অত্যন্ত দ্রবণীয়। জৈব জাতীয় যৌগিক-পদার্থের সংশ্লেষণে অনার্দ্র $AlCl_3$ ব্যবহার হয়। পেট্রোলিয়াম পরিষ্করণেও ইহার ব্যবহার আছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

জিঙ্ক

জিঙ্ক (দস্তা)

চিহ্ন, Zn পারমাণবিক গুরুত্ব, ৭৫·৩৮ ক্রমাঙ্ক, ৩০।

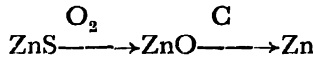
প্রকৃতিতে জিঙ্ক মৌলাবস্থায় থাকে না। সমস্ত জিঙ্কই যৌগরূপে পাওয়া যায়। উহার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম :—

(১) জিঙ্ক-ব্লেণ্ড (Zinc Blende), ZnS

(২) জিঙ্কাইট (Zincite), ZnO ; ফ্র্যাঙ্কলিনাইট (Franklinite), ZnO, Fe_2O_3

(৩) ক্যালামাইন (Calamine), $ZnCO_3$

৩৩-১। **জিঙ্ক**—উহার সালফাইড আকরিক (জিঙ্ক-ব্লেণ্ড) হইতেই প্রায় সমস্ত জিঙ্ক উৎপাদন করা হয়। জিঙ্ক-ব্লেণ্ডকে প্রথমে তাপ-জারিত করিয়া জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত করা হয় এবং পরে অধিকতর উষ্ণতায় জিঙ্ক-অক্সাইডকে কার্বনের সাহায্যে বিজারিত করিলে জিঙ্ক-ধাতু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমস্ত সালফাইড আকরিক হইতে ধাতু-নিষ্কাশনের ইহাই প্রশস্ত উপায়।



$$ZnS \xrightarrow{O_2} ZnO \xrightarrow{C} Zn$$

অতএব জিঙ্ক প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসাবে প্রয়োজন :—

(১) জিঙ্ক-ব্লেণ্ড, (২) কোক (কার্বন)।

সমস্ত পদ্ধতিটি মোটামুটি চারিটি প্রক্রিয়াতে বিভক্ত :—

(ক) আকরিকের গাঢ়ীকরণ (concentration)।

(খ) তাপজারণ দ্বারা জিঙ্ক-অক্সাইড উৎপাদন।

(গ) অক্সাইডের বিজারণ দ্বারা ধাতু উৎপাদন।

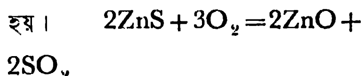
(ঘ) উৎপন্ন জিঙ্কের তড়িৎ-বিশোধন।

(১) **গাঢ়ীকরণ**—জিঙ্ক-ব্লেণ্ডের ভিতর জিঙ্ক-সালফাইড ছাড়া আরও অনেক আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এই সকল অপদ্রব্য প্রথমে যথাসম্ভব দূরীভূত করিয়া লওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে খনিজটিকে চূর্ণ করিয়া জল ও অল্প পরিমাণ তেলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণের ভিতর দিয়া বায়ু পরিচালিত করিলে, তেল-জলের উত্তমরূপ সংমিশ্রণের ফলে উহার উপরে ফেনা উৎপন্ন হয়। সালফাইড-চূর্ণ এই ফেনাতে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু মাটি, বালু প্রভৃতি অন্যান্য অপদ্রব্য জলের নীচে থিতাইয়া যায়। উপরের ফেনা হইতে সালফাইড সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ পাইন তেল এই কাজে ব্যবহৃত হয়, উহার সঙ্গে কখনও জ্যান্থেট (Xanthate)-যৌগও দেওয়া হয়।

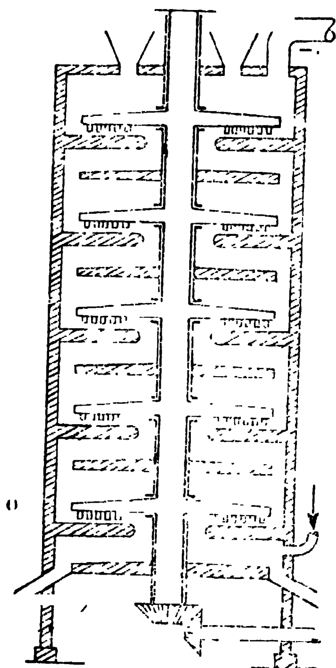
(২) **তাপ-জারণ (Roasting)**—গাঢ় জিঙ্ক-ব্লেণ্ডকে অতঃপর বায়ুপ্রবাহে তাপিত করিয়া জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ একটি হেরেসফ চুল্লীতে সম্পাদিত হয়।

৩৩-ক চিত্র হইতে হেরেসফ চুল্লীর একটি মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইবে। চুল্লীটি একটি উঁচু গোলাকার ড্রামের মত। ইস্পাতের তৈয়ারী হইলেও উহার দেওয়ালের অভ্যন্তর অগ্নিসহ-ইষ্টকের দ্বারা আবৃত। চুল্লীর ভিতরে অনেকগুলি

অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী তাক আছে। চুল্লীর উপরে দুইটি প্রবেশ-দ্বার আছে। ইহাদের ভিতর দিয়া গাঢ় জিঙ্ক-ব্লেণ্ড চুল্লীর মধ্যে দেওয়া হয়। চুল্লীটির ঠিক মধ্যস্থলে একটি খাড়া দণ্ড আছে। এই দণ্ড হইতে বাহুর অনুরূপ অনেকগুলি আলোড়ক বাহির হইয়াছে। মধ্যস্থিত দণ্ডটি বাহির হইতে সর্বদা আস্তে আস্তে ঘুরান হয়। ফলে আলোড়ক-বাহুগুলি বিভিন্ন তাকের জিঙ্ক-সালফাইডকে ধীরে ধীরে উপর হইতে নীচের দিকে পরিচালিত করিয়া দেয়। চুল্লীর নীচের দিকে একটি নলের সাহায্যে উহার ভিতরে উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ পরিচালিত করা হয়। এই উত্তপ্ত বায়ুর দ্বারা জিঙ্ক-সালফাইড জারিত হইয়া জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং চুল্লীর নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়।



$2ZnS + 3O_2 = 2ZnO + 2SO_2$

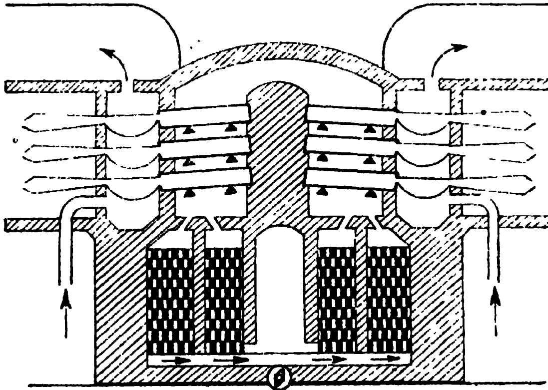


চিত্র ৩৩ক—হেরেসফ চুল্লী

(৩) **জিঙ্ক-অক্সাইডের বিজারণ**· তঃপর জিঙ্ক-অক্সাইডের সহিত উহার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ওজনের বিচূর্ণ কোক মিশ্রিত করিয়া উহাকে ছোট ছোট বকযন্ত্রে তাপিত করা হয়। জিঙ্ক-অক্সাইড বিজারিত হইয়া জিঙ্ক-ধাতুতে পরিণত হয়। $ZnO + C = Zn + CO$

একটি বিশেষ রকমের চুল্লীতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি চুল্লীতে অগ্নিসহ মৃত্তিকার তৈয়ারী ছোট ছোট প্রায় ষাটটি বকযন্ত্রে জিঙ্ক-অক্সাইড ও কোকের মিশ্রণ লওয়া হয়। এক একটি বকযন্ত্রে প্রায় আধমণ মিশ্রণ থাকে। চুল্লীর ভিতরে এই মাটির বকযন্ত্রগুলি উপর হইতে নীচে তিনটি সারিতে এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে প্রত্যেকটি বকযন্ত্রের মুখের দিকটি সামান্য ঢালু অবস্থায় চুল্লীর বাহিরের দিকে থাকে। সমস্ত চুল্লীটি আবৃত থাকে এবং নীচ হইতে গ্যাস-জ্বালানীর সাহায্যে বকযন্ত্রগুলিকে প্রায় ১২০০° সেন্টিগ্রেডে তাপিত করা হয়।

বকযন্ত্রের মুখে মাটির তৈয়ারী একটি গ্রাহক সংলগ্ন থাকে এবং উহার সহিত আর একটি লোহার তৈয়ারী শীতক-নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। উত্তাপে কার্বনদ্বারা জিঙ্ক-অক্সাইড বিজারিত হইয়া কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস শীতকের মুখে আসিয়া ঈষৎ-নীলাভ শিখাসহ জ্বলিতে থাকে। যখন বিজারণ-ক্রিয়া শেষ হইয়া আসে এবং উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়, তখন জিঙ্কও উদ্বায়িত হইয়া আসিয়া উজ্জ্বল সাদা শিখা সহ জ্বলিতে আরম্ভ করে। কার্বন-মনোক্সাইডের শিখা শেষ হইলেই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়। ইতিমধ্যে অধিকাংশ উৎপন্ন জিঙ্ক পাতিত হইয়া আসিয়া গ্রাহকের ভিতর সঞ্চিত হয়। খানিকটা জিঙ্ক-বাষ্প লোহার শীতকেও ঘনীভূত হয়। শীতকের জিঙ্কের সহিত কিছু জিঙ্ক-অক্সাইডও থাকে—ইহাকে জিঙ্ক-ডাস্ট বা দস্তারজঃ বলে (চিত্র ৩৩ খ)।



চিত্র ৩৩খ—জিঙ্ক প্রস্তুতি

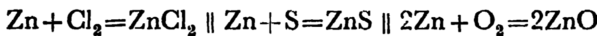
(৪) **জিঙ্কের তড়িৎ-বিশোধন**—উক্ত জিঙ্ক সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ নয়। উহাকে শোধিত করা প্রয়োজন। এইজন্য বিশুদ্ধ জিঙ্ক-সালফেট দ্রবণ ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবিশুদ্ধ জিঙ্ককে অ্যানোড রূপে এবং অ্যালুমিনিয়ামকে ক্যাথোড রূপে রাখিয়া ঐ দ্রবণের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ দিলে বিশুদ্ধ জিঙ্ক ক্যাথোডে জড় হয়।

৩৩-২। জিঙ্কের ধর্ম—জিঙ্ক ঈষৎ-নীলাভ সাদা ধাতু। বাতাসে রাখিয়া দিলে উহার গায়ে একটি জিঙ্ক-অক্সাইডের প্রলেপ বা স্তর পড়ে। ফলে, সচরাচর উহার ধাতব দ্যুতি দেখা যায় না। সাধারণ উষ্ণতায় এবং ২০০° সেন্টিগ্রেডেরও

অধিক উষ্ণতায় জিঙ্ক বেশ শক্ত এবং ভঙ্গুর দেখা যায়। কিন্তু ১০০°-১৫০° উষ্ণতায় উহার ঘাতসহতা ও নমনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় জিঙ্কের চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া লওয়া সম্ভব। জিঙ্কের গলনাঙ্ক ৪১৯° সেন্টি, স্ফুটনাঙ্ক ৯০৭° সেন্টি, এবং ঘনত্ব ৭·১৪।

উত্তপ্ত অবস্থায় সাধারণ জিঙ্কের উপর দিয়া স্টীম পরিচালিত করিলে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় :— $Zn + 2H_2O = Zn(OH)_2 + H_2$

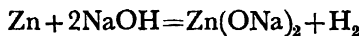
হ্যালোজেন সোজাসুজি জিঙ্ক আক্রমণ করে এবং উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিজেন ও সালফার দ্বারা আক্রান্ত হয়।



$$Zn + Cl_2 = ZnCl_2 \parallel Zn + S = ZnS \parallel 2Zn + O_2 = 2ZnO$$

জিঙ্ক লঘু অ্যাসিডের দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে :— $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$

কস্টিক সোডা বা পটাসের দ্রবণ দস্তারজঃ বা বিচূর্ণ-জিঙ্ক সহ ফুটাইলে, জিঙ্কেট-লবণ ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় :—



$$Zn + 2NaOH = Zn(ONa)_2 + H_2$$

জিঙ্কের ব্যবহার—বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সেল ও ব্যাটারীতে জিঙ্কের প্রয়োজন হয়। লোহার জিনিস মরিচা হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত দস্তা-লিপ্ত করা হয়, এই জন্য ঐ সকল জিনিস গলিত জিঙ্কে ডুবাইয়া লওয়া হয়। ফলে জিনিসের উপর দস্তার একটি প্রলেপ পড়ে। ঘরের "টিন", জলের বালতি প্রভৃতির উপর এইরূপ দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে "Galvanisation" বলে। অনেক সময় বিচূর্ণ দস্তারজঃ লোহার জিনিসের উপর মাখাইয়া উহাকে চুল্লীতে গরম করা হয়। ফলে, লোহার উপর দস্তার একটি দৃঢ় আবরণের সৃষ্টি হয়; ইহাকে 'Sherardisation" বলে।

ইহা ছাড়া অনেক রকম ধাতুসঙ্কর প্রস্তুতিতে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে পিতলই প্রধান (Brass)। তামা এবং দস্তার সমন্বয়ে পিতল তৈয়ারী হয়। অনেক মুদ্রাতে জিঙ্ক অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

আয়রন [লৌহ]

চিহ্ন, Fe   পারমাণবিক গুরুত্ব, ৫৫·৮৫   ক্রমাঙ্ক, ২৬।

পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার বিপুল। অ্যালুমিনিয়াম ব্যতীত অন্য কোন ধাতুই এত প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। ভূত্বকের ওজনের প্রায় শতকরা ৪·১২ ভাগ লৌহ।

স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু ধাতুরূপে লৌহ বিশেষ দেখা যায় না। ধাতুময় উল্কাপিণ্ডের ভিতরেই যেটুকু লৌহ পাওয়া যায় কেবল তাহাই মৌলরূপে থাকে। প্রকৃতিলব্ধ অন্যান্য সমস্ত লৌহ-ই যৌগাবস্থায় থাকে। পরিমাণে বেশী হইলেও উহার খনিজ আকরিকের সংখ্যা অধিক নহে। উহার প্রধান আকরিক :—

(১) অক্সাইড : (ক) ম্যাগনেটাইট (Magnetite), Fe_3O_4

(খ) হিমাটাইট বা লোহাপাথর (Hæmatite), Fe_2O_3

কখন কখন ইহা সোদক-অবস্থাতেও থাকে, Fe_2O_3, xH_2O।

(২) কার্বনেট : "স্প্যাথিক লৌহ-খনিজ" (Spathic Iron ore), $FeCO_3$

(৩) সালফাইড : আয়রন-পাইরাইটিস বা লৌহমাক্ষিক (Iron Pyrites), FeS_2.

প্রাণিদেহের রক্তের লাল-কণিকা হিমোগ্লোবিনে এবং উদ্ভিদের সবুজ অংশে লৌহঘটিত যৌগ আছে। জীবদেহ ও গাছপালার পুষ্টির জন্য উহা আবশ্যক।

আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত লোহা বা লোহার জিনিস দেখি, উহারা বিশুদ্ধ লৌহ নয়। সর্বদাই লোহার সহিত সামান্য পরিমাণ কার্বন ও অন্যান্য মৌল মিশ্রিত থাকে। লোহার ধর্ম ও প্রকৃতি মিশ্রিত-কার্বনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কার্বনের পরিমাণ অনুযায়ী লৌহকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) কাস্ট-আয়রন (Cast Iron) বা ঢালাই-লোহা ;

(২) স্টীল (Steel) বা ইস্পাত ;

(৩) রট-আয়রন (Wrought Iron) বা পেটা-লোহা।

প্রায় সমস্ত লৌহই উহার অক্সাইড খনিজ ম্যাগনেটাইট ও হিমাটাইট হইতে উৎপাদন করা হয়। কখন কখন কার্বনেট-আকরিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গন্ধকযুক্ত আকরিকগুলি লৌহ-নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয় না।

খনিজ হইতে প্রথমে যে লৌহ নিষ্কাশিত হয় তাহাই "কাস্ট-আয়রন"। স্টীল ও রট-আয়রন কাস্ট-আয়রন হইতে প্রস্তুত হয়।

৩৪-১। কাস্ট-আয়রন প্রস্তুতি—প্রখর তাপে অক্সাইড-খনিজগুলিকে কার্বন ও কার্বন-মনোক্সাইড দ্বারা বিজারিত করিয়া লৌহ-ধাতুতে পরিণত করা হয়। লৌহ-উৎপাদনের ইহাই মূল-কথা। দুইটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই নিষ্কাশন সম্পাদিত হয়—(১) ভস্মীকরণ এবং (২) বিগলন।

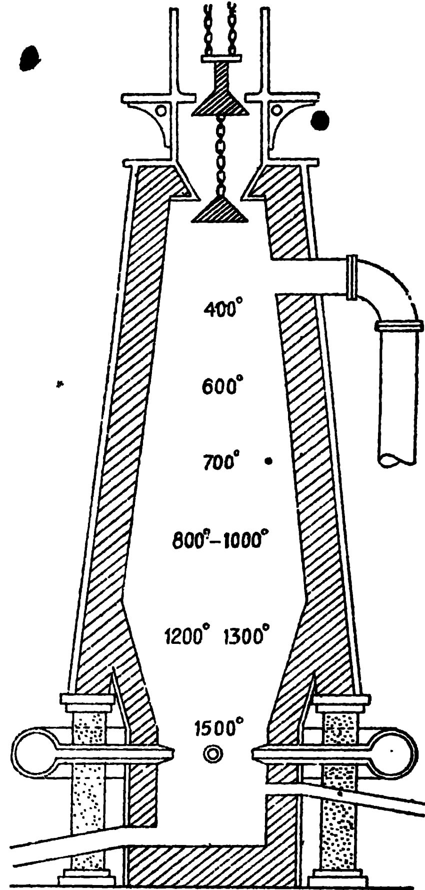
ভস্মীকরণ—একত্র-স্তূপীকৃত খনিজগুলিকে অল্প কয়লা পোড়াইয়া বাতাসের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার জন্য বড় বড় চুল্লী ব্যবহৃত হয়। তাপিত হওয়ার ফলে আকরিকের সহিত সংশ্লিষ্ট জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হইয়া যায় এবং খনিজ পাথরগুলি অনেকটা হাল্কা ও ঝাঁঝরা হয়। যদি আকরিকের ভিতর কোন ফেরাস-যৌগ থাকে তাহাও জারিত হইয়া ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়।

বিগলন—অতঃপর ঝাঁঝরা খনিজগুলিকে কোক ও চুনাপাথরের সহিত মিশাইয়া মারুত-চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে খনিজ পদার্থটি বিজারিত হয় এবং গলিত লৌহ নিষ্কাশিত হইয়া আসে।

মারুত-চুল্লী—লৌহ-নিষ্কাশনে ব্যবহৃত মারুত-চুল্লীগুলি আয়তনে খুব বড় এবং দেখিতে চিম্নীর মত। এই চুল্লীগুলি পুরু ইস্পাতের পাত জুড়িয়া তৈয়ারী করা হয়। শতাধিক ফিট উঁচু চুল্লীর সমস্ত অংশের পরিধি সমান নহে, মাঝখানের অংশটি অপেক্ষাকৃত মোটা। এই প্রশস্ত অংশটিকে চুল্লীর 'বস্' (Bosh) বলে। বস্ হইতে চুল্লীটি নীচের দিকে পুনরায় ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। ইস্পাতের ভিতরের দিকে অগ্নি-সহ মৃত্তিকার পুরু একটি আস্তরণ থাকে। চুল্লীর অধোদেশে এবং উহার চতুর্দিকে কয়েকটি শক্ত এবং মোটা নল সংযুক্ত থাকে। এই নলগুলিকে 'টায়ার' (Tuyers) বলে। ইহাদের সাহায্যে চুল্লীর অভ্যন্তরে বায়ু চালিত হয়। টায়ারেরও নীচে চুল্লীর নিম্নতম প্রকোষ্ঠটি থাকে এবং উৎপন্ন লৌহ ও ধাতুমল উহাতে সঞ্চিত হয়। উপাদান-সমূহ প্রবেশ করানোর জন্য চুল্লীর উপরে 'কাপ এণ্ড কোন' (Cup and cone) নামক একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার সাহায্যে খনিজ প্রভৃতি দেওয়ার সময় ভিতরের তপ্ত-গ্যাস এই পথে বাহির হইতে পারে না। চুল্লীর গ্যাস-সমূহ যাহাতে বাহির হইতে পারে সেইজন্য উপরের দিকে অপর একটি নির্গম-পথ থাকে। বস্ হইতে আরম্ভ করিয়া চুল্লীর নীচের অংশের চারিদিকে শীতল জলপ্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে প্রখর তাপে চুল্লীটির কোন ক্ষতি না হয়।

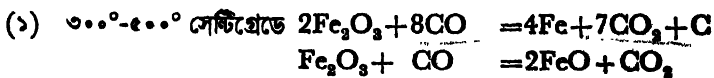
ঝাঁঝরা খনিজ, কোক এবং চুনাপাথর ছোট ছোট বিদ্যুৎ-চালিত গাড়ীতে ভরিয়া চুল্লীর উপরে লইয়া যাওয়া হয় এবং 'কাপ এণ্ড কোন' সরঞ্জামের সাহায্যে

চুল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়। উপাদানগুলি নিম্নোক্ত ওজনের অনুপাতে দেওয়া হয়; খনিজ : কোক : চুনাপাথর=৫ : ২ : ১। এই পদার্থগুলি এমন ভাবে দেওয়া হয় যাহাতে চুল্লীর প্রায় $\frac{8}{5}$ অংশ সব সময়েই ভরা থাকে। সঙ্গে সঙ্গে টায়ারের সাহায্যে উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু প্রচুর পরিমাণে চুল্লীর অধোদেশে প্রবেশ করানো হয়। প্রায় দুই অ্যাটমসফিয়ার চাপে এবং ৭০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই বাতাস প্রবেশ করে। উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে কোক প্রজ্বলিত হইয়া কার্বন-মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি করে। ফলে, অভ্যন্তরস্থ পদার্থগুলি অত্যন্ত তাপিত হইয়া উঠে। চুল্লীর সর্বত্র উষ্ণতা সমান থাকে না। 'বস' এবং উহার নিম্নাংশে উষ্ণতা সর্বাধিক, প্রায় ১৫০০° সেন্টিগ্রেড। 'বস' হইতে উপরের দিকে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং চুল্লীর গলার কাছে উষ্ণতা ৩০০°-৪০০° সেন্টিগ্রেড থাকে।



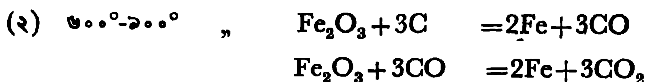
চিত্র—৩৪ক

এই সকল উষ্ণতায় আয়রন-অক্সাইডের সহিত কার্বন ও কার্বন-মনোক্সাইডের নানারূপ বিক্রিয়া ঘটে এবং ধাতব লৌহ উৎপন্ন হইতে থাকে। বিভিন্ন উষ্ণতায় নিম্নলিখিতরূপে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় বলিয়া মনে হয় (চিত্র ৩৪ক)।



(১) ৩০০°-৫০০° সেন্টিগ্রেডে $2Fe_2O_3+8CO = 4Fe+7CO_2+C$

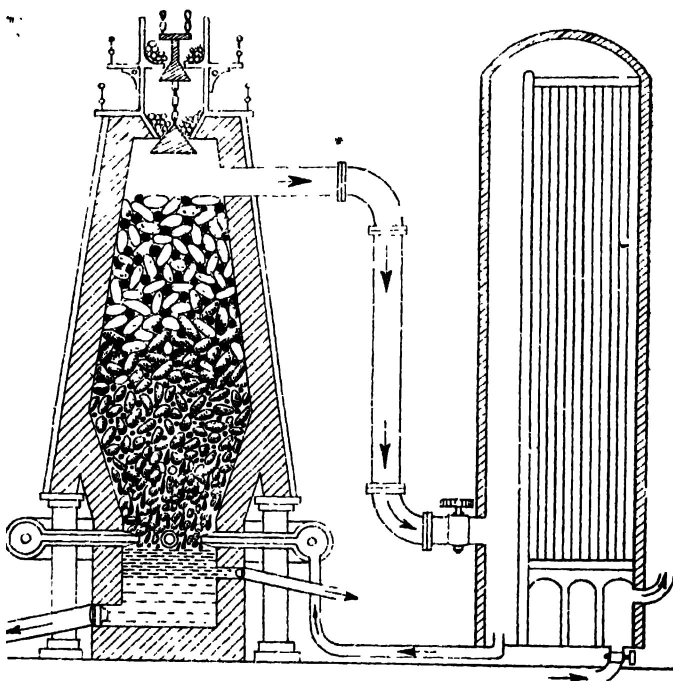
$Fe_2O_3+CO = 2FeO+CO_2$



(২) ৬০০°-৯০০° „ $Fe_2O_3 + 3C = 2Fe + 3CO$

$Fe_2O_3 + 3CO = 2Fe + 3CO_2$

অর্থাৎ 'বসে'র উপরেই অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতাতেই কঠিন আয়রন-অক্সাইড বিজারিত হইয়া যায়। বিজারণের ফলে উৎপন্ন লৌহ এই উষ্ণতায় গলে না, কিন্তু কোমল ও ঝাঁঝরা (Spongy) অবস্থায় থাকে। 'বসে'র দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার ফলে উষ্ণতা-বৃদ্ধি হেতু এই বিজারণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং উৎপন্ন লৌহ গলিত অবস্থায় পরিণত হয়।



চিত্র ৩৪খ—মারুত-চুল্লীতে লৌহ উৎপাদন

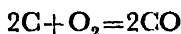
আয়রন-অক্সাইডের বিজারণ ছাড়া আরও অবশ্য-প্রয়োজনীয় একটি বিক্রিয়া চুল্লীর উপরিভাগেই সংঘটিত হয়। চুনাপাথর প্রথমে বিযোজিত হইয়া চুন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। চুন খনিজের সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়া ক্যালসিয়াম-সিলিকেটে পরিণত হয়। উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে ক্যালসিয়াম-সিলিকেট

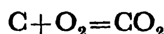
গলিয়া যায়। ইহা অন্যান্য সিলিকেট ও খনিজের অন্যান্য আবর্জনা শোষণ করিয়া ধাতুমলের সৃষ্টি করে।

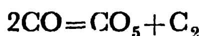

$CaCO_3 = CaO + CO_2$


$CaO + SiO_2 = CaSiO_3$

অতএব 'বসে'র নিকট হইতে নীচ পর্যন্ত খানিকটা কোক ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই অর্থাৎ লৌহ এবং ধাতুমল গলিত অবস্থায় থাকে। টায়ারের উপরে কোক পুড়িয়া প্রধানতঃ কার্বন-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। খানিকটা কার্বন-ডাই-অক্সাইডও হইতে পারে। কিছুটা কার্বন-মনোক্সাইড 'বসে'র নিকটে আসিয়া কয়লার সংস্পর্শে আবার বিযোজিত হইতে পারে।


$2C + O_2 = 2CO$

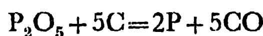

$C + O_2 = CO_2$


$2CO = CO_5 + C_2$

চুল্লীর নিম্নাংশে, ১৪০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় খনিজের সহিত মিশ্রিত ম্যাঙ্গানিজ-অক্সাইড, কিছু সিলিকা, ফসফেট ইত্যাদিও বিজারিত হয় এবং মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন করে। অবশ্য ইহাদের পরিমাণ সামান্য। যথা :—

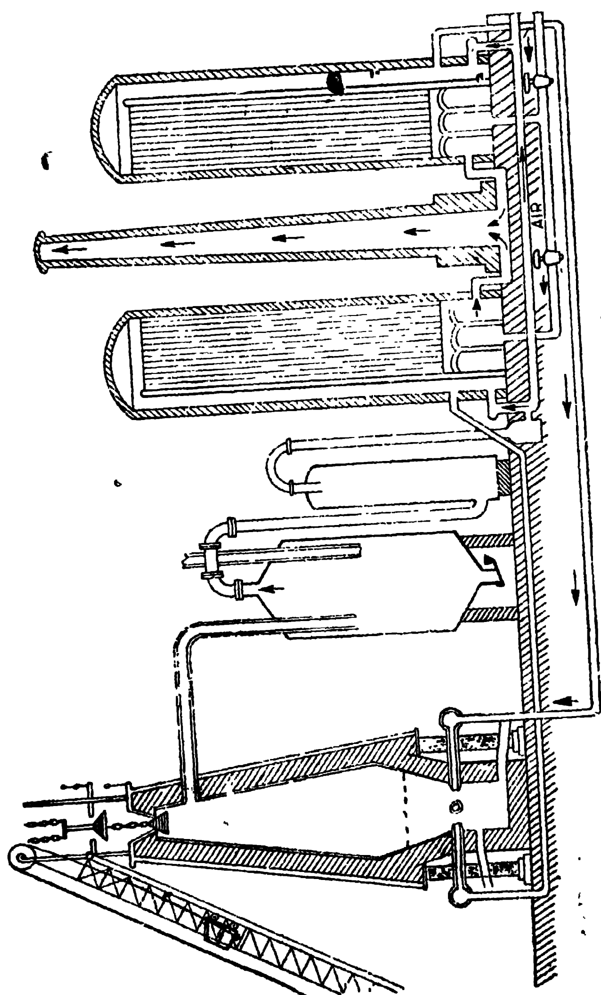

$SiO_2 + 2C = Si + 2CO$


$MnO_2 + 2C = Mn + 2CO$


$P_2O_5 + 5C = 2P + 5CO$

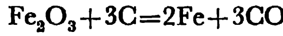
যদি কোন আয়রন-সালফাইড মিশ্রিত থাকে, তাহাও বিজারিত হইয়া যায় :—$FeS + CaO + C = CaS + CO + Fe$

কিয়ৎপরিমাণ কার্বন এবং বিজারিত মৌল পদার্থগুলিকে (Si, P, Mn ইত্যাদি) গলিত লৌহ শোষণ করিয়া লয়। অন্যান্য যে সকল যৌগ থাকে তাহা ক্যালসিয়াম-সিলিকেটের সহিত মিশিয়া ধাতুমলে পরিণত হয়। লৌহ ও ধাতুমল উভয়েই গলিত অবস্থায় নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। ধাতুমল লৌহ অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা, সুতরাং উহা লৌহের উপরে ভাসিতে থাকে। দুইটি নির্গম-নলের সাহায্যে এই দুইটি পদার্থকে পৃথকভাবে বাহির করিয়া লওয়া হয়। গলিত লৌহকে ঠাণ্ডা করিয়া বড় বড় তাল করা হয়। উহাকেই কাস্ট-আয়রন অথবা ঢালাই লোহা বলে। ইহাতে মোটামুটি কার্বন (২-৪·৫% ভাগ), ম্যাঙ্গানিজ (·৮% ভাগ), সিলিকন (১-৩৮% ভাগ) এবং ফসফরাস (·১০% ভাগ) দ্রবীভূত থাকে। ধাতুমল বা গাদ গৃহাদি-নির্মাণে, সিমেণ্ট-প্রস্তুতিতে এবং আরও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৩৪গ—কাস্ট-আয়রন উৎপাদন প্রণালী

৩৪-২। **রট-আয়রন প্রস্তুতি ঃ**—'কাস্ট-আয়রনে' লৌহ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল মৌল থাকে সেগুলিকে যথাসাধ্য দূরীভূত করিলেই 'রট-আয়রন' পাওয়া সম্ভব। কাস্ট-আয়রনের সহিত অব্যবহার্য লোহার টুকরা ইত্যাদি মিশাইয়া উহাকে একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে গলানো হয়। এই চুল্লীতে একটি অক্সাইডের আস্তরণ থাকে। সালফার, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতি প্রথমে ফেরিক অক্সাইড দ্বারা জারিত হয় এবং তৎপর আয়রন-অক্সাইডের সহিত মিশিয়া ধাতুমল উৎপাদন করে। উপর হইতে এই গাদটিকে সরাইয়া লওয়া হয়। কার্বন, ফেরিক অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কার্বন-মনোক্সাইডে রূপান্তরিত হইয়া বাহির হইয়া যায়।



$$Fe_2O_3+3C=2Fe+3CO$$

যাহাতে সমস্ত অপদ্রব্যগুলি ফেরিক অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিয়া দূরীভূত হয় সেইজন্য দীর্ঘ লৌহদণ্ডের সাহায্যে গলিত লৌহকে ক্রমাগত নাড়ানো হয়। আবর্জনা পৃথক হইয়া যাওয়াতে লৌহের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় এবং উহা পিণ্ডাকারে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। এই অবস্থাতেই প্রায় একমণ ওজনের এক একটি ডেলা বলের আকারে লইয়া স্টীম-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়া অভ্যন্তরস্থ গাদ বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে 'রট-আয়রন' প্রস্তুত হয়। ইহা বিশুদ্ধতর লৌহ বটে, কিন্তু ইহাতে সামান্য পরিমাণ কার্বন (·২৫%) ও ধাতুমল মিশ্রিত থাকে।

৩৪-৩। **ইস্পাত বা স্টীল প্রস্তুতি ঃ** সচরাচর স্টীলের ভিতর কার্বনের অনুপাতে ·৫-১·৫% ভাগ থাকে। সুতরাং প্রয়োজনানুরূপ কার্বন রট-আয়রনে মিশাইয়া অথবা কাস্ট-আয়রন হইতে সরাইয়া লইলে স্টীল পাওয়া যাইতে পারে।

(ক) **সিমেণ্টেসন প্রণালী (Cementation Process)**—বড় বড় রট-আয়রনের টুকরাগুলিকে অগ্নিসহ-ইটের বাক্সে কোকচূর্ণের ভিতর রাখিয়া চুল্লীতে লোহিত-তপ্ত করা হয়। এইভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিলে লৌহ খানিকটা কার্বন শোষণ করে এবং উত্তম স্টীলে পরিণত হয়। ব্যয়সাধ্য বলিয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এই পদ্ধতি অবিলম্বিত হয় না।

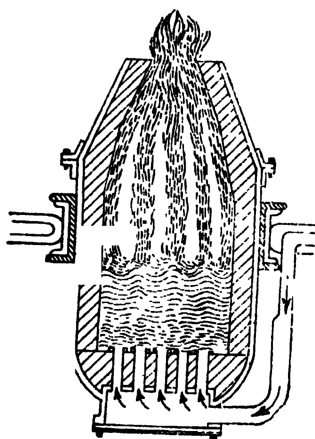
কিন্তু সাধারণ প্রয়োজনের সমস্ত স্টীলই কাস্ট-আয়রন হইতে বিসিমার অথবা সিমেন্স-মার্টিন প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। এই উভয় পদ্ধতিতেই প্রথমে কাস্ট-আয়রনের অপদ্রব্যগুলিকে জারিত করিয়া দূর করা হয় এবং পরে যতটা

আবশ্যক ততটা কার্বন এবং অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া উহাকে স্টীলে পরিণত করা হয়।

অল্প লৌহের সহিত কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া গলান হয়। এই মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাকে 'স্পাইজেল' (Spiegel) বলে। বিশুদ্ধতর লৌহের সহিত প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণে এই স্পাইজেল মিশাইয়া স্টীলের ভিতর ইচ্ছানুরূপ কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ রাখা যায়।

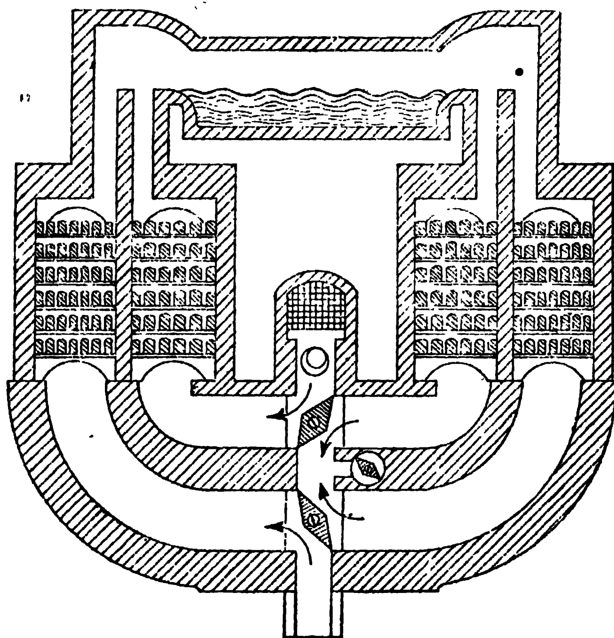
(খ) **বিসিমার প্রণালী (Bessemer's Process)**—বিসিমার-পদ্ধতির আদি-প্রচলন ভারতবর্ষে। বিসিমার সাহেব মাদ্রাজের লৌহকারদের নিকট ইহা শিক্ষা করেন এবং গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে নিজের নামানুসারে ইহার প্রবর্তন করেন।

এই পদ্ধতিতে স্টীল প্রস্তুত করিতে একটি বিশেষ ধরণের চুল্লী ব্যবহৃত হয়। এই চুল্লীকে 'বিসিমার কনভারটার' বলে। এই কনভারটার ইস্পাত বা পেটা-লোহার তৈয়ারী এবং দেখিতে ডিম্বাকৃতি। অবলম্বনের জন্য দুইটি শক্ত লৌহদণ্ড ও যন্ত্রযুক্ত চাকার সাহায্যে এই ডিম্বাকৃতি চুল্লীটি মাটি হইতে কিছু উপরে ঝুলান থাকে। চাকার সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী চুল্লীটিকে সোজা, কাৎ বা উপুড় করা সম্ভব। চুল্লীর নীচে বায়ু-প্রবেশের জন্য কয়েকটি নল সংযুক্ত থাকে। ইস্পাতের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পুরু আস্তরণ থাকে। স্টীল প্রস্তুত করিতে যে কাস্ট-আয়রন ব্যবহৃত হইবে তাহাতে যদি ফসফরাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে তাহা হইলে ক্ষারজাতীয় আস্তরণ দেওয়া হয়—উহাতে ডলোমাইট, $CaCO_3$, $MgCO_3$, ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে, কনভারটারে ব্যবহৃত কাস্ট-আয়রনে যদি ফসফরাসের ভাগ খুব কম থাকে তবে অম্লজাতীয় আস্তরণ দেওয়া হয়—উহাতে সিলিকা থাকে (চিত্র ৩৪ঘ)।



চিত্র ৩৪ঘ—বিসিমার কনভারটার

মারুত-চুল্লী হইতে সোজাসুজি কাস্ট-আয়রন বিসিমার কনভারটারে লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাস্ট-আয়রনে ভরিয়া কনভায়টারটিকে সোজা অবস্থায় রাখিয়া উহার নীচের নলের ভিতর দিয়া অতিরিক্ত চাপে বায়ু পরিচালিত করা হয়। প্রথমেই ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতি জারিত হয় এবং আস্তরণের সহিত মিশিয়া ধাতুমলে পরিণত হয়। ফসফরাস থাকিলে (CaO-MgO-এর আস্তরণ থাকে) উহাও ফসফেটে পরিণত হয়। শেষে কার্বনও জারিত হয় এবং উৎপন্ন কার্বন-মনোক্সাইড চুল্লীর মুখে আসিয়া ঈষৎ নীল শিখা সহ জ্বলিতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কার্বন-মনোক্সাইডের শিখাটি নিভিয়া যায়। তখন বুঝা যায় সমস্ত কার্বন দূর হইয়াছে। চুল্লীটিকে অতঃপর কাৎ করিয়া ভাসমান ধাতুমল পৃথক করিয়া লওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পাইজেল উহাতে মিশান হয়। উত্তমরূপে মিশ্রণের জন্য আরও দুই-এক মিনিট



চিত্র ৩৪৬—সিমেন্স-মার্টিন চুল্লী

বাতাস উহার ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। পরে কনভারটারটি উপুড় করিয়া স্টীল বাহির করিয়া ছাঁচে ঢালাই করা হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই এই ভাবে

কাস্ট-আয়রন স্টীলে পরিণত হয় এবং প্রতিটি চুল্লী হইতে প্রায় আড়াই শত মণ স্টীল পাওয়া যায়।

(ঘ) **সিমেন্স-মার্টিন-প্রণালী** (**Siemens-Martin Open Hearth Process**)—এই প্রণালীতেও বিসিমার-পদ্ধতির অনুরূপ কাস্ট-আয়রনের অপদ্রব্যগুলি যথাসম্ভব জারিত করিয়া দূর করা হয় এবং তৎপর প্রয়োজন-মত স্পাইজেল মিশ্রণ হয়।

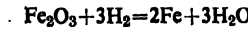
এই পদ্ধতিতে অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী চতুষ্কোণ একটি প্রকোষ্ঠ চুল্লীরূপে ব্যবহৃত হয়। চুল্লীর গহ্বরটি সমতল এবং প্রশস্ত। এই চুল্লীর উপরে একটি নীচু ছাদ আছে। চুল্লীর উভয় প্রান্তেই গ্যাস প্রবেশ ও নির্গমনের ব্যবস্থা আছে (চিত্র ৩৪ ঙ)। চুল্লীর অভ্যন্তরে অম্লজাতীয় SiO_2 অথবা ক্ষারজাতীয় CaO-MgO আস্তরণ থাকে। ফসফরাসের পরিমাণ অধিক হইলে ক্ষারজাতীয় প্রলেপের প্রয়োজন হয়, নতুবা অম্লজাতীয় আস্তরণ থাকাই সুবিধাজনক। এই চুল্লীর অদূরে অনতিরিক্ত বায়ুযোগে কয়লা পোড়াইয়া প্রডিউসার গ্যাস $(CO+N_2)$ তৈয়ারী করা হয়। অতিরিক্ত বায়ুর সহিত প্রডিউসার গ্যাস মিশ্রিত করিয়া লইয়া সিমেন্স-মার্টিন চুল্লীর ভিতরে উহা জ্বালান হয়। এইভাবে এই চুল্লীর অভ্যন্তরে প্রখর তাপ সৃষ্টি করা হয়।

মারুত-চুল্লী হইতে গলিত কাস্ট-আয়রন সোজাসুজি সিমেন্স-মার্টিন চুল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। উহার সহিত ফ্যাক্টরীর অব্যবহার্য ছাঁটাই স্টীল এবং কিছু হিমাটাইট মিশাইয়া দেওয়া হয়। হিমাটাইট Fe_2O_3 দ্বারা কাস্ট-আয়রনের কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি জারিত হয়। কার্বন-মনোক্সাইড উড়িয়া যায়। অন্যান্য অক্সাইড আস্তরণের সংস্পর্শে আসিয়া ধাতুমলে পরিণত হয়। এইভাবে কাস্ট-আয়রনের অপদ্রব্য দূর হইলে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পাইজেল উহাতে দেওয়া হয় এবং আরও তাপিত করিয়া উহাকে উত্তমরূপে মিশাইয়া লওয়া হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করিতে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা প্রয়োজন। স্টীল গলিত অবস্থায় বাহির করিয়া ছাঁচে ঢালা হয়।

বিসিমার স্টীল অপেক্ষা সিমেন্স-মার্টিন স্টীল অনেক উৎকৃষ্ট। সুতরাং সময় বেশী লাগিলেও ভাল স্টীল প্রয়োজন হইলে এই উপায়েই তৈয়ারী করা বাঞ্ছনীয়। কাস্ট-আয়রনে ফসফরাসের পরিমাণ বেশী থাকিলেও এই উপায়ে স্টীল প্রস্তুত করা ভাল।

অনেক সময় মারুত-চুল্লীজাত লৌহের সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং প্রায় সবটা কার্বন বিসিমার পদ্ধতিতে তাড়াইয়া অবশিষ্ট ফসফরাস সিমেন্স-মার্টিন চুল্লীতে দূরীভূত করা হয়। বস্তুতঃ ইহা দুইটি পদ্ধতির সমন্বয়। ইহাকে 'ডুপ্লে প্রণালী' বলে। টাটার কারখানাতে ইহার ব্যবহার হয়।

বিশুদ্ধ লৌহ—সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ লৌহ পাইতে হইলে উত্তপ্ত ফেরিক অক্সাইডকে হাইড্রোজেন গ্যাসে বিজারিত করা হয়।



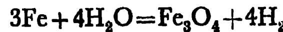
$$Fe_2O_3+3H_2=2Fe+3H_2O$$

লৌহ লবণের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণেও বিশুদ্ধ লৌহ ক্যাথোডে পাওয়া যায়।

৩৪-৪। **লৌহের ধর্ম**:—বিশুদ্ধ লৌহ উজ্জ্বল সাদা রঙের ধাতু। উহার ঘনত্ব ৭·৮৫, গলনাঙ্ক ১৫৩০° এবং স্ফুটনাঙ্ক ২৪৫০° সেন্টিগ্রেড। ইহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

শুষ্ক বাতাসে লৌহের কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু আর্দ্র বাতাসে অতি সহজেই সাধারণ লৌহের উপর মরিচা পড়িতে থাকে।

অক্সিজেন গ্যাসে লোহিততপ্ত করিলে লৌহ জ্বলিয়া উঠে এবং জারিত হইয়া Fe_3O_4 অক্সাইডে পরিণত হয়। লোহিততপ্ত লোহার উপর দিয়া স্টীম পরিচালিত করিলেও লৌহ জারিত হইয়া যায়:—



$$3Fe+4H_2O=Fe_3O_4+4H_2$$

কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাসে তাপিত করিলে, লৌহ উহার সহিত যুক্ত হইয়া 'আয়রন কার্বনিলে' পরিণত হয়:—$Fe+5CO=Fe(CO)_5$

হ্যালোজেন, সালফার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত করিলে, লৌহ উহাদের সঙ্গে যুক্ত হয়:— $Fe+S=FeS$ $2Fe+3Cl_2=2FeCl_3$

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা লৌহ আক্রান্ত হইয়া ফেরাস লবণে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।



$Fe+H_2SO_4=FeSO_4+H_2$ $Fe+2HCl=FeCl_2+H_2$

নাইট্রিক অ্যাসিডেও লৌহ দ্রব হয়। বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের বিক্রিয়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। যথা:—

(ক) শীতল অবস্থায় লঘু অ্যাসিডে



$$4Fe+10HNO_3=4Fe(NO_3)_2+NH_4NO_3+3H_2O$$

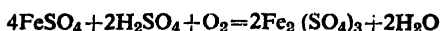
(খ) উষ্ণ অবস্থায় গাঢ় অ্যাসিডে



$$Fe + 6HNO_3 = Fe(NO_3)_3 + 3NO_2 + 3H_2O$$

বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিডে বা ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিডে লৌহ রাখিলে উহা দ্রবীভূত না হইয়া 'নিষ্ক্রিয় লৌহে' পরিণত হয়। সাধারণ লৌহ কপার-সালফেটের সহিত বিক্রিয়া করে, লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে, ইত্যাদি। কিন্তু যে লৌহ বিশুদ্ধ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিয়াছে উহার ঐ সকল ধর্ম লোপ পায়। কপার-সালফেট বা HCl এর সহিত উহা আর বিক্রিয়া করিতে পারে না। এইরূপ লৌহকে 'নিষ্ক্রিয় লৌহ' (Passive iron) বলা হয়। নিষ্ক্রিয় লৌহের উপরিভাগ ঘসিয়া ফেলিলে অথবা উহাকে H_2 গ্যাসে উত্তপ্ত করিলে অথবা এক টুকরা জিঙ্কের সহিত লঘু অ্যাসিডে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে উহার নিষ্ক্রিয়তা লোপ পায় এবং উহা আবার সাধারণ লৌহে পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ক্রোমিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড দ্বারাও লৌহকে এইরূপ নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব। সাধারণতঃ মনে করা হয়—এই সকল অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বিকারক দ্বারা লৌহের উপরি উহার অক্সাইডের একটি অতি পাতলা আবরণ পড়ে এবং এই আবরণটি লৌহের অন্যান্য বিক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

আয়রনের দুইটি যোজ্যতা আছে—দুই এবং তিন। সুতরাং দ্বিযোজী আয়রনের যৌগকে ফেরাস-যৌগ এবং ত্রিযোজী আয়রনের যৌগকে ফেরিক-যৌগ বলা হয়। সাধারণতঃ ফেরিক-যৌগসমূহ ফেরাস-যৌগ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়। ফেরাস-যৌগগুলি বাতাস, অক্সিজেন, ওজোন, নাইট্রিক অ্যাসিড, ডাই-ক্রোমেট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভৃতি দ্বারা জারিত হইয়া ফেরিক-যৌগে পরিণত হয়। ফেরিক-যৌগগুলিকে ফেরাস-অবস্থায় রূপান্তরিত করিতে হইলে $SnCl_2$, SO_2, H_2S প্রভৃতির সাহায্যে বিজারিত করা প্রয়োজন। যথা :—



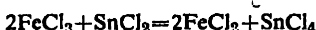
$$4FeSO_4 + 2H_2SO_4 + O_2 = 2Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$



$$2FeSO_4 + 3H_2SO_4 + 2HNO_3 = 2Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + 4H_2O$$



$$2FeSO_4 + H_2SO_4 + H_2O_2 = Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$



$$2FeCl_3 + SnCl_2 = 2FeCl_2 + SnCl_4$$



$$FeCl_3 + H = FeCl_2 + HCl$$



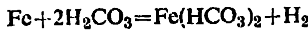
$$2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + S + 2HCl$$

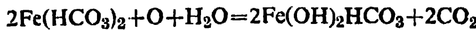
৩৪-৫। লৌহের মরিচা (Rusting of Iron)—সাধারণ লৌহকে আর্দ্র বাতাসে রাখিয়া দিলে উহার উপরিভাগ ধীরে ধীরে একটি বাদামী রঙের গুঁড়াতে পরিণত হইতে থাকে। ইহাকে লোহার 'মরিচা ধরা' বলা হয় এবং একবার মরিচা পড়িতে আরম্ভ করিলে খুব দ্রুত এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে। মরিচা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে উহাতে সোদক 'আয়রন-অক্সাইড' থাকে এবং উহার মোটামুটি সঙ্কেত—$2Fe_2O_3,3H_2O$।

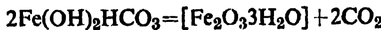
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহে মরিচা পড়ে না। মরিচা পড়িতে হইলে জল বা জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। উহাদের যে কোন একটির অবর্তমানে লোহার উপর মরিচা পড়ে না। মরিচা-ধরা সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। উহাদের দুই একটি আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) কেহ কেহ মনে করেন, বাতাসের জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে যে কার্বনিক অ্যাসিড হয়, উহা লোহাকে আক্রমণ করে এবং উহাকে অ্যাসিড-ফেরাস-কার্বনেটে পরিণত করে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে উহা ক্ষারকীয় কার্বনেটে রূপান্তরিত হয় এবং পরে আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়। উহাই মরিচা।

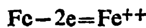

$$CO_2+H_2O=H_2CO_3$$

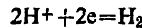

$$Fe+2H_2CO_3=Fe(HCO_3)_2+H_2$$


$$2Fe(HCO_3)_2+O+H_2O=2Fe(OH)_2HCO_3+2CO_2$$


$$2Fe(OH)_2HCO_3=[Fe_2O_33H_2O]+2CO_2$$

(খ) 'মরিচা-পড়া' সম্পর্কে অপর একটি মতবাদে লোহার ভিতরে বৈদ্যুতিক সেলের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। গ্র্যাফাইট-কার্বন-কণিকা ও লৌহ-কণিকাগুলি পরা ও অপরা তড়িৎদ্বার স্বরূপ কাজ করে এবং জল তড়িৎ-বিশ্লেষ্যরূপে এই ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সেলে থাকে। ফলে, অ্যানোডে আয়রন দ্রবীভূত হয় এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।


$$Fe-2e=Fe^{++}$$


$$2H^{+}+2e=H_2$$

পরে জলের OH-আয়ন দ্বারা Fe^{++} আয়ন হইতে ফেরাস-হাইড্রক্সাইড তৈয়ারী হয় এবং উহা জারিত হইয়া মরিচাতে পরিণত হয়।


$$Fe^{++}+2OH^{-}=Fe(OH)_2$$


$$2Fe(OH)_2+O+H_2O=Fe_2O_3,\ 3H_2O$$

সাধারণতঃ লৌহের উপর রঙের বার্নিশ দিয়া উহাকে মরিচা হইতে রক্ষা করা হয়। কিন্তু জিঙ্ক বা টিনের প্রলেপ দিয়াও মরিচা পড়া বন্ধ করা যায়। দস্তা-প্রলেপিত লোহা বা ইস্পাতের পাতকে সাধারণ লোকে 'টিন' বলে। অনেক ক্ষেত্রে আলকাতরা ব্যবহৃত হয়, আবার বিশেষ প্রয়োজনে নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি দ্বারা বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রলেপ দিয়া মরিচা বন্ধ করা হয়।

৩৪-৬। **লৌহের ব্যবহার**—ধাতুর মধ্যে বর্তমানে লৌহের ব্যবহারই সর্বাধিক। বস্তুতঃ বর্তমান যুগের নামই লৌহযুগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ ব্যবহার্য লৌহ মোটামুটি তিন রকমের—কাস্ট-আয়রন, ইস্পাত বা স্টীল ও রট-আয়রন। এই তিন প্রকারের লৌহের ভিতর অবশ্য কার্বনের পরিমাণ বিভিন্ন এবং সেইজন্য উহাদের বাহ্য ও ভৌত ধর্মেরও যথেষ্ট তারতম্য আছে।

প্রকৃতপক্ষে লৌহ একটি অদ্ভুত ধাতু—উহার সাধারণ ধর্ম বা গুণগুলি খাদের তারতম্যে এত আশ্চর্যরকম ভাবে পরিবর্তিত হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। লৌহ যেমন খুব শক্ত হইতে পারে আবার তেমন নরমও হওয়া সম্ভব। লৌহ সাধারণতঃ চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন অবস্থায় একেবারেই উহার চুম্বকত্ব থাকে না। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহনশীল অবস্থায় তৈয়ারী করা সম্ভব, আবার একেবারে ভঙ্গুর অবস্থায় পাওয়াও সম্ভব। ইহার প্রসারাঙ্ক খুব বেশী, আবার একেবারে কমও হইতে পারে। এইরূপ উহার প্রত্যেকটি ধর্মই কমবেশী করা যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন-গুণান্বিত লৌহ পাইতে হইলে প্রায়ই লৌহের সহিত অন্যান্য মৌল কিয়ংপরিমাণে মিশ্রিত করা প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন উষ্ণতায় উহাকে তাপিত করাও প্রয়োজন হয়।

কাস্ট-আয়রন—ইহাতে সাধারণতঃ ২-৪·৫% ভাগ কার্বন থাকে। তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন ও ফসফরাসও থাকে। অন্যান্য লৌহ হইতে ইহার গলনাঙ্ক কম এবং প্রায় ১২০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ইহা তরলিত হইয়া যায়। কাস্ট-আয়রন বেশ কঠোর বটে তবে অত্যন্ত ভঙ্গুর। ইহাকে ঢালাই করা যায় কিন্তু ঘাতসহতা কম থাকার জন্য পিটাইয়া কিছু তৈয়ারী করা যায় না। ইহাকে পিটাইয়া জোড় দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকেও পরিণত করা যায় না। ইহাকে পান দেওয়াও সম্ভব হয় না।

অধিকাংশ কাস্ট-আয়রনই স্টীল ও রট-আয়রন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের কোন কোন তৈজসপত্রাদি, লোহার রেলিং প্রভৃতি প্রস্তুতিতেও কাস্ট-আয়রন ব্যবহার করা হয়।

রট-আয়রন—ইহাতে কার্বনের ভাগ সাধারণতঃ ·১২-·২৫%। ইহার গলনাঙ্ক অন্যান্য লৌহ অপেক্ষা বেশী, প্রায় ১৫০০° সেন্টিগ্রেড। রট-আয়রন অপেক্ষাকৃত নরম এবং যথেষ্ট ঘাতসহনশীল, কিন্তু ইহাকে পান দেওয়া যায় না। উহাকে

পিটাইয়া জোড় দেওয়া যায়। রট-আয়রনে সরু তার বা চাদর তৈয়ারী করা সম্ভব। ইহাও স্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে না।

তার, জাল, বৈদ্যুতিক-চুম্বক প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে রট-আয়রন ব্যবহৃত হয়।

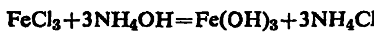
স্টীল (ইস্পাত)—ইস্পাতে ·২৫-১·৫% ভাগ কার্বন সচরাচর থাকে। ইহা ছাড়া সর্বদাই ইস্পাতে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, ফসফরাস, ভ্যানাডিয়াম, টানস্টেন প্রভৃতির কোন একটি বা একাধিক মৌল মিশ্রিত থাকে। এই সকল মৌলগুলি ইস্পাতকে বিভিন্ন গুণান্বিত করিয়া থাকে। ইহাদিগকে ইস্পাত-সঙ্কর (alloy steel) বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ম্যাঙ্গানিজ থাকিলে স্টীল অধিকতর শক্ত ও ঘাতসহনশীল হয়। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত থাকিলে উহার মরিচা-পড়া বন্ধ হয়; মরিচা-হীন লৌহ এইভাবে তৈয়ারী হয়। যে সমস্ত স্টীল দ্রুতগতিশীল-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় তাহাতে টানস্টেন মিশ্রিত করা হয়। শক্ত এবং স্বল্প প্রসারাঙ্ক-বিশিষ্ট স্টীল পাইতে হইলে নিকেলের সহিত মিশ্রিত করা প্রয়োজন।

সাধারণ ইস্পাতকে লোহিততপ্ত করিয়া লইয়া হঠাৎ শীতল জলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিলে উহা অত্যন্ত শক্ত এবং ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। ইহাকে কঠিনীভূত ইস্পাত (Hardened Steel) বলে। কঠিন ও ভঙ্গুর স্টীলকে আবার নির্দিষ্ট কোন উষ্ণতায় তাপিত করিয়া ধীরে ধীরে শীতল করিলে উহার ভঙ্গুরত্ব লোপ পায় এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ স্টীল আবার নমনীয় হইয়া পড়ে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাপিত করিয়া এবং পরে ধীরে ধীরে শীতল করিয়া স্টীলকে এইভাবে নমনীয় করাকে সচরাচর 'ইস্পাতের কোমলায়ন' বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্টীলকে প্রথমতঃ কঠিন ইস্পাতে পরিণত করিয়া পুনরায় তাপিত করা ও কোমলায়িত করাকে 'ইস্পাতের পান-দেওয়া' (Tempering of Steel) বলে। ভিন্ন ভিন্ন কাজে স্টীলের বিভিন্ন রকমের নমনীয়তা প্রয়োজন। যেমন, ছুরি তৈয়ারীর স্টীল ও স্প্রীং তৈয়ারীর স্টীল ঠিক একরকম নয়। কোমলায়িত করার সময় বিভিন্ন উষ্ণতায় কঠিন স্টীলকে তাপিত করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী গুণসমন্বিত করা হয়।

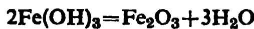
ঘাতসহনশীল এবং ভঙ্গুর, শক্ত এবং নরম সবরকম স্টীলই পাওয়া যায়। স্টীল পিটাইয়া জোড় দেওয়া যায়। ইহাকে পান দেওয়া যায়। ইহাকে স্থায়ী

চুম্বকেও পরিণত করা সম্ভব। স্টীল সাধারণতঃ ১৩০০°-১৪০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গলে। প্রায় সবরকম লোহার জিনিসেই স্টীল ব্যবহার করা যায়। ঘড়ি, চুম্বক, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এঞ্জিন, মেসিনগান, রেলের চাকা, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুতেই স্টীল ব্যবহৃত হয়।

ফেরিক-অক্সাইড, Fe_2O_3 : কোন ফেরিক-লবণের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া দিলে বাদামী ফেরিক-হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। অধঃক্ষেপটি ছাঁকিয়া পৃথক করা হয়। উত্তপ্ত করিলে ফেরিক-হাইড্রক্সাইড হইতে জল পৃথক হইয়া যায় এবং ফেরিক-অক্সাইড পাওয়া যায়।



$$FeCl_3+3NH_4OH=Fe(OH)_3+3NH_4Cl$$



$$2Fe(OH)_3=Fe_2O_3+3H_2O$$

পালিশের জন্য যে 'রুজ' নামক গুঁড়া ব্যবহৃত হয় তাহাও খুব মিহি ফেরিক অক্সাইড-চূর্ণ। উহা ফেরাস-সালফেট-লবণ উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হয়।



$$2FeSO_4=Fe_2O_3+SO_2+SO_3$$

ফেরিক অক্সাইড গাঢ় লাল কঠিন পদার্থ। জলে অদ্রাব্য কিন্তু বিভিন্ন অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া ফেরিক লবণ উৎপন্ন করে।

পালিশের কাজে, রঙ হিসাবে এবং প্রভাবকরূপে ফেরিক অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

লেড (সীসক)

চিহ্ন, Pb। পারমাণবিক গুরুত্ব, ২০৭·২২। ক্রমাঙ্ক, ৮২।

লেডের নানারূপ আকরিক প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গ্যালেনা (Galena), PbS—এইটিই প্রধান। ইহা ছাড়া,

অ্যাঙ্গলেসাইট [Anglesite], $PbSO_4$

সেরুসাইট [Cerussite], $PbCO_3$

লানার্কাইট [Lanarkite], $PbSO_4$, PbO

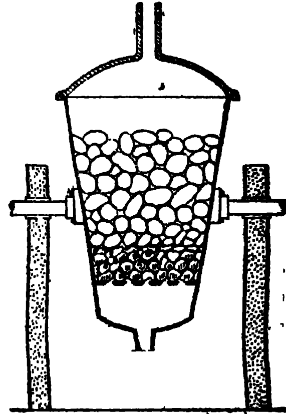
লেড ওকর [Lead ochre], PbO ইত্যাদি, লেডের উল্লেখযোগ্য আকরিক।

৩৫-১। লেড প্রস্তুতি :—সমস্ত লেড ধাতুই গ্যালেনা হইতে প্রস্তুত করা হয়। গ্যালেনা-খনিজ-পাথরে লেড-সালফাইড ছাড়া অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মাটি, বালু প্রভৃতি সিলিকেট-জাতীয় বস্তু ত' থাকেই,

তাহা ছাড়া প্রায় সর্বদাই কিঞ্চিৎ সিলভার-সালফাইড এবং কপার, বিসমাথ প্রভৃতির সালফাইডও থাকে। লেড-সালফাইডের পরিমাণ অনেক সময় শতকরা ৮-১০ ভাগের বেশী নয়।

বর্তমান পদ্ধতিতে প্রথমতঃ গ্যালেনার অপদ্রব্যসমূহ যথাসম্ভব দূরীভূত করা হয়। তৎপর তাপজারণ সাহায্যে লেড-সালফাইডকে লেড-অক্সাইডে পরিণত করা হয়। এই লেড-অক্সাইডকে মারুত-চুল্লীতে কার্বন-সহ উত্তপ্ত অবস্থায় বিজারিত করিলে লেড ধাতু উৎপন্ন হয়। অতঃপর তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধাতুটিকে বিশোধিত করা হয়।

গ্যালেনার গাঢ়ীকরণ—খনিজটি বিচূর্ণ অবস্থায় জল ও অল্প পরিমাণ তেলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। এই মিশ্রণের ভিতর দিয়া বায়ু পরিচালিত করা হয়। তেল ও জলের ঘনিষ্ঠ মিশ্রণের ফলে যে ফেনা হয় উহাতে ধাতব সালফাইডগুলি আকৃষ্ট হইয়া পৃথক হইয়া ভাসিয়া উঠে, কিন্তু মাটি, বালু প্রভৃতি অপদ্রব্যসমূহ জলের নীচে থিতাইয়া যায়। এই ভাবে গাঢ়ীকরণের পর খনিজটিতে প্রায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ লেড-সালফাইড থাকে।



চিত্র ৩৫ক—গ্যালেনার তাপজারণ

তাপজারণ—গাঢ় আকরিকটিকে অতঃপর বায়ুপ্রবাহে তাপিত করিয়া লেড-অক্সাইডে পরিণত করা হয়। লোহার তৈয়ারী অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট চুল্লীতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। এই চুল্লীগুলি দেখিতে অনেকটা বাল্‌তির অনুরূপ। উহার মেঝেটি সচ্ছিদ্র এবং নীচের দিক হইতে বায়ু প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা আছে। চুল্লীর উপরে একটা ঢাকনি ও গ্যাসের নির্গম-পথ আছে। মেঝেতে প্রথমে খানিকটা কোক কয়লা রাখা হয়। তাহার উপরে গাঢ় গ্যালেনার সহিত সামান্য চুন মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে লওয়া হয়। প্রথমে কয়লা পুড়িয়া চুল্লীটিকে তাপিত করিয়া তোলে এবং পরে বিক্রিয়া হইতে যে তাপ উদ্ভূত হয় তাহাতেই প্রয়োজনীয় উষ্ণতা থাকে। বিক্রিয়ার জন্য নীচ হইতে ক্রমাগত উত্তপ্ত বায়ু পরিচালিত করা হয়। লেড-সালফাইড তাপজারিত হইয়া লেড-

অক্সাইডের ছোট ছোট হাল্‌কা কাঁকরে পরিণত হয়। খানিকটা লেড-সালফাইড অবশ্য লেড-সালফেটে পরিণত হইয়া যায় (চিত্র ৩৫ক)।



$$2PbS + 3O_2 = 2PbO + 2SO_2 \; ; \quad PbS + 2O_2 = PbSO_4$$

বিক্রিয়াশেষে চুল্লীর ঢাক্‌নিটি সরাইয়া লেড়-অক্সাইড কাঁকরগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়।

বিগলন—লেড-অক্সাইডের কাঁকরের সহিত কোক কয়লা মিশ্রিত করিয়া একটি ছোট মারুত-চুল্লীতে উহাকে অধিকতর উষ্ণতায় বিজারিত করা হয়। কিছুটা আয়রন-অক্সাইড ও চুন বিগালক হিসাবে উহার সহিত মিশাইয়া লওয়া হয়।

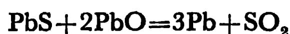
মারুত-চুল্লীটি প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু, পুরু ইস্পাতের পাতের তৈয়ারী, এবং ভিতরের দিকে অগ্নিসহ-ইষ্টকের দ্বারা আচ্ছাদিত। চুল্লীর নীচের অংশটি অপেক্ষাকৃত সরু হইয়া একটি ছোট প্রকোষ্ঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে। চুল্লীটির উপরের দিকে খনিজ, কোক প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। উৎপন্ন গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার একটি নির্গম-পথও আছে। চুল্লীর নিম্নাংশে উত্তপ্ত শুষ্কবায়ু প্রবেশ করার জন্য চুল্লীর চতুর্দিকে কয়েকটি নল (Tuyers) আছে।

চুল্লীর উপর হইতে লেড-অক্সাইড প্রভৃতি ক্রমশঃ নীচের দিকে যাইতে থাকে এবং তপ্ত বায়ুপ্রবাহের সংস্পর্শে আসে। কার্বন প্রথমে পুড়িয়া কার্বন-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। অধিক উষ্ণতায় লেড-অক্সাইড কার্বন এবং কার্বন-মনোক্সাইড উভয়ের দ্বারা বিজারিত হইয়া লেড ধাতুতে পরিণত হয় :—



$$PbO + C = Pb + CO \qquad PbO + CO = Pb + CO_2$$

অধিক উষ্ণতার জন্য উৎপন্ন লেড বিগলিত অবস্থায় থাকে এবং ধীরে ধীরে নীচের প্রকোষ্ঠে আসিয়া সঞ্চিত হয়। যদি কোন লেড-সালফাইড অক্সাইডের সহিত অবিকৃত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা এই উষ্ণতায় লেড-অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া দ্বারা ধাতুতে পরিণত হইয়া যায়। আয়রন-অক্সাইডও লেড-সালফাইডের বিজারণে সহায়তা করে :—



$$PbS + 2PbO = 3Pb + SO_2$$

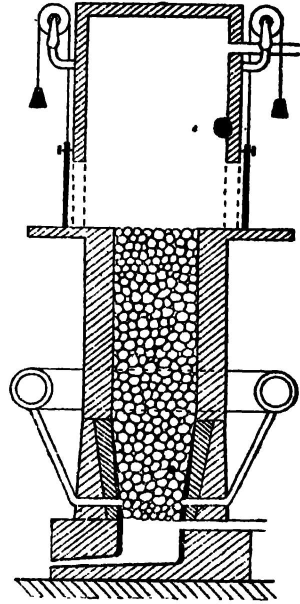


$$2PbS + Fe_2O_3 + 3C = 2Pb + 2FeS + 3CO$$

কোন লেড-সালফেট থাকিলে উহাও লেড-সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া করে :— $PbS + PbSO_4 = 2Pb + 2SO_2$

খনিজের ভিতর যে সিলিকা থাকে তাহা চুনের সহিত যুক্ত হইয়া ক্যালসিয়াম সিলিকেটে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম সিলিকেট আয়রন-সালফাইড এবং অন্যান্য

অপদ্রব্য একত্র হইয়া যে ধাতুমল সৃষ্টি হয় তাহাও গলিত অবস্থায় নীচের প্রকোষ্ঠে গলিত সীসকের উপর সঞ্চিত হয়। এই প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নির্গম-নল দ্বারা ধাতু ও ধাতুমল বাহির করিয়া লওয়া হয় (চিত্র ৩৫খ)। $CaO + SiO_2 = CaSiO_3$

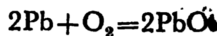


৩৫ খ—লেডের মারুত-চুল্লী

তড়িৎ-বিশোধন—মারুত-চুল্লী হইতে যে লেড ধাতু পাওয়া যায় তাহাতে আরও অন্যান্য ধাতু স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এইজন্য এই লেড খুব নরম বা ঘাতসহ হয় না। বেটের (Bett's) তড়িৎ-বিশোধন প্রণালীতে উৎকৃষ্টতর লেড প্রস্তুত করা হয়। একটি তড়িৎ-বিশ্লেষক সেলে উৎপন্ন লেডের মোটা পাত অ্যানোড রূপে লওয়া হয়। পাতলা বিশুদ্ধ লেডের পাত ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোডকে লেড-ফ্লুয়োসিলিকেট ($PbSiF_6$) এবং ফ্লুয়োসিলিসিক অ্যাসিডের (H_2SiF_6) একটি মিশ্রণের ভিতর রাখিয়া উহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। অ্যানোড হইতে লেড ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং ক্যাথোডে বিশুদ্ধ লেড সঞ্চিত হইতে থাকে। অন্যান্য ধাতুগুলি সেলের নীচে থিতাইয়া যায়। এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ লেড প্রস্তুত করা হয়।

৩৫-২। লেডের ধর্ম—লেডের রঙ ধূসর কিন্তু উহার একটি ধাতব দ্যুতি আছে। লেডের ঘনত্ব প্রায় ১১·৪ এবং উহার গলনাঙ্ক ৩২৬° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ভারী হইলেও ধাতুটি অত্যন্ত নরম, ছুরির সাহায্যে উহাকে কাটিয়া ফেলা সহজ। লেড কাগজের উপর কালো দাগ কাটিতে পারে।

অনার্দ্র বাতাসে থাকিলে লেডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে ধাতুটির উপর উহার ক্ষারকীয় কার্বনেটের একটি অতি-পাতলা সাদা আবরণ পড়ে। অধিক উষ্ণতায় বাতাসে বা অক্সিজেনে লেডকে তাপিত করিলে উহার হল্‌দে অক্সাইড পাওয়া যায়।



$$2Pb + O_2 = 2PbO$$

বিশুদ্ধ জলের সহিত লেডের কোন বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু জলে যদি অন্যান্য লবণ দ্রবীভূত থাকে তাহা হইলে লেড আক্রান্ত হইয়া থাকে। লেডের যৌগসমূহ দ্রবীভূত অবস্থায় শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষ। সেইজন্য পানীয় জল সরবরাহ করিবার সময় সাবধানতা গ্রহণ

করা প্রয়োজন। পানীয় জলে সর্বদাই প্রায় খানিকটা বাই-কার্বনেট, সালফেট প্রভৃতি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। উহারা লেডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া অদ্রবণীয় লেড-কার্বনেট, সালফেট ইত্যাদি উৎপন্ন করে। লেডের এই সমস্ত অদ্রবণীয় লবণ ধাতুটির উপর অতি সহজেই একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে এবং পরে লেড জলের সহিত সংস্পর্শে আসিবার আর সুযোগ পায় না। এইজন্যই সাধারণতঃ পানীয় জল লেড-পাইপ দ্বারা সরবরাহ করা সম্ভব। পানীয় জল যদি সম্পূর্ণ "মৃদু" হয় এবং উহাতে কোন দ্রবীভূত কার্বনেট বা সালফেট না থাকে তবে লেডের পাইপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডে লেড সহজে দ্রবীভূত হয় না, কারণ অল্প একটু বিক্রিয়া করিলেই লেডের উপর লেড-ক্লোরাইড ও সালফেটের আবরণ পড়িয়া উহাদের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ফুটাইলে, লেড-সালফেট ও সালফার-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়।



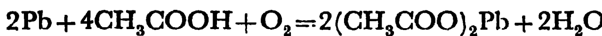
$$Pb + 2H_2SO_4 = PbSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

নাইট্রিক অ্যাসিডে সহজেই লেড দ্রবীভূত হয়।



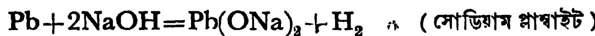
$$Pb + 4HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + N_2O_4 + 2H_2O$$

অক্সিজেন থাকিলে অ্যাসেটিক অ্যাসিডেও লেড দ্রব হয় এবং লেড-অ্যাসিটেট উৎপন্ন হয়।



$$2Pb + 4CH_3COOH + O_2 = 2(CH_3COO)_2Pb + 2H_2O$$

কস্টিকসোডা বা পটাসের সহিত গলাইলেও লেড ধীরে ধীরে দ্রব হইয়া প্লাম্বাইট-লবণে পরিণত হয়।



$$Pb + 2NaOH = Pb(ONa)_2 + H_2$$ (সোডিয়াম প্লাম্বাইট)

লেডের ব্যবহার :—টাইপ ধাতু প্রস্তুতিতে প্রচুর লেড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে লেড ৮২%, অ্যান্টিমনি ১৫% এবং টিন ৩·০% থাকে। লেড ও টিনের সঙ্কর-ধাতু ঝালাই করার কাজে প্রয়োজন হয়। লেড (২০%) এবং টিন (৮০%) হইতে যে সঙ্কর-ধাতু পাওয়া যায় তাহাকে পয়টার (Pewter) বলে—উহা হইতে নানারকম থালা-বাসন ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। জলের নল, চৌবাচ্চা, সালফিউরিক অ্যাসিডের টাওয়ার প্রভৃতি লেড হইতে প্রস্তুত করা হয়। ব্যাটারী প্রস্তুতিতে এবং তড়িৎবাহী তারের আবরক হিসাবে লেড সর্বদাই ব্যবহার হয়।

লেডের যৌগসমূহ

লেড-অক্সাইড—লেডের তিনটি অক্সাইড আছে :—

(১) **লেড-মনোক্সাইড বা লিথার্জ (Litharge), PbO**

ইহার বাংলা নাম, মুদ্রাশঙ্খ।

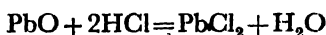
(২) ট্রাইপ্লাম্বিক-টেট্রোক্সাইড বা 'রেড লেড' বা মিনিয়াম (Red Lead or minium)—Pb_3O_4

ইহার বাংলা নাম সীসসিন্দুর।

(৩) লেড-ডাই-অক্সাইড, PbO_2।

৩৫-৩। লেড-মনোক্সাইড [মুদ্রাশঙ্খ], PbO : গলিত সীসার উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত করিলে উহা জারিত হইয়া লেড-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। উৎপন্ন মনোক্সাইডও সেই উষ্ণতায় গলিত অবস্থাতেই থাকে। শীতল হইলে উহা হলুদ স্ফটিকাকার ধারণ করে। $2Pb+O_2=2PbO$

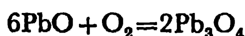
ইহা একটি উভধর্মী অক্সাইড। জলে অদ্রাব্য কিন্তু অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সহিতই বিক্রিয়া করিয়া উহা বিভিন্ন লবণ উৎপাদন করে :—


$$PbO+2HCl=PbCl_2+H_2O$$


$$PbO+2KOH=K_2PbO_2+H_2O \text{ (ফুটন্ত অবস্থায়)}$$

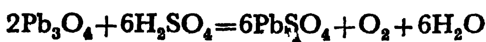
লেড-মনোক্সাইড রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাচ প্রস্তুতিতে, কাচ বা মাটির বাসনের উপর প্রলেপ দিতে, এবং লেডের নানাবিধ যৌগ-প্রস্তুতিতে লেড-মনোক্সাইড প্রয়োজন হয়।

৩৫-৪। ট্রাইপ্লাম্বিক টেট্রোক্সাইড বা **রেড-লেড, Pb_3O_4 :** পরাবর্ত-চুল্লীতে বিচূর্ণ লেড-মনোক্সাইডকে বায়ুপ্রবাহে কয়েক ঘণ্টা তাপিত করিলে উহা ধীরে ধীরে গাঢ় লাল "রেড-লেডে" পরিণত হয়।


$$6PbO+O_2=2Pb_3O_4$$

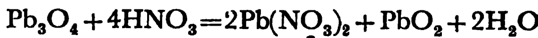
ইহা জলে অদ্রবণীয়। অতিরিক্ত উত্তাপে ইহা বিযোজিত হইয়া পুনরায় লেড-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। ইহার জারণ-ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গাঢ় অ্যাসিডের সহিত ফুটাইলে, অ্যাসিডসমূহ জারিত হইয়া যায় ; যথা :—


$$Pb_3O_4+8HCl=3PbCl_2+Cl_2+4H_2O$$


$$2Pb_3O_4+6H_2SO_4=6PbSO_4+O_2+6H_2O$$

কাচশিল্পে, দিয়াশলাই-প্রস্তুতিতে ও রঙ হিসাবে রেড-লেড সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

৩৫-৫। লেড-ডাই-অক্সাইড, PbO_2ঃ রেড-লেডের উপর গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে কাল লেড-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



$$Pb_3O_4 + 4HNO_3 = 2Pb(NO_3)_2 + PbO_2 + 2H_2O$$

লেড-ডাই-অক্সাইড কাল অনিয়তাকার পদার্থ। উহা তীব্র জারণগুণসম্পন্ন। সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি মৌল উহার সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠে এবং বিস্ফোরণও সংঘটিত হইতে পারে। সালফার-ডাই-অক্সাইডের সহিত ইহা সোজাসুজি যুক্ত হইয়া লেড-সালফেটে পরিণত হয়।

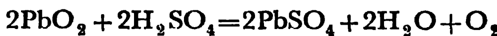


$$PbO_2 + SO_2 = PbSO_4$$

রেড-লেডের অনুরূপ লেড-ডাই-অক্সাইডও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডকে ফুটন্ত অবস্থায় জারিত করে :—

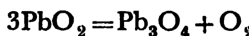


$$PbO_2 + 4HCl = PbCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$



$$2PbO_2 + 2H_2SO_4 = 2PbSO_4 + 2H_2O + O_2$$

৪৪০° সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় লেড-ডাই-অক্সাইড বিযোজিত হইয়া রেড-লেডও অক্সিজেনে পরিণত হয় :—



$$3PbO_2 = Pb_3O_4 + O_2$$

লেড-ডাই-অক্সাইড দিয়াশলাই-প্রস্তুতিতে ও ব্যাটারীতে ব্যবহৃত হয়। জারক হিসাবে ল্যাবরেটরীতেও ইহার ব্যবহার আছে।

৩৫-৬। লেড-কার্বনেট, $PbCO_3$ঃ লেডের কোন লবণের জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট দ্রবণ মিশাইয়া সাদা লেড-কার্বনেট অধঃক্ষিপ্ত করা হয়।

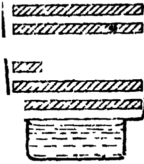


$$Pb(NO_3)_2 + 2NaHCO_3 = PbCO_3 + CO_2 + H_2O + 2NaNO_3$$

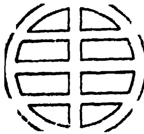
বাই-কার্বনেটের পরিবর্তে সোডিয়াম-কার্বনেট মিশ্রিত করিলে ক্ষারকীয় লেড-কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ ক্ষারকীয়-লেড-কার্বনেট, $2PbCO_3$ $Pb(OH)_2$, সাদা রঙ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। বাজারে ইহার প্রচলিত নাম "সীসশ্বেত" বা "সফেদা" (White Lead)। সস্তা এবং আবরণ-ক্ষমতা সমধিক বলিয়াই ইহার প্রচলন এত বেশী। নানা উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হইলেও ডাচ-প্রণালীতে ইহা বেশীর ভাগ তৈয়ারী করা হয়।

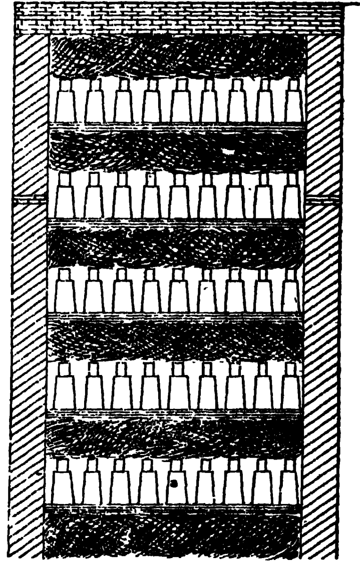
সফেদা (White Lead) প্রস্তুতি। ডাচ-প্রণালী: এই প্রণালীতে চিত্র ৩৫ গ (১)-এর অনুরূপ কতকগুলি মাটির পাত্রে খানিকটা লঘু অ্যাসেটিক



চিত্র ৩৫ গ—(১)



চিত্র ৩৫ গ—(২)



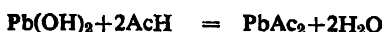
চিত্র ৩৫ গ—ডাচ প্রণালীতে সীসশ্বেত প্রস্তুতি

অ্যাসিড লওয়া হয়। অ্যাসিডের উপর বাকী অংশটি সীসার টুকরাতে ভর্তি থাকে। সীসার টুকরাগুলি সাধারণতঃ সচ্ছিদ্র গোলাকার চাক্তির মত হইলে সুবিধা হয় [চিত্র ৩৫গ (২)]। এই সীসার চাক্তিগুলি এমন ভাবে রাখা হয় যেন তরল অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিতে না পারে।

অতঃপর এই মাটির পাত্রগুলি পর পর সারিবদ্ধ ভাবে একটি ঘরের উপর হইতে নীচে পর্যন্ত বিভিন্ন তাকের উপর সাজাইয়া রাখা হয় এবং সমস্ত পাত্রগুলির চারিদিকে ও উপরে ওকগাছের ছালদ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। যে ঘরে ইহা রাখা হয় তাহার চারিদিকে বায়ু-চলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকে। অনেক সময় ওকগাছের ছালের পরিবর্তে ঘোড়ার মলও ব্যবহৃত হয়। এইভাবে উহাদিগকে প্রায় ২-৩ মাস রাখিয়া দিলে, সীসার টুকরাগুলি সীসশ্বেতে পরিণত হইয়া যায়। উহাকে বাহির করিয়া জলে ধৌত করা হয় এবং অপরিবর্তিত সীসক হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। পরে শূন্য-চাপে তাপিত করিয়া উহাদিগকে শুষ্ক করা হয়।

ওকের ছাল বা ঘোড়ার মল প্রথমে পচিতে থাকে। ইহার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডও উৎপন্ন হয়। লেড আর্দ্র বাতাসে লেড-হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। উত্তাপের জন্য অ্যাসেটিক অ্যাসিড উদ্বায়িত হইয়া আসিয়া লেড-হাইড্রক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করে। ফলে উহা হইতে লেড-অ্যাসিটেট পাওয়া যায়। এই লেড-অ্যাসিটেট ধীরে ধীরে উপরোক্ত $Pb(OH)_2$ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া প্রথমে ক্ষারকীয় লেড-অ্যাসিটেট ও পরে সীসশ্বেত বা white lead উৎপাদন করে।


$$2Pb + O_2 + 2H_2O = 2Pb(OH)_2$$


$$Pb(OH)_2 + 2AcH = PbAc_2 + 2H_2O$$


$$PbAc_2 + 2Pb(OH)_2 = PbAc_2,\ [Pb(OH)_2]_2$$


$$3PbAc_2,\ [Pb(OH)_2]_2 + 4CO_2$$


$$= 2[PbCO_3]_2,\ Pb(OH)_2 + 3PbAc_2 + 4H_2O$$

[AcH, অ্যাসেটিক অ্যাসিড]

কপার (তাম্র)

চিহ্ন, Cu। পারমাণবিক গুরুত্ব, ৬৩·৫৪। ক্রমাঙ্ক, ২৯।

তামার ব্যবহার বহু পুরাতন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বেও যে তামা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

তামা পৃথিবীতে মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহার পরিমাণ পৃথিবীর মোট তামার তুলনায় খুব বেশী নয়। ইতালী, রাশিয়া, সুইডেন ও আমেরিকাতে এরূপ তাম্র-ধাতুর খনি আছে। কিন্তু অধিকাংশ তামাই প্রকৃতিতে উহার বিভিন্ন যৌগরূপে থাকে। উহার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম :—

(১) কপার-পাইরাইটিস [মাক্ষিক] (Copper Pyrites), $CuFeS_2$

(২) চালকোসাইট (Chalcocite), Cu_2S

(৩) কিউপ্রাইট (Cuprite), Cu_2O

(৪) মেলাকোনাইট (Melaconite), CuO

(৫) ম্যালাকাইট (Malachite), $CuCO_3$, $Cu(OH)_2$

(৬) অ্যাজুরাইট (Azurite), $2CuCO_3$, $Cu(OH)_2$

ভারতবর্ষে সামান্য কিছু কপার-সালফাইড (পাইরাইটিস) খনিজ আছে। বিহারের

সিংভূম জেলার অন্তর্গত মুসাবানীতে উহা পাওয়া যায়। ঘাটশীলাতে এই খনিজ হইতে তামা প্রস্তুত করা হয়। সিকিম ও দার্জিলিংয়ের নিকটস্থ পাহাড়েও কিছু কপারের আকরিক পাওয়া যায়।

৩৫-৭। কপার-প্রস্তুতি— (ক) অক্সাইড বা কার্বনেট জাতীয় আকরিক হইতে তামা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। বিচূর্ণ আকরিকের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে তাপিত করিলেই আকরিক-সমূহ বিজারিত হইয়া ধাতব কপারে পরিণত হয়।



$$Cu_2O+C=2Cu+CO \; ; \; CuCO_3+C=Cu+CO+CO_2$$

(খ) কিন্তু অধিকাংশ কপারই উহার সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য কপার-পাইরাইটিস [$CuFeS_2$] আকরিক হইতে প্রস্তুত করা হয়। এই খনিজটিতে কপার সালফার ও লোহের সহিত সংযুক্ত থাকে। আকরিকটি বিজারিত করিয়া লৌহ ও সালফার হইতে কপার-মুক্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং এইজন্য বিশেষ রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি কয়েকটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। প্রক্রিয়াগুলি প্রধানত :—

(১) আকরিকের গাঢ়ীকরণ ; (২) তাপজারণ ;

(৩) তাপজারিত আকরিকের বিগলন ও "ম্যাট" (matte) প্রস্তুতি ;

(৪) "ম্যাট" হইতে ধাতু নিষ্কাশন ; (৫) উৎপন্ন কপারের বিশোধন।

(১) **আকরিকের গাঢ়ীকরণ :—**কপার-পাইরাইটিস খনিজে শতকরা ২-৩ ভাগের অধিক কপার থাকে না। আয়রন সালফাইড ছাড়া ইহার সহিত আরও অনেক অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। উহাদের অধিকাংশই সিলিকেট জাতীয়। এই সকল অপদ্রব্য প্রথমেই যথাসম্ভব দূর করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে খনিজটিকে প্রথমে উত্তমরূপে বিচূর্ণ করিয়া জল ও অল্প পরিমাণ পাইন তেলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। তেলের সহিত একটু Xanthate যৌগও দেওয়া হয়। নীচ হইতে সরু নলের মধ্য দিয়া প্রচুর বায়ু ঐ মিশ্রণের ভিতরে প্রবাহিত করা হয়। ইহাতে তেল ও জলের উত্তমরূপ সংমিশ্রণ হয় এবং উহার উপরে ফেনা উৎপন্ন হয়। কপার ও অন্যান্য ধাতব সালফাইড-সমূহ এই ফেনাতে ভাসিয়া ওঠে কিন্তু মাটি এবং সিলিকেট জাতীয় দ্রব্যগুলি জলের নীচে থিতাইয়া যায়। উপরের ফেনা হইতে সালফাইড সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে খানিকটা অপদ্রব্য দূর করার পর যে আকরিক পাওয়া যায় উহাতে কপারের পরিমাণ প্রায় ৩৫% থাকে।

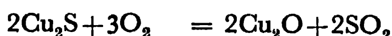
(২) **তাপজারণ**—গাঢ় আকরিকটিকে অতঃপর একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে বায়ুপ্রবাহে তাপিত করা হয়। ইহাতে উদ্বায়ী পদার্থগুলি, যথা আর্সেনিক-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, প্রভৃতি প্রথমে দূর হয়। অতঃপর আকরিকের খানিকটা সালফার জারিত হইয়া সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে নির্গত হইয়া যায়। কিছুটা আয়রন এবং স্বল্প পরিমাণ কপার উহাদের অক্সাইডে পরিণত হয়।



$$2CuFeS_2+O_2 = Cu_2S+2FeS+SO_2$$

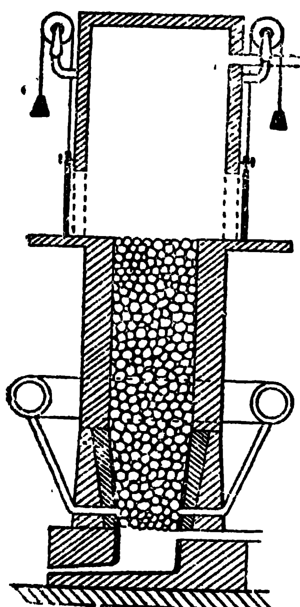


$$2CuFeS_2+4O_2 = Cu_2S+2FeO+3SO_2$$



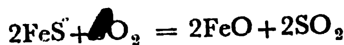
$$2Cu_2S+3O_2 = 2Cu_2O+2SO_2$$

(৩) **বিগলন-সাহায্যে "ম্যাট" (Cu_2S) প্রস্তুতি**—তাপজারণের পর যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাতে Cu_2S, FeS, FeO এবং কিছু Cu_2O থাকে। অবশ্য ইহাদের সহিত অন্যান্য আবর্জনাও কিছু থাকে। উহার সহিত খানিকটা সিলিকা (SiO_2) ও কোক মিশাইয়া একটি ইস্পাত-নির্মিত মারুত-চুল্লীতে তাপিত করা হয়। সমগ্র চুল্লীটির বাহিরের দিকে শীতল জল-প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে এবং ভিতরের দিকেও ইস্পাতের উপর অগ্নিসহ-ইষ্টকের একটি আবরণ থাকে। চুল্লীর উপরের প্রবেশ-দ্বার সাহায্যে উহার ভিতরে ক্রমাগত তাপজারিত আকরিক, কোক ও সিলিকার মিশ্রণ ঢালা হয়। চুল্লীর নীচের দিকে কয়েকটি বড় বড় নলের সাহায্যে উহার অভ্যন্তরে প্রচুর শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ু পরিচালিত করা হয়। প্রথমে কোক উত্তপ্ত বায়ুতে প্রজ্বলিত হইয়া যথেষ্ট তাপ ও উষ্ণতার সৃষ্টি করে। অধিক উষ্ণতায় আয়রন-সালফাইড-সমূহ জারিত হইয়া আয়রন-অক্সাইডে পরিণত হয়। কিন্তু কপার-সালফাইডের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। যদি কিছু কপার-সালফাইড জারিত হয় অথবা পূর্বের তাপ



চিত্র ৩৫ঘ—কপারের মারুত-চুল্লী

জারণকালে কোন কপার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তবে উহা আয়রন-সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া পুনরায় কপার-সালফাইডে পরিণত হইয়া যায়। আয়রন অপেক্ষা কপারের সালফার-আসক্তি সমধিক বলিয়া ঐরূপ হয়।



$$2FeS + 3O_2 = 2FeO + 2SO_2$$

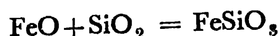


$$Fe_2S_3 + 4O_2 = 2FeO + 3SO_2$$



$$Cu_2O + FeS = Cu_2S + FeO$$

অর্থাৎ মারুত-চুল্লীতে প্রায় সমুদয় আয়রন অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু কপার উহার সালফাইড অবস্থাতেই থাকে। এই আয়রন-অক্সাইড সঙ্গে সঙ্গে সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়া আয়রন-সিলিকেটে পরিণত হয়।

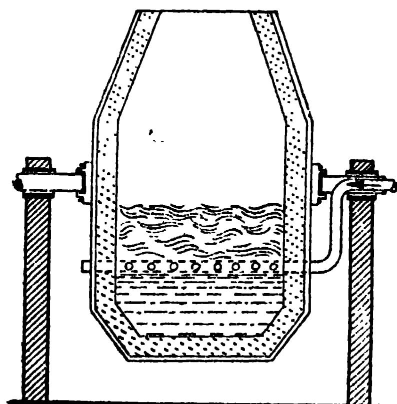


$$FeO + SiO_2 = FeSiO_3$$

মারুত-চুল্লীর নিম্নাংশে উষ্ণতা অত্যন্ত অধিক থাকে। ফলে, আয়রন-সিলিকেট ও কপার-সালফাইড উভয়েই বিগলিত হইয়া যায়। এই গলিত পদার্থগুলি চুল্লীর নীচে একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। আয়রন-সিলিকেট অনেক হাল্কা বলিয়া উহা গলিত কপার-সালফাইডের উপরে ভাসিয়া থাকে। আয়রন-সিলিকেটের সহিত অন্যান্য অপদ্রব্যও মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অপরিবর্তিত আয়রন-সালফাইড কপার-সালফাইডের সহিত থাকে। উপর হইতে ধাতুমল হিসাবে আয়রন-সিলিকেট সরাইয়া লইলে কপার-সালফাইড পাওয়া যায়। ইহাকেই "ম্যাট" বলে। ইহাতে সর্বদাই কিছু আয়রন-সালফাইড থাকে।

(৪) **"ম্যাট" হইতে কপার নিষ্কাশন**—গলিত "ম্যাট"কে সোজাসুজি মারুত-চুল্লী হইতে একটি "বিসিমার কনভারটার" চুল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। উহার সহিত অল্প একটু সিলিকাও মিশ্রিত করা হয়। এই কনভারটার একটি বিরাট ডিম্বাকৃতি চুল্লী। ইহা ইস্পাতের তৈয়ারী। ইস্পাতের দেওয়ালের ভিতরের দিকটা অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত থাকে। চুল্লীটি মাটিতে বসান থাকে না। উহাকে দুইটি যন্ত্রযুক্ত চাকা ও দুইটি শক্ত লৌহদণ্ডের (Pinion) সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা হয়। চুল্লীর উপরের মুখটি খোলা থাকে। ইচ্ছা করিলে, সম্পূর্ণ চুল্লীটিকে উপুড় করিয়া উহার ভিতরের পদার্থগুলি ঢালিয়া লওয়া যায় (চিত্র ৩৫৬)।

কনভারটারের মধ্যস্থলে একটি নল প্রবেশ করান থাকে এবং ইহার সাহায্যে গলিত ম্যাটের ভিতর উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ পরিচালিত করা হয়। প্রথমেই আয়রন-সালফাইড জারিত হয় এবং সিলিকা সংযোগে আয়রন-সিলিকেট ধাতুমলে পরিণত হয়। ধাতুমলটি সরাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর বায়ু প্রবাহের দ্বারা কপার-সালফাইড কপার-অক্সাইডে পরিণত হইতে থাকে। উৎপন্ন কপার-অক্সাইড সঙ্গে সঙ্গেই অবিকৃত কপার-সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কপার ধাতুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, কপার-সালফাইড বায়ুতাপিত হওয়ার ফলে স্বতঃ-বিজারিত হয় :—



চিত্র ৩৫৬—কনভারটার (কপার)



$$2Cu_2S+3O_2 = 2Cu_2O+2SO_2$$



$$Cu_2S+2Cu_2O = 6Cu+SO_2$$

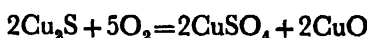
উৎপন্ন কপার ধাতু গলিত অবস্থায় কনভারটারের নীচে জড় হইতে থাকে। যে নল দিয়া কনভারটারে বায়ু প্রবেশ করে তাহার নীচে উৎপন্ন কপার সঞ্চিত হয় সুতরাং আর জারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্যই বায়ু-বহনকারী নলটি কনভারটারের মধ্যস্থলে প্রবেশ করান থাকে। বিক্রিয়াশেষে কনভারটারটি উপুড় করিয়া গলিত কপার বাহির করিয়া লওয়া হয়। কনভারটার হইতে যে কপার পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ নয়। উহার বিশোধন প্রয়োজন।

(৫) **কপার-বিশোধন**—কনভারটার হইতে উৎপন্ন কপারের সহিত কিছু অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত থাকে। এই কপারকে একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে অল্প অল্প বায়ু-প্রবাহে গলান হয়। ভিতরের দিকে চুল্লীটির গায়ে একটি সিলিকার প্রলেপ থাকে। কপারের সহিত অন্যান্য অবর ধাতু যাহা মিশ্রিত থাকে সেগুলি প্রথমে জারিত হইয়া অক্সাইডে পরিণত হয় এবং তৎপর সিলিকার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে ধাতুমলের সৃষ্টি করে। ধাতুমল উপর হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। কিছুটা কপারও কপার-অক্সাইডে পরিণত হইতে পারে। এইজন্য অতঃপর

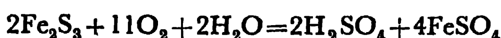
কিছু কোকচূর্ণ গলিত কপারের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সমগ্র গলিত কপারকে কাঁচা কাঠের দ্বারা খুব ভালভাবে নাড়িয়া দেওয়া হয়। কাঁচা কাঠ হইতে যে কয়লা ও হাইড্রোকার্বন গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা কপার-অক্সাইডের বিজারণে সাহায্য করে। এইভাবে যে কপার পাওয়া যায় তাহাতে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ কপার থাকে।

তড়িৎ-বিশোধন—আরও শুদ্ধতর কপার প্রয়োজন হইলে তড়িৎ-বিশোধনের সাহায্য লওয়া হয়। একটি সেলে কপার-সালফেট দ্রবণ লওয়া হয়। উহার সহিত কিছু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া উহাকে অম্লীকৃত করা হয়। যে কপারকে বিশোধিত করা প্রয়োজন উহাকে প্রথমে খুব পুরু বড় বড় চতুষ্কোণ পাতে অ্যানোডরূপে কপার-সালফেট লবণে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। খুব পাতলা বিশুদ্ধ কপার-পাত দ্বারা ক্যাথোড তৈয়ারী করা হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোড পর পর দ্রবণের ভিতর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে অ্যানোড হইতে কপার আয়নিত হইয়া দ্রবীভূত হইতে থাকে এবং ক্যাথোডে কপার সঞ্চিত হইতে থাকে। অনেক সময়েই অ্যানোডের চারিদিকে একটি সূক্ষ্ম বস্ত্রের বা মসলিনের থলে রাখা হয়। গোল্ড, সিলভার, প্লাটিনাম প্রভৃতি অদ্রাব্য ধাতুগুলি উহাতে সঞ্চিত হয়। বলা বাহুল্য, যদিও পরিমাণে সামান্য তবু তড়িৎ-বিশোধনের এই গাদ খুব মূল্যবান এবং বরধাতু প্রস্তুতির ইহা একটি উপায়। তড়িৎ-বিশোধিত কপারের ভিতর এই ধাতুর পরিমাণ ৯৯.৯৯%।

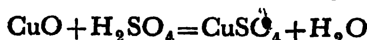
(গ) **সিক্ত-প্রণালীতে কপার প্রস্তুতি**—কখনও কখনও আকরিক মধ্যস্থ অদ্রবণীয় কপার যৌগটিকে কপারের দ্রবণীয় যৌগে পরিণত করা হয়। পবে জল প্রয়োগে উহাকে অন্যান্য আবর্জনা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয় এবং তৎপর এই পৃথকীকৃত যৌগ হইতে ধাতু নিষ্কাশিত করা হয়। কয়েক হাজার টন পাইরাইটিস আকরিক বিচূর্ণ করিয়া সিক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখা হয়। কয়েক মাস এইভাবে থাকিলে উহার সালফাইড-সমূহ জারিত হইয়া সালফেটে পরিণত হইতে থাকে।



$$2Cu_2S + 5O_2 = 2CuSO_4 + 2CuO$$



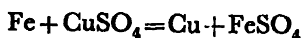
$$2Fe_2S_3 + 11O_2 + 2H_2O = 2H_2SO_4 + 4FeSO_4$$



$$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$$

যেখানে আকরিক-চূর্ণ স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়, তাহার পাশে বড় একটি সিমেণ্টের চৌবাচ্চাতে কপার-সালফেট ও ফেরাস-সালফেট দ্রবণ আসিয়া সঞ্চিত

হয়। এই দ্রবণে খানিকটা লৌহচুর দিলেই কপার প্রতিস্থাপিত হইয়া বাহির হইয়া আসে। পরে উহাকে ছাঁকিয়া পৃথক করা হয় ও বিশোধিত করা হয়।



$$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$$

৩৫-৮। কপারের ধর্ম—কপার ধাতুর একটি বিশেষ লাল রঙ আছে, উহাকে "তামাটে লাল" বলা হয়। ইহার ঘাতসহতা এবং তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবহন-ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ঘনত্ব ৮·৮৫, গলনাঙ্ক ১০৮৩° সেন্টিগ্রেড।

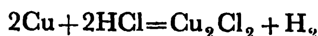
শুষ্ক বাতাসে কপারের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর্দ্র বাতাসে দীর্ঘকাল থাকিলে উহার উপরে কপার-অক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে এবং অনেক সময়ে ক্ষারকীয় সালফেটের আবরণও পড়িতে দেখা যায়। বাতাসে বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে কপার উহার অক্সাইডে পরিণত হইয়া কাল হইয়া যায়।



$$2Cu + O_2 = 2CuO$$

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা কপার মোটেই আক্রান্ত হয় না। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহযোগে বাতাসে কপার তাপিত করিলে কপার-ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। $2Cu + 4HCl + O_2 = 2CuCl_2 + 2H_2O$

কিন্তু হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড গ্যাস উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে কিউপ্রাস-ক্লোরাইড পাওয়া যায়।



$$2Cu + 2HCl = Cu_2Cl_2 + H_2$$

ক্ষারক দ্রবণে কপারের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অক্সিজেনের সান্নিধ্যে গাঢ় অ্যামোনিয়াতে কপার-চূর্ণ ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া গাঢ় নীল কিউপ্রো-অ্যামোনিয়াম-হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়:—



$$2Cu + 8NH_4OH + O_2 = 2Cu(NH_3)_4(OH)_2 + 6H_2O$$

কপারের ব্যবহার—বিদ্যুৎ-শিল্পে কপারের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুৎ-সরবরাহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপারের তার ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ-প্রলেপন, ব্লক-তৈয়ারী প্রভৃতিতেও কপার ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের ব্যবহার্য বাসনপত্রও কোন কোন সময় কপার হইতে তৈয়ারী হয়। মুদ্রা-প্রস্তুতিতে কপার অন্যতম উপাদান।

কপার অন্যান্য ধাতুর সহিত সংমিশ্রণের ফলে নানারূপ প্রয়োজনীয় সঙ্কর-ধাতু উৎপাদন করে। যথা:—

(১) পিতল, [Cu+Zn]

(২) ব্রোঞ্জ, [Cu+Sn+Zn]

(৩) জার্মান সিলভার, [Cu+Zn+Ni]

(৪) মোনেল মেটেল, [Cu+Ni]

(৫) বেল মেটেল (কাঁসা), [Cu+Sn)

৩৫-৯। কিউপ্রিক সালফেট বা কপার-সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$ (তুঁতে): গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফুটন্ত অবস্থায় কপারের সহিত বিক্রিয়া করে এবং কপার-সালফেট উৎপাদন করে :—



$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে কপার-অক্সাইড দ্রবীভূত করিয়াও কপার-সালফেট প্রস্তুত করা সম্ভব :— $CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$

উৎপন্ন কপার-সালফেটের দ্রবণটি গাঢ় করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিলে নীল রঙের সোদক কপার-সালফেট স্ফটিক কেলাসিত হয়। উহাতে প্রত্যেকটি কপার-সালফেট অণুর সহিত পাঁচটি জলের অণু যুক্ত থাকে। ইহার ইংরেজী নাম 'ব্লু-ভিট্রিয়ল'।

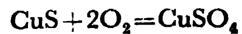
অধিক পরিমাণে কপার-সালফেট প্রয়োজন হইলে নিম্নোক্ত উপায়ের সাহায্যে উহা প্রস্তুত করা হয় :—

(১) কপার-পাইরাইটিস অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহে তাপজারিত করা হয় (Roasted)। ইহাতে কপার-সালফাইড কপার-সালফেটে এবং আয়রন-সালফাইড আয়রন-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। অতঃপর উহাকে জলের সহিত ফুটাইয়া লইলে কপার-সালফেট জলে দ্রবীভূত হইয়া অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া আসে। দ্রবণটিকে গাঢ় অবস্থায় শীতল করিলে কপার-সালফেট কেলাসিত হয়।

(২) কপারের ছিলা, কপারের ভাঙা টুকরা প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণ সালফারের সহিত মিশাইয়া পরাবর্ত-চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে কপার-সালফাইড পাওয়া যায়। অতঃপর উহাকে বায়ুপ্রবাহে আরও তাপিত করিলে উহা কপার-সালফেটে পরিণত হয়। চুল্লী হইতে বাহির করিয়া জলে ফুটাইয়া কপার-সালফেট দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় এবং যথারীতি $CuSO_4, 5H_2O$ কেলাসিত করা হয়।



$Cu + S = CuS$



$CuS + 2O_2 = CuSO_4$

কিউপ্রিক সালফেট নীলবর্ণের স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। এই সোদক স্ফটিকগুলি উত্তপ্ত করিলে উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার জল উবিয়া যায় এবং ২৩০° সেন্টিগ্রেডে উহা অনার্দ্র সাদা অনিয়তাকার কপার-সালফেটে পরিণত হয়।

কিউপ্রিক সালফেট জলে যথেষ্ট দ্রবণীয়। অ্যামোনিয়ার সহিত মিশাইলে কপার-সালফেট কিউপ্রো-অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়।

পটাসিয়াম-আয়োডাইড এবং পটাসিয়াম-সায়নাইডের সহিত কপার-সালফেট বিক্রিয়া করে এবং কিউপ্রাস-যৌগে পরিণত হয়:—



$$2CuSO_4 + 4KI = Cu_2I_2 + 2K_2SO_4 + I_2$$



$$2CuSO_4 + 4KCN = 2CuCN + 2K_2SO_4 + C_2N_2$$

কপার-সালফেট তড়িৎ-লেপনের জন্য প্রয়োজন হয়। রাগবন্ধক (mordant) হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জীবাণু এবং কীট-বিনাশক রূপেও ইহার ব্যবহার আছে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

রাসায়নিক গণনা

রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে সকল পদার্থ অংশ গ্রহণ করে তাহাদের, অথবা বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহের পরিমাণ, আয়তন, সঙ্কেত প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল হইতে গণনার দ্বারা নির্ধারণ সম্ভব। এই সকল গণনাতে রাসায়নিক সংযোগসূত্র, অ্যাভোগাড্রো-প্রকল্প এবং সমীকরণের সাহায্য লওয়া হয়। কয়েকটি সাধারণ গণনার বিষয় এখানে আলোচনা করা হইতেছে।

১। যৌগের সঙ্কেত হইতে উপাদানসমূহের পরিমাণ নির্ণয়—

যৌগিক পদার্থের সঙ্কেত হইতে উহার মৌলগুলির পারমাণবিক গুরুত্বসমূহ যোগ করিয়া উহার আণবিক গুরুত্ব জানা যায়। পদার্থটির আণবিক গুরুত্বের পরিমাণে কোন্ উপাদান কতটুকু আছে তাহাও জানা যায়। অতএব, যৌগটিতে উহার বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা অনুপাত বাহির করা যায়।

(ক) সালফিউরিক অ্যাসিডে উহার উপাদানগুলির শতকরা কি অনুপাতে আছে বাহির কর।

H_2SO_4=২×১+১×৩২+৪×১৬=৯৮ (আণবিক গুরুত্ব)। অর্থাৎ, ৯৮ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন, ৩২ গ্রাম সালফার এবং ৬৪ গ্রাম অক্সিজেন আছে।

অতএব, হাইড্রোজেনের পরিমাণ=$\frac{২}{৯৮}$×১০০=২·০৪১%

অক্সিজেনের পরিমাণ=$\frac{৬৪}{৯৮}$×১০০=৬৫·৩০৬%

সালফারের পরিমাণ=$\frac{৩২}{৯৮}$×১০০=৩২·৬৫৩%

(খ) ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের উপাদানসমূহের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর। ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের সঙ্কেত, $CaCO_3$।

উহার আণবিক গুরুত্ব, ৪০+১২+৩×১৬=১০০।

অতএব ১০০ ভাগ ক্যালসিয়াম-কার্বনেটে ৪০ ভাগ ক্যালসিয়াম, ১২ ভাগ কার্বন ও ৪৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। অর্থাৎ

ক্যালসিয়াম=$\frac{৪০}{১০০}$×১০০=৪০%, কার্বন=$\frac{১২}{১০০}$×১০০=১২%

অক্সিজেন= ৪৮ ×১০০=৪৮%

(গ) কোন কোন সময় যৌগিক পদার্থের কোন উপাদান-মৌলটির পরিমাণ সোজাসুজি বাহির করা হয় না, অন্য কোন যৌগ বা মূলক রূপে হিসাব করা হয়। যেমন, ক্যালসিয়াম-ফসফেটের ফসফরাস P_2O_5 হিসাবে নির্ণয় কর।

ক্যালসিয়াম-ফসফেটের সঙ্কেত, $Ca_3(PO_4)_2$।

উহার আণবিক গুরুত্ব=৩×৪০+২×৩১+৮×১৬=৩১০।

ক্যালসিয়াম-ফসফেটকে [$2CaO, P_2O_5$] এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। P_2O_5 এর গুরুত্ব=২×৩১+৫×১৬=১৪২।

∴ ৩১০ ভাগ ক্যালসিয়াম-ফসফেট হইতে ১৪২ ভাগ P_2O_5 পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, P_2O_5-এর পরিমাণ=$\frac{১৪২×১০০}{৩১০}$=৪৫·৮%

(ঘ) ডলোমাইটে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?

ডলোমাইটের সঙ্কেত, $CaCO_3, MgCO_3$; অর্থাৎ, ($CaO, MgO, 2CO_2$)।

ডলোমাইটের আণবিক গুরুত্ব $=$ (৪০ + ১২ + ৪৮) + (২৪ + ১২ + ৪৮)
$=$ ১৮৪

CO_2-এর আণবিক গুরুত্ব $=$ ১২ + ৩২ $=$ ৪৪

অতএব, ওজন হিসাবে,

১৮৪ ভাগ ডলোমাইটে ২ × ৪৪ (= ৮৮) ভাগ CO_2 আছে

∴ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ $=$ ৮৮/১৮৪ × ১০০ $=$ ৪৭.৮%

(ঙ) কপার-সালফেটের সোদক স্ফটিকে জলের পরিমাণ কত?

কপার-সালফেটের সঙ্কেত, $CuSO_4, 5H_2O$

উহার আণবিক গুরুত্ব $=$ ৬৩.৫ + ৩২ + ৪ × ১৬ + ৫ × ১৮ $=$ ২৪৯.৫

এবং উহাতে ৫টি জলের অণু অর্থাৎ ৫ × ১৮ (= ৯০) ভাগ জল আছে

অতএব, সোদক কপার-সালফেটে জলের পরিমাণ $=$ ৯০/২৪৯.৫ × ১০০
$=$ ৩৬.০৭%

অনুশীলন

(১) হিমাটাইট আকরিকে আয়রনের অনুপাত কত?

(২) বিশুদ্ধ বক্সাইটে অ্যালুমিনিয়াম ও সিনাবারে মারকারির অনুপাত নির্ণয় কর।

(৩) জিপসাম ও অ্যানহাইড্রাইট আকরিকে উপাদানগুলি শতকরা কত পরিমাণে আছে?

(৪) অ্যামোনিয়াম-সালফেটে ও অ্যামোনিয়াম-নাইট্রেটে উহাদের উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে?

(৫) পটাসিয়াম-ফেরোসায়ানাইডের ($K_4FeC_6N_6$) উপাদান চারিটির শতকরা পরিমাণ বাহির কর।

(৬) একশত গ্রাম অ্যামোনিয়াম-ক্লোরো-প্লাটিনেটে [$(NH_4)_2PtCl_6$] কতটুকু প্লাটিনাম আছে?

(৭) একশত গ্রাম অ্যালামে [$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$] কতখানি অ্যালুমিনিয়াম আছে?

(৮) চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) এবং স্পিরিটের (C_2H_6O) কার্বনের শতকরা পরিমাণ কত হইবে?

(৯) নিম্নলিখিত সোদক স্ফটিকগুলিতে জলের অংশ কত হইবে?

(ক) সোডা, $Na_2CO_3, 10H_2O$

(খ) সোহাগা, $Na_2B_4O_7, 10H_2O$

(গ) . ফেরিক-ক্লোরাইড, $FeCl_3$, $6H_2O$

(ঘ) ম্যাগনেসিয়াম-সালফেট, $MgSO_4$, $7H_2O$

(১০) মার্বেল পাথরের ক্যালসিয়ামটি চুন হিসাবে নির্ণয় কর।

(১১) অ্যানহাইড্রাইট আকরিকের ($CaSO_4$) কত অংশ SO_2 হিসাবে পাওয়া সম্ভব ?

(১২) ফেরাস-সালফেটের ($FeSO_4$) শতকরা কত অংশ Fe_2O_3 হিসাবে পাওয়া যায় ?

(১৩) অ্যামোনিয়াম-সালফেটে কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া আছে ?

(১৪) ক্যাওলিনে (Al_2O_3, $2SiO_2$, $2H_2O$) সিলিকার শতকরা পরিমাণ কত ?

(১৫) পটাসিয়াম-ক্লোরেট ও সোডিয়াম-ক্লোরেটের প্রতি পাউণ্ডের দাম একই। এই দুইটি পদার্থ পৃথক উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন প্রস্তুত করা হইলে, অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যয়ের অনুপাত কি হইবে ?

(১৬) এক গ্রাম একটি যৌগ হইতে ০·২১৬৮ গ্রাম কপার পাওয়া গেল। সেই যৌগের ভিতর CuO-এর শতকরা পরিমাণ কত ?

২। উপাদানসমূহের পরিমাণ হইতে যৌগিক পদার্থের স্থূল-সঙ্কেত নির্ণয়—

কোন যৌগের উপাদানগুলি উহাতে ওজনের কি অনুপাতে আছে জানা থাকিলে যৌগ পদার্থটির স্থূল-সঙ্কেত অনায়াসেই বাহির করা যায়। স্থূল-সঙ্কেত বাহির করার মোটামুটি নিয়মটি এই :—যে ওজনে উপাদানগুলি সংযুক্ত থাকে, সেই ওজনগুলিকে উহাদের নিজ নিজ পারমাণবিক গুরুত্ব দ্বারা ভাগ করিয়া যৌগিক পদার্থটিতে উপাদানগুলির পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতটি প্রথমে বাহির করিতে হইবে। অতঃপর এই অনুপাতটিকে উহাদের মধ্যে যে রাশিটি সর্বাপেক্ষা ছোট উহা দ্বারা ভাগ করিয়া সরলতর করিতে হইবে। এই অনুপাতটি সরল অনুপাত হওয়া দরকার। এই অনুপাত গ্রহণ করার সময় যদি কোন রাশি পূর্ণসংখ্যার খুব কাছাকাছি হয় তবে আসন্ন পূর্ণসংখ্যাটি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে উহাদের ল. সা. গু. বাহির করিয়া উহাকে সরল অনুপাতে পরিণত করিতে হইবে।

উপরোক্ত নির্ণয়ে উপাদান-পরমাণুগুলি সংখ্যাহিসাবে যে অনুপাতে যুক্ত তাহাই জানা যায়। ইহা হইতে যৌগটির একটি অণুতে কয়েকটি পরমাণু বর্তমান তাহা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং যে সঙ্কেতটি বাহির করা যায়, তাহা স্থূল-সঙ্কেত **(Empirical formula), আণবিক সঙ্কেত নহে। আণবিক সঙ্কেত (Molecular formula) জানিতে হইলে, আণবিক গুরুত্বও জানা থাকা দরকার।**

কোন পদার্থের উপাদানের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা অংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এই শতকরা হার ওজনের হিসাবে বা আয়তনের হিসাবে হইতে পারে।

সাধারণতঃ কঠিন পদার্থের উপাদানগুলি ওজনের হিসাবে শতকরা অংশে প্রকাশিত হয়। যথা, মার্বেল পাথরে শতকরা ৪০ ভাগ ক্যালসিয়াম আছে। অর্থাৎ ১০০ গ্রাম মার্বেল পাথরে ৪০ গ্রাম ক্যালসিয়াম বর্তমান।

আবার, তরলমিশ্রে বা দ্রবণের ভিতর কোন উপাদানের পরিমাণ প্রকাশ করিতে সচরাচর আয়তনের ১০০ ভাগ মিশ্রে ওজনের কত পরিমাণ উপাদান আছে তাহাই উল্লিখিত হয়। যথা,—"শতকরা ৫ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ" বলিলে ১০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে বুঝা যায়। "শতকরা ৩৩ ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড" বলিলে সাধারণতঃ ১০০ ঘনসেন্টিমিটার অ্যাসিডে ৩৩ গ্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড আছে ধরা হইবে।

উদাহরণ। চুনের ভিতর ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত $=৫:২$। উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? [Ca=৪০, O=১৬]

ওজনের অনুপাত, $Ca : O = ৫ : ২$

পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে, $Ca : O = \frac{৫}{৪০} : \frac{২}{১৬} = \frac{১}{৮} : \frac{১}{৮} = ১ : ১$

অতএব, চুনের স্থূল-সঙ্কেত, CaO।

উদাহরণ ২। মার্বেল-পাথর ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগ। ওজনের হিসাবে উপাদানগুলির অনুপাত—$Ca : O : C = ৫ : ৬ : ১{\cdot}৫$। মার্বেলের স্থূল-সঙ্কেত নির্ণয় কর। [Ca=৪০, O=১৬, C=১২]

ওজনের অনুপাতে : $Ca : O : C = ৫ : ৬ : ১{\cdot}৫$

$= ১০ : ১২ : ৩$

∴ পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে, $Ca : O : C = \frac{১০}{৪০} : \frac{১২}{১৬} : \frac{৩}{১২}$

$= ১ : ৩ : ১$

অতএব, মার্বেলের স্থূল-সঙ্কেত হইবে, CaO_3C অথবা $CaCO_3$।

উদাহরণ ৩। কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগের ভিতর কার্বনের পরিমাণ ৪৮% হইলে, পদার্থটির স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? [C=১২]

পদার্থটিতে কার্বন=৮৪% ∴ হাইড্রোজেন=১০০−৮৪=১৬%

∴ ওজনের অনুপাত C : H=৮৪ : ১৬

পরমাণু-সংখ্যার অনুপাত C : H=$\frac{৮৪}{১২}$: $\frac{১৬}{১}$=৭ : ১৬

∴ পদার্থটির স্থূল-সঙ্কেত, C_7H_{16} ।

উদাহরণ ৪। পটাসিয়াম সালফেটে শতকরা ৪৪·৮২ ভাগ পটাসিয়াম ও শতকরা ৩৬·৭৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? [K=৩৯, S=৩২, O=১৬]

পটাসিয়াম-সালফেটে, পটাসিয়াম, সালফার ও অক্সিজেন আছে।

পটাসিয়ামের পরিমাণ=৪৪·৮২% অক্সিজেনের পরিমাণ=৩৬·৭৮%

∴ সালফারের পরিমাণ=১০০−৪৪·৮২−৩৬·৭৮=১৮·৪%

অতএব, ওজনের অনুপাতে, K : S : O=৪৪·৮২ : ১৮·৪ : ৩৬·৭৮

∴ পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে, K : S : O=$\frac{৪৪·৮২}{৩৯}$: $\frac{১৮·৪}{৩২}$: $\frac{৩৬·৭৮}{১৬}$

=১·১৫ : ০·৫৭ : ২·২৯

ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট রাশি, ০·৫৭। অনুপাতটি ০·৫৭ দ্বারা ভাগ করিয়া, উহাকে সরলতর করা যাইতে পারে।

∴ K : S : O=$\frac{১·১৫}{·৫৭}$: $\frac{·৫৭}{·৫৭}$: $\frac{২·২৯}{৫৭}$=২·০১ : ১ : ৪·০১

৪·০১ এবং ২·০১ এই সংখ্যাগুলি প্রায় পূর্ণসংখ্যার সমান। সুতরাং উহার পরিবর্তে আসন্ন পূর্ণসংখ্যা ৪ এবং ২ ধরিয়া লইতে হইবে। অতএব, পটাসিয়াম-সালফেটের স্থূল-সঙ্কেত হইবে, K_2SO_4 ।

উদাহরণ ৫। সোডিয়াম-ফসফেট লবণে Na=১৯·১৬%, হাইড্রোজেন=১·৬৬% এবং ফসফরাস=২৫·৮৩% আছে। বাকী অংশটুকু অক্সিজেন। অনার্দ্র সোডিয়াম-ফসফেটের স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর। [Na = ২৩, O = ১৬, P = ৩১]

সোডিয়াম-ফসফেটে অক্সিজেনের পরিমাণ

= ১০০ − ২৫·৮৩ − ১·৬৬ − ১৯·১৬ = ৫৩·৩৫%

অতএব, ওজনের অনুপাতে—

Na : H : P : O = ১৯·১৬ : ১·৬৬ : ২৫·৮৩ : ৫৩·৩৫

∴ পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে,

$$Na : H : P : O = \frac{১৯·১৬}{২৩} : \frac{১·৬৬}{১} : \frac{২৫·৮৩}{৩১} : \frac{৫৩·৩৫}{১৬}$$

$$= ·৮৩৩ : ১·৬৬ : ·৮৩৩ : ৩·৩৩৪$$

ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রাশি, ·৮৩৩। সমস্ত রাশিগুলিকে ইহার দ্বারা ভাগ করিলে অনুপাতটি হইবে :—

$$Na : H : P : O = \frac{·৮৩৩}{·৮৩৩} : \frac{১·৬৬}{·৮৩৩} \quad \frac{·৮৩৩}{·৮৩৩} \quad \frac{৩·৩৩৪}{·৮৩৩}$$

$$= ১ : ১·৯৯ : ১ : ৪·০১$$

১·৯৯ এবং ৪·০১ প্রায় পূর্ণসংখ্যার সমান বলিয়া উহাদিগকে যথাক্রমে আসন্ন পূর্ণসংখ্যা ২ এবং ৪ মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, পরমাণু-সংখ্যার অনুপাত হইবে—Na : H : P : O=১ : ২ : ১ : ৪

অতএব, সোডিয়াম-ফসফেটের স্থূল-সঙ্কেত হইবে, NaH_2PO_4।

উদাহরণ ৬। ক্লোরোফর্ম, কার্বন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগে উৎপন্ন। উহাতে ক্লোরিন ৮৯·১২% এবং কার্বন ১০·০৪% আছে। ক্লোরোফর্মের বাষ্প-ঘনত্ব=৫৯·৭৫ হইলে, উহার আণবিক সঙ্কেত কি হইবে?

ক্লোরোফর্ম Cl=৮৯·১২% C=১০·০৪%

অতএব, হাইড্রোজেনের পরিমাণ—

H=১০০—৮৯·১২—১০·০৪=০·৮৪%

ওজনের অনুপাতে, C : H : Cl=১০·০৪ : ০·৮৪ : ৮৯·১২

অর্থাৎ, পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে,

$$C : H : Cl = \frac{১০·০৪}{১২} : \frac{০·৮৪}{১} : \frac{৮৯·১২}{৩৫·৫}$$

$$= ·৮৩৭ : ·৮৪ : ২·৫১$$

সর্বাপেক্ষা ছোট ·৮৩৭ দ্বারা রাশিগুলিকে ভাগ করিয়া অনুপাতটিকে সরলতর করিলে,

$$C : H : Cl = \frac{·৮৩৭}{·৮৩৭} : \frac{·৮৪}{·৮৩৭} \quad \frac{২·৫১}{·৮৩৭}$$

$$= ১ : ১·০০৪ : ৩ = ১ : ১ : ৩।$$

অতএব, ক্লোরোফর্মের স্থূল-সঙ্কেত হইবে $CHCl_3$। উহার আণবিক সঙ্কেত মনে কর, $(CHCl_3)_n$, n একটি পূর্ণসংখ্যা। এই আণবিক সঙ্কেত গ্রহণ করিলে উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে,

$(CHCl_3)_n$ = n × ১২ + n × ১ + ৩n × ৩৫·৫

= ১১৯·৫ n।

কিন্তু উহার বাষ্প-ঘনত্ব, ৫৯·৭৫।

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব = ২ × ৫৯·৭৫ = ১১৯·৫

∴ ১১৯·৫ n = ১১৯·৫ ∴ n = ১।

অর্থাৎ, ক্লোরোফর্মের আণবিক সঙ্কেত, $CHCl_3$।

উদাহরণ ৭। চিনিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। উহার কার্বন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ, C = ৪২·১১%, H = ৬·৪৩%। চিনির স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? [C = ১২, O = ১৬]

অক্সিজেনের পরিমাণ = ১০০ − ৪২·১১ − ৬·৪৩ = ৫১·৪৬%

অতএব ওজনের অনুপাতে,

C : H : O = ৪২·১১ : ৬·৪৩ : ৫১·৪৬

পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে

$$C : H : O = \frac{৪২·১১}{১২} : \frac{৬·৪৩}{১} : \frac{৫১·৪৬}{১৬}$$

= ৩·৫০১ : ৬·৪৩ : ৩·২১৬

সর্বাপেক্ষা ছোট ৩·২১৬ দ্বারা ভাগ করিলে অনুপাতটি হইবে

$$C : H : O = \frac{৩·৫০১}{৩·২১৬} : \frac{৬·৪৩}{৩·২১৬} : \frac{৩·২১৬}{৩·২১৬}$$

= ১·০৯ : ২·০ : ১·০

পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করিতে ইহাকে অন্ততঃ ১১ দ্বারা গুণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে

C : H : O = ১১·৯৯ : ২২ : ১১

= ১২ : ২২ : ১১ (আসন্ন পূর্ণসংখ্যাতে ধরিয়া)

∴ চিনির স্থূল-সঙ্কেত হইবে, $C_{12}H_{22}O_{11}$।

উদাহরণ ৮। একটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। উহার বাষ্প-ঘনত্ব ২৭ এবং উহাতে শতকরা ওজনের ৮৮·৮৮ ভাগ কার্বন আছে। উহার আণবিক সঙ্কেত নির্দেশ কর।

যৌগিক পদার্থটিতে কার্বনের পরিমাণ, C=৮৮·৮৮%

∴ উহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ=১০০−৮৮·৮৮=১১·১২%

সুতরাং উহাতে মৌল দুইটির পরমাণু-সংখ্যার অনুপাত হইবে :—

$$C : H = \frac{৮৮·৮৮}{১২} : \frac{১১·১২}{১}$$

$$= ৭·৪০৭ : ১১·১২$$

$$= \frac{৭·৪০৭}{৭·৪০৭} : \frac{১১·১২}{৭·৪০৭}$$ [ছোট সংখ্যাটির দ্বারা ভাগ করিয়া]

$$= ১ : \frac{৩}{২} = ২ : ৩$$

অতএব, পদার্থটির স্থূল-সঙ্কেত হইবে, C_2H_3।

মনে কর, উহার আণবিক সঙ্কেত, $(C_2H_3)n$ (n একটি পূর্ণসংখ্যা)

অর্থাৎ, উহার আণবিক গুরুত্ব = ২n × ১২ + ৩n × ১।

কিন্তু উহার বাষ্প-ঘনত্ব ২৭,

সুতরাং আণবিক গুরুত্ব = ২ × ২৭ = ৫৪।

∴ ২n × ১২ + ৩n × ১ = ৫৪

অথবা, ২৭n = ৫৪, ∴ n = ২

∴ উহার আণবিক সঙ্কেত, $(C_2H_3)_2$ অর্থাৎ C_4H_6।

অনুশীলন

(১) পটাসিয়াম ক্লোরেটে উহার উপাদানগুলি নিম্নলিখিত ওজনের অনুপাতে থাকিলে উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? : Cl : O=১ : ০·৯১ : ১·২৩

(K=৩৯, Cl=৩৫·৫, O=১৬)

(২) সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেটের উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত :—
Na : H : S : O=১·৯২ : ০·০৮৩ : ২·৬৭ : ৫·৩৩ ; উহার স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর।

[Na=২৩, S=৩২, O=১৬]

(৩) জিঙ্ক সালফাইডে সালফারের ওজনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ হইলে উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? [Zn=৬৫, S=৩২]

(৪) একটি লেড অক্সাইডে দেখা গেল লেডের পরিমাণ ৯০·৬৬%। অক্সাইডটির স্থূল-সঙ্কেত নির্ণয় কর। [Pb=২০৭·২, O=১৬]

(৫) ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটে ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন আছে। উহাতে ম্যাগনেসিয়াম ও কার্বনের পরিমাণ, Mg=২৮·৫৭%, C=১৪·২৮%। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর।

Mg=২৪, C=১২, O=১৬]

(৬) কার্বন, অক্সিজেন ও ক্লোরিন সংযোগে উৎপন্ন একটি পদার্থে O=১৬·১৬% এবং C=১২·১২% আছে, উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে ? [C=১২, O=১৬, Cl=৩৫·৫]

(৭) সোডিয়াম, বোরন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ Na=২২·৮৬% এবং B=২১·৪২% আছে। উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে ?

[Na=২৩, B=১০·৮, O=১৬]

(৮) সিলিসিক অ্যাসিডে সিলিকন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত আছে। সিলিকন ও অক্সিজেনের ওজনের পরিমাণ, Si=৩৫·৯% এবং O=৬১·৫৪%। সিলিসিক অ্যাসিডের স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর। [Si=২৮, O=১৬]

(৯) জিঙ্ক ফসফেট Zn=৫০·৬৫%, P=১৬·১০%, এবং অবশিষ্ট অক্সিজেন থাকে। উহার স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে ? [Zn=৬৫, P=৩১, O=১৬]

(১০) সোডিয়াম আয়োডেট যৌগটিতে Na=১১·৬৫%, I=৬৪·১৪% এবং O=২৪·২১% আছে। উহার স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর। [Na=২৩, I=১২৭, O=১৬]

(১১) কার্বন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত সায়নোজেন গ্যাসে শতকরা ৪৬·১৫ ভাগ কার্বন থাকে। সায়নোজেনের বাষ্প-ঘনত্ব ২৬ হইলে, উহার আণবিক সঙ্কেত কি হইবে? [C=১২, N=১৪]

(১২) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে গঠিত একটি কোহলে ৩৮·৭১% ভাগ কার্বন এবং ৫১·৬১% ভাগ অক্সিজেন আছে। উহার বাষ্প-ঘনত্ব ৩১। কোহলটির আণবিক সঙ্কেত কি ? [C=১২, O=১৬

(১৩) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত একটি যৌগের উপাদানগুলির ওজনের পরিমাণ, C=৫৪·৫৪%, H=৯·০৯%, O=৩৬·৩৭%।

পদার্থটির আণবিক গুরুত্ব ১৩২। উহার আণবিক সঙ্কেত বাহির কর।

(১৪) অ্যাসেটিক অ্যাসিডে ৫৩·৩৩% অক্সিজেন এবং ৪০·০% কার্বন আছে। বাকীটুকু হাইড্রোজেন। উহার আণবিক গুরুত্ব ৬০। অ্যাসেটিক অ্যাসিডের আণবিক সঙ্কেত কি ?

(১৫) ন্যাপথালিনের ভিতর ৯৩·৭৫% ভাগ কার্বন আছে। বাকীটুকু হাইড্রোজেন। উহার বাষ্প-ঘনত্ব ৬৪। ন্যাপথালিনের আণবিক সঙ্কেত কি হইবে ?

(১৬) কিউপ্রাস ক্লোরাইডের আণবিক গুরুত্ব ১৯৭। উহাতে কপারের অংশ ৬৩·৯৬%। উহার আণবিক সঙ্কেত কি ? [Cu=৬৩, Cl=৩৫·৫]

(১৭) অনার্দ্র ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত $MgSO_4$। উহার সোদক স্ফটিকে ৫১·২২% জল আছে। সোদক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত কি হইবে?

[Mg=২৪, S=৩২, O=১৬]

(১৮) অ্যালাম K_2SO_4 এবং $Al_2(SO_4)_3$ এর যুক্ত-যৌগিক। উহার স্ফটিকে ৪৫·৫৭% ভাগ জল বর্তমান। অ্যালামের স্ফটিকের সঙ্কেত নির্ণয় কর।

[K=৩৯, S=৩২, O=১৬, Al=২৭]

(১৯) ১·২৪৫ গ্রাম কপার সালফেটের সোদক স্ফটিক উত্তপ্ত করিয়া জল দূরীভূত করিলে ০·৭৯৫ গ্রাম অনার্দ্র $CuSO_4$ পাওয়া যায়। সোদক কপার সালফেটের অণুতে কয়টি জলের অণু সংশ্লিষ্ট থাকে? [Cu=৬৩, S=৩২, O=১৬]

(২০) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সোদক স্ফটিক উত্তপ্ত করিলে উহার প্রতি গ্রাম হইতে ০·৪৯৩ গ্রাম জল উড়িয়া যায়। সোদক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্কেত লিখ।

[Ca=৪০, Cl=৩৫·৫, O=১৬]

(২১) লৌহের দুইটি সোদক ক্লোরাইডের উপাদানগুলির অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) Fe=২৮·১৪% ; Cl=৩৫·৬৮% ; H_2O=৩৬·১৮%

(খ) Fe=২০·৭৪% ; Cl=৩৯·৩৭% ; H_2O=১৯·৮৯%

উহাদের সঙ্কেত নির্ধারণ কর।

[Fe=৫৬, Cl=৩৫·৫, O=১৬]

(২২) সিলভার ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়ার একটি যুক্ত-যৌগিকে অ্যামোনিয়া=১৫·০৮৮% সিলভার=৬৩·৯০% এবং ক্লোরিন=২১·০১২% আছে। উহার সঙ্কেত কি?

[Ag=১০৮, Cl=৩৫·৫, N=১৪]

(২৩) সোডার স্ফটিকে জলীয় অংশ শতকরা ১৪·৫২ ভাগ এবং মোট অক্সিজেন ও কার্বনের অংশ যথাক্রমে O=৫১·৬১% এবং C=৯·৬৮%। সোদক সোডার সঙ্কেত নির্ণয় কর। [Na=২৩, C=১২, O=১৬]

(২৪) ক্যাসিটেরাইট নামক টিনের আকরিকে মাত্র ৮% টিন-জাত অক্সাইড আছে, ২৫ গ্রাম আকরিক হইতে ১·৫৭৬ গ্রাম টিন পাওয়া যায়। টিন-অক্সাইডের স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে?

[Sn=১১৮]

(২৫) একটি যৌগিকের উপাদানসমূহের পরিমাণ :

S=৩৯%, H=২·৪৮%, O=৫৮·৫২%

উহার স্থূল-সঙ্কেত বাহির কর।

(২৬) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগপদার্থে C=৪০% এবং হাইড্রোজেন=৬·৬৭% আছে। ইহার আণবিক গুরুত্ব ১৮০। পদার্থটির আণবিক সঙ্কেত নির্ণয় কর। (কলিকাতা)

(২৭) একটি সোদক স্ফটিক অনার্দ্র করিলে উহার ওজন শতকরা ৪৫·৬ ভাগ কমিয়া যায়। অনার্দ্র স্ফটিকের বিশ্লেষণে দেখা যায়, উহাতে Al=১০·৫%, K=১৫·১%, S=২৪·৮% এবং O=৪৯·৬% আছে। সোদক ও অনার্দ্র পদার্থটির স্থূল-সঙ্কেত কি হইবে? (এলাহাবাদ)

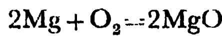
(২৮) সালফার, ক্লোরিন ও অক্সিজেনে গঠিত একটি যৌগপদার্থে S=২৩·৭৬% এবং Cl=৫২·৫৪% আছে। পদার্থটির বাষ্প-ঘনত্ব=৬৮। উহার আণবিক সঙ্কেত বাহির কর। (বোম্বাই)

(২৯) সিলিকন ক্লোরাইডে ১৬·৪৭ শতাংশ সিলিকন আছে। উহার বাষ্প-ঘনত্ব ৮৫। সিলিকনের পারমাণবিক গুরুত্ব কত।

(৩০) একটি দ্বিযৌগিক লবণের বিশ্লেষণে দেখা গেল, K=১৭·৮, Ni=১৩·৫, SO_4=৪৪ এবং H_2O=২৪·৭ শতাংশ আছে। লবণটির সঙ্কেত কি হইবে? [K=৩৯, Ni=৫৮·৭]

৩। বিক্রিয়ক-পদার্থ অথবা উৎপন্ন-পদার্থের ওজন নির্ধারণ—

কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তনে কতখানি পদার্থ প্রয়োজন, অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রিয়ক হইতে কি পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হয় উহা সমীকরণ সাহায্যে সহজেই বাহির করা যায়। যেমন—ম্যাগনেসিয়ামকে পোড়াইলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়।



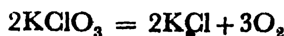
$$2Mg + O_2 = 2MgO$$

২ × ২৪ ৩২ ২ × ৪০

অর্থাৎ ওজনের হিসাবে, ৪৮ ভাগ ম্যাগনেসিয়ামের জারণে ৩২ ভাগ অক্সিজেন প্রয়োজন এবং উহা হইতে ৮০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ৪৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হইতে ৮০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। অথবা, ৮০ সের ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করিতে ৪৮ সের ম্যাগনেসিয়াম ধাতু পোড়ান দরকার।

সমীকরণ হইতে এইভাবে বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের ওজনের সম্পর্ক জানা যায়।

উদাহরণ। (১) ৫ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে কতখানি পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রয়োজন?



$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$$

২ (৩৯ + ৩৫·৫ + ৪৮)   ৩ × ৩২

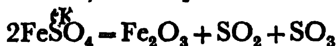
=২৪৫   =৯৬

অর্থাৎ, ৬৪ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ২৪৫ গ্রাম $KClO_3$ প্রয়োজন।

∴ ৫ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুতিতে $\frac{২৪৫ \times ৫}{৬৪}$ গ্রাম

$= ১৯\cdot১$ গ্রাম $KClO_3$ প্রয়োজন।

(২) এক সের ফেরাস সালফেট হইতে কতখানি ফেরিক অক্সাইড পাওয়া যায়? [Fe = ৫৬, S = ৩২]



$$2FeSO_4 = Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$$

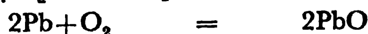
$$2FeSO_4 = ২ \times [৫৬ + ৩২ + ৬৪] = ৩০৪$$

$$Fe_2O_3 = ২ \times ৫৬ + ৩ \times ১৬ = ১৬০$$

অর্থাৎ, ৩০৪ সের ফেরাস সালফেট হইতে ১৬০ সের Fe_2O_3 পাওয়া যায়।

১ সের ফেরাস সালফেট হইতে $\frac{১৬০}{৩০৪}$ সের ০·৫২৬ সের Fe_2O_3 পাওয়া যায়।

(৩) দুই পাউণ্ড লেড-মনোক্সাইড প্রস্তুত করিতে কতখানি লেড-ধাতু প্রয়োজন হইবে? [Pb = ২০৮]



$$2Pb + O_2 = 2PbO$$

$$২ \times ২০৮ = ৪১৬ \qquad ২(২০৮ + ১৬) = ৪৪৮$$

অর্থাৎ, ৪৪৮ পাউণ্ড লেড-মনোক্সাইডের জন্য ৪১৬ পাউণ্ড লেড প্রয়োজন

∴ ২ .... $\frac{৪১৬ \times ২}{৪৪৮}$ ....

$= ১\cdot৮৬$ পাউণ্ড।

(৪) এক কিলোগ্রাম ডলোমাইট আকরিক উত্তপ্ত করিলে ওজনের কি পরিমাণ হ্রাস হইবে? [Ca = ৪০, Mg = ২৪]



$$CaCO_3, MgCO_3 = CaO + MgO + 2CO_2$$

$$১০০ + ৮৪ = ১৮৪ \qquad (৫৬ + ৪০) = ৯৬$$

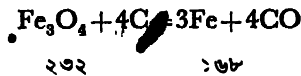
কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস অবস্থায় উড়িয়া যাওয়ার ফলে ওজনের হ্রাস হইবে।

অর্থাৎ ১৮৪ গ্রাম ডলোমাইট বিযোজিত হইলে ৯৬ গ্রাম অক্সাইড থাকিবে।

∴ ১০০০ গ্রাম ডলোমাইট বিযোজিত হইলে $\frac{৯৬ \times ১০০০}{১৮৪}$ গ্রাম $= ৫২১\cdot৭$ গ্রাম অক্সাইড থাকিবে।

ওজনের হ্রাস $১০০০ - ৫২১\cdot৭ = ৪৭৮\cdot৩$ গ্রাম।

(৫) একটি ম্যাগনেটাইট আকরিকে শতকরা ৬০ ভাগ ফেরাসো-ফেরিক অক্সাইড আছে। এই আকরিকের পাঁচ শত মণ হইতে কতটা লৌহ পাওয়া যাইতে পারে? [Fe—৫৬]



$$Fe_3O_4+4C=3Fe+4CO$$

২৩২ ১৬৮

৫০০ মণ আকরিকে বস্তুতঃ আয়রন অক্সাইডের পরিমাণ $=\frac{৫০০\times৬০}{১০০}$

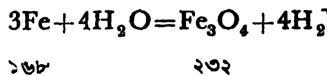
$=$৩০০ মণ।

দেখা যাইতেছে, ২৩২ মণ অক্সাইড হইতে ১৬৮ মণ লৌহ পাওয়া সম্ভব।

∴ ৩০০ মণ অক্সাইড হইতে $\frac{১৬৮\times৩০০}{২৩২}$ .... মণ লৌহ পাওয়া যায়

$=$২১৭·২ মণ।

(৬) এক মণ লৌহচূরের উপর দিয়া স্টীম পরিচালিত করিলে উৎপন্ন আয়রন-অক্সাইড কতখানি পাওয়া যাইবে? [Fe=৫৬]



$$3Fe+4H_2O=Fe_3O_4+4H_2$$

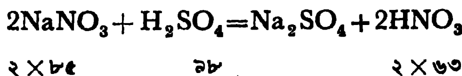
১৬৮ ২৩২

অর্থাৎ ১৬৮ মণ লৌহ হইতে ২৩২ মণ আয়রন অক্সাইড পাওয়া যায়,

∴ ১ মণ.................. $\frac{২৩২}{১৬৮}$ মণ..................................

$=$১·৩৮ মণ।

(৭) চিলির নাইট্রেটে শতকরা ৯২ ভাগ $NaNO_3$ থাকে। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে শতকরা ৯৬ ভাগ অ্যাসিড আছে। ২০ পাউণ্ড নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণে উক্ত নাইট্রেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড লইতে হইবে? [Na=২৩, N=১৪, S—৩২]



$$2NaNO_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+2HNO_3$$

২×৮৫ ৯৮ ২×৬৩

অর্থাৎ, ১২৬ পাউণ্ড নাইট্রিক অ্যাসিডের জন্য ১৭০ পাউণ্ড $NaNO_3$ এবং ৯৮ পাউণ্ড H_2SO_4 প্রয়োজন।

∴ ২০ পাউণ্ড নাইট্রিক অ্যাসিডের জন্য $\frac{১৭০\times২০}{১২৬}$ পাউণ্ড $NaNO_3$ এবং

$\frac{৯৮ \times ২}{১২৬}$ পাউণ্ড H_2SO_4 প্রয়োজন। কিন্তু ৯২ পাউণ্ড $NaNO_3$ ১০০ পাউণ্ড চিলি-নাইট্রেট হইতে পাওয়া যায়।

$\frac{১৭০ \times ২০}{১২৬}$ পাউণ্ড $NaNO_3$ $\frac{১০০ \times ১৭০ \times ২০}{১২৬ \times ৯২}$ পাউণ্ড চিলি-নাইট্রেট হইতে পাওয়া যায়।

=২৯·৩ পাউণ্ড চিলি-নাইট্রেট।

এবং, ৯৬ পাউণ্ড H_2SO_4 ১০০ পাউণ্ড অ্যাসিড হইতে পাওয়া যায়

∴ $\frac{৯৮ \times ২০}{১২৬}$ পাউণ্ড H_2SO_4 $\frac{১০০}{৯৬} \times \frac{৯৮ \times ২০}{১২৬}$ পাউণ্ড অ্যাসিড হইতে পাওয়া যায়।

=১৬·২ পাউণ্ড অ্যাসিড।

(৮) সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে ক্লোরিন উৎপন্ন করা হইল। ক্যালসিয়াম কার্বনেট হইতে উদ্ভূত চুনের দ্রবণে উহা শোষণ করাইয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুত করা হইল। ৮২৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুত করিতে কতটা সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত করা প্রয়োজন হইবে?

[Ca=৪০, Cl=৩৫·৫, Na=২৩]

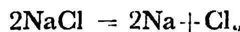


$$6Ca(OH)_2 + 6Cl_2 = 5CaCl_2 + Ca(ClO_3)_2 + 6H_2O$$

৬×৭১ ২০৭

অর্থাৎ, ২০৭ গ্রাম $Ca(ClO_3)_2$ প্রস্তুতিতে ৪২৬ গ্রাম Cl_2 প্রয়োজন।

∴ ৮২৮ গ্রাম $Ca(ClO_3)_2$ প্রস্তুতিতে $\frac{৪২৬ \times ৮২৮}{২০৭}$ গ্রাম Cl_2 = ১৭০৪ গ্রাম Cl_2 প্রয়োজন।



$$2NaCl = 2Na + Cl_2$$

২×৫৮·৫ ৭১

অর্থাৎ ৭১ গ্রাম Cl_2 প্রস্তুতিতে ১১৭ গ্রাম NaCl প্রয়োজন।

∴ ১৭০৪ গ্রাম Cl_2 প্রস্তুতিতে $\frac{১১৭ \times ১৭০৪}{৭১}$ গ্রাম NaCl = ২৮০৮ গ্রাম NaCl প্রয়োজন।

∴ ৮২৭ গ্রাম $Ca(ClO_3)_2$ প্রস্তুত করিতে ২৮০৮ গ্রাম NaCl বিশ্লেষিত করা দরকার হইবে।

১। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির প্রত্যেকটির ১০ গ্রাম করিয়া লইয়া পৃথকভাবে খুব উত্তপ্ত করিলে কি কি গ্যাস এবং কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে ?

(১) পটাসিয়াম ক্লোরেট, (২) লেড-নাইট্রেট, (৩) ফেরাস সালফেট, (৪) অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট।

২। ১'৩২ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির কোন্‌টি কি পরিমাণে লইলে উক্ত গ্যাস পাওয়া যাইতে পারে ?

(১) কার্বন, (২) সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট, (৩) কার্বন মনোক্সাইড, এবং (৪) লেড-কার্বনেট।

৩। ৬'৩ মণ সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে কত মণ সালফার পোড়ান প্রয়োজন হইবে ?

৪। ১৮ গ্রাম স্টীম উত্তপ্ত লৌহের উপর পরিচালিত করিলে কতখানি আয়রন অক্সাইড পাওয়া যাইবে ? (কলিকাতা)

৫। ২'৯ গ্রাম কস্টিক সোডা লঘু দ্রবণে লইয়া উহাতে শীতল অবস্থায় ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত করিলে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে ? (কলিকাতা)

৬। ৫০০ গ্রাম বাতাসের সমস্ত অক্সিজেন দূর করিতে কতটা ফসফরাস পোড়াইতে হইবে ? অবশিষ্ট গ্যাসের ওজন কত হইবে ? বাতাসে ওজনের অনুপাতে শতকরা ২৩ ভাগ অক্সিজেন আছে। (কলিকাতা)

৭। একটি কপার-সালফেট দ্রবণে জিঙ্ক মিশাইলে ২'১ গ্রাম কপার অধঃক্ষিপ্ত হইল। এই বিক্রিয়াতে কতটুকু জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হইল ? [Cu = ৬৬, Zn = ৬৫]

৮। সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণে খানিকটা কপার-চূর্ণ মিশাইলে ০'২৬ গ্রাম সিলভার অধঃক্ষিপ্ত হইল। কি পরিমাণ কপার ইহাতে দ্রবীভূত হইল ? [Ag = ১০৮, Cu = ৬৩]

৯। ৫ গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইডের সমস্তটুকু আয়োডিন নিষ্কাশিত করিতে কতখানি H_2O_2 প্রয়োজন ?

১০। ৫০ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করিতে কতখানি সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার ? এই পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড যদি পাইরাইটিস হইতে তৈয়ারী করা হয় তবে কত পাইরাইটিস প্রয়োজন হইবে ?

[পাইরাইটিস = FeS_2 ; S = ৩২, Fe = ৫৬, N = ১৪]

১১। ৪'২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত করিতে কতখানি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন হইবে ?

১২। একটি কপারের আকরিকে শতকরা ৫০ ভাগ কিউপ্রাস সালফাইড আছে। এই আকরিকের ১০০ গ্রাম হইতে কতটা কপার পাওয়া যাইবে ? (এলাহাবাদ)

১৩। ৭'২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত করিতে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োজন তাহা কি পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে পাওয়া যাইবে ?

১৪। ৩০ গ্রাম $KClO_3$ হইতে যে অক্সিজেন পাওয়া গেল উহাকে জিঙ্ক ও সালফিউরিক

অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের সহিত সংযোজিত করিয়া জলে পরিণত করা হইল। ইহাতে কি পরিমাণ জিঙ্ক ব্যয় হইল ? (কলিকাতা)

১৫। ১০০ গ্রাম হাইড্রোজেনকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত করিতে যে ক্লোরিন প্রয়োজন উহা প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ MnO_2 দরকার হইবে ? (Mn = ৫৫)

১৬। ৫ মণ ক্যালসিয়াম সায়নামাইড প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ কার্বাইড দরকার উহার জন্য কতটা চুন প্রয়োজন হইবে ?

১৭। এ্কটি জিঙ্ক-উৎপাদনের কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ১৫০ শত মণ জিঙ্কব্লেণ্ড ব্যবহৃত হয়। আকরিকের মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ জিঙ্ক-সালফাইড। এই কারখানায় সপ্তাহে কতটা কোক বিজারক হিসাবে প্রয়োজন হয় ?

১৮। ৬·৪ গ্রাম সালফার পোড়াইয়া যে পরিমাণ SO_2 পাওয়া যায় উহার সমপরিমাণ SO_2 কপার ও সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে তৈয়ারী করিতে কতখানি অ্যাসিড প্রয়োজন হইত ?

১৯। ১৩·৪ গ্রাম লেড কার্বনেট হইতে যে পরিমাণ লেড মনোক্সাইড পাওয়া যায় উহা লেড নাইট্রেট হইতে উৎপন্ন করিতে কত পরিমাণ লেড নাইট্রেট প্রয়োজন হইবে ?

২০। ১০ গ্রাম চকের সহিত সমপরিমাণ ওজন H_2SO_4 মিশাইলে কতখানি ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইবে ?

২১। ৬০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ৪০ গ্রাম চুন একত্র উত্তপ্ত করিলে কতখানি অ্যামোনিয়া পাওয়া যাইবে ?

২২। ৮·৪ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের সহিত ৯ গ্রাম সালফিউরিক মিশাইলে উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের পরিমাণ কত হইবে ?

২৩। একটি অবিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ৫ গ্রাম পরিমাণ লবণ জলে দ্রবীভূত করিয়া উহাতে অতিরিক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশান হইল। ১২·৮ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত হইল। সোডিয়াম ক্লোরাইডে আবর্জনার পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ছিল ?

২৪। একটি সিলভারের আকরিকে শতকরা ১·২ ভাগ সিলভার আছে। চিলির নাইটারে শতকরা ৮৮ ভাগ সোডিয়াম নাইট্রেট থাকে। নাইটার হইতে উৎপন্ন নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা ১০০ মণ আকরিকের সিলভারকে সম্পূর্ণরূপে সিলভার নাইট্রেটে পরিণত করিতে কত মণ নাইটার প্রয়োজন হইবে।

২৫। কপার ও সিলভারের এক গ্রাম পরিমাণ একটি সঙ্কর ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে ২·০৬ গ্রাম গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড প্রয়োজন হয়। সঙ্করের ভিতর ধাতু দুইটির ওজনানুপাত নির্ণয় কর।

২৬। ১·০৬ গ্রাম পরিমাণ CaO এবং $CaCO_3$-এর মিশ্রণকে দ্রবীভূত করিতে ১·৪৭ গ্রাম H_2SO_4 প্রয়োজন হইলে মিশ্রণটিতে কার্বনেট শতকরা কত ভাগ ছিল ?

২৭। ১·২৫ গ্রাম ওজনের কপার এবং কিউপ্রিক অক্সাইডের একটি মিশ্রণকে হাইড্রোজেন গ্যাসে বিজারিত করিয়া ১·০৪৯ গ্রাম কপার পাওয়া গেল। মিশ্রণটিতে কপারের অনুপাত কিরূপ ছিল ? [Cu = ৬৩]

২৮। ৫০ গ্রাম লৌহকে অ্যামোনিয়াম ফেরিক অ্যালামে পরিণত করিতে কি পরিমাণ

অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন হইবে? [Fe=৫৬, S=৩২, N=১৪] ঐ ফেরিক অ্যালামের সঙ্কেত, $(NH_4)_2SO_4,Fe_2(SO_4)_3,24H_2O$.

২৯। ০·৩ গ্রাম খনিজ খাদ্যলবণ জলে দ্রবীভূত করিয়া অতিরিক্ত $AgNO_3$ দেওয়াতে ০·৭০ গ্রাম AgCl অধঃক্ষেপ দেয়। খনিজটিতে খাদ্যলবণের অনুপাত কত?

৩০। পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্লোরেটের ১২ গ্রাম একটি মিশ্রণ তাপিত করার পর ৮·০৮ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড পড়িয়া রহিল। মিশ্রণটিতে ক্লোরেট কত শতাংশ ছিল?

৩১। KCl এবং NaClএর ১·৮৭৩ গ্রাম একটি মিশ্রণ হইতে ৩·৭৩১ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড পাওয়া গেল। মিশ্রণটিতে কতটুকু সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল?

৩২। ৪ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও কার্বনেট মিশ্রণ তাপিত করাতে ০·৪৬৪ ওজনের হ্রাস হইল। মিশ্রণটিতে সোডিয়াম কার্বনেটের অনুপাত কত?

৩৩। KCl এবং KIএর খানিকটা মিশ্রণ পটাসিয়াম সালফেটে পরিণত করিলে দেখা গেল ওজনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। মিশ্রণে আয়োডাইড এবং ক্লোরাইড কি অনুপাতে ছিল?

৩৪। ৮ গ্রাম MnO_2 সাহায্যে HCl হইতে ক্লোরিন উৎপাদন করিয়া উহাকে KI-দ্রবণে পরিচালনা করিলে কতটা আয়োডিন পাওয়া যাইবে?

৪। বিক্রিয়ক অথবা বিক্রিয়াজাত পদার্থের আয়তন-নির্ধারণ—

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে সকল পদার্থ অংশ গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন হয়, তাহাদের ওজন কিভাবে নিরূপণ করা যায় তাহাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বিক্রিয়ক অথবা বিক্রিয়াজাত পদার্থ যদি গ্যাসীয় হয় তাহা হইলে উহাদের ওজনের পরিবর্তে আয়তন নির্ধারণ অধিক প্রয়োজন।

এইরূপ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন নিরূপণ করিতে হইলে তিনটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে :—

(১) সমীকরণ সাহায্যে কি পরিমাণ পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে বা উৎপন্ন হয় তাহার ওজন স্থির করিতে হইবে।

(২) প্রতি গ্রাম-অণু পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় ২২·৪ লিটার আয়তন থাকে। এই নিয়মের দ্বারা যে কোন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের প্রমাণ-অবস্থায় আয়তন স্থির করা যাইবে।

(৩) গ্যাসটি যদি প্রমাণ অবস্থায় না থাকে, তবে গ্যাস-সমীকরণ $\frac{PV}{T}=\frac{P'V'}{T'}$ সাহায্যে উহাকে প্রমাণ-অবস্থার আয়তনে পরিবর্তিত করা যাইবে।

উদাহরণ ১। ১০ গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট বিযোজিত করিয়া প্রমাণ-অবস্থায় কত লিটার অক্সিজেন পাওয়া যাইবে? [K=৩৯]



$$2KNO_3 = 2KNO_2 + O_2$$

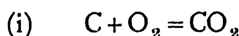
২ × ১০১ ২২·৪ লিটার

অর্থাৎ প্রমাণাবস্থায় ২০২ গ্রাম নাইট্রেট হইতে ২২·৪ লিটার O_2 পাওয়া যায়

∴ ” ১০ গ্রাম ” ” $\frac{২২·৪ \times ১০}{২০২}$ ” ” ” ”

= ১·১০৯ লিটার।

উদাহরণ ২। কার্বন পোড়াইয়া অথবা ক্যালসিয়াম কার্বনেট উত্তপ্ত করিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করা যায়। ৩৩·৬ লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করিতে হইলে উপরোক্ত পদার্থের কোন্‌টি কত পরিমাণ প্রয়োজন হইবে? [Ca = ৪০]



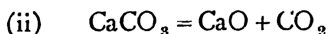
(i) $C + O_2 = CO_2$

১২ ২২·৪ লিটার

অর্থাৎ ২২·৪ লিটার CO_2 প্রস্তুতিতে ১২ গ্রাম কার্বন প্রয়োজন।

∴ ৩৩·৬ ” CO_2 ” $\frac{১২ \times ৩৩·৬}{২২·৪}$ ” ”

= ১৮ গ্রাম কার্বন।



(ii) $CaCO_3 = CaO + CO_2$

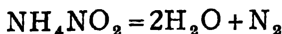
১০০ ২২·৪ লিটার

∴ ২২·৪ লিটার CO_2 প্রস্তুতিতে ১০০ গ্রাম $CaCO_3$ প্রয়োজন।

∴ ৩৩·৬...... .... $\frac{১০০ \times ৩৩·৬}{২২·৪}$ ....

= ১৫০ গ্রাম $CaCO_3$

উদাহরণ ৩। ২৭° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে ৫ লিটার নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে কতটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট প্রয়োজন হইবে?



$$NH_4NO_2 = 2H_2O + N_2$$

৬৪ ২২·৪ লিটার

উক্ত নাইট্রোজেনের প্রমাণ-অবস্থায় আয়তন V লিটার হইলে, $\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$

অথবা, $\frac{৭৫০ \times ৫}{২৭৩ + ২৭} = \frac{৭৬০ \times V}{২৭৩}$

∴ $V = \frac{৭৫০ \times ৫ \times ২৭৩}{৩০০ \times ৭৬০}$ লিটার (প্রমাণাবস্থায়)

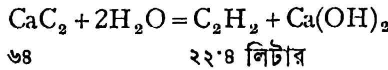
কিন্তু প্রমাণাবস্থায় ২২·৪ লিটার N_2 প্রস্তুতিতে ৬৪ গ্রাম NH_4NO_2 প্রয়োজন

∴ „ $\frac{৭৫০ \times ৫ \times ২৭৩}{৩০০ \times ৭৬০}$ „ „ „ $\frac{৬৪ \times ৭৫০ \times ৫ \times ২৭৩}{২২·৪ \times ৩০০ \times ৭৬০}$ গ্রাম „

প্রয়োজন

= ১২·৮৩ গ্রাম NH_4NO_2 ।

উদাহরণ ৪। ৯৬ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড হইতে উৎপন্ন অ্যাসিটিলীন গ্যাসকে পোড়াইয়া যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যাইবে ২৭° সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৪০ মিলিমিটার চাপে তাহার আয়তন কত হইবে ?



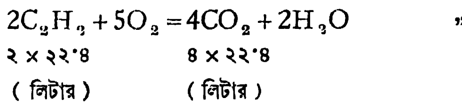
$$CaC_2 + 2H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

৬৪ ২২·৪ লিটার

প্রমাণ-অবস্থায় ৬৪ গ্রাম CaC_2 ২২·৪ লিটার অ্যাসিটিলীন উৎপাদন করে

∴ ৯৬ গ্রাম CaC_2 $\frac{২২·৪ \times ৯৬}{৬৪}$ লিটার অ্যাসিটিলীন উৎপাদন করে

= ৩৩·৬ লিটার অ্যাসিটিলীন।



$$2C_2H_2 + 5O_2 = 4CO_2 + 2H_2O$$

২ × ২২·৪ ৪ × ২২·৪

(লিটার) (লিটার)

অর্থাৎ, প্রমাণাবস্থায় ২ × ২২·৪ লিটার C_2H_2 হইতে ৪ × ২২·৪ লিটার CO_2 পাওয়া যায়

অথবা............১ লিটার C_2H_2 হইতে ২ লিটার CO_2 পাওয়া যায়

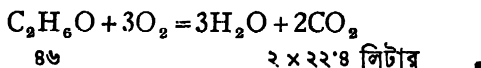
অতএব.............৩৩·৬.................৬৭·২ লিটার......

এই উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ২৭° সেন্টি এবং ৭৪০ মি. মি. চাপে আয়তন যদি V ধরা হয়, তাহা হইলে

$$\frac{৭৪০ \times V}{২৭৩ + ২৭} = \frac{৭৬০ \times ৬৭·২}{২৭৩}$$

∴ $V = \frac{৭৬০ \times ৬৭·২}{২৭৩} \times \frac{৩০০}{৭৪২}$ লিটার = ৭৫·৮৪ লিটার।

উদাহরণ ৫। তরল কোহলের সঙ্কেত C_2H_6O এবং উহার ঘনত্ব ০·৯২। ১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল কোহল পোড়াইয়া প্রমাণাবস্থায় কত লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যাইবে ?



$$C_2H_6O + 3O_2 = 3H_2O + 2CO_2$$
৪৬   ২ × ২২·৪ লিটার

১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল কোহলের ওজন = ১২৫ × ·৯২ গ্রাম। কিন্তু প্রমাণ-অবস্থায় ৪৬ গ্রাম কোহল হইতে ২ × ২২·৪ লিটার CO_2 পাওয়া যায়।

∴ প্রমাণ-অবস্থায় ১২৫ × ·৯২ গ্রাম কোহল হইতে $\frac{২ + ২২·৪ \times ১২৫ \times ·৯২}{৪৬}$ লিটার CO_2 পাওয়া যায়

= ১১২ লিটার CO_2।

উদাহরণ ৬। একটি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে ওজনের অনুপাতে শতকরা ৬৫ ভাগ অ্যাসিড আছে এবং উহার ঘনত্ব = ১·৫৬। এই অ্যাসিডের তিন লিটার যদি ২৫০০ গ্রাম জিঙ্কের সহিত মিশান হয় তবে ২৭° সেন্টিগ্রেডে এবং প্রমাণ চাপে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন কত হইবে? [Zn = ৬৫]

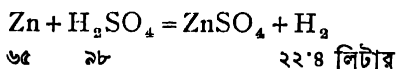
তিন লিটার অ্যাসিডের ওজন = ৩০০০ × ১·৫৬ = ৪৬৮০ গ্রাম

এই অ্যাসিডে শতকরা ৬৫ ভাগ H_2SO_4 আছে

অর্থাৎ ১০০ গ্রাম অ্যাসিডে H_2SO_4 আছে ৬৫ গ্রাম

∴ ৪৬৮০ গ্রামে H_2SO_4 অ্যাসিডের পরিমাণ, $\frac{৬৫ \times ৪৬৮০}{১০০}$ গ্রাম

= ৩০৪২ গ্রাম।



$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$
৬৫   ৯৮   ২২·৪ লিটার

অর্থাৎ ৯৮ গ্রাম H_2SO_4-এর জন্য ৬৫ গ্রাম Zn প্রয়োজন

∴ ৩০৪২ গ্রাম H_2SO_4 এর জন্য $\frac{৬৫ \times ৩০৪২}{৯৮}$ গ্রাম Zn প্রয়োজন

= ২০১৭·৬ গ্রাম Zn।

কিন্তু উহাতে ২৫০০ গ্রাম Zn আছে। অতএব এই বিক্রিয়াতে সম্পূর্ণ অ্যাসিড (H_2SO_4) সালফেটে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

প্রমাণ-অবস্থায় ৯৮ গ্রাম H_2SO_4 হইতে ২২·৪ লিটার H_2 পাওয়া যায়

∴ ৩০৪২.................... $\frac{২২·৪ \times ৩০৪২}{৯৮}$ লিটার......

= ৬৯৫·৩ লিটার H_2।

এই H_2এর আয়তন, ২৭° উষ্ণতায় এবং প্রমাণ চাপে যদি V হয় তাহা হইলে, $\frac{V \times ৭৬০}{৩০০} = \frac{৬৯৫·৩ \times ৭৬০}{২৭৩}$

$\therefore\ V = \frac{৬৯৫·৩ \times ৩০০}{২৭৩}$ লিটার = ৭৬৪·০৩ লিটার।

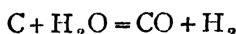
উদাহরণ ৭। ১৫° উষ্ণতায় এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে ১১২০ লিটার ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করিতে হইলে কি পরিমাণ জল বাষ্পীভূত করিতে হইবে?

মনে কর, ১১২০ লিটার ওয়াটার গ্যাসের প্রমাণ-অবস্থায় আয়তন = V লিটার

$$\therefore\ \frac{১১২০ + ৭৫৬}{২৮৮} = \frac{V \times ৭৬০}{২৭৩}$$

$$\therefore\ V = \frac{১১২০ \times ৭৫৬ \times ২৭৩}{২৮৮ \times ৭৬০}\ \text{লিটার}$$

= ১০৫৬·০৮ লিটার।



$$C + H_2O = CO + H_2$$

১৮ ২২·৪ + ২২·৪ (= ৪৪·৮) লিটার

অর্থাৎ প্রমাণ-অবস্থায় ৪৪·৮ লিটার ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুতিতে ২৮ গ্রাম জল বাষ্পীভূত হয়।

∴..............১০৫৬·০৮ লিটার ওয়াটার গ্যাস পাইতে $\frac{১৮ \times ১০৫৬·০৮}{৪৪·৮}$

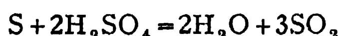
= ৪২৪·৩ গ্রাম জল বাষ্পীভূত হইবে।

উদাহরণ ৮। ১০ গ্রাম কপার এবং সালফার পৃথকভাবে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ফুটাইলে উৎপন্ন SO_2 গ্যাসের আয়তনের অনুপাত কি হইবে? (কলিকাতা)



$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2$$

৬২ ২২·৪ লিটার



$$S + 2H_2SO_4 = 2H_2O + 3SO_2$$

৩২ ৩ × ২২·৪ = (৬৭·২) লিটার

প্রমাণ-অবস্থায়—

৬৩ গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে ২২·৪ লিটার SO_2 পাওয়া যায়।

∴ ১০ গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে $\frac{২২\cdot৪ \times ১০}{৬৩}$ লিটার SO_2 পাওয়া যায়।

আবার, ৩২ গ্রাম সালফারের বিক্রিয়াতে ৬৭·২ লিটার SO_2 পাওয়া যায়

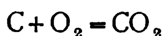
∴ ১০ .... $\frac{১০ \times ৬৭\cdot২}{৩২}$ লিটার.........

অতএব উৎপন্ন SO_2 গ্যাসের আয়তনের অনুপাত

$$= \frac{২২\cdot৪ \times ১০}{৬৩} : \frac{১০ \times ৬৭\cdot২}{৩২}$$

$$= ৩২ : ১৮৯।$$

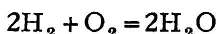
উদাহরণ ৯। বাতাসে ওজন হিসাবে অক্সিজেনের পরিমাণ ২৩%। একটি খনির কয়লাতে দেখা গেল, কার্বন ও হাইড্রোজেনের ওজনের পরিমাণ $C = ৯৬\%$; $H = ৪\%$। ১৫° সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপের কত লিটার বাতাসের সাহায্যে উপরোক্ত কয়লার ১০ কিলোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে জারিত করা হইবে? (বাতাসের ঘনত্ব = ১৪·৪)



১২ ৩২

১০ কিলোগ্রাম কয়লাতে

কার্বনের পরিমাণ = ৯৬০০ গ্রাম



৪ ৩২

হাইড্রোজেনের পরিমাণ = ৪০০ গ্রাম

অর্থাৎ ১২ গ্রাম কার্বনের জারণের জন্য ৩২ গ্রাম O_2 প্রয়োজন

∴ ৯৬০০........................ $\frac{৩২ \times ৯৬০০}{১২}$ ....

এবং ৪ গ্রাম H_2এর জারণের জন্য ৩২ গ্রাম O_2 প্রয়োজন

∴ ৪০০........................৩২০০..........O_2...........

∴ কয়লার সম্পূর্ণ জারণের জন্য $= \frac{৩২ \times ৯৬০০}{১২} + ৩২০০$

$= ২৮৮০০$ গ্রাম O_2 প্রয়োজন।

কিন্তু ২৩ গ্রাম অক্সিজেন ১০০ গ্রাম বাতাসে থাকে।

∴ ২৮৮০০ .... $\frac{১০০ \times ২৮৮০০}{২৩}$ গ্রাম বাতাসে থাকে

কিন্তু প্রমাণ-অবস্থায় ১ লিটার হাইড্রোজেনের ওজন = ·০৯ গ্রাম।

∴ ১ লিটার বাতাসের ওজন = ·০৯ × ১৪·৪ = ১·২৯৬ গ্রাম।

অতএব, প্রমাণ-অবস্থায়, প্রয়োজনীয় বাতাসের

আয়তন $=\frac{১০০ \times ২৮৮০০}{২৩ \times ১\cdot২৯৬}$ লিটার

$=৯৬৬১৮\cdot৩$ লিটার

উক্ত বাতাসের আয়তন ১৫° সেন্টি, এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে যদি V ধরা হয়, তাহা হইলে

$$\frac{V \times ৭৫৬}{২৮৮}=\frac{৯৬৬১৮\cdot৩ \times ৭৬০}{২৭৩}$$

অথবা, $V=\frac{৯৬৬১৮\cdot৩ \times ৭৬০ \times ২৮৮}{৭৫৬ \times ২৭৩}$ লিটার

$=১০২৪৬৬\cdot৩$ লিটার বাতাস প্রয়োজন হইবে।

উদাহরণ ১০। ১৫২০ ঘন সেন্টিমিটার একটি গ্যাস-মিশ্রণে ২৭° সেন্টি এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে মিথেন $=$ ২০% এবং কার্বন-মনোক্সাইড $=$ ৮০% ছিল। এই গ্যাস-মিশ্রণের পরিপূর্ণ জারণের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন তাহা উৎপাদন করিতে কতখানি $KClO_3$ লাগিবে? (কলিকাতা)

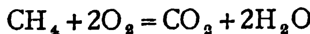
গ্যাস-মিশ্রণটির প্রমাণ-অবস্থার আয়তন যদি V ঘন সেন্টি. হয় তাহা হইলে,

$$\frac{V \times ৭৬০}{২৭৩}=\frac{১৫২০ \times ৭৫০}{৩০০}$$

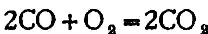
$\therefore \quad V=\frac{১৫২০ \times ৭৫০ \times ২৭৩}{৩০০ \times ৭৬০}=১৩৬৫$ ঘন সেন্টিমিটার

ইহাতে মিথেনের পরিমাণ $=\frac{১৩৬৫ \times ২০}{১০০}=২৭৩$ ঘন সেন্টিমিটার

এবং কার্বন-মনোক্সাইডের পরিমাণ $=\frac{১৩৬৫ \times ৮০}{১০০}=১০৯২$ ঘন সেন্টিমিটার


$$CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O$$

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন


$$2CO+O_2=2CO_2$$

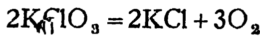
২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন

অর্থাৎ, ২৭৩ ঘন সেন্টিমিটার মিথেনের জন্য ২×২৭৩ ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন

এবং ১০৯২ ঘন সেন্টি. COএর জন্য $\frac{১০৯২}{২}$ ঘনসেন্টি. O_2 প্রয়োজন। প্রমাণ-অবস্থায়, মোট প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের আয়তন = ২ × ২৭৩ + ½ × ১০৯২

= ১০৯২ ঘন সেন্টিমিটার

= ১·০৯২ লিটার



$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$

২ × ১২২·৫   ৩ × ২২·৪ লিটার

অর্থাৎ ৬৭·২ লিটার অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ২৪৫ গ্রাম $KClO_3$ প্রয়োজন

∴ ১·০৯২ লিটার অক্সিজেন প্রস্তুতিতে = $\frac{২৪৫ \times ১·০৯২}{৬৭·২}$ গ্রাম $KClO_3$ প্রয়োজন

= ৩·৯৮ গ্রাম $KClO_3$।

অনুশীলন

১। ১৮ গ্রাম স্টীমের সাহায্যে কত পরিমাণ লৌহকে আয়রন অক্সাইডে পরিণত করা যাইবে ? উৎপন্ন হাইড্রোজেনের প্রমাণাবস্থায় আয়তন কত হইবে ? (কলিকাতা)

২। ০·৭৬ গ্রাম ফেরাস সালফেট তাপ সাহায্যে বিযোজিত করিলে প্রমাণাবস্থায় উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন কত হইবে ?

৩। ০·৪৮৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফাইডের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় কত ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবে ?

৪। প্রমাণ-অবস্থায় ১০ লিটার অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ NH_4Cl প্রয়োজন হইবে ? (কলিকাতা)

৫। কত গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড সাহায্যে প্রমাণাবস্থায় ৫ লিটার ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া সম্ভব হইবে ?

৬। ১০·৮ গ্রাম মারকিউরিক অক্সাইড বিযোজিত করিয়া যে অক্সিজেন পাওয়া যাইবে ১৭° সেন্টি উষ্ণতায় এবং ৭৪০ মিলিমিটার চাপে তাহার আয়তন কত হইবে ?

৭। ২০০ গ্রাম চুনাপাথরের উপর অতিরিক্ত অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ২৫° উষ্ণতায় এবং ৭২০ মিলিমিটার চাপে আয়তন কি হইবে ?

৮। ২৭° উষ্ণতায় এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে ২ লিটার কার্বন-মনোক্সাইড দরকার। কতখানি ফর্মিক অ্যাসিড হইতে উহা পাওয়া যাইবে ?

৯। ২৫ গ্রাম জিঙ্ক হইতে অতিরিক্ত HCl দ্বারা উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে সম্পূর্ণ জারিত করিতে ১২° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং ৭৮০ মিলিমিটার চাপের অক্সিজেনের কত আয়তন পরিমাণ প্রয়োজন হইবে ? (কলিকাতা)

১০। এক গ্রাম সালফার সম্পূর্ণ পোড়াইতে ৩০° সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের কতখানি বাতাস দরকার হইবে? বাতাসে আয়তন হিসাবে অক্সিজেনের পরিমাণ ২০.৮% এবং এক লিটার হাইড্রোজেনের (প্রমাণাবস্থায়) ওজন=.০৯ গ্রাম। (কলিকাতা)

১১। ১০০০ লিটার আয়তনবিশিষ্ট একটি বেলুনকে ২৭° সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের হাইড্রোজেন গ্যাস পূর্ণ করিতে হইবে। কত কম পরিমাণ লৌহের সাহায্যে এই হাইড্রোজেন উৎপাদন করা সম্ভব হইবে? (কলিকাতা)

১২। ২৭° সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের ১০০ ঘনসেন্টিমিটার মিথেন গ্যাসকে অতিরিক্ত অক্সিজেনসহ পোড়াইলে প্রমাণাবস্থায় উৎপন্ন CO_2এর আয়তন কত হইবে? উৎপন্ন জলের ওজনের পরিমাণই বা কত? (কলিকাতা)

১৩। ২৭° সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করিতে কি ওজনের অ্যামোনিয়া এবং ক্লোরিন দরকার হইবে? (কলিকাতা)

১৪। এক গ্রাম আয়রনকে ফেরিক ক্লোরাইডে রূপান্তরিত করিয়া উহাকে জলে দ্রবীভূত করা হইল। প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন পরিমাণ H_2S গ্যাস দ্বারা উহাকে ফেরাস ক্লোরাইডে বিজারিত করা সম্ভব হইবে? (পাটনা)

১৫। একটি জলীয় দ্রবণে ৫ গ্রাম HCl আছে। প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন NH_3 গ্যাস দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করা যাইবে? (পাটনা)

১৬। ১৮° সেন্টি উষ্ণতায় এবং ৭৬৫ মিলিমিটার চাপে ৩৮০ ঘনসেন্টিমিটার হাইড্রোজেন Pb_3O_4এর উপর দিয়া পরিচালিত করিলে উৎপন্ন জলের ওজন কত হইবে? (নাগপুর)

১৭। ১০ গ্রাম খনিজ সালফার পোড়াইয়া প্রমাণ অবস্থায় ৬ লিটার SO_2 গ্যাস পাওয়া গেল। উহাতে বিশুদ্ধ সালফার শতকরা কত ভাগ ছিল? (বোম্বাই)

১৮। এক গ্রাম সোডিয়াম-পারদ সংকরের সহিত জলের বিক্রিয়ার ফলে ১৩° সেন্টি উষ্ণতায় এবং প্রমাণ চাপে ২০০ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন পাওয়া গেল। পারদ সংকরে সোডিয়াম শতকরা কত ভাগ ছিল? (এলাহাবাদ)

১৯। $CaCO_3$ এবং $MgCO_3$এর একটি মিশ্রণের এক গ্রাম হইতে প্রমাণ-অবস্থায় ২৪০ ঘন সেন্টিমিটার CO_2 গ্যাস পাওয়া গেল। মিশ্রণটির উপাদান দুইটির অনুপাত কি ছিল? (নাগপুর)

২০। একটি $KClO_3$র সহিত কিছু KCl মিশ্রিত ছিল। এই মিশ্রণের ১.৫৫৫ গ্রাম বিযোজিত করিয়া যে অক্সিজেন পাওয়া গেল উহাতে ২৭° সেন্টি এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের ১৫২ ঘন সেন্টিমিটার অ্যাসিটিলীনকে সম্পূর্ণ জারিত করা সম্ভব হইল। মিশ্রণটিতে $KClO_3$ শতকরা কত ভাগ ছিল? (কলিকাতা)

২১। একটি ঘরের বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পরীক্ষা করা হইতেছিল। ১০০ লিটার বাতাসকে KOH এর উপর পরিচালিত করাতে পটাসের ওজন ০.০৮ গ্রাম বৃদ্ধি পাইল। ওজন হিসাবে বাতাসে CO_2এর পরিমাণ কত ছিল? (পাঞ্জাব)

২২। আয়তন হিসাবে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ। মোমের উপাদান C=৮০% এবং H=২০%। ৬০ গ্রাম মোম পোড়াইতে ২৭° সেন্টি এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে কত পরিমাণ আয়তনের বাতাস প্রয়োজন হইবে? (কলিকাত

২৩। এক গ্রাম কয়লাকে প্রডিউসার গ্যাসে পরিণত করিতে প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন বাতাসের প্রয়োজন? বাতাসে ওজন হিসাবে অক্সিজেন শতকরা ২৩ ভাগ থাকে। বাতাসের ঘনত্ব, ১৪'৪।

২৪। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেটের একটি সমপরিমাণ মিশ্রণকে শ্বেততপ্ত করিয়া সমস্ত CO_2 গ্যাস দূরীভূত করা হইল। মিশ্রণটির ওজন কি অনুপাতে হ্রাস পাইবে? এক গ্রাম মিশ্রণ হইতে প্রমাণ-অবস্থায় উৎপন্ন CO_2এর আয়তন কত হইবে?

২৫। ৫ গ্রাম KCl অতিরিক্ত $H_2SO_4 + MnO_2$ সহ উত্তপ্ত করা হইল। উৎপন্ন ক্লোরিনকে একটি কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণে পরিচালিত করা হইল। ৫০ ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণে ৫ গ্রাম কস্টিক সোডা দ্রবীভূত ছিল। ক্লোরিনের শোষণের পর দ্রবণটিতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে নির্ধারণ কর। (কলিকাতা)

৫। বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার আয়তনের পারস্পরিক সম্বন্ধ—

নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায়, গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়া-কালে উহাদের আয়তনগুলি সরলানুপাতে থাকে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ যদি গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উহার আয়তনও বিক্রিয়কের আয়তনের সহিত সরলানুপাতে থাকে [গে-লুসাক]।

আবার, নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় সমস্ত গ্যাসের এক গ্রাম-অণুর আয়তন একই হইবে [অ্যাভোগাড্রো]। সমীকরণের সাহায্যে কোন্ পদার্থের কত অণু বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে জানা যায়। অতএব উহাদের কত গ্রাম-অণু বিক্রিয়া করে তাহাও জানা যায়। সুতরাং উহাদের আয়তনগুলির পরিমাণও জানা যায়। যথা—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$

∴ ২ গ্রাম-অণু হাইড্রোজেন এবং ১ গ্রাম-অণু অক্সিজেন মিলিয়া ২ গ্রাম-অণু স্টীম উৎপন্ন করে।

অতএব, ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ১ ঘনায়তন অক্সিজেন মিলিয়া ২ ঘনায়তন স্টীম উৎপন্ন করিবে। প্রত্যেকটি উপাদানই একই চাপ ও উষ্ণতায় মাপিতে হইবে এবং গ্যাসীয় অবস্থায় না থাকিলে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, কোন বিক্রিয়াতে গ্যাসীয় পদার্থগুলির অণুর অনুপাত ও উহাদের আয়তনের অনুপাত একই হইতে হইবে।

অতএব, বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের বিক্রিয়ক হইতে কত আয়তন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহা জানা সম্ভব।

উদাহরণ ১। এক লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে কত লিটার কার্বন-মনোক্সাইড একই উষ্ণতা ও চাপে প্রস্তুত করা সম্ভব ?



$$CO_2 + C = 2CO$$

অর্থাৎ, ১ ঘনায়তন CO_2 হইতে ২ ঘনায়তন CO পাওয়া যায়

∴ ১ লিটার CO_2.........২ লিটার CO............

=২ লিটার CO।

উদাহরণ ২। একই চাপ ও উষ্ণতায় ১০০ লিটার স্টীম হইতে কত লিটার ওয়াটার গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে ?



$$H_2O + C = CO + H_2$$

১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন

অর্থাৎ, ১ ঘনায়তন স্টীম হইতে ২ ঘনায়তন ওয়াটার গ্যাস উৎপন্ন হয়

∴ ১০০ লিটার স্টীম হইতে ২০০ লিটার ওয়াটার গ্যাস পাওয়া যাইবে

=২০০ লিটার ওয়াটার গ্যাস।

উদাহরণ ৩। বাতাসে অক্সিজেন আয়তন হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ আছে। ১০০০ লিটার সালফার-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ বাতাসের প্রয়োজন ?



$$S + O_2 = SO_2$$

১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন

অর্থাৎ ১ ঘনায়তন SO_2 প্রস্তুত করিতে ১ ঘনায়তন অক্সিজেন প্রয়োজন।

∴ ১০০০ লিটার........................১০০০ লিটার......... ....

=১০০০ লিটার অক্সিজেন।

কিন্তু ২০ লিটার অক্সিজেন ১০০ লিটার বাতাস হইতে পাওয়া যাইবে।

∴ ১০০০................. $\frac{১০০ \times ১০০০}{২০}$ লিটার...................................

=৫০০০ লিটার বাতাস।

উদাহরণ ৪। ২০ ঘন সেন্টিমিটার মিথেন গ্যাসকে ১০০ ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বারা জারিত করিলে উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রণের আয়তন কত হইবে ? চাপ ও উষ্ণতা অপরিবর্তিত রাখা হইবে।



$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন

অর্থাৎ ১ ঘনায়তন CH_4 এর জন্য ২ ঘনায়তন O_2 প্রয়োজন এবং উহাতে ১ ঘনায়তন CO_2 উৎপন্ন হইবে।

অতএব ২০ ঘন সেণ্টিমিটার মিথেনের জন্য ৪০ ঘন সেণ্টিমিটার অক্সিজেন ব্যয় হইবে এবং উৎপন্ন CO_2এর পরিমাণ ২০ ঘন সেণ্টিমিটার।

জারণের পর, অক্সিজেনের পরিমাণ = ১০০ − ৪০ = ৬০ ঘন সেণ্টি.

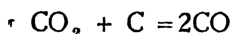
CO_2 এর পরিমাণ = ২০ ঘন সেণ্টিমিটার

মোট গ্যাসের পরিমাণ = ৬০ + ২০

= ৮০ ঘন সেণ্টি.।

উদাহরণ ৫। প্রমাণাবস্থায় ৮০০ ঘন সেণ্টিমিটার CO_2 গ্যাস উত্তপ্ত কোকের উপর দিয়া পরিচালনার ফলে উহার আয়তন ১৩০০ ঘন সেণ্টিমিটারে পরিণত হইল। বিক্রিয়াশেষে গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগুলি কি কি পরিমাণ আছে?

$$CO_2 + C = 2CO$$



মনে কর, x ঘন সেণ্টিমিটার গ্যাস কার্বন দ্বারা বিজারিত হইয়াছে; তাহা হইলে, উৎপন্ন CO গ্যাসের পরিমাণ = ২x ঘন সেণ্টি.

∴ অপরিবর্তিত CO_2 গ্যাসের আয়তন = (৮০০ − x) ঘন সেণ্টি.

অতএব, ২x + ৮০০ − x = ১৩০০

∴ x = ৫০০

অর্থাৎ, উৎপন্ন কার্বন-মনোক্সাইড = ১০০০ ঘন সেণ্টি.

এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড = ৩০০ ঘন সেণ্টি.।

সুতরাং মিশ্রণে NO = ৪৪ ঘনসেণ্টিমিটার এবং N_2O = ১৬ ঘনসেণ্টিমিটার ছিল।

উদাহরণ ৬। কার্বন-মনোক্সাইড [CO], মিথেন [CH_4] এবং ইথেনের [C_2H_6] একটি ১০ ঘনসেণ্টি. মিশ্রণকে ৪০ ঘনসেণ্টি. অক্সিজেন সহ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বারা জারিত করিলে ১২ ঘনসেণ্টিমিটার CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হইল এবং ২৩ ঘনসেণ্টি. অক্সিজেন অবশিষ্ট থাকিল। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগুলির পরিমাণ বাহির কর।

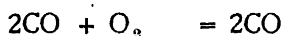
মনে কর, COএর আয়তন = x ঘনসেন্টিমিটার

CH_4এর আয়তন = y ”

C_2H_6এর আয়তন = z ”

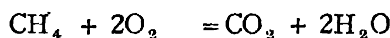
∴ x+v+z = ১০

আমরা জানি,



$2CO + O_2 = 2CO$

২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন



$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন



$2C_2H_6 + 7O_2 = 4CO_2 + 6H_2O$

২ ঘনায়তন ৭ ঘনায়তন ৪ ঘনায়তন

∴ x ঘনসেন্টি. COএর জন্য $\frac{x}{2}$ ঘনসেন্টি. O_2 প্রয়োজন এবং x ঘনসেন্টি. CO_2 উৎপন্ন হয়,

y ঘনসেন্টি. CH_4এর জন্য ২y ঘনসেন্টি. O_2 প্রয়োজন এবং y ঘনসেন্টি. CO_2 উৎপন্ন হয়,

z ঘনসেন্টি. C_2H_6 এর জন্য $\frac{৭z}{২}$ ঘনসেন্টি. O_2 প্রয়োজন এবং ২z ঘনসেন্টি. CO_2 উৎপন্ন হয়।

∴ উৎপন্ন CO_2এর পরিমাণ, x + y + ২z = ১২

এবং প্রয়োজনীয় O_2এর পরিমাণ $\frac{x}{২} + ২y + \frac{৭z}{২} = ৪০ - ২৩ = ১৭$

অতএব, x + y + z = ১০

x + y + ২z = ১২

x + ৪y + ৭z = ৩৪

∴ x = ৪ ঘনসেন্টিমিটার, COএর আয়তন
z = ৪ ঘনসেন্টিমিটার, CH_4এর আয়তন
z = ২ ঘনসেন্টিমিটার, C_2H_6এর আয়তন } উত্তর।

অনুশীলন

১। ২৫ লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করিতে একই চাপ ও উষ্ণতায় কত আয়তন হাইড্রোজেন দরকার হইবে ?

২। বাতাসে অক্সিজেন আয়তন হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ আছে। ১০০ লিটার SO_2 গ্যাসকে জারিত করিতে কি পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন হইবে ? চাপ ও উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হইবে না।

৩। আয়তন হিসাবে বায়ুতে, O_2=২১%, N_2=৭৯%। বায়ুর সমস্তটুকু অক্সিজেনই যদি কার্বনের সহিত যুক্ত হয় তবে উৎপন্ন প্রডিউসার গ্যাসের উদাপানগুলির শতকরা পরিমাণ কি হইবে ?

৪। ৫০ লিটার অ্যাসিটিলীন গ্যাস প্রজ্বলনে কত লিটার বায়ু প্রয়োজন হইবে ? (বায়ুতে O_2=২০%) উৎপন্ন CO_2 গ্যাসের আয়তন কত হইবে। চাপ ও উষ্ণতা অপরিবর্তনীয়।

৫। ৫ লিটার নাইট্রিক অক্সাইডকে নাইট্রোজেন-পার-অক্সাইডে পরিণত করিতে একই চাপ ও উষ্ণতায় কতখানি অক্সিজেন প্রয়োজন হইবে ? উৎপন্ন N_2O_4 গ্যাসের আয়তন কত হইবে ?

৬। প্রমাণাবস্থায় ১ লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করিতে ২৭° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের কতখানি কার্বন-মনোক্সাইড ও অক্সিজেন প্রয়োজন হইবে ?

৭। ১০০ লিটার CO_2 হইতে প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন পরিমাণ CO গ্যাস পাওয়া যাইতে পারে। (কলিকাতা)

৮। ১৭° সেণ্টি. উষ্ণতা ৭২০ মিলিমিটার চাপে ৯০ ঘনসেণ্টিমিটার ক্লোরিন অ্যামোনিয়া হইতে কতটা নাইট্রোজেন প্রমাণাবস্থায় উৎপন্ন করিতে পারিবে ?

৯। ৭০ ঘনসেণ্টিমিটার CO, ২৮ ঘনসেণ্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সাহায্যে জারিত করা হইল। তৎপর গ্যাস-মিশ্রণটিকে KOH দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হইলে কি গ্যাস কত পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিবে ? (বোম্বে)

১০। ২৫ ঘনসেণ্টিমিটার আয়তন একটি হাইড্রোজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডের মিশ্রণ উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়া পরিচালনার পর দেখা গেল উহার আয়তন ২০ ঘনসেণ্টিমিটার হইয়াছে। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদান দুইটি শতকরা কি পরিমাণে ছিল ? চাপ ও উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় নাই। (কলিকাতা)

১১। একটি কোলগ্যাসে, H=৪৫%, CH_4=৩০%, CO=২০% এবং C_2H_2=৫% ছিল। ১০০ ঘনায়তন কোলগ্যাসে ১৬০ ঘনায়তন অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া বিদ্যুৎ-শিখার সাহায্যে জারিত করিলে, বিক্রিয়া-শেষে কি কি গ্যাস কত পরিমাণে থাকিবে এবং গ্যাসের মোট আয়তন কত হইবে ? (পাঞ্জাব)

১২। একটি গ্যাস-মিশ্রণে H=৪৬%, CH_4=৪০%, C_2H_4=১৪% আছে। ১০০ লিটার এই মিশ্রণকে জারিত করিতে কতটা বায়ুর দরকার হইবে ? বায়ুতে অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ আছে।

১৩। CO এবং C_2H_2 গ্যাসের ৪০ ঘনসেণ্টিমিটার একটি মিশ্রণ ১০০ ঘনসেণ্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া একটি গ্যাসমানযন্ত্রের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সহকারে জারিত করা হইল। বিক্রিয়ার পর গ্যাসের আয়তন ১০৪ ঘনসেণ্টি. হইল এবং KOH দ্বারা শোষণের পর অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন ৪৮ ঘনসেণ্টি. দেখা গেল। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানদ্বয়ের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর। (এলাহাবাদ)

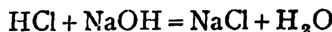
১৪। কার্বন-মনোক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এক লিটার একটি মিশ্রণ হইতে ১৬০০ ঘনসেন্টিমিটার CO পাওয়া গেল। উষ্ণতা ও চাপের কোন পরিবর্তন হয় নাই। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদান দুইটি কত পরিমাণ ছিল? (কলিকাতা)

১৫। মিথেন, ইথিলীন ও অ্যাসিটিলীনের ২০ ঘনসেন্টিমিটার একটি মিশ্রণকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সাহায্যে সম্পূর্ণ জারিত করিতে ৪৯ ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হইল এবং উহার ফলে ৩৩ ঘনসেন্টিমিটার CO_2 পাওয়া গেল। মিশ্রণের উপাদানগুলি কোন্‌টা কত পরিমাণে ছিল?

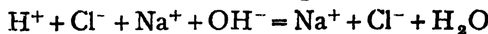
১৬। ১৫ ঘনসেন্টিমিটার হাইড্রোজেন, কার্বন-মনোক্সাইড এবং মিথেনের একটি মিশ্রণের জারণের জন্য ১৫ ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হইল এবং উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১০ ঘনসেন্টিমিটার। উপাদানগুলি মিশ্রণে কি অনুপাতে ছিল?

৬। অম্লমিতি ও ক্ষারমিতি (Acidimetry & Alkalimetry)

প্রশমন-ক্রিয়া ঃ অম্ল ও ক্ষারের দ্রবণ একত্র হইলেই উহাদের ভিতর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং জল ও লবণ উৎপন্ন হয়। দ্রবণে অম্ল আয়নিত হইয়া H^+ আয়ন উৎপাদন করে এবং ক্ষার OH^- আয়ন উৎপাদন করে। অম্ল এবং ক্ষারের ক্রিয়ার সময় H^+ এবং OH^- আয়ন মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করে :—



$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$



$$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- = Na^+ + Cl^- + H_2O$$

এইরূপ অম্ল ও ক্ষারের বিক্রিয়াটিকে সচরাচর **"প্রশমন-ক্রিয়া"** (Neutralisation) বলা হয়। বস্তুতঃ প্রশমন-ক্রিয়াতে H^+ এবং OH^- আয়নের মিলন ঘটে।

বলা বাহুল্য, রাসায়নিক সূত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষারের সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অম্ল বিক্রিয়া করিবে। অতএব, কোন অম্লদ্রবণের সহিত উহাকে প্রশমিত করিতে যতটা ক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত করিলে সম্পূর্ণ অম্লটুকু প্রশমিত হইয়া লবণে পরিণত হইবে এবং অতিরিক্ত ক্ষারটুকু অবশিষ্ট থাকিবে। পক্ষান্তরে মিশ্রিত ক্ষারের পরিমাণ অম্লটুকুর প্রশমনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে, অতিরিক্ত অম্ল থাকিয়া যাইবে এবং সম্পূর্ণ ক্ষারটুকু রূপান্তরিত হইবে। অর্থাৎ, ক্ষার এবং অম্ল একত্র হইলেই যতক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া লোপ পায় ততক্ষণ বিক্রিয়া চলিবেই। যদি অম্ল ও ক্ষার দুইটিই উহাদের পরস্পরের প্রয়োজনীয় অনুপাতে থাকে তবে দুইটিই লোপ পাইবে এবং লবণের একটি প্রশম-দ্রবণ পাওয়া যাইবে।

নির্দেশক—অম্ল দ্রবণ লিটমাসকে লাল এবং ক্ষার দ্রবণ লিটমাসকে নীল বর্ণে পরিণত করে। সুতরাং কোন দ্রবণে দুই এক ফোঁটা লিটমাস মিশাইলে যদি ইহা লাল হয় তবে উহা অম্ল দ্রবণ বুঝা যাইবে। আর যদি লিটমাস মিশাইলে দ্রবণের রং নীল হয় তবে দ্রবণটি ক্ষারজাতীয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ

বর্ণ-পরিবর্তনের সাহায্যে লিটমাস কোন দ্রবণের অম্ল বা ক্ষার গুণ নির্দেশ করিতে পারে।

লিটমাসের মত এরূপ আরও অন্যান্য অনেক পদার্থ আছে যাহারা নিজেদের বর্ণের পরিবর্তন দ্বারা অম্ল ও ক্ষার-দ্রবণ চিহ্নিত করিতে পারে ; যথা :—ফিনলথ্যলিন, মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড ইত্যাদি। যে সকল পদার্থ অম্ল এবং ক্ষার দ্রবণের সংস্পর্শে বিভিন্ন রং ধারণ করিয়া উহাদিগকে নির্দেশ করিতে পারে, সেই পদার্থগুলিকে আমরা 'নির্দেশক' বা 'সূচক' (Indicators) বলি। আমরা সর্বদা যে সকল নির্দেশক ব্যবহার করি, ক্ষার এবং অম্ল দ্রবণে তাহাদের রঙের পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করা হইল :—

	নির্দেশক	অম্ল দ্রবণে	ক্ষার দ্রবণে
১।	লিটমাস	লাল	নীল
২।	মিথাইল অরেঞ্জ	গোলাপী	হলুদ
৩।	মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
৪।	ফিনলথ্যলিন	বর্ণহীন	লাল

মনে কর, একটি HCl দ্রবণকে NaOH দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করা হইতেছে। HCl দ্রবণটি একটি বীকারে লইয়া উহাকে দুই ফোঁটা ফিনলথ্যলিন নির্দেশক দেওয়া হইল। উহা বর্ণহীনই থাকিবে। অতঃপর উহাতে বিন্দু বিন্দু ক্ষার দ্রবণ মিশাইলে, ক্রমে ক্রমে উহার অম্ল কমিয়া যাইবে। কিন্তু যতক্ষণ অম্ল থাকিবে দ্রবণটি বর্ণহীনই থাকিবে। কিন্তু ক্ষার দ্রবণ আরও মিশ্রিত করিয়া যেইমাত্র সম্পূর্ণ অম্লটুকু প্রশমিত হইয়া যাইবে এবং একফোঁটা ক্ষার অতিরিক্ত হইবে তৎক্ষণাৎ দ্রবণটিকে ফিনলথ্যলিন লাল করিয়া দিবে। যে অবস্থায়, অর্থাৎ যতখানি ক্ষার দিলে সম্পূর্ণ অম্লটুকু প্রশমিত হয় তাহাকে "প্রশমন-ক্ষণ" (Neutral point) বলে। নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের দ্বারা এইভাবে প্রশমন-ক্ষণ নির্ধারণ সম্ভব। অম্ল দ্রবণে ক্ষার না ঢালিয়া, ক্ষার দ্রবণে অম্ল ধীরে ধীরে মিশাইয়াও প্রশমন-ক্ষণ বাহির করা যায়। সুতরাং নির্দেশক যে কেবল কোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব নির্দেশ করে তাহা নহে, উহা প্রশমন-ক্ষণ নির্ধারণে বিশেষ উপযোগী। ফিনলথ্যলিনের পরিবর্তে অন্যান্য নির্দেশক দ্বারাও প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয় করা যায়।

অম্ল দুই শ্রেণীর—তীব্র এবং মৃদু। কতকগুলি অম্ল যেমন HCl, H_2SO_4

ইত্যাদি দ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হইয়া থাকে এবং প্রচুর H^+ আয়ন উৎপন্ন করে। ইহারা তীব্র অম্ল। আবার অ্যাসেটিক অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতির তড়িৎ-বিযোজন খুব কম, সুতরাং উহারা বিশেষ H^+ আয়ন দেয় না। ইহাদিগকে মৃদু অম্ল বলে।

অম্লের মত ক্ষারও তীব্র এবং মৃদু দুই শ্রেণীর। তীব্র ক্ষার, যথা KOH আয়নিত হইয়া প্রচুর OH^- আয়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু মৃদু ক্ষার, যথা NH_4OH বিশেষ আয়নিত হয় না এবং উহা খুব সামান্য OH^- আয়ন উৎপাদন করে।

অম্ল ও ক্ষারের বিক্রিয়াকালে প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয়ে উহাদের তীব্রতা বা মৃদুতা অনুযায়ী নির্দেশক ব্যবহার করিতে হয়। সব নির্দেশক সমস্ত রকম বিক্রিয়ার প্রশমন-ক্ষণ স্থির করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। যথাযোগ্য নির্দেশক ব্যবহারের একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয়	উপযুক্ত নির্দেশক
১। তীব্র ক্ষার—মৃদু অম্ল	ফিনলথ্যলিন
২। মৃদু ক্ষার—তীব্র অম্ল	মিথাইল অরেঞ্জ
৩। তীব্র ক্ষার—তীব্র অম্ল	যে কোন নির্দেশক

অম্ল ও ক্ষারের তুল্যাঙ্ক—অম্লের যতভাগ পরিমাণ ওজনে একভাগ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে, সেই পরিমাণকে "অম্লের তুল্যাঙ্ক" (equivalent wt. of the acid) বলে। সুতরাং যত গ্রাম অ্যাসিড হইতে এক গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে, তত গ্রাম সেই অ্যাসিডের "গ্রাম-তুল্যাঙ্ক" (gm-equivalent)। যেমন, ৩৬·৫ ভাগ HCl হইতে একভাগ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

∴ HClএর তুল্যাঙ্ক, ৩৬·৫ ; এবং HClএর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৬·৫ গ্রাম।

H_2SO_4এর ৯৮ ভাগ হইতে ২ ভাগ হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করা যায়।

অতএব, H_2SO_4এর তুল্যাঙ্ক, $\frac{৯৮}{২}$ = ৪৯ ; এবং H_2SO_4 এর গ্রাম তুল্যাঙ্ক, ৪৯ গ্রাম।

আবার, অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-সংখ্যাই উহার ক্ষারগ্রাহিতা। অতএব, অ্যাসিডের গ্রাম-অণুকে উহার ক্ষারগ্রাহিতা দ্বারা ভাগ করিলেই উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক পাওয়া যাইবে :—

$$\text{অম্লের গ্রাম-তুল্যাঙ্ক} = \frac{\text{অম্লের গ্রাম-অণু}}{\text{অম্লের ক্ষারগ্রাহিতা}}$$

ক্ষারের তুল্যাঙ্কও অনুরূপ উপায়ে স্থির করা হয়। ক্ষারের যত ভাগ পরিমাণ ওজনের একটি OH মূলক অর্থাৎ ১৭ ভাগ ওজনের OH মূলক থাকে, সেই পরিমাণকে "ক্ষারের তুল্যাঙ্ক" (equivalent wt. of the base) বলে। সুতরাং যত গ্রাম ক্ষারবস্তুতে ১৭ গ্রাম OH মূলক থাকে, উহাই ক্ষারের "গ্রাম-তুল্যাঙ্ক" (gm. equivalent)। যেমন, NaOHএর ৪০ ভাগে ১৭ ভাগ OH মূলক আছে;

∴ NaOHএর তুল্যাঙ্ক, ৪০ ; এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৪০ গ্রাম। আবার, $Ca(OH)_2$এর ৭৪ ভাগ ওজনের ৩৪ ভাগ OH মূলক আছে। অতএব, $Ca(OH)_2$এর তুল্যাঙ্ক $\frac{৭৪}{২}$ = ৩৭ ; এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৭ গ্রাম।

আমরা জানি, ক্ষারের OH মূলকের সংখ্যাই উহার অম্লগ্রাহিতা। অতএব, ক্ষারের গ্রাম-অণুকে উহার অম্লগ্রাহিতা দ্বারা ভাগ করিলে, কত গ্রাম ক্ষারে একটি OH মূলক আছে পাওয়া যাইবে। উহাই ক্ষারের তুল্যাঙ্ক।

$$\therefore \text{ ক্ষারের তুল্যাঙ্ক} = \frac{\text{ক্ষারের গ্রাম-অণু}}{\text{ক্ষারের অম্লগ্রাহিতা}}$$

দেখা যাইতেছে, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক কোন অম্লে এক গ্রাম প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকিবে। আবার, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক কোন ক্ষারে ১৭ গ্রাম OH মূলক থাকিবে। এক গ্রাম হাইড্রোজেনকে প্রশমিত করিতে ঠিক ১৭ গ্রাম OH মূলকই প্রয়োজন। অতএব, স্বচ্ছন্দে বলা যায়, ক্ষারের যত গ্রাম ওজন এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অম্লকে প্রশমিত করে, উহাই ক্ষারের "গ্রাম-তুল্যাঙ্ক"।

লবণের তুল্যাঙ্ক—ক্ষারমিতিতে কখনও কখনও লবণের তুল্যাঙ্ক প্রয়োজন হয়। লবণের ভিতরে যে ধাতুটি থাকে উহার তুল্যাঙ্ক-ভাগ যত ভাগ পরিমাণ লবণে থাকিবে, তাহাই লবণের তুল্যাঙ্ক হইবে। যেমন,

Na_2CO_3 লবণের আণবিক গুরুত্ব, ১০৬ এবং উহাতে ৪৬ ভাগ সোডিয়াম আছে। সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক, ২৩।

অতএব ২৩ ভাগ সোডিয়াম $\frac{১০৬}{২}$ অর্থাৎ ৫৩ ভাগ Na_2CO_3এ আছে।

∴ Na_2CO_3এর তুল্যাঙ্ক, ৫৩। উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৫৩ গ্রাম।

$Al_2(SO_4)_3$এর আণবিক গুরুত্ব, ৩৪২ এবং উহাতে ২৪ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম আছে। অ্যালুমিনিয়ামের তুল্যাঙ্ক, ৯।

∴ ৯ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম $\frac{৩৪২ \times ৯}{৫৪}$ = ৫৭ ভাগ $Al_2(SO_4)_3$তে আছে

∴ $Al_2(SO_4)_3$এর তুল্যাঙ্ক ৫৭ এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৫৭ গ্রাম।

অম্ল এবং ক্ষারের দ্রবণ—সব অম্ল বা ক্ষারের দ্রবণের শক্তি বা মাত্রা এক হইতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণে যে পরিমাণ অম্ল বা ক্ষার দ্রবীভূত থাকে তাহার উপর উহার শক্তি নির্ভর করে।

এক লিটার দ্রবণে অ্যাসিড বা ক্ষারের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রবীভূত থাকিলে উক্ত দ্রবণকে **"তুল্য-দ্রবণ"** বা 'নরম্যাল দ্রবণ' বলে। সঙ্কেতের পূর্বে 'N' লিখিয়া তুল্য-দ্রবণ বুঝান হয়। N HCl অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তুল্য-দ্রবণ। N KOH অর্থাৎ কস্টিক পটাসের তুল্য-দ্রবণ।

HClএর তুল্যাঙ্ক, ৩৬.৫। উহার তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে ৩৬.৫ গ্রাম HCl থাকিবে।

Na_2CO_3এর তুল্যাঙ্ক, ৫৩। উহার তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে ৫৩ গ্রাম Na_2CO_3 থাকিবে।

কোন কোন সময় এক লিটার অম্ল বা ক্ষার দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্কের পরিবর্তে উহার কোন ভগ্নাংশ পরিমাণ দ্রাব থাকে। সেই সকল দ্রবণের নাম মাত্রানুযায়ী দেওয়া হয়। যেমন: একটি ক্ষার দ্রবণের এক লিটারে যদি এক গ্রাম-তুল্যাঙ্কের একশত ভাগের এক ভাগ থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্রবণকে শতাংশ-তুল্য-দ্রবণ (Centinormal solution) বলা হয়। ক্ষার এবং অম্লের এইরূপ দুইটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

	লিটারে দ্রাবের তুল্যাঙ্ক-পরিমাণ	দ্রবণের মাত্রার সঙ্কেত	নাম	দ্রাবের পরিমাণ Na_2CO_3	H_2SO_4
১।	১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	N	তুল্য-দ্রবণ	৫৩ গ্রাম	৪৯ গ্রাম
২।	৩ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	3N	ত্রিগুণ তুল্য-দ্রবণ	১৫৯ "	১৪৭ "
৩।	½ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	.5N	অর্ধ তুল্য-দ্রবণ	২৬.৫ "	২৪.৫ "
৪।	$\frac{১}{১০}$ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	.1N	দশমাংশ তুল্য-দ্রবণ	৫.৩ গ্রাম	৪.৯ গ্রাম

লিটারে দ্রাবের তুল্যাঙ্ক-পরিমাণ		দ্রবণের মাত্রার	নাম সঙ্কেত	দ্রাবের পরিমাণ Na_2CO_3	H_2SO_4
৫।	$\frac{১}{১০০}$ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	·০১N	শতাংশ তুল্য-দ্রবণ	·৫৩ „	·৪৯ „
৬।	$\frac{১}{১০০০}$ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক	·০০১N	সহস্রাংশ তুল্য-দ্রবণ	·০৫৩ „	·০৪৯ „

ইত্যাদি।

·০৩N HClকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তিন-শতাংশ তুল্য-দ্রবণ বলা হইবে। ·০২৭N NaOHকে কস্টিক সোডার ২৭ সহস্রাংশ তুল্য-দ্রবণ অথবা ·০২৭ তুল্য-দ্রবণ বলা হইবে।

এক লিটার দ্রবণে যত গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব থাকিবে তাহাই সেই দ্রবণের **"শক্তি বা তুল্যাঙ্ক মাত্রা"** (Normality)। যেমন, ·৫N Na_2CO_3 দ্রবণের তুল্যাঙ্ক-মাত্রা ·৫ ; কেন না উক্ত দ্রবণে ·৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক সোডিয়াম কার্বনেট এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত আছে। পরবর্তী আলোচনাতে "মাত্রা" উল্লেখ করিলে তুল্যাঙ্ক-মাত্রা বুঝিতে হইবে।

এক লিটার দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্কের পরিবর্তে যদি এক গ্রাম-অণু দ্রাব থাকে তবে উহাকে **"আণবিক দ্রবণ"** (molar solution) বলা হয়। পূর্বের মতই এক গ্রাম-অণুর এক-শতাংশ দ্রাব এক লিটার দ্রবণে থাকিলে দ্রবণটিকে ·০১M অর্থাৎ শতাংশ আণবিক-দ্রবণ বলা যাইবে।

প্রতি লিটার দ্রবণে যত গ্রাম-অণু দ্রাব দ্রবীভূত থাকিবে, তাহাই দ্রবণের আণবিক-মাত্রা হইবে।

কস্টিক সোডার গ্রাম-অণু ৪০, এবং তুল্যাঙ্কও ৪০। সুতরাং উহার আণবিক-দ্রবণ এবং তুল্য-দ্রবণ একই। সমস্ত একক্ষারী অম্ল এবং একাম্লী ক্ষারের তুল্যাঙ্ক ও গ্রাম-অণু সমান, সুতরাং উহাদের আণবিক দ্রবণ এবং তুল্য-দ্রবণ একই হইবে। কিন্তু অন্যান্য অম্ল বা ক্ষারের বেলায় আণবিক-দ্রবণের শক্তি তুল্যদ্রবণ অপেক্ষা অধিক হইবে। যেমন,

H_2SO_4এর তুল্যাঙ্ক, ৪৯। উহার তুল্য-দ্রবণের প্রতি লিটারে ৪৯ গ্রাম H_2SO_4 থাকে। আবার H_2SO_4এর গ্রাম-অণু, ৯৮ গ্রাম। উহার আণবিক-দ্রবণের প্রতি লিটারে ৯৮ গ্রাম H_2SO_4 থাকে।

∴ H_2SO_4এর আণবিক-দ্রবণটির শক্তি উহার তুল্য-দ্রবণের শক্তির দ্বিগুণ।

প্রমাণ-দ্রবণ (Standard Solution)। কোন দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রাবের পরিমাণ জানা থাকিলে উহাকে "প্রমাণ-দ্রবণ" বলা হয়। অর্থাৎ, দ্রবণে শক্তি বা মাত্রা যদি জানা থাকে তবে উহা প্রমাণ-দ্রবণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সাধারণতঃ আয়তনিক বিশ্লেষণে তুল্য-দ্রবণ অথবা দশমাংশ তুল্য-দ্রবণ প্রমাণ-দ্রবণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

দ্রবণের মাত্রা গণনা—আমরা জানি, তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব থাকে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণে কত গ্রাম দ্রাব আছে জানিলে, দ্রবণটির মাত্রা হিসাব করা যায়। আবার, দ্রবণের মাত্রা জানা থাকিলে, কোন নির্দিষ্ট আয়তন দ্রবণে কি পরিমাণ দ্রাব আছে তাহাও স্থির করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

উদাহরণ ১। ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ২·৪৫ গ্রাম H_2SO_4 আছে। দ্রবণটির মাত্রা কত?

২৫০ ঘনসেন্টিমিটারে ২·৪৫ গ্রাম H_2SO_4 আছে।

$\therefore$ ১ লিটারে $\frac{২·৪৫}{২৫০} \times ১০০০ = ৯·৮$ গ্রাম H_2SO_4 আছে।

H_2SO_4-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক = ৪৯ গ্রাম।

$\therefore$ দ্রবণটির মাত্রা = $\frac{৯·৮}{৪৯}N = ০·২N$।

উদাহরণ ২। ৫ লিটার দ্রবণে ১০·৬ গ্রাম Na_2CO_3 থাকিলে, উহার মাত্রা কি হইবে?

ঐ দ্রবণের এক লিটারে $\frac{১০·৬}{৫} = ২·১২$ গ্রাম Na_2CO_3 আছে।

Na_2CO_3-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক = ৫৩ গ্রাম।
অর্থাৎ এক লিটারে ৫৩ গ্রাম Na_2CO_3 থাকিলে উহা (N) তুল্য-দ্রবণ হইবে।

$\therefore$ „ „ ২·১২ গ্রাম „ „ „ $\frac{২·১২}{৫৩}N$ „ „

= ০·০২N দ্রবণ হইবে।

উদাহরণ ৩। ০·২৫N NaOH-এর ১০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে কতখানি কস্টিক সোডা আছে?

NaOH-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক = ৪০ গ্রাম

∴ ১ লিটার (N) তুল্য-দ্রবণে ৪০ গ্রাম কস্টিক সোডা থাকে।

অর্থাৎ, ১ লিটার ০·২৫N দ্রবণে ৪০ × ·২৫ গ্রাম কস্টিক সোডা থাকিবে।

সুতরাং, ১০০ ঘনসেন্টিমিটার ০·২৫N দ্রবণে $\frac{৪০ \times ·২৫ \times ১০০}{১০০০}$ গ্রাম

= ১·০ গ্রাম কস্টিক সোডা থাকিবে।

উদাহরণ ৪। ১২N HCl দ্রবণের কত আয়তনে উহার এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক থাকিবে?

HClএর তুল্যাঙ্ক, ৩৬·৫।

অতএব, ১২N HCl দ্রবণের এক লিটারে ১২ × ৩৬·৫ গ্রাম অ্যাসিড থাকিবে

∴ $\frac{১০০০}{১২}$ ঘনসেন্টিমিটারে ৩৬·৫ গ্রাম

= ৮৩·৩ ঘনসেন্টিমিটার।

উদাহরণ ৫। ১০% Na_2CO_3 দ্রবণের তুল্যাঙ্ক-মাত্রা কত?

১০% Na_2CO_3 দ্রবণের প্রতি ১০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ১০ গ্রাম Na_2CO_3 আছে।

∴ প্রতি লিটার উক্ত দ্রবণে ১০ × ১০ গ্রাম Na_2CO_3 আছে।

Na_2CO_3এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক = ৫৩ গ্রাম।

∴ উক্ত দ্রবণের মাত্রা = $\frac{১০০}{৫৩}$ N = ১·৮৮ N।

অনুশীলন

(১) ১০০ ঘনসেন্টিমিটার কস্টিক-সোডার দ্রবণে ২·২ গ্রাম NaOH থাকিলে, দ্রবণটির মাত্রা কি হইবে?

(২) ৪৫ ঘনসেন্টিমিটার H_2SO_4 দ্রবণে ৫০০ মিলিগ্রাম H_2SO_4 আছে। দ্রবণটির মাত্রা কত?

(৩) ৩·৩ লিটার কস্টিক সোডার একটি দ্রবণে ১·৩২ গ্রাম NaOH থাকিলে দ্রবণের মাত্রা কত হইবে?

(৪) ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার HCl দ্রবণে ২৫ গ্রাম অ্যাসিড থাকিলে দ্রবণটির মাত্রা কি হইবে?

(৫) ০·৩N HNO_3 এর ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম HNO_3 প্রয়োজন?

(৬) ০·২৩ N অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (CH_3COOH) ৮০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে কতটুকু অ্যাসিড আছে ? অ্যাসেটিক অ্যাসিড এককক্ষারী অম্ল।

(৭) ৫ লিটার ২·২N H_2SO_4 দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম H_2SO_4 প্রয়োজন ?

(৮) ১·২ লিটার ০·৫N $FeCl_3$ দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম $FeCl_3,6H_2O$ প্রয়োজন ?

(৯) ০·০৫ মাত্রাবিশিষ্ট ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার $Al_2(SO_4)_3$এর দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম $Al_2(SO_4)_3$ প্রয়োজন হইবে ?

(১০) (ক) ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার ০·১ N, (খ) ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার ০·০৫ N; (গ) ১০০ ঘনসেন্টিমিটার ০·২৫ N Na_2CO_3 দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কি কি পরিমাণ Na_2CO_3 লাগিবে ?

(১১) নিম্নলিখিত দ্রবণগুলির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা নির্ণয় কর :—

(ক) ২·৬%Na_2CO_3 দ্রবণ (খ) ১২%HCl দ্রবণ।

(গ) ৫%H_2SO_4 দ্রবণ (ঘ) ৪%NaOH দ্রবণ।

(১২) ১০ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন। ০·০২ N H_2SO_4 দ্রবণের কত আয়তন লইতে হইবে ?

(১৩) ৫ গ্রাম কস্টিক সোডার জন্য ০·২৫ N মাত্রাবিশিষ্ট NaOH দ্রবণের কত ঘনসেন্টিমিটার লওয়া প্রয়োজন ?

(১৪) ৪ লিটার একটি H_2SO_4 অ্যাসিড দ্রবণে ১০ গ্রাম H_2SO_4 আছে। উহাতে আর কত গ্রাম HCl দ্রবীভূত করিলে দ্রবণটির অম্ল-মাত্রা ০·১ N হইবে ?

(১৫) দুই গ্রাম কস্টিক সোডা এবং দুই গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট একত্র ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে দ্রবীভূত থাকিলে, দ্রবণটির ক্ষার-মাত্রা কত হইবে ?

(১৬) এক লিটার একটি কস্টিক পটাস দ্রবণে ২ গ্রাম KOH আছে। দ্রবণটির মাত্রা ০·০৫N করিতে উহাতে আর কত গ্রাম NaOH মিশাইতে হইবে ?

(১৭) ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার একটি H_2SO_4 দ্রবণে ১·২২৫ গ্রাম H_2SO_4 আছে। দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা ও আণবিক-মাত্রা কত ?

(১৮) ০·২৫ M আণবিক-মাত্রাবিশিষ্ট Na_2CO_3 দ্রবণের প্রতি ১০০ ঘনসেন্টিমিটারে কত গ্রাম সোডা আছে ?

অম্ল ও ক্ষারের বিক্রিয়ার মূলগত নীতি : যে কোন অম্লের এক তুল্যাঙ্ক-ভাগে এক ভাগ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে। সেইরূপ যে কোন ক্ষারের এক তুল্যাঙ্ক-ভাগে ১৭ ভাগ OH মূলক আছে। এক ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত ১৭ ভাগ OH মূলক মিলিত হইয়াই প্রশমন-ক্রিয়াতে জল উৎপাদন হয়। অতএব, একথা বলা যাইতে পারে, যে কোন অ্যাসিডের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক

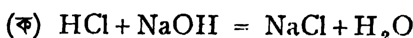
যে কোন ক্ষারের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ককে প্রশমিত করিতে পারে। সংক্ষেপে লিখিতে পারি,

এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অ্যাসিড ≡ এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার

অথবা '২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অ্যাসিড ≡ '২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার

অর্থাৎ x গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অ্যাসিড ≡ x গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার

অম্ল এবং ক্ষারের বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা :—



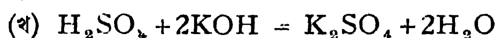
(ক) $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$

৩৬'৫ ৪০

৩৬'৫ গ্রাম HCl ৪০ গ্রাম NaOH প্রশমিত করে।

HClএর গ্রাম-তুল্যাঙ্কও ৩৬'৫ গ্রাম এবং NaOHএর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৪০ গ্রাম।

অতএব, HClএর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক NaOHএর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক প্রশমিত করে।



(খ) $H_2SO_4 + 2KOH = K_2SO_4 + 2H_2O$

৯৮ ২ × ৫৬

৯৮ গ্রাম H_2SO_4 ১১২ গ্রাম KOH প্রশমিত করে।

∴ ৪৯ " " ৫৬ " " " "।

উহাদের গ্রাম-তুল্যাঙ্ক : H_2SO_4 = ৪৯ গ্রাম ; KOH = ৫৬ গ্রাম।

অতএব, H_2SO_4এর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক KOHএর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক প্রশমিত করে।

দেখা যাইতেছে, যে কোন অ্যাসিডের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্কের প্রশমন-ক্ষমতা সমান। সাধারণে ব্যবহৃত বিভিন্ন অম্ল ও ক্ষারের গ্রাম-তুল্যাঙ্ক এখানে দেওয়া হইল।

ক্ষার		অম্ল	
NaOH	= ৪০ গ্রাম।	HCl	= ৩৬'৫ গ্রাম।
KOH	= ৫৬ গ্রাম	H_2SO_4	= ৪৯'০ গ্রাম।
$Ca(OH)_2$	= ৩৭ গ্রাম	H_3PO_4	= ৩২'৬৭ গ্রাম।
Na_2CO_3	৫৩ গ্রাম	HNO_3	= ৬৩'০ গ্রাম।
NH_4OH	= ৩৫ গ্রাম	CH_3COOH	= ৬০'০ গ্রাম।

সুতরাং ৪'০ গ্রাম কস্টিক সোডা ≡ ৩'৬৫ গ্রাম HCl

≡ ৪'৯ " H_2SO_4

≡ ৬'০ " CH_3COOH ইত্যাদি।

অথবা ৩৬.৫ গ্রাম HCl ≡ ৪০ গ্রাম NaOH

≡ ৫৬ „ KOH

≡ ৩৭ $Ca(OH)_2$

≡ ৫৩ „ Na_2CO_3 ইত্যাদি

অতএব এই নীতি হইতে কোন অম্লের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি ক্ষারের কত ওজনকে প্রশমিত করিবে জানিতে পারি।

অম্ল বা ক্ষারের তুল্য-দ্রবণের এক লিটার আয়তনে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব থাকে।

যে কোন অম্লের এক লিটার তুল্য-দ্রবণে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অ্যাসিড আছে।

যে কোন ক্ষারের এক লিটার তুল্য-দ্রবণে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার আছে।

কিন্তু ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক অ্যাসিড ≡ ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার।

অতএব, যে কোন অ্যাসিডের এক লিটার তুল্য-দ্রবণ যে কোন ক্ষারের ১ লিটার তুল্য-দ্রবণকে প্রশমিত করিবে। অর্থাৎ

অ্যাসিডের ১ লিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ক্ষারের ১ লিটার তুল্য-দ্রবণ

সুতরাং, অ্যাসিডের ৫ লিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ক্ষারের ৫ লিটার তুল্য-দ্রবণ

অথবা, অ্যাসিডের ৩০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ক্ষারের ৩০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ

অতএব, অ্যাসিডের x ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ক্ষারের x ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ

ইহার অর্থ, কোন অম্লের তুল্য-দ্রবণের কোন নির্দিষ্ট আয়তনকে প্রশমিত করিতে ক্ষারের সমায়তন তুল্য-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে।

সহজেই বুঝা যায়, তুল্য-দ্রবণের পরিবর্তে যদি সম-মাত্রায় দুইটি অম্ল ও ক্ষার লওয়া হয়, উহাদের প্রশমনে সমায়তন পরিমাণ প্রয়োজন হইবে।

(১N) তুল্য-দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব ১০০০ ঘনসেন্টিমিটারে দ্রবীভূত থাকে।

১/২ N দ্রবণে „ „ „ „ ২ × ১০০০ „ „ „ „

∴ ১/১০ N দ্রবণে „ „ „ „ ১০ × ১০০০ „ „ „ „

১/৫০ N দ্রবণে „ „ „ „ ৫০ × ১০০০ „ „ „ „

অর্থাৎ, দ্রবণের মাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব যে আয়তন দ্রবণে থাকিবে তাহা বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে। অতএব, V ঘন-সেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণে যতটুকু অম্ল বা ক্ষার থাকে $\frac{১}{১০}$ N দ্রবণের ১০ V ঘন-সেন্টিমিটারে ততটুকু অম্ল বা ক্ষার থাকিবে।

∴ V ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ২V ঘনসেন্টিমিটার $\frac{১}{২}$ N দ্রবণ

≡ ৪V " " $\frac{১}{৪}$ N দ্রবণ

≡ ১০V " " $\frac{১}{১০}$ N দ্রবণ

≡ ১০০V " " $\frac{১}{১০০}$ N দ্রবণ

অর্থাৎ, সম-পরিমাণ দ্রাববিশিষ্ট দুইটি দ্রবণের আয়তন ও মাত্রার গুণফল সর্বদা একই হইবে।

সুতরাং কোন একটি দ্রবণের মাত্রা ও আয়তন জানা থাকিলে উহা সেই পদার্থের তুল্য-দ্রবণের কত আয়তনের সমান বাহির করিতে পারা যাইবে। মনে কর, একটি অম্লের মাত্রা ০·০৫N, উহার ৪০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণের কত আয়তনের সমান হইবে?

ধর, উক্ত দ্রবণটুকু তুল্য-দ্রবণের x ঘনসেন্টিমিটারের সমতুল্য।

∴ ০·০৫N × ৪০ = x × ১

∴ x = ২ ঘনসেন্টিমিটার।

এই নিয়মটি অম্ল অথবা ক্ষার দ্রবণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখন ধরা যাউক, ৫০ ঘনসেন্টিমিটার একটি ০·২N মাত্রার অম্ল-দ্রবণকে ক্ষার দ্বারা প্রশমিত করিতে হইবে। ক্ষার-দ্রবণটির মাত্রা যদি ০·৩৫N হয়, তবে কত আয়তন ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে?

৫০ ঘনসেন্টিমিটার ০·২N অম্ল-দ্রবণ ≡ ·২ × ৫০ ঘনসেন্টিমিটার অম্লের তুল্য-দ্রবণ।

মনে কর, ইহার প্রশমনে x ঘনসেন্টিমিটার ০·৩৫N ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন।

∴ x ঘনসেন্টিমিটার ০·৩৫N ক্ষার-দ্রবণ ≡ ·৩৫ × x ঘনসেন্টিমিটার ক্ষারের তুল্য-দ্রবণ।

∴ ক্ষারের $\cdot 35 \times x$ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ অম্লের $\cdot 2 \times 50$ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ। কিন্তু সম-মাত্রার দ্রবণ সমায়তনে প্রশমিত হয়। অতএব

$\cdot 35 \times x = \cdot 2 \times 50$ [∴ $x = 28\cdot 6$ ঘনসেন্টিমিটার]

অর্থাৎ, ক্ষারের মাত্রা × ক্ষারের আয়তন ≡ অম্লের মাত্রা × অম্লের আয়তন। এই সমতা সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

একটি ক্ষার-দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তন লইয়া উহাকে একটি প্রমাণ অম্ল-দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করিলে, উক্ত সমীকরণ হইতে ক্ষারের মাত্রা বা দ্রবণে ক্ষারের পরিমাণ জানা যাইবে। এইরূপে ক্ষার-পরিমাণ নির্ধারণকে 'ক্ষারমিতি' বলে।

একটি প্রমাণ ক্ষার-দ্রবণ (অর্থাৎ মাত্রা ও আয়তন জানা আছে) দ্বারা কোন অম্লের দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে উহার পরিমাণ ঐ ভাবেই নিরূপণ করা সম্ভব। ইহাই 'অম্লমিতি'।

প্রমাণ-দ্রবণ প্রস্তুতকরণ: প্রমাণ-দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট কূপী ব্যবহৃত হয়। এই কূপীগুলির গলাতে একটি চিহ্ন দিয়া ১০০, ২৫০, ৫০০ বা ১০০০ ঘনসেন্টিমিটার আয়তন নির্দেশ করা থাকে। কূপীগুলির কাঁচের ছিপি থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব তৌল সাহায্যে মাপিয়া কূপীতে লওয়া হয় এবং উহাতে জল দেওয়া হয়। দ্রাবটি গলিয়া গেলে আস্তে আস্তে চিহ্ন পর্যন্ত জল মিশান হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব পাওয়া যায়। উহার মাত্রা জানা আছে, সুতরাং উহা প্রমাণ-দ্রবণ।

(ক) $\cdot 1N\ Na_2CO_3$ **দ্রবণ।** Na_2CO_3এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৫৩ গ্রাম। অতএব, $\cdot 1N$ দ্রবণের প্রতি লিটারে ৫·৩ গ্রাম Na_2CO_3 থাকে।

∴ $\cdot 1N$ দ্রবণের ২৫০ ঘনসেন্টিমিটারে $\frac{5\cdot 3}{4} = 1\cdot 325$ গ্রাম Na_2CO_3 থাকিবে।

একটি পরিষ্কার ও শুষ্ক তৌল-বোতল প্রথমে ওজন করা হয়। অতঃপর উহাতে অল্প অল্প করিয়া বিশুদ্ধ অনার্দ্র Na_2CO_3 চূর্ণ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওজন করা হইতে থাকে। তৌল-বোতলের ওজন যতক্ষণ না ১·৩২৫ গ্রাম বৃদ্ধি পায় ততক্ষণ Na_2CO_3 স্বল্প পরিমাণে দেওয়া হয়। এইভাবে তৌল-বোতলে ১·৩২৫ গ্রাম প্রয়োজনীয় Na_2CO_3 লওয়া হইল।

২৫০ ঘনসেন্টিমিটার একটি কূপীকে উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া একটি ফানেলের সাহায্যে তৌল-বোতলের Na_2CO_3 টুকু উহাতে দেওয়া হয়। পরে তৌল-বোতলটি পুনঃ পুনঃ পাতিত জলে ধুইয়া ফানেলের ভিতর দিয়া কূপীতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ Na_2CO_3 কূপীতে স্থানান্তরিত করা হয়। Na_2CO_3 দ্রবীভূত হইলে কূপীতে আরও জল দেওয়া হয়, যতক্ষণ না উহার উপরের তল কূপীর চিহ্নের সহিত এক হয়। কূপীটিকে ভাল করিয়া ঝাঁকাইয়া লইতে হয় যাহাতে দ্রবণটি সমভাবে মিশ্রিত হয়। অতএব, ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ১·৩২৫ গ্রাম Na_2CO_3 আছে। উহার মাত্রা ·১N। ইহা প্রমাণ-দ্রবণ।

(খ) প্রথমে একটি গাঢ়তর H_2SO_4 অ্যাসিড দ্রবণ মোটামুটি তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। H_2SO_4 দ্রবণের মাত্রাটি অতঃপর সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়। একটি পরিষ্কার বুরেটে এই অ্যাসিডটি লওয়া হয়। বুরেটটি অবশ্য ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া এই অ্যাসিডেই প্রথমতঃ ধুইয়া লইতে হয়। একটি বীকারে পিপেট দ্বারা ২৫ ঘনসেন্টিমিটার Na_2CO_3র একটি প্রমাণ-দ্রবণ (১N অথবা ·১N) লওয়া হয় এবং উহাতে দুই ফোঁটা মিথাইল-অরেঞ্জ নির্দেশক এবং প্রায় তিন চার গুণ পরিমাণ (অর্থাৎ ১০০ ঘনসেন্টি.) পাতিত জল মিশান হয়। দ্রবণটি ক্ষারীয় বলিয়া উহার রং হলুদ থাকিবে। বুরেট হইতে এখন ক্ষার-দ্রবণে ফোঁটা ফোঁটা H_2SO_4 দ্রবণ দেওয়া হয় এবং একটি কাচদণ্ড সাহায্যে উহাকে নাড়ান হয়। এইভাবে H_2SO_4 দিতে থাকিলে যখন সম্পূর্ণ ক্ষারটুকু প্রশমিত হইবে, দ্রবণটি গোলাপী-লাল হইয়া পড়িবে। এইভাবে "প্রশমন-ক্ষণ" জানা যাইবে। বুরেটের লিখন হইতে কত ঘনসেন্টিমিটার অ্যাসিড দেওয়া হইয়াছে জানা যাইবে।

মনে কর, ২৫ ঘনসেন্টিমিটার ·১N ক্ষার প্রশমনে ৩·১ ঘনসেন্টিমিটার অ্যাসিড প্রয়োজন হইল।

$$\therefore \text{ অ্যাসিড-দ্রবণের মাত্রা} = \frac{২৫ \times ·১}{৩·১} N = ·৮০৬N।$$

এইভাবে বুরেট হইতে ক্ষার বা অম্ল ধীরে ধীরে অম্ল বা ক্ষারের ভিতর ঢালিয়া উহাদিগকে প্রশমিত করিয়া উহাদের মাত্রা নির্ণয় করাকে "টাইট্রেশন" (titration) বলে। উপযুক্ত পরিমাণে জল মিশাইয়া উহাকে ইচ্ছামত মাত্রায় পরিণত করা যায়।

অম্লমিতি ও ক্ষারমিতি সম্পর্কিত গণনা—

উদাহরণ ১। ১·১N মাত্রাবিশিষ্ট একটি অম্ল-দ্রবণের ৩০০ ঘনসেন্টিমিটারের সহিত কতটুকু জল মিশাইলে উহা তুল্য-দ্রবণে পরিণত হইবে ?

মনে কর, x ঘনসেন্টিমিটার জল মিশ্রিত করিতে হইবে।

∴ (x + ৩০০) ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ ≡ ১·১ N মাত্রার ৩০০ ঘন-সেন্টিমিটার দ্রবণ।

∴ (x + ৩০০) × ১ = ১·১ × ৩০০

∴ x = ১·১ × ৩০০ − ৩০০ = ৩০ ঘনসেন্টিমিটার।

উদাহরণ ২। ২৫ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষার-দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩২ ঘনসেন্টিমিটার $\frac{১}{১০}$ N HCl দ্রবণ প্রয়োজন হইল। ক্ষার-দ্রবণটির মাত্রা কত ?

মনে কর, ক্ষার-দ্রবণের মাত্রা = x N

২৫ × x N = ৩২ × $\frac{১}{১০}$ N

$x = \frac{৩২}{২৫} \times \frac{১}{১০}$N = ১·২৮$\left(\frac{১}{১০}\right)$N

অথবা, ক্ষার-দ্রবণের মাত্রা, ·১২৮ N।

উদাহরণ ৩। ২০ ঘনসেন্টিমিটার N HCl এবং ৬০ ঘনসেন্টিমিটার $\frac{১}{২}$ N H_2SO_4 মিশ্রিত করা হইয়াছে। মিশ্রণটিকে ০·৩৩ N KOH দ্রবণ সাহায্যে প্রশমিত করিতে কতটা ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে ?

৬০ ঘনসেন্টিমিটার $\frac{N}{২}$ H_2SO_4 ≡ ৩০ ঘনসেন্টিমিটার N H_2SO_4

∴ মিশ্রণে মোট (২০ + ৩০) = ৫০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ আছে। মনে কর, উহার প্রশমনে x ঘনসেন্টিমিটার ·৩৩N KOH লাগিবে।

∴ x ঘনসেন্টিমিটার ·৩৩N ক্ষার-দ্রবণ ≡ ৫০ ঘনসেন্টিমিটার অম্লের তুল্য-দ্রবণ।

∴ x × ·৩৩ = ৫০ × ১

∴ $x = \frac{৫০}{·৩৩}$ = ১৫১·৫ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষার-দ্রবণ।

উদাহরণ ৪। একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ২০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ অতিরিক্ত পরিমাণ চকের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিলে প্রমাণ-অবস্থায় ১০

ঘনসেন্টিমিটার CO_2 পাওয়া গেল। অম্ল-দ্রবণটির শক্তি তুল্যাঙ্ক-মাত্রায় নির্ণয় কর।

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

২ × ৩৬·৫ ২২·৪ লিটার

অর্থাৎ ২২৪০০ ঘনসেন্টিমিটার CO_2 প্রমাণ-অবস্থায় উৎপন্ন করিতে ৭৩ গ্রাম HCl প্রয়োজন।

∴ ১০ ঘনসেন্টিমিটার CO_2 অবস্থায় উৎপন্ন করিতে

$\frac{৭৩ \times ১০}{২২৪০০}$ = ·০৩২৬ গ্রাম HCl প্রয়োজন

∴ ২০ ঘনসেন্টিমিটার অম্ল-দ্রবণে ·০৩২৬ গ্রাম HCl আছে

∴ ১০০০.................. $\frac{·০৩২৬ \times ১০০০}{২০}$ = ১·৬৩ গ্রাম HCl আছে

HCl-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৬·৫ গ্রাম

স্নুতরাং, উক্ত-দ্রবণের তুল্যাঙ্ক-মাত্রা = $\frac{১·৬৩}{৩৬·৫}$N

= ·০৪৪ N।

উদাহরণ ৫। ১০ গ্রাম কপারের সহিত অতিরিক্ত গাঢ় H_2SO_4এর বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত SO_2 গ্যাস যদি ১ লিটার ½ N Na_2CO_3 দ্রবণে পরিচালিত করা হয়, তবে কত গ্রাম Na_2CO_3 অপরিবর্তিত থাকিবে?

(কলিকাতা)

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

৬৩ ৬৪

$$Na_2CO_3 + SO_2 = Na_2SO_3 + CO_2$$

১০৬ ৬৪

∴ ৬৩ গ্রাম কপারের বিক্রিয়া- SO₂ ১০৬ গ্রাম Na_2CO_3কে রূপান্তরিত করে।

১০ গ্রাম $\frac{১০৬ \times ১০}{৬৩}$ গ্রাম

= ১৬·৮২গ্রাম Na_2CO_3।

Na_2CO_3-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৫৩ গ্রাম।

∴ $\frac{১}{২}$ N মাত্রার এক লিটার Na_2CO_3 দ্রবণে $\frac{৫৩}{২}$ = ২৬·৫ গ্রাম Na_2CO_3 ছিল।

∴ অপরিবর্তিত Na_2CO_3এর পরিমাণ = ২৬·৫ − ১৬·৮২

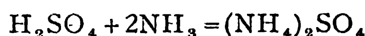
= ৯·৬৮ গ্রাম।

উদাহরণ ৬। ২৭° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপের ৫ লিটার অ্যামোনিয়া ·১N H_2SO_4 অ্যাসিডের কত আয়তন পরিমাণ প্রশমিত করিবে ?

প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে উক্ত অ্যামোনিয়ার আয়তন "V" লিটার হইলে

$$\frac{V \times ৭৬০}{২৭৩} = \frac{৫ \times ৭৫০}{৩০০}$$

$$V = \frac{৫ \times ৭৫০}{৩০০ \times ৭৬০} = ২৭৩ = ৪.৪৯০ \text{ লিটার।}$$



$$H_2SO_4 + 2NH_3 = (NH_4)_2SO_4$$

৯৮ গ্রাম   ২ × ২২·৪ লিটার

∴ প্রমাণ-অবস্থায় ৪৪·৮ লিটার অ্যামোনিয়া ৯৮ গ্রাম H_2SO_4 প্রশমিত করে।

∴ „ ৪·৪৯ „ „ $\frac{৪৪.৮ \times ৯৮}{৪.৪৯}$ গ্রাম „ প্রশমিত করে

= ৯৮০ গ্রাম। (আনুমানিক)

৪·৯ গ্রাম H_2SO_4 ·১N দ্রবণের ১ লিটারে থাকে

∴ ৯৮০ গ্রাম „ „ „ $\frac{১ \times ৯৮০}{৪.৯}$ „ „

= ২০০ লিটারে থাকে।

অতএব উক্ত অ্যামোনিয়া ২০০ লিটার অ্যাসিড-দ্রবণ প্রশমিত করিবে।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত দ্রবণগুলির সহিত কি পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে উহারা তুল্য-দ্রবণে পরিণত হইবে ?

(ক) ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার ১·২N HCl,
(খ) ১৫০০ „ ১·৩২N NaOH
(গ) ৩৩ „ ১·৮N H_2SO_4।

২। নিম্নলিখিত দ্রবণগুলি হইতে কতটুকু আয়তন লইলে উহাদের স্ব স্ব ০·১N মাত্রার ১ লিটার দ্রবণ পাওয়া যাইবে ?

(ক) ০·৮N NaOH (খ) ০·৬৬N HCl (গ) ০·৯৮N Na_2CO_3।

৩। NaOH এবং Na_2CO_3-এর সমান ওজন পরিমাণ সমায়তন জলে দ্রবীভূত করিলে দ্রবণ দুইটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রার অনুপাত কি হইবে ?

৪। একটি সালফিউরিক অ্যাসিডে ওজনানুপাতে ২২·২% H_2SO_4 আছে। উহার ঘনত্ব, ১·১৬০। এই অ্যাসিডটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা কত ?

৫। নিম্নলিখিত দ্রবণগুলির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা বাহির কর :—

(ক) H_2SO_4 : ঘনত্ব = ১·৮০৬৮; গাঢ়ত্ব = ৮৭·৮%

(খ) NaOH দ্রবণ : ঘনত্ব = ১·৩২ ; গাঢ়ত্ব = ২৮% ।

৬। ১০·৮% HCl দ্রবণের (ঘনত্ব = ১·০৫) কত আয়তন পরিমাণ লইলে ৫ লিটার N HCl করা সম্ভব হইবে ?

৭। ৫০ ঘনসেণ্টিমিটার একটি NaOH দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩৬ ঘনসেণ্টিমিটার ০·৩৬N HCl প্রয়োজন হইল। কস্টিক সোডা দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা এবং উহার প্রতি লিটারে কত গ্রাম NaOH আছে নির্ণয় কর।

৮। ৩০ ঘনসেণ্টিমিটার H_2SO_4 দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ১৮ ঘনসেণ্টিমিটার ০·৫N Na_2CO_3 প্রয়োজন হইল। H_2SO_4 দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা কি ? ঐ দ্রবণের প্রতি লিটারে কত গ্রাম H_2SO_4 আছে ?

৯। নিম্নলিখিত দ্রবণসমূহকে পৃথক পৃথক প্রশমিত করিতে হইলে কি কি আয়তন ০·২৫N Na_2CO_3 প্রয়োজন ?

(ক) ৫০ ঘনসেণ্টিমিটার ০·৫N H_2SO_4 অ্যাসিড,

(খ) ৩২ " ০·৩২N অ্যাসেটিক অ্যাসিড,

(গ) ৮০ " ০·১২N অক্সালিক অ্যাসিড।

১০। ৬৬ ঘনসেণ্টিমিটার আয়তনের একটি Na_2CO_3 ছিল। উহা প্রশমিত করিতে ০·৪৪N মাত্রার ৪২ ঘনসেণ্টিমিটার H_2SO_4 প্রয়োজন হইল। Na_2CO_3 দ্রবণটিতে কত গ্রাম Na_2CO_3 ছিল ?

১১। ২৫ ঘনসেণ্টিমিটার ০·৬N HClএর সহিত ৪০ ঘনসেণ্টিমিটার ০·২N Na_2CO_3 দ্রবণ মিশাইলে, মিশ্রিত দ্রবণের অম্ল-মাত্রা কি হইবে ? মিশ্রিত দ্রবণে কত গ্রাম NaCl আছে ?

১২। ১০২ ঘনসেণ্টিমিটার ০·১N NaOH এর সহিত ৯৮ ঘনসেণ্টিমিটার ০·১N H_2SO_4 মিশাইলে, মিশ্রিত দ্রবণের ক্ষারমাত্রা কি হইবে ?

১৩। ৬০ ঘনসেণ্টিমিটার N H_2SO_4এর সহিত ৪০ ঘনসেণ্টিমিটার $\frac{N}{২}$ H_2SO_4 মিশাইয়া উহাকে ১·১২N NaOH দ্বারা প্রশমিত করা হইল। NaOH দ্রবণের কত আয়তন প্রয়োজন হইবে ?

১৪। ২৫ ঘনসেণ্টিমিটার একটি ক্ষার-দ্রবণকে প্রথমতঃ ০·৭৫ N মাত্রার ৮ ঘনসেণ্টিমিটার একটি অ্যাসিড দ্বারা প্রশমন করা হইল। সম্পূর্ণ প্রশমন করার জন্য ০·৮N মাত্রার আরও ১৫ ঘনসেণ্টিমিটার অ্যাসিড প্রয়োজন হইল। ক্ষার-দ্রবণটির মাত্রা কত ? (কলিকাতা, ১৯১৩)

১৫। ২০ ঘনসেণ্টিমিটার H_2SO_4 অ্যাসিড-দ্রবণকে প্রশমিত করিতে প্রথমতঃ ২০ ঘনসেণ্টিমিটার ০·২N NaOH দেওয়া হইল এবং পরে সম্পূর্ণ প্রশমনের জন্য আরও ৪·৫ ঘনসেণ্টিমিটার ০·০৫N Na_2CO_3 দিতে হইল। অম্লদ্রবণটির প্রতি লিটারে কত গ্রাম H_2SO_4 ছিল ?

১৬। ০·৫ গ্রাম পটাসিয়াম-বাই-কার্বনেটকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করিতে ২০ ঘনসেন্টিমিটার ০·২৫N HCl প্রয়োজন হয়। পটাসিয়াম-বাই-কার্বনেটের তুল্যাঙ্ক কত ?

১৭। ৪০০ ঘনসেন্টিমিটার ০·১N HCl অ্যাসিডে কত গ্রাম আয়রন দ্রবীভূত হইবে ?

১৮। ১ গ্রাম বিশুদ্ধ ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে ৩০·৬ ঘনসেন্টিমিটার N HCl প্রয়োজন হইল। ধাতুটি দ্বিযোজী। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত ?

১৯। ১০% সোডিয়াম-কার্বনেট দ্রবণের কত আয়তন ১ লিটার H_2SO_4 অ্যাসিডকে প্রশমিত করিবে ? সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রতি লিটারে ৪·৯ গ্রাম H_2SO_4 আছে।

(কলিকাতা, ১৯১৩)

২০। সোডিয়াম-বাই-সালফেট $NaHSO_4$ অম্লরূপে ব্যবহৃত হয়। ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার ১·২ N HNO_3 প্রশমনে যতখানি N KOH প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ কস্টিক-পটাস প্রশমিত করিতে কত গ্রাম $NaHSO_4$ প্রয়োজন হইবে ?

২১। সোডিয়াম-কার্বনেট ও পটাসিয়াম-কার্বনেটের একটি মিশ্রণের ২·০ গ্রাম প্রশমিত করিতে ৩০ ঘনসেন্টিমিটার N H_2SO_4 প্রয়োজন হইল। মিশ্রণটিতে শতকরা কত ভাগ পটাসিয়াম-কার্বনেট ছিল ?

২২। ১০ ঘনসেন্টিমিটার H_2SO_4 (ঘনত্ব, ১·৮৩) লইয়া জল মিশাইয়া ১ লিটার করা হইল। এই দ্রবণের ২০ ঘনসেন্টিমিটারকে প্রশমিত করিতে ৩৫ ঘনসেন্টিমিটার ০·২N NaOH প্রয়োজন হইল। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডটিতে শতকরা কত ভাগ H_2SO_4 ছিল ?

২৩। ১০ গ্রাম NaOH (৯৫%) লইয়া ২০০ ঘনসেন্টিমিটার জলে দ্রবীভূত করা হইল। উহার সহিত ৫০ ঘনসেন্টিমিটার ১·৫N HCl মিশ্রিত করা হইল। অতঃপর জল মিশাইয়া মিশ্রিত দ্রবণের আয়তন ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার করা হইল। এই দ্রবণটির ক্ষার অথবা অম্ল-মাত্রা বাহির কর।

(কলিকাতা, ১৯২৮)

২৪। এক কিলোগ্রাম $CaCO_3$ হইতে উদ্ভূত চুনকে প্রশমিত করিতে ০·১N মাত্রার কত আয়তন HCl প্রয়োজন ? (কলিকাতা, ১৯৩৮)

২৫। ·২৮১৫ গ্রাম চুনাপাথরকে ৩০ ঘনসেন্টিমিটার N HNO_3 অ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হইল। অতিরিক্ত অম্লটুকুর প্রশমনে ২৪·৪৩ ঘনসেন্টিমিটার N(NaOH) প্রয়োজন হইল। চুনাপাথরটিতে শতকরা কত ভাগ CO_2 ছিল বাহির কর। (এলাহাবাদ, ১৯২৮)

২৬। সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের একটি মিশ্রণের ২ গ্রাম ৫০ ঘনসেন্টিমিটার N NaOH সহিত উত্তপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ অ্যামোনিয়া দূর করা হইল। অতঃপর অতিরিক্ত ক্ষারটুকু ২০ ঘনসেন্টিমিটার N H_2SO_4 দ্বারা প্রশমিত করা হইল। মিশ্রণটিতে NH_4Cl শতকরা কত ভাগ ছিল ? (বোম্বাই, ১৯১৭)

২৭। ১০ ঘনসেন্টিমিটার একটি ক্ষার-দ্রবণ ১৭ ঘনসেন্টিমিটার একটি H_2SO_4 দ্রবণকে প্রশমিত করে। আবার, ২৫ ঘনসেন্টিমিটার উক্ত ক্ষার-দ্রবণ ৩৫ ঘনসেন্টিমিটার একটি HCl দ্রবণ প্রশমিত করে। অম্লদ্রবণ দুইটির শক্তির তুলনা কর।

২৮। ১২৫ ঘনসেন্টি. লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরাস সালফাইড দিয়া প্রমাণ অবস্থায় ৫৬০ ঘনসেন্টি. H_2S পাওয়া গেল। অ্যাসিডের অম্ল-মাত্রা কি ছিল ? (কলিকাতা)

২৯। একটি ধাতুর ০·২১ গ্রাম ১০০ ঘনসেন্টি. ০·৫N H_2SO_4এ দ্রবীভূত করা হইল। অতিরিক্ত অ্যাসিড প্রশমিত করিতে প্রমাণ মাত্রার ৩২·৫ ঘনসেন্টি. ক্ষার প্রয়োজন হইল। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত?

৩০। একটি দ্বিযোজী ধাতুর ১·০৫৪ গ্রাম কার্বনেট ৫০ ঘনসেন্টি. N HCl অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিবার পর অতিরিক্ত অম্লটুকু ৫০ ঘনসেন্টি. ০·৫N NaOH দ্বারা প্রশমিত করা হইল। ধাতুটির পারমাণবিক গুরুত্ব কত?

অনুশীলন

১। ল্যাবরেটরীতে সচরাচর কিভাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়? কিপস্ যন্ত্রের একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার উপকারিতা ও ব্যবহার বুঝাইয়া দাও। হাইড্রোজেনের প্রধান ধর্মগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। ক্ষার হইতে কিরূপে হাইড্রোজেন পাওয়া সম্ভব, সমীকরণ সহ বর্ণনা কর।

৩। শিল্প-প্রয়োজনে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করার প্রণালী কি কি? আমাদের দেশে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং কেন?

৪। জায়মান হাইড্রোজেনের বিশেষত্ব কি? উহার রাসায়নিক ধর্মের উদাহরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

(ক) অন্তর্ধৃতি (খ) প্রভাবক (গ) বহুরূপতা।

৬। তাপ প্রয়োগে এই সকল বস্তুর কি পরিবর্তন হয় :—

(ক) লেড নাইট্রেট (খ) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (গ) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (ঘ) মারকিউরিক অক্সাইড (ঙ) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড?

৭। অক্সাইড কয় প্রকার? উদাহরণ সহ উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৮। জারণ ও বিজারণ ক্রিয়ার সংজ্ঞার্থ লিখ। "জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া যুগপৎ সম্পন্ন হয়"—ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৯। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির প্রস্তুতি ও রাসায়নিক ধর্মের আলোচনা কর :—

(১) ওজোন (২) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড।

১০। কি কি উপায়ে জলের খরতা দূরীকরণ সম্ভব? জলের খরতার কারণ কি?

১১। (ক) লৌহ (খ) সোডিয়াম (গ) কার্বন (ঘ) ক্যালসিয়াম কার্বাইড (ঙ) অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড—এই সকল পদার্থের জলের সহিত কিরূপ বিক্রিয়া হইবে?

১২। নিম্নোক্ত পদার্থগুলি একত্রিত করিলে কি পরিবর্তন হইবে, সমীকরণ সহ বুঝাইয়া দাও :—

(ক) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড।

(খ) মারকিউরিক ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়া।

(গ) অ্যামোনিয়া ও কপার সালফেট।

(ঘ) জিঙ্ক, সালফিউরিক অ্যাসিড ও পটাস-পারমাঙ্গানেট।

(ঙ) ওজোন ও লেড-সালফাইড।

১৩। বায়ুকে মিশ্র-পদার্থরূপে গণ্য করার কারণ কি? নিষ্ক্রিয় গ্যাস কাহাকে বলে? উহাদের নাম লিখ।

১৪। ল্যাবরেটরীতে নাইট্রিক অ্যাসিড কিভাবে তৈয়ারী করা হয়, একটি চিত্রসহ বুঝাইয়া দাও। নাইট্রিক অ্যাসিড নিম্নোক্ত ধাতুগুলিকে কি অবস্থায় কিরূপভাবে আক্রমণ করে লিখ :— (ক) লৌহ (খ) কপার (গ) মারকারি (ঘ) জিঙ্ক।

১৫। (ক) নাইট্রিক অ্যাসিড জারকরূপে,

(খ) সালফিউরিক অ্যাসিড নিরুদকরূপে,

(গ) নাইট্রাস অ্যাসিড নিরুদকরূপে,

(ঘ) আয়োডিন জারকরূপে,—বিক্রিয়া করে, এরূপ দুইটি করিয়া উদাহরণ সমীকরণসহ উল্লেখ কর।

১৬। বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা কর। উহার ক্ষার ও বিজারণগুণ প্রমাণ কর। সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের সহিত অ্যামোনিয়ার কি রকম বিক্রিয়া হয়?

১৭। নিম্নলিখিত গ্যাসগুলির আয়তন-সংযুতি ও সঙ্কেত কিভাবে নির্ণয় করা যায় :— (ক) অ্যামোনিয়া (খ) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড?

১৮। হেভার-পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া-প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৯। শিল্প-প্রয়োজনে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২০। চারিটি হ্যালোজেনের ধর্মগুলির একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখ।

২১। ফ্লুরিন কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন? কিভাবে উহা পাওয়া সম্ভব হইল? হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড পাওয়ার উপায় কি? এই অ্যাসিডের প্রয়োজন কি?

২২। ল্যাবরেটরীতে ব্রোমিন ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? উহাদের রাসায়নিক ধর্মগুলি উল্লেখ কর।

২৩। সমুদ্র-জল হইতে আয়োডিন পাওয়ার উপায় কি? আয়োডিনকে কি রকম ভাবে হাইড্রো-আয়োডিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে?

২৪। বিরঞ্জক-চূর্ণ প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ইহার বিরঞ্জন-ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়?

২৫। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার-ফসফেট সার দুইটি কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? সিন্ধ্রীতে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব কি?

২৬। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির ভিতর কোন অবস্থায় কিরূপে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় লিখ :—

(১) সাদা ফসফরাস এবং কস্টিক সোডা।

(২) পীত ফসফরাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিড

(৩) সালফার এবং সালফিউরিক অ্যাসিড

(৪) আয়োডিন এবং সোডিয়াম থায়োসালফেট

(৫) চিনি এবং সালফিউরিক অ্যাসিড

(৬) ফেরিক ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড?

২৭। অস্থিভস্ম হইতে পীত ফসফরাস উৎপাদন করার উপায় কি? পীত ফসফরাসকে লাল ফসফরাসে কেমন করিয়া পরিণত করা হয়?

২৮। ফসফরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম ফসফেটের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে কি পরিবর্তন হয়?

২৯। সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করার পদ্ধতি কি? উহার বিজারক-গুণ প্রমাণ কর।

৩০। স্পর্শ পদ্ধতিতে কি উপায়ে সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়?

৩১। সালফিউরেটের হাইড্রোজেন গ্যাসের বিজারক-গুণ প্রমাণ করার জন্য তিনটি উদাহরণ দাও। বিশ্লেষণ-কার্যে হাইড্রোজেন সালফাইডের প্রয়োজনীয়তা দেখাও।

৩২। বহুরূপতা কি? সালফার ও অক্সিজেনের বিভিন্ন রূপভেদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

পরিভাষা

(ক)

অংশপ্রেষ—partial pressure
অংশাঙ্কিত কুপী—graduated flask
অংশাঙ্কিত নল—graduated tube
অগ্নিসহ—fire proof
অগ্ন্যুৎপাদক বোমা—incendiary bomb
অঙ্গার—carbon
অঙ্গারাম্ল—carbon dioxide
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অতিতপ্ত—superheated
অতিপৃক্ত—supersaturated
অতিবেগুনী আলো—ultra-violet rays
অদ্রবণীয়, অদ্রাব্য—insoluble
অধঃক্ষেপ—precipitate
অধঃক্ষেপণ—precipitation
অধাতু—non-metal
অধোভ্রংশ—downward distillation
অনচ্ছ—opaque
অনার্দ্র—anhydrous
অনিয়তাকার—amorphous
অনুদ্বায়ী—non-volatile
অনুপ্রভ—phosphorescent
অনুপ্রেষপাতন—vacuum distillation
অন্তরক—insulator
অন্তর্ধূমপাতন—destructive distillation
অন্তর্ধৃতি—occlusion
অপদ্রব্য—impurities
অপরাবিদ্যুৎ—negative electricity
অপরাবিদ্যুৎবাহী—electronegative
অপরিবাহী—non-conductor
অবদ্রব—emulsion
অবরধাতু—base metal
অবশেষ—residue
অবস্থাগত পরিবর্তন—physical change
অবিকৃত—undecomposed, unreacted
অবিনাশিতা—indestructibility
অভিকর্ষাঙ্ক—acc. due to gravity
অভ্র—mica
অম্ল—acid
অম্লগ্রাহিতা—acidity (ক্ষারের)
অম্লরাজ—aqua regia
অম্ল লবণ—acid salt
অম্লসহ পাথর—acid-proof stone
অম্লমিতি—acidimetry
অম্লীকরণ—acidification
অষ্টপলা—octahedral
অসংপৃক্ত—unsaturated
অসমকেন্দ্রী—eccentric
অসমযোজ্যতা—co-ordinate covalency
অসমসত্ত্ব—heterogeneous
অস্থিভস্ম—bone ash
আংশিক কেলাসন—fractional crystallisation
আংশিক পাতন—fractional distillation
আকরিক—ore
আণবিক গুরুত্ব—molecular weight
আণবিক দ্রবণ—molar solution
আণবিক সঙ্কেত—molecular formula
আদর্শ মৌল—type elements
আর্দ্র বিশ্লেষণ—hydrolysis
আদিক—qualitative
আপেক্ষিক তাপ—specific heat
আধান—charge
আবরণ—coating, layer
আবর্জনা—impurities
আবর্ত বলয়—vortex ring
আবেশ কুণ্ডলী—induction coil
আম্লিক—acidic

আয়তন—volume
আয়তন অনুপাত—volumetric composition
আয়নিত হওয়া—ionisation
আল্‌কাতরা—coal-tar
আলোড়ক—stirrer
আসক্তি—affinity
আস্রাবণ—decantation

ইন্ধন—fuel
ইস্পাত—steel
ইস্পাত সঙ্কর—alloy steel

উজ্জ্বলন চামচ—deflagrating spoon
উভমুখী—reversible
উৎসেচক—enzyme
উৎক্ষেপী পাম্প—force pump
উদ্‌গ্রহ—deliquescence
উদ্‌ত্যাগ—efflorescence
উদ্বায়ী—volatile
উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার—wood charcoal
উদ্দীপক—promoter
উপজাত দ্রব্য—by-products
উপাদান—components, constituents, ingredients
উভধর্মী—amphoteric
উষ্ণতা—temperature

ঊর্ধ্বপাতন—sublimation
ঊর্ধ্বভ্রংশ—upward displacement

ঋণাত্মক—negative

একক—unit
একপরমাণুক—monatomic
একবৃত্তিক—monotropic
একযোজী—monovalent
একস্থানিক—isotopes
একাম্লী—monacidic

ওজন—weight
ওজন-সংযুতি—gravimetric composition

কঞ্চুক—jacket
কঠিন—solid
কপারের ছিলা—copper turnings
কলিচুন—slaked lime
ক[illegible]—sediment
কপূ[illegible]—camphor
কাচদণ্ড—glass rod
কাচনল—glass tube
কাঁচা মাল—raw material
কীটনাশক—germicidal
কূপী—flask
কৃত্রিম সার—artificial fertiliser
কেন্দ্রাতিগ—centrifugal
কেলাস—crystal
কেলাস জল—water of crystallisation
কেলাসন—crystallisation
কোমলায়ন—annealing
কোহল—alcohol
কৈশিক—capillary
ক্রিয়া—action

ক্ষণভঙ্গুর—unstable
ক্ষার—alkali
ক্ষারক—base
ক্ষারকীয়—basic
ক্ষারগ্রাহিতা—basicity
ক্ষারধাতু—alkali metals
ক্ষারমিতি—alkalimetry
ক্ষারলবণ—basic salt
ক্ষারীয়—alkaline
ক্ষীণ—weak

খনিজ—mineral
খনিজ জল—mineral water
খনিজ মল—gangue
খরজল—hard water
খর্পর—basin
খরতা—hardness
খল—mortar
খাদ্য লবণ—common salt

গন্ধক—sulphur
গন্ধক রজ—flowers of sulphur
গলন—melting
গলনাঙ্ক—melting point
গলিত—fused, molten
গাঢ়—concentrated
গাঢ়ত্ব/গাঢ়ীকরণ—concentration
গাদ—slime, sediment
গালক মিশ্র—fusion mixture
গুটী—bead
গুণানুপাত সূত্র—law of multiple proportion
গুরু ধাতু—heavy metals
গোলা চুন—milk of lime
গ্যাসায়তন সূত্র—law of gaseous volume
গ্যাসদ্রোণী—pneumatic trough
গ্যাসব্যাপন—gaseous diffusion
গ্যাসমাপক যন্ত্র—eudiometer
গ্যাসমিতি—eudiometry
গ্যাসীয় অবস্থা—gas or gaseous state
গ্রাম অণু—gram molecule
গ্রাম তুল্যাঙ্ক—gram equivalent
গ্রাম পরমাণু—gram atom
গ্রাহক—receiver
ঘনত্ব—density
ঘনায়তন—volume
ঘনীভবন—condensation
ঘাতসহতা—malleability
ঘূর্ণী চুল্লী—rotatory furnace
ঘোলাটে—turbid
চাপ—pressure
চিক্কণ লেপ—glaze
চিহ্ন—symbol
চুন—lime
চুনের জল—lime water
চুনের ভাটি—lime kiln
চুল্লী—furnace
চুনাপাথর—limestone
চেতনানাশক—anaesthetic
জটিল লবণ—complex salt
জলগাহ—water bath
জ্বলনাঙ্ক—ignition temperature, flash point
জলাকর্ষী—hygroscopic
জড় পদার্থ—matter
জড় পদার্থের নিত্যতাবাদ—law of conservation of matter
জালি—wire-gauge
জারক—oxidising agent
জারণ—oxidation
জায়মান—nascent
জৈবজাতীয়—organic
জৈবদ্রাবক—organic solvent
জৈবপদার্থ—organic substance
ঝাঁঝরা হাতা—perforated ladle
ঝামাপাথর—pumice stone
ঝালাই—solder
ঝিল্লী-বিশ্লেষণ—dialysis
ঢালাই লোহা—cast iron
তঞ্চন—coagulation
তত্ত্ব—theory
তরল—liquid, fluid
তল—surface
তড়িৎ—electricity
তড়িৎ-উদাসী—electrically neutral
তড়িৎ-নিরপেক্ষ— „
তড়িৎলেপন—electro-plating
তড়িৎ-পরিবাহিতা—electrical conductivity
তড়িৎ-বিশোধন—electro-refining
তড়িৎ-বিয়োজন—electrolytic dissociation
তড়িৎ-বিশ্লেষণ—electrolysis
তড়িৎ-বিশ্লেষ্য—electrolyte
তড়িদ্দ্বার—electrodes
তাপ—heat

তাপ-উৎপাদক—exothermic
তাপ-গ্রাহক, তাপশোষক—endothermic
তাপজারণ—roasting
তাপনমূল্য—calorific value
তাপ-পরিবাহিতা—conduction of heat
তাপ-বিনিময়—exchange of heat
তাপ-বিযোজন—decomposition by heat
তাপ-বিয়োজন—thermal dissociation
তাপীয় একক—thermal unit
তাম্র—copper
তারজালি—wire gauge
তাড়িত-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক—electro-chemical equivalent
তীক্ষ্ম-ক্ষার—caustic alkali
তীব্র-অম্ল—strong acid
তীব্রতা—strength
তুঁতে—copper sulphate
তুলাদণ্ড—balance
তুল্যাঙ্ক—equivalent weight
তুল্যাঙ্ক-অনুপাত-সূত্র—law of equivalent proportion
তুল্যাঙ্ক-মাত্রা—normality
তুল্য-দ্রবণ—normal solution
তেজস্ক্রিয়া—radio-activity
ত্রিযোজী—trivalent

থিতান—sedimentation

দস্তা—zinc
দস্তারজ—zinc dust
দস্তার ছিবড়া—granulated zinc
দহন—combustion
দহন সহায়ক—supporter of combustion
দাহ-চুল্লী—combustion furnace
দাহ-নল—combustion tube
দাহ্য—combustible, inflammable
দীর্ঘনাল-ফানেল—thistle funnel
দীপ—burner
দ্যুতি—lustre

দুঃস্থিত—unstable
দ্রব, দ্রবণ—solution
দ্রবীভূত—dissolved
দ্রাব—solute
দ্রাবক—solvent
দ্রাব্যতা—solubility
দ্রাব্যতা-লেখ—solubility curve
দ্রোণী—trough
দ্বি-আম্লিক—di-acidic
দ্বি-ক্ষারী—dibasic
দ্বিধাতুক লবণ—double salt
দ্বিপরমাণুক—diatomic
দ্বিযোজী—divalent
দ্বিযৌগিক পদার্থ—binary compound

ধনাত্মক—positive
ধর্ম—properties
ধর্ম, অবস্থাগত—physical properties
ধর্ম, রাসায়নিক—chemical properties
ধাতু—metal
ধাতুকল্প—metalloid
ধাতুনিষ্কাশন—extraction of metal
ধাতুমল—slag
ধাতুলেপন—plating
ধাতু-সঙ্কর—alloys
ধূমায়মান—fuming
ধূসর—gray

নমনীয়—plastic
নল—tube
না-ধর্মী—negative
নিক্তি—balance
নির্গম-নল—delivery tube
নিত্য—constant
নির্দেশক—indicator
নির্বাত-অবস্থা—absence of air
নির্বীজন—sterilisation
নিরাপদ দীপ—safety-lamp
নিরুদক—anhydride

নিরুদক, নিরুদনকারী—dehydrating agent
নিরুদন—dehydration
নিশাদল—salammoniac, ammon-chloride
নিষ্কাশন—extraction, liberation
নিষ্ক্রিয়-গ্যাস—inert gas
নিষ্ক্রিয়-লৌহ—passive iron

পদার্থ—matter
পদার্থের অবস্থা—states of matter
পদার্থের গঠন—constitution of matter
পদ্ধতি—process
পরম উষ্ণতা—absolute temperature
পরম মাত্রা—absolute scale
পরম শূন্য—absolute zero
পরমাণু—atom
পরমাণু-ক্রমাঙ্ক—atomic number
পরমাণু তাপ—atomic heat
পরমাণু বাদ—atomic theory
পরাবর্তচুল্লী—reverberatory furnace
পরাবিদ্যুৎ—positive electricity
পরাবিদ্যুৎবাহী—electropositive
পরিবর্তাঙ্ক—transition temperature
পরিন্যাস—deposit
পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি—filtration
পরিস্রুৎ—filtrate
পরীক্ষা—experiments, test
পর্যায়—period
পর্যায়-সারণী—periodic table
পর্যায়-সূত্র—periodic law
পাতন—distillation
পাতনকুপী—distillation flask
পান-দেওয়া—tempering
পারদ—mercury
পারদসঙ্কর—amalgam
পারমাণবিক গুরুত্ব—atomic weight
পুনরুৎপাদন-প্রণালী—regenerative process
পেটালোহা—wrought iron
প্রকল্প—hypothesis
প্রকোষ্ঠপদ্ধতি—chamber process
প্রক্রিয়া—method, process
প্রণালী—method
প্রজ্বলন—ignition, burning
প্রতিবিন্যাস—rearrangement
প্রতিসরাঙ্ক—refractive index
প্রতিস্থাপন—displacement
প্রতিস্থাপিত—substituted
প্রবর্ধক—positive catalyst
প্রভাবক—catalyst
প্রভাবন—catalysis
প্রমাণ অবস্থা—N. T. P.
প্রমাণ উষ্ণতা—normal temperature
প্রমাণ ঘনত্ব—normol density
প্রমাণ চাপ—normal pressure
প্রমাণ দ্রবণ—standard solution
প্রলম্বিত—suspended
প্রলেপ—coating
প্রশম—neutral
প্রশমন—neutralisation
প্রশমন-ক্ষণ—neutral point
প্রসারণ—expansion
প্রসারাঙ্ক—co-efficient of expansion
প্রসার্যতা—ductility
প্রাণিজ-অঙ্গার—animal charcoal
প্রেষ—pressure
ফটকিরি—alum
ফুৎশিখা—blowpipe flame
ফেনা—froth, foam, lather
ফোয়ারা পরীক্ষা—fountain experiment

বকযন্ত্র—retort
বর্গ, শ্রেণী—group
বর্ণালী—spectrum
বর্ণালী-পটি—band spectrum
বর্ধক—positive catalyst
বন্ধন—fixation
বরধাতু—noble metal
বলয়-পরীক্ষা—ring-test

বলাহিত—activated
বস্তু—substance
বহুবৃত্তিক—enantiotropic
বহুযোজী—polyvalent, multivalent
বহুযৌগিক-ক্রিয়া—polymerisation
বহুরূপতা—allotropy
বাতচোষক—aspirator
বাধক—negative catalyst
বালিখোলা—sand-bath
বালু—sand
বায়ু—air
বায়ুচুল্লী—air oven
বায়ুমণ্ডল—atmosphere
বায়ুরোধী—air-tight
বাষ্প—vapour
বাষ্পঘনত্ব—vapour density
বাষ্পীভবন—vaporisation, evaporation
বিকারক—reagent
বিক্রিয়ক—reactant
বিক্রিয়া—chemical reaction
বিক্রিয়াজাত ফল—products, resultants
বিক্রিয়াতাপ—heat of reaction
বিগলন—smelting
বিগালক—flux
বিজারক—reducing agent
বিজারণ—reduction
বিদ্যুৎক্ষরণ, বিদ্যুৎমোক্ষণ—electric discharge
বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা—conduction of electricity
বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ—electric spark
বিন্দুপাতী, বিন্দুপাতী-ফানেল—dropping funnel
বিপরিবর্ত-ক্রিয়া—double decomposition
বিপরীত-অনুপাত—inversely proportional
বিবর্তন-চক্র—cycle
বিযোজন—decomposition
বিয়োজন—dissociation
বিরঞ্জক-চূর্ণ—bleaching powder
বিরঞ্জন—bleaching
বিরলমৃত্তিক মৌল—rare-earth elements
বিশোধন—refining
বিশোষক—absorbent
বিশোষণ—absorption
বিশ্লেষণ—analysis, decomposition
বিশ্লেষক ঝিল্লী—dialyser
বিস্ফোরক—explosive
বীজঘ্ন—disinfectant
বীজবারক—antiseptic
বুদ্বুদ—bubble
বুদ্বুদন—effervescence
বৃত্তাকার যৌগ—ring compounds
বেগ—velocity
ব্যাপন, ব্যাপ্তি—diffusion
ব্যাপন বেগ—velocity of diffusion
ব্যস্ত-অনুপাত—inversely proportional
ভঙ্গুর—brittle
ভস্ম—ash, calx
ভস্মীকরণ—calcination
ভাসমান—floating, suspended
ভাস্বর—incandescent
ভূসা—lampblack, soot
ভৌত—physical
মধ্যাবরক—diaphragm
মরিচা—rust
মাত্রিক—quantitative
মারুতচুল্লী—blast furnance
মালিন্য—impurities
মিথোনুপাত সূত্র—law of reciprocal proportions
মিশ্রণ, সংমিশ্রণ—mixture
মিশ্র পদার্থ—mechanical mixture
মূষাধার—clay-pipe triangle
মূচি—crucible
মূলক—radical
মৃৎক্ষার ধাতু—alkaline earth metals

মৃদু-অম্ল—weak acid
মৃদু-ক্ষার—weak base
মৃদু-জল—soft water
মৃদু-দহন—slow combustion
মৌল, মৌলিক পদার্থ—elements
যন্ত্র—apparatus
যুগ্ম-লবণ—double-salt
যুত-যৌগিক—additive compound
যোজক—bond, valence bond
যোজনভার—combining weight
যোজ্যতা—valency
যৌগ, যৌগিক পদার্থ—compounds
যৌগমূলক—radical
রঞ্জন—dyeing
রসায়ন—chemistry
রাগ-বন্ধক—mordant
রাগ-বন্ধন—mordanting
রাসায়নিক—chemical
রাসায়নিক পরিবর্তন—chemical change
রূপভেদ—allotropic modification
রূপান্তর—change
লঘু—dilute
লবণ—salt
লবণোদক—brine
লেই—paste
লোহিত তপ্ত—red-hot
লৌহচুর—iron filings
শক্তি—energy
শক্তি—strength, normality of a solution
শঙ্কু-কূপী—conical flask
শব্দহীন তড়িৎস্ফুরণ—silent electric discharge
শমিতলবণ—neutral salt
শিখা—flame
শিখা বিজারক—reducing flame
শিখা জারক—oxidising flame
শীতক—condenser
শুষ্ক পরীক্ষা—dry test
শুষ্কীকরণ—desiccation
শূন্যগর্ভ—hollow
শেষদ্রব—mother liquor
শোধন—purification
শোষকাধার—desiccator
শোষণ—absorption
শ্বেততপ্ত—white-hot
শ্রেণী—group
সঙ্কর—alloy
সঙ্কেত—formula
সঙ্কোচন—contraction
সংগঠন—formation
সংনম্যতা—compressibility
সংবৃত-চুল্লী—muffle furnace
সংমিশ্রণ—mixture
সংশ্লেষণ—synthesis
সংযুতি—composition
সংযুতি-সঙ্কেত—structural formula
সংযোগ—union
সংযোগসূত্র—laws of chemical combination
সক্রিয়—active, reactive
সঙ্কোচনশীল—compressible
সচ্ছিদ্র—porous
স্টীমপ্রকোষ্ঠ—steam oven
স্থিতিস্থাপকতা—volume elasticity
স্থিরানুপাত সূত্র—law of constant proportion
স্থূলসঙ্কেত—empirical formula
সন্ধিগত মৌল—transitional elements
স্ফটিক—crystal, quartz
স্ফটিক লবণ—rock-salt
স্ফটিকীকরণ—crystallisation
স্ফুটন—boiling
স্ফুটনাঙ্ক—boiling point
সন্ধান—fermentation
সমগোত্রীয়—homologous

সমসত্ত্ব—homogeneous
সমযৌগিক পদার্থ—isomers
সমযোজ্যতা—covalency
সম্পৃক্ত—saturated
সমাকৃতিত্ব—isomorphism
সমাকৃতিসম্পন্ন—isomorphous
সমাকৃতি-সূত্র—l. of isomorphism
সমীকরণ—equation
সর—film, layer
সরন্ধ্র—porous
সরল অনুপাত—simple ratio
স্বতঃজারণ—auto-oxidation
স্বতঃদহন—spontaneous combustion
সাঙ্কেতিক আলোক—signal light
সাক্ষাৎ সংযোগ—direct union
সাধারণ, সামান্য-মিশ্র—mechanical mixture
সান্দ্র—viscous
সান্দ্রতা—viscosity
সার—fertiliser
সারবন্দী-কার্বন-যৌগ—open-chain compounds
া—table
vermillion
সি প্রণালী—wet process
সীসক, সীসা—lead
সূত্র—law
সোদক—hydrated
সোরা, শোরা—saltpetre
সোহাগা—borax

হাতা—ladle
হাঁ-ধর্মী—positive
হিমমিশ্র—freezing mixture
হিমাঙ্ক—freezing point
হিমীভবন—freezing
হিরাকস্—green vitriol
ferrous sulphate
হীরক—diamond

পরিভাষা

(খ)

Absence of air—নির্বাত-অবস্থা
Absolute scale—পরমমাত্রা
Absolute temp.—পরম উষ্ণতা
Absolute zero—পরম শূন্য
Absorb—বিশোষণ
Absorbent—বিশোষক
Acceleration due to gravity—অভিকর্ষাঙ্ক
Acid—অম্ল, অ্যাসিড
Acidic— আম্লিক
Acidification—অম্লীকরণ
Acidimetry—অম্লমিতি
Acidity of a base—ক্ষারের অম্লগ্রাহিতা
Acid-proof—অম্লসহ
Acid salt—অম্ললবণ
Acid, strong—তীব্র অম্ল
Acid, weak—মৃদু অম্ল
Action—ক্রিয়া
Active—সক্রিয়
Activated—বলাহিত
Additive compound—যুত-যৌগিক
Affinity—আসক্তি
Air—বায়ু
Air oven—বায়ু-চুল্লী
Antiseptic—বীজবারক
Apparatus—যন্ত্র
Aqua regia—অম্লরাজ
Air-tight—বায়ুরোধী
Alcohol—কোহল
Alkali—ক্ষার
Alkali, caustic—তীক্ষ্ণ-ক্ষার
Alkali metals—ক্ষার ধাতু
Alkali, mild—মৃদু ক্ষার

Alkaline—ক্ষারীয়
Alkaline-earth metals—মৃৎক্ষার-ধাতু
Allotropic modification—রূপভেদ
Allotropy—বহুরূপতা
Alloy—সঙ্করধাতু
Alloy steel—ইস্পাতসঙ্কর
Alum—ফটকিরি
Amalgam—পারদমিশ্র, পারদ সঙ্কর, অ্যামালগাম
Amorphous—অনিয়তাকার
Amphoteric—উভধর্মী
Anaesthetic—চেতনানাশক
Analysis—বিশ্লেষণ
Anhydride—নিরুদক
Anhydrous—অনার্দ্র
Animal charcoal—প্রাণিজ-অঙ্গার
Annealing—কোমলায়ন
Aromatic—গন্ধবহ
Artificial fertiliser—কৃত্রিম সার
Aspirator—বাতচোষক
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল
Atom—পরমাণু, অ্যাটম
Atomic—পারমাণবিক, অ্যাটমিক
Atomic heat—পরমাণুতাপ
Atomic number—পরমাণু-ক্রমাঙ্ক
Atomic theory—পরমাণুবাদ
Atomic weight—পারমাণবিক গুরুত্ব
Auto-oxidation—স্বতঃজারণ

Balance—তুলা, নিক্তি
Base—ক্ষারক
Basic—ক্ষারকীয়
Basicity (of an acid)—ক্ষারগ্রাহিতা
Basic salt—ক্ষারলবণ
Basin—খর্পর
Bead—গুটী
Binary compound—দ্বিযৌগিক পদার্থ
Bivalent—দ্বিযোজী
Blast furnace—মারুত চুল্লী
Bleaching—বিরঞ্জন
Blowpipe flame—ফুংশিখা
Boiling—স্ফুটন
Boiling point—স্ফুটনাঙ্ক
Bone-ash—অস্থিভস্ম
Borax—সোহাগা
Brine—লবণোদক
Brittle—ভঙ্গুর
Bubble—বুদ্বুদ
Burner—দীপ
Bye-product—উপজাত

Calcination—ভস্মীকরণ
Calorific value—তাপনমূল্য
Clax—ভস্ম
Camphor—কর্পূর
Capillary—কৈশিক
Carbon—অঙ্গারক, কারবন
Carbon dioxide—অঙ্গারাম্ল
Cast iron—ঢালাই লোহা
Catalysis—প্রভাবন
Catalyst—প্রভাবক
Centrifugal force—কেন্দ্রাতিগ
Chamber process—প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি
Change—রূপান্তর
Charge—আধান
Chemical (adj.)—রাসায়নিক
Chemical change—রাসায়নিক পরিবর্তন
Chemical properties—রাসায়নিক ধর্ম
Chemistry—রসায়ন
Claypipe triangle—মুষাধার
Coagulation—তঞ্চন
Coal-tar—আলকাতরা
Coating—আবরণ, সর
Co-efficient of expansion—প্রসারাঙ্ক
Combining weight—যোজনভার
Combustible—দাহ্য
Combustion—দহন
Combustion tube—দাহ-নল

Common salt—খাদ্য লবণ
Composition—সংযুতি
Compound—যৌগিক, যৌগ
Compound radical—যোগজ মূলক
Compressible—সঙ্কোচনশীল
Compressibility—সংনম্যতা
Concentrate—গাঢ়ীকরণ
Concentrated—গাঢ়, গাঢ়তাপন্ন
Concentration—গাঢ়ীকরণ, -ভবন
Condensation—ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Condenser—শীতক, কন্‌ডেনসার
Conduction—পরিবাহিতা
Constant—নিত্য
Constituent—উপাদান
Constitution of matter—পদার্থের গঠন
Contraction—সঙ্কোচন
Co-ordinate covalency—অসমযোজ্যতা
Copper—তাম্র, তামা
Copper sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া
Copper turnings—কপারের ছিলা
Co-valency—সমযোজ্যতা
Crucible—মুচি, মুষা
Crystal—কেলাস
Crystallisation—কেলাসন
Cycle—বিবর্তন, চক্র

Decantation—আস্রাবণ
Decomposition—বিযোজন
Deflagrating spoon—উজ্জ্বলন-চামচ
Dehydration—নিরুদন
Deliquescence—উদগ্রহ
Deliquescent—উদগ্রাহী
Delivery tube—নির্গমনল
Density—ঘনত্ব
Deposit—পরিন্যাস
Desiccation—শুষ্কীকরণ
Desiccator—শোষকাধার
Destructive distillation—অন্তর্ধূমপাতন
Diacid—দ্বি-আম্লিক

Dialyser—বিশ্লেষক-ঝিল্লী
Diamond—হীরক
Diaphragm—মধ্যাবরক
Diatomic—দ্বিপরমাণুক
Dibasic—দ্বিক্ষারী
Diffusion—ব্যাপন
Dilute—লঘু
Direct combination, union—সাক্ষাৎ-সংযোগ
Disinfectant—বীজঘ্ন
Displacement—ভ্রংশ, প্রতিস্থাপন
Displacement downwards—অধোভ্রংশ
Displacement upwards—উর্ধ্বভ্রংশ
Dissociation—বিয়োজন
Dissolve—দ্রবীভূত করা
Distillation—পাতন
Distillation flask—পাতন-কূপী
Double decomposition—বিপরিবর্ত
Double salt—যুগ্মলবণ, দ্বিধাতুক লবণ
Dry test—শুষ্ক পরীক্ষা
Ductility—প্রসার্যতা
Dyeing—রঞ্জন

Eccentric—অসমকেন্দ্রী
Effervescence—বুদ্বুদন
Efflorescence—উদ্ত্যাগ
Electric discharge—বিদ্যুৎ-ক্ষরণ, মোক্ষণ
Electricity—বিদ্যুৎ, তড়িৎ
Electricity, negative—অপরাবিদ্যুৎ, না-ধর্মীবিদ্যুৎ
Electricity, positive—পরাবিদ্যুৎ, হাঁ-ধর্মীবিদ্যুৎ
Electricity neutral—উদাসী, তড়িৎ-নিরপেক্ষ
Electro-chemical equivalent—তাড়িত-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক
Electrode—তড়িৎ-দ্বার
Electrolysis—তড়িদ্বিশ্লেষ
Electrolyte—তড়িদ্বিশ্লেষ্য
Electrolytic—তড়িদ্বিশ্লিষ্ট

Electrolytic dissociation—তড়িৎ-বিয়োজন
Eectronegative—অপরাবিদ্যুৎবাহী
Electroplating—তড়িৎ-লেপন
Eiectropositive—পরাবিদ্যুৎবাহী
Electro-refining—তড়িৎ-বিশোধন
Element—মৌল, মৌলপদার্থ
Empirical formula—স্থূলসঙ্কেত
Enantiotropic—বহুবৃত্তিক
Endothermic—তাপগ্রাহী
Energy—শক্তি
Enzyme—এনঝাইম, উৎসেচক
Equivalent—তুল্যাঙ্ক
Eudiometer—ইউডিয়মিটার, গ্যাসমান যন্ত্র
Eudiometry—গ্যাসমিতি
Evaporation—বাষ্পীকরণ, ভবন
Exothermic—তাপ-উৎপাদক
Expansion—প্রসারণ
Experiment—পরীক্ষা, অভিক্রিয়া
Explosive—বিস্ফোরক
Extraction—নিষ্কাশন

Fertilizer—সার
Fermentation—সন্ধান
Film—সর
Filtrate—পরিস্রুৎ
Filtration—পরিস্রুতি, পরিস্রাবণ
Fire-proof—অগ্নিসহ
Fixation—বন্ধন
Flame—অগ্নিশিখা
Flame, oxidising—জারক শিখা
Flame, reducing—বিজারক শিখা
Flash-point—জ্বলনাঙ্ক
Flask—কাচকূপী
Flask, conical—শঙ্কুকূপী
Flask, distillation—পাতনকূপী
Flask, graduated—অংশাঙ্কিত কূপী
Floating—ভাসমান
Flowers of sulphur—গন্ধক-রজ
Fluid—তরল
Flux—বিগলক
Force pump—উৎক্ষেপী পাম্প
Formation—সংগঠন
Fountain experiment—ফোয়ারা পরীক্ষা, উৎস পরীক্ষা
Fractional crystallizaion—আংশিক কেলাসন
Fractional distillation—আংশিক পাতন
Freezing—হিমীভবন
Freezing mixture—হিমমিশ্র
Freezing point—হিমাঙ্ক
Froth—ফেনা
Fuel—ইন্ধন
Fuming—ধূমায়মান
Funnel, dropping—বিন্দুপাতী-ফানেল
Funnel, thistle—দীর্ঘনাল-ফানেল
Furance—চুল্লী
Furance combustion—দাহচুল্লী
Furance, muffle—সংবৃতচুল্লী
Furnace, reverberatory—পরাবর্তচুল্লী
Fused—গলিত
Fusion—গলন
Fusion mixture—গালক মিশ্র
Fusion point—গলনাঙ্ক

Gangue—খনিজ মল
Gas—গ্যাস, গ্যাসীয় অবস্থা
Gaseous diffusion—গ্যাস-ব্যাপন
Germicidal—কীটনাশক
Glass rod—কাচদণ্ড
Glass tube—কাচনল
Glaze—চিক্কণ লেপ
Gram-atom—গ্রাম-পরমাণু
Gram-equivalent—গ্রাম-তুল্যাঙ্ক
Gram-molecule—গ্রাম-অণু
Granulated zinc—দস্তার ছিবড়া
Gravimetric composition—তৌলিক সংযুতি

Gray—ধূসর
Green vitriol—হিরাকস
Group—শ্রেণী, বর্গ
Hardness—খরতা, কঠোরতা
Hard water—খরজল
Heat—তাপ, উত্তাপ
Heat exchange—তাপবিনিময়
Heat of reaction—বিক্রিয়া-তাপ
Heavy metal—গুরু-ধাতু
Heterogeneous—অসমসত্ত্ব
Homogeneous—সমসত্ত্ব
Homologous—সমগোত্রীয়
Hollow—শূন্যগর্ভ
Hydrated—সোদক
Hydrolysis—আর্দ্র-বিশ্লেষ
Hygroscopic—জলাকর্ষী
Hypothesis—প্রকল্প
Ignition—জ্বলন
Ignition temperature—জ্বলনাঙ্ক
Impurities—অপদ্রব্য, মালিন্য, আবর্জনা
Incandescent—ভাস্বর
Incendiary bombs—অগ্ন্যুৎপাদক বোমা
Indestructibility—অনশ্বরতা
Indicator—সূচক, নির্দেশক
Induction coil—আবেশ কুণ্ডলী
Inert, inactive—নিষ্ক্রিয়
Inflammable—দাহ্য
Ingredient—উপাদান
Inorganic—অজৈব, পার্থিব
Insoluble—অদ্রাব্য
Insulator—অন্তরক
Inversely proportional—ব্যস্ত অনুপাতে, বিপরীত অনুপাতে
Ionisation—আয়নিত হওয়া
Iron-filings—লৌহচূর্ণ
Iron, wrought—পেটা লোহা
Isomers—সমযৌগিক পদার্থ
Isomorphism—সমাকৃতিত্ব
Isomorphous—সমাকৃতি
Isotope—একস্থানিক
Jacket—কঞ্চুক, বহিরাবরণ
Ladle—হাতা
Lamp-black—ভুসা
Lather—ফেনা
Law—সূত্র
Law of Chemical combination—রাসায়নিক সংযোগ সূত্র
Law of conservation of matter—জড়পদার্থের নিত্যতাবাদ
Law of constant proportion—স্থিরানুপাত সূত্র
Law of equivalent proportion—তুল্যাঙ্ক-অনুপাত সূত্র
Law of gaseous volumes—গ্যাসায়তন সূত্র
Law of isomorphism—সমাকৃতি সূত্র
Law of multiple proportion—গুণানুপাত সূত্র
Law of partial pressure—অংশপ্রেষ সূত্র
Law of reciprocal proportion—মিথোনুপাত সূত্র
Lead—সীসক, সীসা
Lime—চুন
Lime kiln—চুনের ভাটি
Limestone—চুনাপাথর
Lime water—চুনের জল
Lustre—দ্যুতি
Malleability—ঘাতসহতা
Matter—জড়পদার্থ, পদার্থ
Mechanical mixture—মিশ্র পদার্থ
Melt—গলা
Melting point—গলনাঙ্ক
Mercury—পারদ
Metal—ধাতু
Metal, base—অবরধাতু

Metalloid—ধাতুকল্প
Metal, noble—বরধাতু
Mica—অভ্র
Milk of lime—চুনগোলা
Mineral—খনিজ
Mineral water—খনিজ জল
Mixture—মিশ্রণ, সংমিশ্রণ
Molar solution—আণবিক দ্রবণ
Molecular formula—আণবিক সঙ্কেত
Molecular weight—আণবিক গুরুত্ব
Molecule—অণু
Molten—গলিত
Monoacidic—একাম্লী
Monoatomic—একপরমাণুক
Monotropic—একবৃত্তি
Monovalent—একযোজী
Mordanting—রাগবন্ধন
Mortar—খল
Mother-liquor—শেষদ্রব
Multivalent—বহুযোজী

Nascent—জায়মান
Negative—ঋণাত্মক, না-ধর্মী, অপরা
Negative catalyst—বাধক
Neutral—প্রশমিত
Neutralization—প্রশমন
Neutral point—প্রশমক্ষণ
Neutral salt—প্রশম লবণ
Non-conductor—অপরিবাহী
Non-metal—অধাতু
Non-volatile—অনুদ্বায়ী
Normal density—প্রমাণ ঘনত্ব
Normality—তুল্যাঙ্ক মাত্রা
Normal pressure—প্রমাণ চাপ
Normal solution—তুল্য দ্রবণ
Normal temperature—প্রমাণ উষ্ণতা
N. T. P.—প্রমাণ অবস্থা

Occlusion—অন্তর্ধৃতি
Octahedral—অষ্টপলা, অষ্টতলক
Opaque—অনচ্ছ
Open-chain carbon compounds—সারবন্দী কার্বন যৌগ
Ore—আকরিক
Organic—জৈবজাতীয়
Organic solvent—জৈব দ্রাবক
Organic substance—জৈব পদার্থ
Oxidation—জারণ
Oxidising agent—জারক দ্রব্য

Passive iron—নিষ্ক্রিয় লৌহ
Paste—লেই
Period—পর্যায়
Periodic law—পর্যায়-সূত্র
Periodic table—পর্যায়-সারণী
Perforated ladle—ঝাঁঝরা হাতা
Phosphorescent—অনুপ্রভ
Physical change—অবস্থাগত পরিবর্তন
Physical property—অবস্থাগত ধর্ম
Plastic—নমনীয়
Plating—ধাতু-লেপন
Pneumatic trough—গ্যাসদ্রোণী
Polymerisation—বহুযৌগিক ক্রিয়া
Polyvalent—বহুযোজী
Porous—সরন্ধ্র, সচ্ছিদ্র
Positive catalyst—প্রবর্ধক, বর্ধক
Precipitate—অধঃক্ষেপ
Precipitation—অধঃক্ষেপণ
Preparation—প্রস্তুতি
Pressure—প্রেষ, চাপ
Process—পদ্ধতি
Promoter—উদ্দীপক
Property—ধর্ম
Pumice stone—ঝামা পাথর
Purificatoin—শোধন

Qualitative—আদিক
Quantitative—মাত্রিক
Quartz—স্ফটিক

Radical—মূলক

Radioactive—তেজস্ক্রিয়
Rare-earth elements—বিরলমৃত্তিক মৌল
Raw materials—কাঁচামাল
Reaction—বিক্রিয়া
Reaction product—বিক্রিয়াজাত ফল
Reactant—বিক্রিয়ক
Reactive—সক্রিয়
Reagent—বিকারক
Rearrangement—প্রতিবিন্যাস
Receiver—গ্রাহক
Red hot—লোহিত তপ্ত
Reducing agent—বিজারক দ্রব্য
Reduction—বিজারণ
Refining—শোধন
Regenerator—পুনরুৎপাদনকারী
Residue—অবশেষ
Retort—বকযন্ত্র
Reversible—উভমুখী
Ring compound—বৃত্তাকার যৌগ
Ring test—বলয় পরীক্ষা
Roasting—তাপ-জারণ
Rock salt—খনিজ লবণ
Rotatory furnace—ঘূর্ণচুল্লী
Rust—মরিচা

Safety lamp—নিরাপদ দীপ
Salammoniac—নিশাদল
Salt—লবণ
Salt, complex—জটিল লবণ
Sand—বালি
Sand bath—বালি খোলা
Saturated—সম্পৃক্ত
Sediment—গাদ
Sedimentation—থিতান
Signal light—সাঙ্কেতিক আলোক
Silent electric discharge—শব্দহীন তড়িৎস্ফুরণ
Slag—ধাতুমল
Slaked lime—কলিচুন
Slow combustion—মৃদু দহন
Smelting—বিগলন
Soft water—মৃদুজল
Solder—ঝালা
Solid—কঠিন
Soluble—দ্রবণীয়
Solubility—দ্রাব্যতা, দ্রবণীয়তা
Solute—দ্রাব
Solution—দ্রব, দ্রবণ
Solvent—দ্রাবক
Soot—ভুসা
Spark—স্ফুলিঙ্গ
Spectrum—বর্ণালী
Specific heat—আপেক্ষিক তাপ
Spontaneous combustion স্বতঃদহন
Standard solution—প্রমাণ দ্রবণ
Steel—ইস্পাত
Sterilization—নিবীজন
Stirrer—আলোড়ক
Strength—তীব্রতা, শক্তি
Strong acid—তীব্র অম্ল
Structural formula—সংযুতি-সঙ্কেত
Sublimation—ঊর্ধ্বপাতন
Substance—বস্তু
Suspended—প্রলম্বিত
Sulphur—গন্ধক
Super-heated—অতিতপ্ত
Super saturated—অতিপৃক্ত
Supporter of combustion—দহন-সহায়ক
Surface—তল
Symbol—সঙ্কেত
Synthesis—সংশ্লেষণ

Table—তালিকা, সারণী
Temperature—উষ্ণতা
Tempering—পান দেওয়া
Test—পরীক্ষা
Theory—তত্ত্ব
Thermal Unit—তাপীয় একক

Thermal dissociation—তাপ-বিয়োজন
Transformation—রূপান্তর
Transitional elements—সন্ধিগত মৌল
Transition temperature—পরিবর্তাঙ্ক
Trivalent—ত্রিযোজী
Trough—দ্রোণী
Tube—নল
Turbid—ঘোলাটে
Type element—আদর্শ মৌল
Ultraviolet rays—অতিবেগুনী আলো
Undecomposed—অবিকৃত
Union—সংযোগ
Unit—একক
Unsaturated—অসংপৃক্ত
Unstable—দুঃস্থিত, ক্ষণভঙ্গুর
Vaccum distillation—অনুর্ধ্বপাতন
Valence bond—যোজক
Valency—যোজ্যতা
Vapour—বাষ্প
Vapour density—বাষ্পঘনত্ব
Vaporisation—বাষ্পীকরণ, বাষ্পীভবন
Velocity—বেগ
Velocity of diffusion—ব্যাপন-বেগ
Vermillion—সিন্দূর
Viscous—সান্দ্র
Viscosity—সান্দ্রতা
Volatile—উদ্বায়ী
Volume—ঘনায়তন, আয়তন
Volume elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
Vortex rings—আবর্তবলয়
Water-bath—জলগাহ
Water of crystallisation—কেলাসজল
Weak acid—মৃদু অম্ল
Weak base—মৃদু ক্ষার
Weak solution—ক্ষীণ দ্রব
Weight—ওজন
Wet process—সিক্ত প্রণালী
White hot—শ্বেততপ্ত
Wire-gauge—তারজালি
Wood charcoal—কাঠকয়লা
Zinc—দস্তা
Zinc dust—দস্তা-রজ

মৌলপঞ্জী

মৌলিক পদার্থ	চিহ্ন	পারমাণবিক গুরুত্ব	পরমাণু-ক্রমাঙ্ক
অক্সিজেন	O	১৬'০০	৮
অসমিয়াম	Os	১৯১'৫	৭৬
আর্সেনিক	As	৭৪'৯১	৩৩
আরগন	A	৩৯'৯৪	১৮
আরবিয়াম	Er	১৬৭'৬৪	৬৮
আয়রন	Fe	৫৫'৮৫	২৬
আয়োডিন	I	১২৬'৯২	৫৩
আমেরিকিয়াম	Am	—	৯৫
অ্যালুমিনিয়াম	Al	২৬'৯৭	১৩
অ্যান্টিমনি	Sb	১২১'৭৬	৫১
অ্যাস্টাটিন	At	—	৮৫
ইউরেনিয়াম	U	২৩৮'০৭	৯২
ইউরোপিয়াম	Eu	১৫২'০	৬৩
ইণ্ডিয়াম	In	১১৪'৭৬	৪৯
ইটারবিয়াম	Yb	১৭৩'০৪	৭০
ইট্রিয়াম	Y	৮৮'৯২	৩৯
ইরিডিয়াম	Ir	১৯৩'১	৭৭
কৃপ্টন	Kr	৮৩'৭	৩৬
কপার	Cu	৬৩'৫৪	২৯
কার্বন	C	১২'০১	৬
কালিফোর্নিয়াম	Cf	—	৯৮
কোবাল্ট	Co	৫৮'৯৪	২৭
কুরিয়াম	Cm	—	৯৬
ক্লোরিন	Cl	৩৫'৪৫	১৭
ক্রোমিয়াম	Cr	৫২'০১	২৪
ক্যাডমিয়াম	Cd	১১২'৪১	৪৮
ক্যালসিয়াম	Ca	৪০'০৮	২০
গোল্ড	Au	১৯৭'২	৭৯
গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	১৫৭'৩	৬৪
গ্যালিয়াম	Ga	৬৯'৭২	৩১
জারমেনিয়াম	Ge	৭২'৩	৩২
জিঙ্ক	Zn	৬৫'৩৮	৩০
জিনন	Xe	১৩১'৩	৫৪

মৌলিক পদার্থ	চিহ্ন	পারমাণবিক গুরুত্ব	পরমাণু-ক্রমাঙ্ক
জরিকোনিয়াম	Zr	৯১'২২	৪০
টাংস্টেন	W	১৮৪'০	৭৪
টারবিয়াম	Tb	১৫৯'২	৬৫
টাইটেনিয়াম	Ti	৪৭'৯	২২
টিন	Sn	১১৮'৭	৫০
টেলুরিয়াম	Te	১২৭'৬১	৫২
ট্যানটালাম	Ta	১৮১'৪	৭৩
ডিসপ্রোসিয়াম	Dy	১৬২'৪৬	৬৬
থুলিয়াম	Tm	১৬৯'৪	৬৯
থোরিয়াম	Th	২৩২'১২	৯০
থ্যালিয়াম	Tl	২০৪'৩৯	৮১
নাইয়োবিয়াম	Nb	৯২'৯১	৪১
নাইট্রোজেন	N	১৪'০০৮	৭
নিকেল	Ni	৫৮'৬৯	২৮
নিয়ন	Ne	২০'১৮	১০
নিয়োডিমিয়াম	Nd	১৪৪'২৭	৬০
নেপচুনিয়াম	Np	—	৯৩
পটাসিয়াম	K	৩৯'০৯৬	১৯
প্লাটিনাম	Pt	১৯৫'২৩	৭৮
প্লুটোনিয়াম	Pu	—	৯৪
প্রেসিয়োডিমিয়াম	Pr	১৪০'৯২	৫৯
প্রোটো অ্যাক্টিনিয়াম	Pa	২৩১'০	৯১
প্রোমেথিয়াম	Pm	—	৬১
প্যালেডিয়াম	Pd	১০৬'৭	৪৬
ফস্‌ফরাস্	P	৩০'৯৮	১৫
ফ্লোরিন	F	১৯'০	৯
ফ্র্যান্সিয়াম	Fr	—	৮৭
বার্কেলিয়াম	Bk	—	৯৭
বিসমাথ	Bi	২০৯'০	৮৩
বেরিলিয়াম	Be	৯'০২	৪
বেরিয়াম	Ba	১৩৭'৩৬	৫৬
বোরন	B	১০'৮২	৫
ব্রোমিন	Br	৭৯'৯১	৩৫
ভ্যানাডিয়াম	V	৫০'৯৫	২৩
মলিবডিনাম	Mo	৯৬'০	৪২
মারকারি	H	২০০'৬	৮০
ম্যাসুরিয়াম	Ma	৯৭'৮	৪৩

মৌলিক পদার্থ	চিহ্ন	পারমাণবিক গুরুত্ব	পরমাণু-ক্রম
ম্যাঙ্গানিজ	Mn	৫৪'৯৩	২৫
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২৪'৩২	১২
রুথেনিয়াম	Ru	১[illegible]'৭	৪৪
রুবিডিয়াম	Rb	৮৫[illegible]	৩৭
রেডিয়াম	Ra	২২৬'০৫	৮৮
রেনিয়াম	Re	১৮৬'৩১	৭[illegible]
রোডিয়াম	Rh	১০২'৯১	৪৫
র‍্যাডন	Rn	২২২'০	৮৬
লিথিয়াম	Li	৬'৯৪	৩
লুটেসিয়াম	Lu	১৭৫'০	৭১
লেড	Pb	২০৭'২২	৮২
ল্যান্থানাম	La	১৩৮'৯২	৫৭
সামারিয়াম	Sm	১৫০'৪৩	৬২
সালফার	S	৩২'০৬৬	১৬
সিজিয়াম	Cs	১৩২'৯১	৫৫
সিলিকন	Si	২৮'০৬	১৪
সিলভার	Ag	১০৭'৮৮	৪৭
সিরিয়াম	Ce	১৪০'১৩	৫৮
সেলেনিয়াম	Se	৭৮'৯৬	৩৪
সোডিয়াম	Na	২২'৯৯	১১
স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	৪৫'১০	২১
স্ট্রনসিয়াম	Sr	৮৭'৬৩	৩৮
হলমিয়াম	Ho	১৬৩'৫	৬৭
হাইড্রোজেন	H	১'০০৮	১
হিলিয়াম	He	৪'০০৩	২
হাফনিয়াম	Hf	১৭৮'৬	৭২